বাংলা উপন্যাসের ধারা

শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী

পাঠভবন
১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : অনিতা মিত্র
পাঠভবন
১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (অক্টোবর ১৯৬১)

মুদ্রক : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ফর্মা ১ থেকে ১১ পর্যন্ত মুদ্রিত, ও শ্রীবিবেকরঞ্জন দাস অনুশীলনী প্রকাশন,
২০ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফর্মা ১২ থেকে ২৬ পর্যন্ত মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বহু আয়াসের পর 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের মিল এইটুকু যে দৈবাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম একই; কার্যতঃ দ্বিতীয় সংস্করণের বইটি একটি সম্পূর্ণ নতুন বই। প্রথম সংস্করণের যে সামান্য অংশ এ বইতে সংযোজিত হয়েছে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অথবা আলস্যের জন্য সেটুকুও বজায় না রাখতে পারলেই আমি খুশী হতাম। প্রথম যখন দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিয়েছিলাম, তখন উদ্দেশ্য ছিল যে আগের বইয়ের ফাঁকগুলি শুধু পূরণ করব। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে দেখলাম আগের বইয়ের প্রায় কিছুই বজায় রাখা যায় না।

বইখানি আমূল পরিবর্তন করেও আমি যে খুব সন্তুষ্ট হতে পেরেছি তা নয়। আসন্ন প্রকাশের মুহূর্তে মনটা খুবই খুঁত খুঁত করছে; মনে হচ্ছে সব কথা ঠিক মত গুছিয়ে লিখতে পারিনি। যদি কখনো তৃতীয় সংস্করণ বার করার সুযোগ পাই, তবে আর একবার হয়তো বইখানা ঢেলে সাজবার প্রয়োজন বোধ করব।

এই বই রচনায় আমি কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তা আমার পক্ষে বলা সহজ নয়। তবু খানিকটা আভাস দিতে চেষ্টা করব। আমার পদ্ধতি প্রথমত ঐতিহাসিক। আলোচনার সুবিধার জন্য আমি সমগ্র কালকে কয়েকটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভাগ করেছি এবং ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটি পর্যায়ের কালসীমার মধ্যে পরিবেশ মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত। এই ধরনের বিভাগ কৃত্রিম হলেও বোধ করি অপরিহার্য। আমি আরও ধরে নিয়েছি যে কোন বিশেষ দেশের কোন বিশেষ কালের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বৈদেশিক প্রভাব, ঐতিহ্যগত প্রভাব প্রভৃতি মিলিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা সেই দেশের সেই কালের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। তার মানে এই নয় যে কোন দেশের কোন কালের পরিবেশকে জানলেই তার সাহিত্যের সম্ভাব্য রূপটা অনুমান করা যায়। কোন লেখক বা তাঁর সাহিত্য-কর্ম পূর্বানুমান-সাপেক্ষ নয়। পরিবেশ এবং সাহিত্য-কর্মকে পাশা-পাশি রাখলে

আমরা উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা বুঝতে পারি বটে, কিন্তু পরিবেশ দ্বারা সাহিত্য-কর্মকে ষোল আনা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ লেখকের সক্রিয় মন পরিবেশকে নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী অনুধাবন করে, সমালোচনা করে, অতিক্রম করে যেতে চেষ্টা করে। লেখকের বোধের সীমার বাইরে পরিবেশের অনেক কিছু থেকে যায়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তিনি পরিবেশকে অতিক্রম করে যান। এই কারণেই প্রত্যেক লেখক এবং তাঁর শিল্প-কর্ম বিশিষ্ট এবং অনন্য। এই অনন্যতাকে অনুসন্ধান করা আমি আমার কর্তব্য-কর্ম বলে গণ্য করেছি।

দ্বিতীয়ত, আমার পদ্ধতি প্রধানতঃ ব্যাখ্যামূলক। লেখকের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মের গূঢ় তাৎপর্যকে উপস্থাপিত করাই আমার লক্ষ্য: যদিও আমি জানি এ দুরূহ কাজে যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সমালোচনা এবং বিচারের অপ্রিয় দায়িত্ব আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছি; কারণ কাজটা শুধু অপ্রিয়ই নয়, বিচারের কোন নির্ভরযোগ্য সর্বজনীন মানদণ্ড আছে কিনা সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং রূপ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু নয়। বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে গেলেই তা কোন-না-কোন রূপ গ্রহণ করবে, এবং সেই রূপের বাইরে বিষয়-বস্তুর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা স্বতন্ত্র ভাবে রূপ-রীতি নিয়ে আলোচনা করি; আর তা সম্ভবপর এই জন্য যে বিষয়বস্তুর অসংখ্য বৈচিত্র্য থাকলেও উপন্যাসের মৌল সাংগঠনিক রীতি মাত্র অল্প কয়েকটি। এ বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপ-রীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়। তথাপি বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে আমি মাঝে মাঝে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি।

সাহিত্যের আলোচনায় যাঁরা 'প্রফাণ্ডিটি' আশা করেন, আমার আশঙ্কা এ বই পড়ে তাঁরা গভীরভাবে মর্মাহত হবেন। কারণ আমি যথাসাধ্য স্পষ্ট, যথাযথ এবং সহজবোধ্য ভাষায় আমার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। সাঙ্কেতিকতার নামে দুর্বোধ্যতা এবং ভাষার কুহক সৃষ্টি আমার ঠিক আসে না, এবং আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেরই নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ বই সর্বস্তরের, এমন কি সাহিত্য ব্যাপারে অনভিজ্ঞ পাঠকের কথা ভেবে লেখা, বিশেষ ভাবে ছাত্রদের কথা ভেবে লেখা নয়। কিন্তু সেজন্যই আমার বিশ্বাস এ বই সত্যি সত্যি ছাত্রদের কিছু কাজে লাগতে পারে।

পরিশেষে একটি অবান্তর কথা বলি। যদিও সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য কোন সস্তা উপদেশ লাভ করা নয়, তবু বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে যদি কোন উপদেশ লাভ করা সম্ভব হয় তো তা এই : বাংলা উপন্যাসকে যদি সুনিশ্চিত অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণ পেতে হয় তবে দুটি জিনিসের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। লেখককে মনে রাখতে হবে যে সমকালীন জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু বা প্রেরণা হওয়া উচিত। লেখক যদি আন্তরিকভাবে ভনিতা ও অহমিকাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেন, তবেই তাঁর রচনায় সত্যিকারের মৌলিকতা আত্মপ্রকাশ করবে। লেখককে আরও মনে রাখতে হবে যে উপন্যাসকে তিনি যদি সাময়িক চিত্ত-বিনোদনের উপায় থেকে অধিক মর্যাদা দেন, এবং নিছক উদ্দেশ্যমূলক বা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার বলে গণ্য না করেন, তবে তাঁর পরিকল্পিত উপন্যাসকে অবশ্যই একটি নিটোল শিল্প-কর্ম হয়ে উঠতে হবে। সাহিত্য যদি সাহিত্য-কর্ম হিসাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে, তবেই তার অন্যবিধ মূল্যের প্রশ্ন ওঠে।

অবশেষে, যাঁরা আমার প্রথম সংস্করণের বইখানাকে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদেরকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশের ব্যাপারেও আমি বহু বন্ধু বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীর কাছে নানাভাবে ঋণী। বিশেষ করে অধুনা-লুপ্ত 'নতুন সাহিত্যে'র সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার সিংহ এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিনয় ঘোষের আনুকূল্য-লাভ না করলে এই বই কখনোই আত্মপ্রকাশ করত না। তাঁদের কাছে মামুলি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি প্রীতির সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করব না।

অচ্যুত গোস্বামী

উৎসর্গ-পত্র

অগ্রজ

অধ্যাপক **শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী-কে**
যাঁর সঙ্গে আমার মতের অমিল থাকলেও
নিরঙ্কুশ আন্তরিকতারজন্য যাঁকে আমি
শ্রদ্ধা করি।

প্রথম পরিচ্ছেদ | উপন্যাস

পৃথিবী অনেক বড়; সাদা চোখে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সামান্য আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়। চাঁদে গেলে হয়তো আমরা দূর থেকে পৃথিবীর গোলাকৃতি দেখে ধন্য হতে পারতাম; কিন্তু আপাতত আমরা চাঁদে যেতে পারছি না। কাজেই আমাদের পৃথিবীর মানচিত্র বা গ্লোব দেখার আগ্রহ। তেমনি জীবন অনেক বড়; আমাদের ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের মধ্যে জীবনের খুব সামান্য ভগ্নাংশই আমরা দেখতে পাই; জীবনের একটি ঘটনার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেখার জন্য আমাদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। তাই সেই আদিম কাল থেকেই মানুষের মনে গল্প শোনার আগ্রহ—ঘটনার শেষ পরিণতি জানার জন্য।

অন্যান্য শিল্পকর্ম থেকে কাহিনী বা গল্পের তফাৎ এই যে তা চলিষ্ণু পরিবর্তনশীল জীবনের পরিচয় দেয়। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের নিজের বৃত্তে গতিশীল বলে গতিশীলতার অভিজ্ঞতা তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

কিন্তু গল্প-কাহিনী যে জ্ঞান দেয় তার একটা বিশেষ জাত আছে। জ্ঞানার্জনের নানান পথ আমাদের জানা আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে বিশ্লেষণ করে, শ্রেণী বিভাগ করে, তার গুণাগুণ নির্ধারণ করে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তার নাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা empirical knowledge। আর এক ধরনের জ্ঞান বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা লভ্য; যুক্তিপন্থী (rationalist) দার্শনিকরা এই জ্ঞানের সাধক। মনের যে শক্তিটির দ্বারা আমরা এই দুই জাতের জ্ঞানের সাধনা করি তার নাম বুদ্ধি বা intellect। কিন্তু এ দুটি পদ্ধতি ছাড়া জ্ঞান লাভের আর একটি উপায় হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শিশু যেমন কোনো একটা জিনিস হাতে পেলে তার গায়ে হাত বুলিয়ে স্পর্শানুভূতি লাভ করে, চোখ দিয়ে

তার বর্ণ-বিশেষত্ব দেখে নেয়, মুখে দিয়ে তার স্বাদটুকু এবং কঠিনত্ব বা কোমলত্ব বুঝতে চেষ্টা করে, তেমনি ভাবে জ্ঞান-অর্জন করার নামই প্রত্যক্ষ বা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণ-জ্ঞান নয়; চোখ দিয়ে কোনো জিনিসের সবটুকু এক সঙ্গে দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় না সেটুকুকে আমরা কল্পনা দ্বারা পূরণ করে নিই। আবার বর্তমানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান মিলিয়ে নিতে হলেও কল্পনা বা ইম্যাজিনেশনের দরকার হয়। কল্পনাই অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আইডিয়া হিসাবে মনের মধ্যে ধরে রাখে। বিজ্ঞানের কাজ বিশ্লেষণাত্মক; কল্পনার কাজ সংশ্লেষণাত্মক, সে একবারে সমগ্রকে দেখে নেয়।

অনেক সময় বুদ্ধিসম্মত যুক্তি-পারম্পর্য একসঙ্গে সংশ্লেষিতভাবে কল্পনায় বিধৃত হয়। সেই জন্যই গল্প-কাহিনীতে যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্য বা যুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়।

এই ইম্যাজিনেশনের জ্ঞানই শিল্প সাহিত্য তথা গল্প-কাহিনীর উপজীব্য। মনে রাখা দরকার শৈল্পিক ইম্যাজিনেশন মূলত সৃষ্টিধর্মী। তা বাস্তব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নতুন বাস্তব রচনা করে যার অস্তিত্ব শুধু মানুষের মনে। এইভাবে কল্পিত ইমেজের মারফৎ বৃহৎ দুরাধিগম্য বাস্তবকে বোঝার চেষ্টা চলে। প্রত্যেক মানবিক কর্মের সঙ্গেই কিছু না কিছু ভালো-লাগা মন্দ-লাগা জড়িত থাকে। বিজ্ঞান বা দর্শনের অনুশীলনেও কিছু অনুভূতি জড়িত থাকে। ইম্যাজিনেশনের সঙ্গে আবেগ অনুভূতির যোগ আরও নিবিড়, কারণ তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কাজেই ইম্যাজিনেশনলব্ধ অভিজ্ঞতা কিছু আবেগ বা অনুভূতি অবশ্যই জাগ্রত করে। আবার অপর মানুষের আবেগ অনুভূতির স্বরূপ বুঝতে হলেও আমরা ইম্যাজিনেশনের সাহায্য নিই।

ইম্যাজিনেশনের সাহায্যে আমরা যে শুধু জ্ঞান লাভ করি তাই নয়, তা আমাদের সুখ লাভেরও উপায় বটে। ঘটনা বাস্তবে যেমন করে ঘটে শুধু তা জেনেই আমরা সন্তুষ্ট নই; ঘটনা যেমন করে ঘটলে আমরা খুশি হই, তার কদরও আমাদের কাছে কম নয়। আবার কিছু কিছু মানব-কল্যাণকামী ব্যক্তি আছেন যাঁরা ঘটনা যেমন করে ঘটলে মানুষের কল্যাণ হয় তার উপর গুরুত্ব দেন। আমাদের জ্ঞান-তৃষ্ণার সঙ্গে সুখ-কামনা এবং কল্যাণ-কামনা যুক্ত হয় বলেই ইম্যাজিনেশন-সৃষ্ট শিল্প সাহিত্যের আলোচনা এত জটিল হয়ে উঠেছে। বস্তুত বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনায় যেমন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার একটা

প্রয়াস আছে, ইম্যাজিনেশনের পথিকদের মধ্যে তেমন ভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসার খুব তাগিদ দেখা যায় না। শিল্প-সাহিত্য তাই সব সময় সৃষ্টি-কর্তার ব্যক্তিত্বের রঙে অনুরঞ্জিত। শৈল্পিক নির্লিপ্ততা (detachment) বা নিরপেক্ষতা (objectivity) বলে একটি কথা আছে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র, তা যতখানি ভঙ্গি ততখানি বাস্তব নয়।

এবার আমরা উপন্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত গল্প-কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তার সামান্য খোঁজখবর নেব।

পুরাকাহিনী বা myth—সাম্প্রতিককালে অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বাইবেল-কথিত এবং প্রাচীন গ্রীসের মিথ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। এ সব পুরা-কাহিনীর মধ্যে অনেক অলৌকিক ব্যাপার আছে বলে এগুলি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। অতি প্রাচীনকালে যখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্ম হয়নি যখন বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট, তখন এই সব মিথের জন্ম হয়েছিল। আদিম মানুষের চিন্তা অত্যন্ত রূপকধর্মী ছিল; কাজেই পুরা-কাহিনীর অলৌকিকত্বের মধ্যে অনেক রূপক-তাৎপর্য আমরা আবিষ্কার করতে পারি। সেকালের মানুষেব অনেক দার্শনিক ও নৈতিক ভাবনা এই সব পুরা-কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। এগুলির যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও সম্প্রতি অনুমান করা গিয়েছে। আদম এবং ঈভের চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে পুরুষ এবং নারী চরিত্রেব চিরন্তন পার্থক্য সূচিত হয়েছে। শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ ঈভের কাহিনী নিঃসন্দেহে একটি রূপক। আবেল ও কালিবের কাহিনীর মধ্যে সেকালের নৈতিক চিন্তা এবং problem of evil-এর প্রকাশ ঘটেছে। বিখ্যাত গ্রীক নাটক ঈডিপাস ওরেগ্নন প্রভৃতি মিথিক্যাল কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। এদের মধ্যে গ্রীকদের নৈতিক ও নিয়তিবাদী চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। মিসেস্ সুসান্না ল্যাঙ্গার (Mrs. Susanna Langer) মিথকে "Primitive phase of metaphysical thought, the first embodiment of general ideas." (Philosophy in a New Key—P 201) বলে গণ্য করেছেন।

পুরা-কাহিনীকে প্রকৃত অর্থে সাহিত্য-কর্ম বলে গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ; কারণ সাহিত্য হচ্ছে illusion of reality—বাস্তবের ভ্রান্তি, বাস্তব নয়। অথচ প্রাচীন মানুষের কাছে মিথ আর বাস্তবে কোনো প্রভেদের চেতনা ছিল না। কিন্তু প্রাচীন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মিথকে যদি সাহিত্য-কর্ম বলে

গণ্য না করা যায়, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা যাবে না কেন আমি ঠিক বুঝি না। আমরা তো জানি যে মিথ আসলে রূপক বা প্রতীকী কাহিনী, যা বাস্তব-সত্যের উপর আলোক নিক্ষেপ করে, কিন্তু বাস্তব নয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন করা হয়েছে, ভারতবর্ষীয় পুরা-কাহিনী সম্পর্কেও অনুরূপ গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, অন্যান্য পুরাণ এবং উপনিষদের মধ্যে অনেক মিথিক্যাল কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। নচিকেতার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, পুরু কর্তৃক যযাতির জরাভার গ্রহণ, সূর্য-কর্তৃক কুন্তীর গর্ভবতী হওয়া, লাঙলের ফলায় সীতার জন্মলাভ, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান প্রভৃতি এখনও আমাদের জনসমাজে বহুলপ্রচলিত। কুন্তীর কাহিনীর মধ্যে সূর্যের জীবনদায়িনী শক্তির ইঙ্গিত থাকা সম্ভব এবং সীতার কাহিনীর মধ্যে সম্ভবত মাটি যে সমস্ত জীব জগতের আদি উপাদান এই ইঙ্গিত রয়েছে। সাবিত্রী ও নলের উপাখ্যানের মধ্যে মানুষের গভীর প্রেম ও সত্যনিষ্ঠা যে দৈবী শক্তির উপরও জয়লাভ করতে পারে এই দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে।

আজও আমরা স্বপ্নের মধ্যে মিথ তৈরি করি। কার্ল ইয়ুং (Carl Jung) বলেছেন যে কখনও স্বপ্নের মধ্যে এমন জটিল প্রতীকী সংগঠন দেখা যায় যার সঙ্গে প্রাচীনকালের মিথের যথেষ্ট মিল আছে। মানুষের অচেতন মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে এ জাতীয় স্বপ্ন এবং মিথের জন্ম। মিথের মধ্যে মানুষের মৌল প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করা যায়—এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের পুরাণ কাহিনীকে উচ্চস্তরের সাহিত্য-কর্ম বলে মানতে আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। অন্তত প্রাচীনকালের মিথ যে পরবর্তী কালের যাবতীয় সাহিত্য-কর্মের জনক এ বিষয়ে বোধ করি সামান্যই সন্দেহের অবকাশ আছে।

রূপকথা বা Folk Tale—নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ধর্মীয় আচার নিয়ম (rituals), মিথ এবং ফোক্ টেলস্—যে কোনো জাতির প্রাচীন ইতিহাসে খুঁজলে পাওয়া যায়। তার মানে রূপকথাও প্রায় মিথের মতোই প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে। কথাসরিৎসাগর এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি সম্ভবত প্রাচীনকালের রূপকথার উদাহরণ। বাংলা দেশের যে সমস্ত রূপকথা লোকসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং যার কিছু কিছু লালবিহারী দে-র Folk Tales of Bengal এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের ঠাকুমার ও ঠাকুরদাদার ঝুলিতে সংকলিত

হয়েছে, সে-সবের যে কবে কোথায় জন্ম হয়েছিল তা আমরা জানি না। খুব সম্ভব অনেক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এসে এগুলি বর্তমানের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

পুরাণ কাহিনীর মতো গভীর তাৎপর্য রূপকথায় নেই। পুরাণ কাহিনীর কল্পনার ভিত্তি রূপক এবং প্রতীক: রূপকথা অনেক সময়ই আজগুবি কল্পনার সৃষ্টি। এবং সেই জন্যই রূপকথা অনেক বেশি উপভোগ্য। আমরা যাকে ইংরাজিতে make-believe বলি, রূপকথার কাহিনী অনেকটা সেই জাতের। পিপাসা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমরা যেমন অনেক জল খাওয়ার স্বপ্ন দেখি, রূপকথাও সেই রকম আমাদের অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনার আশাতীত চরিতার্থতার স্বপ্নজগৎ। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন থেকেই রূপকথার উদ্ভব। মিথের সঙ্গে রূপকথার একটি মস্ত তফাৎ এই যে মিথের সঙ্গে গভীর বিশ্বাস জড়িত বলে আদিম মানুষ মিথকে কল্পনা বলে ভাবতে পারত না; কিন্তু রূপকথা যে কাল্পনিক তা কথক এবং শ্রোতা উভয়েরই জানা। কাজেই মিথকে সাহিত্য-কর্ম বলা চলে কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও রূপকথাকে অনায়াসে সাহিত্য বলা চলে। যদিও তা নিম্নস্তরের সাহিত্য।

রূপকথার একটি সম্ভাব্য মডেল এই রকম: শিকার করতে করতে রাজপুত্র পথ হারিয়ে এক ঘুমন্ত রাজপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক নিদ্রিত রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলে তিনি জানলেন রাজ্যটি রাক্ষস-কবলিত। রাক্ষস বধ করে রাজকন্যাকে বিবাহ করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। অথবা, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ফল খেয়ে রানীরা গর্ভবতী হল, সকলের টুকটুকে ছেলে হল, কিন্তু ছোট রানীর ফল-বাটার পরিমাণ কম হয়েছিল বলে তার গর্ভে হল বানর। তারপর ছয় রানীর ও তাদের ছয় ছেলের ঈর্ষা ও হিংসাকে পরাস্ত করে সেই বানর পুত্র শেষ পর্যন্ত জয়ী হল এবং হিংসুটেরা উপযুক্ত শাস্তি পেল। বলা বাহুল্য বানর-পুত্র উপযুক্ত রাজকন্যাও লাভ করল এবং শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, সে দিব্যি মানুষ, বানরের খোলস পরে থাকে মাত্র।

এ-সবের চেয়ে কেশবতী রাজকন্যা, মধুমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি গল্পগুলি আর একটু উচ্চস্তরের এবং শিশুদের অপেক্ষা বয়স্কদের অধিকতর উপযোগী। কারণ এই গল্পগুলির মূল আবেগ ভাবোচ্ছ্বাসমূলক প্রেম। বারো হাত চুল দেখে এক রাজপুত্র চুলের মালিককে লাভ করার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। মধুমালাকে স্বপ্নে দেখে আর এক রাজপুত্র প্রেমে অন্ধ হয়ে গেলেন। উভয় কাহিনীতেই

বহু বাধা-বিঘ্ন জয় করে রাজপুত্র শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিত রাজকন্যাকে লাভ করলেন।

রূপকথা হল মানুষের কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাহিনী। আমাদের কল্পনায় রাজা বা রাজপুত্র সব চেয়ে সুখী; কাজেই রূপকথার নায়ক সর্বদাই রাজা বা রাজপুত্র, কাঠুরে নায়কও শেষ পর্যন্ত রাজ্য লাভ করবে। মানুষের প্রধান কামনা কাঞ্চন আর কামিনী রূপকথার জমকালো কাহিনীতে আশাতীত রকমে সহজলভ্য। ইরাণের আরব্যোপন্যাসও মূলত এই জাতের কাহিনী; তবে আরব্যোপন্যাসে চমৎকারিত্ব বেশি, বাংলা রূপকথায় কবিত্ব বেশি।

রূপকথার কাহিনীর কোনো সামাজিক ভিত্তি নেই। তার মধ্যে কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের পরিচয় নেই। এক কালে সরল বিশ্বাসী, দরিদ্র, জীবনে বঞ্চিত গ্রামবাসীদের কাছে রূপকথা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। শহর এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা বয়স্কদের রাজ্য ছেড়ে শিশুদের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

নিছক মনোরঞ্জন করাই রূপকথার উদ্দেশ্য হলেও রূপকথা পাঠকের মধ্যে কতকগুলি সরল বিশ্বাসের জন্ম দেয়। মানুষের কামনা যদি সৎ আর আন্তরিক হয় তবে পথে যত বাধা-বিঘ্নই দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত সে তার কামনার বাস্তবকে লাভ করবেই। অশুভ শক্তি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবেই। রূপকথা এই সরল বিশ্বাসকে জাগ্রত করে মানুষের কর্মোদ্যমকে সাহায্য করে।

উপকথা বা Fable—হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রে পশুপক্ষীতে মনুষ্যধর্ম আরোপ করে তাদের নিয়ে এক জাতের গল্প লেখা হয়েছে। ইওরোপের ঈশপের গল্পমালার মধ্যেও একই ধরনের প্রয়াস দেখা যায়। জাতক-কাহিনী-গুলি অবশ্য একটু ভিন্ন জাতের; তার মধ্যে উচ্চতর মানবিক ভাবাদর্শকে উপস্থাপনার চেষ্টা আছে। এই সব কাহিনীকে উপকথা নাম দেওয়া চলতে পারে। রূপকথার মতো এ সব কাহিনীও লোকসমাজে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে এক কালে, বা এখনও হয়ে থাকে।

রূপকথার উদ্দেশ্য entertainment—সাময়িক আনন্দ লাভ; তার আর কোনো প্রত্যক্ষ উপযোগিতা নেই। কিন্তু উপকথার কাহিনীর বাস্তব উপযোগিতা আছে, এগুলিকে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ wisdom-এর সংগ্রহ-শালা বলা চলতে পারে। শৃগালের মিষ্টি কথায় ভুলে বায়স মুখ খুলল আর তার মুখের পিষ্টক খণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। শৃগালের কথায় ভুলে ছাগল

কুয়োয় লাফিয়ে পড়ল; শৃগাল তার পিঠে চড়ে মাটিতে উঠে এল, ছাগল কুয়োর মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। এই জাতীয় অজস্র কাহিনীর মধ্যে প্রতারকের মিষ্ট কথায় ভুললে ঠকতে হয়, বোকাকে শাস্তি পেতে হয়, বুদ্ধিমান প্রবলতর শত্রুর উপরও জয়ী হতে পারে ইত্যাদি নানা উপদেশাত্মক বক্তব্য থাকে। আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি গ্রামের বৃদ্ধ অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিরা এই ধরনের গল্প উদ্ভাবন করে বালকদের বা তরুণদের শোনাতেন। যা নিতান্ত বাস্তবের ঘটনা তাকে পশুপক্ষীর জীবনে রূপান্তরিত করায় এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। যা ছিল বাস্তবের বিষয়, তা হয়ে দাঁড়াল কল্পনার বস্তু; অথচ তবু তা বাস্তব উপযোগিতা হারাল না। এই জন্যই গল্পগুলি এক ধরনের শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে।

রূপকথার গল্পের সঙ্গে উপকথার গল্পের কিছু সাংগঠনিক পার্থক্য আছে। রূপকথার গল্পের যত সমস্যা, যত অশান্তি-উদ্বেগ-যন্ত্রণা সব কিছু কাহিনীর মধ্যে নিরসন হয়ে কাহিনীর সুখজনক সুসমাপ্তি ঘটে। তার ফলে এই কাহিনী মনকে পুরোপুরি ভাবনা-মুক্ত ও পরিতৃপ্ত করে; কাহিনীর কোনো জের আর মনের মধ্যে থাকে না। কিন্তু উপকথার কাহিনীতে দুর্বৃত্তকে বা অজ্ঞাত কুলশীলকে বিশ্বাস করার ফলে শাস্তি পেতে হয়, এবং সে শাস্তি চূড়ান্ত; অপরাধ না করেও শাস্তিলাভের কোনো প্রতিকার কাহিনীর সীমার মধ্যে ঘটে না বলে কাহিনীর জের আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় এবং আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই উপকথা হল প্রয়োজনীয় শিল্প—useful art।

ব্রতকথা—লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি আজকাল পুস্তকাকারে কিনতে পাওয়া যায়। আগের দিনে বিভিন্ন পূজার সমাপ্তির পর মেয়েরা দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কাহিনী উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে শোনাত। এরই নাম ব্রতকথা; এবং এর মধ্যে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু কাহিনী থাকে বলে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়ে পড়েছে। সাধারণত ব্রতকথার মধ্যে যে সব কাহিনী থাকে তা খুব সরলরেখাত্মক; তার মধ্যে তেমন কোনো নাটকীয়তা বা গভীরতা নেই। যেমন, লক্ষ্মীর পাঁচালীতে একটি কাহিনী আছে: অবন্তীনগরের এক সওদাগর ধনগর্বে গর্বিত হয়ে লক্ষ্মী দেবীকে অবজ্ঞা করেছিল; তার ফলে তার আর দুর্দশার সীমা থাকে না; লক্ষ্মীর ব্রত আরম্ভ করার ফলে তার সমস্ত দুর্দশার অবসান ঘটল।

এ-সব কাহিনী শিল্পকর্ম হিসাবে তুচ্ছ হলেও একে নিছক কুসংস্কারের পরিপোষক বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে—লক্ষ্মী দেবী ধন দান করেন, তাই বলে লক্ষ্মী পূজা পরিশ্রম করে ধনোপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা নয়। কোনো ব্রতকথাতেই এমন উক্তি নেই যে পরিশ্রম না করেও শুধু লক্ষ্মীর পূজা করেই ধন লাভ করা যায়। যারা লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তিমান তাদের আচরণেও এ ধরনের কোনো প্রবণতা দেখা যায় না। তবে লক্ষ্মী পূজা এবং তার অনুষঙ্গ ব্রতকথার সামাজিক উপযোগিতা কিসে? এর সামাজিক উপযোগিতা হল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ফলপ্রাপ্তির আশায় মানুষ যে দিনের পর দিন ক্লান্তিকর একঘেয়ে কাজ করে যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ প্রেরণা এবং সাফল্যের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। আদিম মানুষরা ম্যাজিক বলে কথিত যে সব রীতি-নীতি পালন করত তা-ও এই ধরনের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য বলে অধ্যাপক কলিংউড্ (Collingwood : Art & Aesthetics) অনুমান করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে এই ধরনের আর্টকে ম্যাজিক্যাল আর্ট নাম দেওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য—যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁচালী বা ব্রতকথার প্রচলন হয়েছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিরও প্রচার হয়েছিল। তবে আকারে অনেক বৃহৎ বলে এগুলি নিছক দেব-দেবীর পূজার অনুষঙ্গ মাত্র হয়ে থাকেনি ; এগুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে আসরে গাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। জীবনের নিরাপত্তা এবং জাগতিক কামনা-বাসনার চরিতার্থতার জন্য দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করাই এ মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির উদ্দেশ্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় মানুষদের জীবনযাত্রায় এগুলির অত্যন্ত ব্যাপক উপযোগিতা ছিল। দৈনন্দিন কর্ম জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ এবং প্রেরণা এই কাহিনীগুলি সরবরাহ করত। তার একটি সহজ প্রমাণ এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পেশার সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনীর একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, সাপুড়েদের মধ্যে চাঁদ সদাগরের কাহিনী, ব্যাধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কালকেতুর কাহিনী, নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে গোরখনাথ মীননাথ কাহিনী। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' নামক উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বেদেদের জীবনযাত্রার পিছনে যে মানস-পরিমণ্ডল তার উপর চাঁদসদাগর বেহুলার কাহিনীর প্রভাব কত গভীর। যে-সব কাহিনী মানুষের রুক্ষ অনুর্বর কঠোর জীবন সংগ্রামের পিছনে জীবন-রস সঞ্চার করেছে তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া কখনই সঙ্গত নয়।

বলা বাহুল্য কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই এ সব কাহিনী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা অনার্য। কিন্তু মুকুন্দরাম প্রমুখ উচ্চ বর্ণের কবিগণ এ সব কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন। তা আর্য কালচার কর্তৃক অনার্য কালচার আত্মসাৎ করার একটি উদাহরণ হতে পারে। ভারতবর্ষীয় চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে এদেশে বিভিন্ন কালচার অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় না। তাই আর্যরা যেমন অনার্য মঙ্গলকাব্যকে গ্রহণ করেছে, তেমনি আমাদের অনার্য রক্ত সম্ভূত নিম্নবর্ণের সমাজ রামায়ণ মহাভারত বৈষ্ণবকাব্যকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্য আর রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে কোনো রকম সংমিশ্রণ ঘটেনি।

তবে উচ্চ বর্ণের কবিদের হাতে পড়ে যে লৌকিক কাহিনীগুলির সুবিপুল রূপান্তর ঘটেছিল এ বিষয়ে বোধ করি কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য কতখানি রূপান্তর যে ঘটেছিল তা অনুমান করা দুরূহ ; কারণ লিখিত রূপ লাভের পূর্বে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীগুলির যে কী রূপ ছিল তা কী করে জানা সম্ভব ? কাহিনীগুলিকে যাঁরা কাব্যরূপ দিয়েছিলেন তাঁরা এগুলির জন্মক্ষেত্র থেকে একটু দূরে ছিলেন বলে যা ছিল মূলত ধর্মীয় ব্যাপার তাকে সাহিত্য-কর্মে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

মঙ্গলকাব্য পুরোপুরি লৌকিক কাব্য। তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিন্দু বিসর্গও নেই। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে নিজের দেশবাসীর জন্য যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে—তাই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মৌল কামনা। দৈবানুগ্রহ লাভের প্রার্থনা কোথাও জীবন যুদ্ধের বা কর্মানুরাগের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়নি। বিপদে রক্ষা করার দুর্বল প্রার্থনা নয়, বিপদকে জয় করার শক্তি প্রার্থনাই সেদিনকার দারিদ্র্য-পীড়িত, অত্যাচারিত বিড়ম্বিত গণমানসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। প্রায় সমস্ত মঙ্গল-কাব্যেই সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বিবৃত হয়েছে। বাস্তবতার সঙ্গে রূপকথার মিলন ঘটেছে। কিন্তু রূপকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের পার্থক্য এই যে, রূপকথা শুধু সাময়িক মনোরঞ্জনের জন্য, মঙ্গলকাব্যের স্বপ্ন কর্মজীবনের প্রেরণা।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। একের পর এক সমালোচক স্বীকার করেছেন যে

মুকুন্দরামের মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের প্রথম পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ শুধু এই নয় যে তিনি ক্ষমা-সুন্দর ব্যঙ্গের ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ সংলাপের ভিতর দিয়ে মুরারী শীল, তার পত্নী ও ভাড়ু দত্তের বাস্তবানুগ চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অথবা শুধু এই জন্য নয় যে, কালকেতু-অধ্যুষিত বনে প্রাণ ভয়ে ভীত বনের পশুদের চণ্ডীর কাছে আবেদন জানানোর ভাষার মধ্যে তিনি সরস কৌতুকের ভিতর দিয়ে জমিদারের অত্যাচারে পীড়িত গ্রামের মানুষদের অসহায়তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একটি প্রচলিত কাহিনীকে মুকুন্দরাম তাঁর শিল্পী দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে নিয়ে একটি অখণ্ড শিল্পবস্তুতে পরিণত করে নিয়েছেন। এ কাহিনীর কোনো অংশ থেকে কোনো অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না ; কোনো অংশ সমগ্রকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র গৌরব অর্জন করেনি। কালকেতু উপাখ্যানটি আসলে মুকুন্দরামের অন্তরের একটি স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নটিই সমস্ত কাহিনীটিকে আলোকিত করেছে, স্বপ্ন বলেই দেবী চণ্ডীর উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কালকেতুর আদর্শ রাজ্য পত্তনের মধ্যে এই স্বপ্ন বিধৃত। সে রাজ্যে কোনো অত্যাচার নেই, অবিচার নেই, ছোট-বড ভেদ নেই, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নেই, জীবিকার জন্য মানুষকে কোনো নিষ্ঠুর অবমাননা স্বীকার করতে হয় না।

কালকেতু চরিত্রটির মধ্যে মুকুন্দরামের নিজের ক্ষমা-সুন্দর মানব-দরদী চরিত্রটির ছায়াপাত ঘটেছে। ব্যাধের সন্তান হলেও তার মধ্যে নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র সেই। ভাড়ু দত্তের অত অন্যায় সত্ত্বেও তার শাস্তি শুধু রাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়া। কলিঙ্গ রাজ তার উপর অনেক অত্যাচার করেছে, তবু কালকেতুর মনে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা নেই।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা কিছু কিছু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ মাত্র। তাই অবশ্য স্বাভাবিক। মানুষ চিরকালই নিজের ছায়া অনুযায়ী দেব-দেবী বা ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে ; কারণ নিজের বাস্তবতার চৌহদ্দীর বাইরে যাওয়ার শক্তি তার নেই। যে সমাজমানসে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের জন্ম, সেই সমাজের মানুষদের চরিত্র তাদের মধ্যে প্রতিফলিত। বিশেষ করে মনসাকে তো প্রায় দেবী বলেই মনে হয় না। যখন সে দীন বেশে কর জোড়ে চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা প্রার্থনা করছে, তখন সে মোটেই দেবী নয়, অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি। অন্ত্যজ সমাজ ভদ্র সমাজের সামাজিক প্রতিপত্তি বা ঐশ্বর্য দাবি করছে না। শুধু দাবি করছে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি, তাদের দেব-

দেবীকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই তাদের মানুষ হিসাবে স্বীকার করা। কিন্তু ভদ্র সমাজের জাগ্রত প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর সেটুকু দিতেও রাজী নয়। চাঁদ সদাগরের চরিত্র একটি অপরূপ সৃষ্টি। তার মধ্যে যে আভিজাত্য, গর্ব এবং বজ্রকঠিন দৃঢ়তা, তার মধ্যে বিজয়ী আর্য রক্তের অপরিম্লান দম্ভই অনুরণিত হয়ে উঠেছে। কাজেই বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীতে মূলত ভদ্র ও ভদ্রেতর সমাজের মধ্যে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত হয়েছে। এই দুই বিবদমান সমাজের মধ্যে দুতিয়ালি করেছে একটি নারী—বেহুলা। উচ্চ সমাজের কাছে তার যুক্তি খুব সহজ : নিম্ন বর্ণের সমাজকে অস্বীকার করে তুমি বাঁচতে পারো না। তোমার যত ঐশ্বর্য, যত সন্তান সন্ততি সব কিছু আসলে ইতর সমাজের কৃপালব্ধ, কারণ তাদের শ্রমেই সব কিছু গড়ে ওঠে। তাদের অস্বীকার করার ফলেই তুমি আজ সন্তানহীন, ঐশ্বর্যহীন।

পূর্বে যত রকমের কাহিনীর আলোচনা করেছি তার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর তফাৎ এই যে পূর্ববর্তী সব কাহিনীতেই ঘটনা স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ : ঘটনা শুধু নিজের গতিতে এবং আকস্মিকতার ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে চলে; পক্ষান্তরে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে ঘটনার পিছনে যে একটি সমাজ আছে এবং সামাজিক ঘাত প্রতিঘাত আছে অসম্পূর্ণভাবে হলেও এই চেতনা রয়েছে। এখনও অবশ্য আকস্মিকতা অথবা দৈবানুগ্রহ কাহিনীকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করছে; কিন্তু সমাজের সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র এখন আর উপেক্ষিত নয়।

গীতিকা—একই ভাবে সমাজ চেতনা আভাসিত হয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকাতে। বেদে কর্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণ তনয় নদ্যার ঠাকুরের অসামাজিক প্রেম এই আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু। ভাবাতিশয্যের দিক থেকে এই প্রেমের চিত্র প্রায় রূপকথার মধুমালা প্রভৃতি গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এখানে প্রেমকে একদিকে গ্রাম্যসমাজ ও অপর দিকে বেদে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়েছে। এই অসমান যুদ্ধের শেষ পরিণতি ঘটেছে দুটি কুসুম কোরকের অকাল মৃত্যু বরণে; কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মের যে বিদ্রোহ তারা সূচিত করেছে তার সুর অমরত্ব লাভ করেছে কাব্যের মধ্যে।

পরিশেষে, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যে লোকমানসের বাস্তব বোধ প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের বাস্তব বোধের মৌলিক তফাৎটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটির জন্ম

হয়েছে দরিদ্র, উৎপীড়িত, সুখ-বঞ্চিত জনমানসের মধ্যে, সুতরাং ঐহিক সুখ লাভই তাদের বাস্তব চিন্তার মুখ্য লক্ষ্য। পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতে তাদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে যারা জীবনে ভোগ করেছে প্রচুর, ঐশ্বর্যের মধ্যে যারা লালিত পালিত। তারা ভোগের ভিতরে থেকে জেনেছে যে ভোগে সুখ নেই, ভোগ শুধু আরও ভোগ-কামনা সৃষ্টি করে এবং তা হিংসা বিদ্বেষ অধর্মাচরণে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। এমন কি স্বয়ং ভগবানও মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে জীবনে সুখী হননি, এবং ধর্মের খাতিরে ধার্মিক স্ত্রীকে জীবন থেকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই একটি বৈরাগ্যের সুর, বাস্তবকে অতিক্রম করে যাওয়ার আকুতি রামায়ণ-মহাভারতের বাস্তব বোধের বিশেষত্ব।

বাস্তব চেতনার এই দুটি ধারা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রধান জাতীয় উত্তরাধিকার।

এখন প্রশ্ন এই: উপরে আলোচিত কাহিনীগুলির সঙ্গে উপন্যাসের মৌল চরিত্রের তফাৎ কি?

মধ্যযুগের কবির মনে সমাজের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি অনেক বেশি প্রবল ছিল: তাই সমাজকে একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তিনি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমাজমানসের দৃষ্টিভঙ্গির প্রায়-অভিন্নতাও লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে যে কালে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়, সে-কালে লেখকের সঙ্গে সমাজের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং ক্রমশ সে অনুভূতি বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই একটু ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ায় পর থেকে তিনি সমাজকে স্পষ্টতরভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সমাজের সকলে যে চোখ দিয়ে জগৎকে দেখে তিনি সে চোখ দিয়ে জগৎকে দেখেননি। তার ফলে পূর্ববর্তী কাহিনীসমূহের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীর প্রথম পার্থক্য এই যে, এ কাহিনীর পটভূমিকায় সমাজের একটি প্যাটার্ন আভাসিত হয়ে ওঠে। এ প্যাটার্ন সমাজতাত্ত্বিকের অনুমোদিত প্যাটার্ন না-ও হতে পারে; তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত।

মধ্যযুগের কাহিনীতে ব্যক্তির গুরুত্ব খুব কম। রূপকথায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাটাই বড; উপকথায় উপদেশটাই বড; মঙ্গলকাব্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পিছনে আবেগ সঞ্চারটাই বড়। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে রচিত উপন্যাসে ব্যক্তি-চরিত্র অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে। মহাকাব্যে ও মঙ্গলকাব্যে

চরিত্র প্রধানত কতকগুলি (নৈতিক অর্থে) দোষ বা গুণের সমষ্টি ; আমাদের দেশের উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির এ পদ্ধতি অনেকদিন পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করলেও উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী (motive and action)-র দ্বারা চরিত্রকে চিহ্নিত করার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েছে।

ব্যক্তি তার কর্মোপলক্ষে সমাজ বা সমাজের একাংশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় ; এই হল উপন্যাসের প্লটের ভিত্তি। ব্যক্তি বনাম সমাজ—এই হল উপন্যাসের মূল ডায়ালেক্‌টিকস্ ; যেমন মধ্যযুগের কাহিনীর মূল ডায়ালেক্‌টিকস্ হল ব্যক্তি বনাম ভাগ্য বা আকস্মিকতা। উপন্যাসের দ্বন্দ্ব শুধু বহির্ঘটনাতেই যে প্রকাশ এবং বিকাশ লাভ করে তা নয়, তা ব্যক্তির আন্তর চেতনাতেও প্রতিবিম্বিত হয় ; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মনের মধ্যে সমাজ বাস করে। উপন্যাসের কাহিনী ক্রমশ প্রধানত মানুষের অন্তর্লোকের কাহিনী হয়ে উঠেছে। বহির্ঘটনা শুধু অন্তর্লোককে আলোকিত করার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বা আবেগ অনুভূতির জগতের প্রতি এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব দানের থেকে জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু ফ্রয়েডের আবির্ভাব উপন্যাস শিল্পকে খুব সাহায্য করেছে বলে আমি মনে করি না। কারণ অনেক লেখক নিজের অভিজ্ঞতার উপর কল্পনা প্রয়োগ করে একটি বাস্তবের প্যাটার্ন তৈরি না করে ফ্রয়েডীয় কোনো সস্তা ফর্মুলাকে কোনো বিশেষ কাহিনীতে রূপ দিতে চেয়েছেন। এটা শিল্প সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত প্রক্রিয়া নয়। যাঁরা মার্কসীয় ফর্মুলাকে এইভাবে উদাহরণীকৃত (exemplify) করতে চেয়েছেন তাঁরাও একই ভুল করেছেন। অবশ্য ফ্রয়েড এবং মার্কস্ উভয়েই মানুষের কল্পনার পরিসরকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, অনুমানের ক্ষমতাকে প্রসারিত করেছেন। এইভাবে যাঁরা এঁদের গ্রহণ করেছেন তাঁরা উপকৃত হয়েছেন।

প্লট, চরিত্র এবং ভাষার ভিত্তিতে উপন্যাসের পর্যালোচনা এখন পুরনো হয়ে গেছে। কারণ আমরা জানি উপন্যাসে প্লট এবং চরিত্র স্বাধীনও নয় প্রধানও নয়। এদের নিয়ন্ত্রিত করে উপন্যাসের থীম (উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়কে বিমূর্ত ভাষায় খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করার নাম থীম) এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শন বা জীবনাভিজ্ঞতা। এই থীম এবং দৃষ্টিভঙ্গির পথ ধরে আমরা লেখকের বিশিষ্ট শিল্প-ভাবনায় পৌঁছতে পারি। তখন আমরা দেখতে পাই যে লেখক শুধু তাঁর কালের সৃষ্টি নন ; বা কালের গ্রাহক-যন্ত্র মাত্র নন। কালের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক ডায়ালেক্‌টিক্যাল। সেইজন্যই আপন অন্তরের

আলোতে লেখক কালকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, কালের ঊর্ধ্বে উঠে কালকে সমালোচনা করতে পারেন, এবং কালকে অতিক্রম করে গিয়ে ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারেন। লেখকের এই শক্তি আছে বলে আধুনিক উপন্যাসে একটি নতুন জিনিসের দেখা পাওয়া যায়—যার নাম সমস্যা। সমস্যা বলতে আমি সেই সব প্রশ্ন বুঝি, যার মধ্যে বিতর্ক বা পক্ষাবলম্বনের অবকাশ আছে। মধ্যযুগীয় কোনো কাহিনীতে সমস্যার অস্তিত্ব নেই; তবে মহাকাব্যে কিছু কিছু নৈতিক সমস্যার সাক্ষাৎ মেলে। আধুনিক উপন্যাসে নৈতিক রাজ-নৈতিক সামাজিক আত্মিক—নানা সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা সেই লেখককেই অধিক মূল্য দিই যাঁর মানসপটে যুগ-চিন্তা ছায়া বিস্তার করেছে এবং যিনি তাঁর সক্রিয় কল্পনার দ্বারা যুগ-চিন্তার উপর নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ আঁকতে পেরেছেন।

আধুনিক উপন্যাস আমাদের পরিচিত বাস্তবকে অবলম্বন করে রচিত হয় এ ধারণা ভুল। প্রাচীন রূপকথা-উপকথায় আমরা যেরকম কল্পনাবিলাস দেখতে পেয়েছি, উপন্যাসেও সেরূপ, অথচ ভিন্ন ধরনের কল্পনা-বিলাসিতার অভাব নেই। যেসব উপন্যাস সম্পর্কে আমরা মনে করি একেবারে আমাদের ঘরোয়া জীবনের ছবি দেখানো হয়েছে, সেখানেও আমরা আসলে যা পাই তা বাস্তবের ভ্রান্তি, বাস্তব নয়। শিল্প-সাহিত্য কখনও বাস্তবের অনুকরণ নয়। অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের মনে এ রকমের ধারণা ছিল বটে, কিন্তু ফটোগ্রাফি আবিষ্কার হওয়ার পর আমরা দেখলাম যে রাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর যে সব ছবিকে আমরা এককালে হুবহু প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া বলে মনে করতাম সে সবের সঙ্গে ফটো-গ্রাফের অনেক তফাৎ। তেমনি সাংবাদিকতার উন্নতির ফলে এখন একটি অবিকল বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে চমৎকার রিপোর্টাজ লেখা যায়। কিন্তু রিপোর্টাজ উপন্যাস নয়। উপন্যাস আর বাস্তবে যে কিছু ব্যবধান থাকবেই তার সহজ কারণ এই যে বাস্তবের আদি অন্ত নেই, কিন্তু উপন্যাস আদি অন্ত সম্পন্ন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ। উপন্যাস একটি কাল্পনিক প্যাটার্ন, যার মধ্যে লেখকের বাস্তব সম্পর্কিত ভাবনা বা সম্ভাব্য সত্য চিন্তা বিধৃত হয়।

উপন্যাস আর বাস্তবের এই পার্থক্য দেখে অনেকে মনে করেন উপন্যাস বিষয়বস্তু—একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। কিন্তু মুশকিল এই যে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে রূপকে পাওয়া যায় না, আবার রূপকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুকে পাওয়া যায় না।

তবে যাঁরা উপন্যাসকে form হিসাবে দেখতে ভালবাসেন তাঁরা উপন্যাস রচনায় কয়েকটি মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। যেমন, সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীকে বিবৃত করা; কোনো বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক নিজের ভাষায় কাহিনী বিবৃত করতে পারেন; লেখক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবেন আর চরিত্ররা উত্তম পুরুষে যার যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন; লেখক কোনো চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উত্তম পুরুষে কাহিনী বিবৃত করবেন।

আবার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক প্রয়োজনমতো ত্রিবিধ পদ্ধতির সাহায্য নেন—দৃশ্য বর্ণনা (scene), সংক্ষেপিত বিবরণ (summary) এবং বর্ণনা (description)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় দৃশ্যগুলিকে লেখক এতটা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেন যে, ঘটনাটি বাস্তবে ঘটতে মোটামুটি একই সময় লাগত। এই ধরনের বিভিন্ন পূর্ণ দৃশ্যের মাঝে মাঝে ঘটনার ধারাবাহিক গতিকে লেখক সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তখন সময়কে লেখক দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রকৃতি বা চরিত্রের mood বর্ণনার সময় সময়ের অগ্রগতি প্রায় থাকে না। এই তিন রকমের প্রক্রিয়ার উপযুক্ত সমন্বয়ের উপরে কাহিনীর সার্থকতা নির্ভর করে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি মধ্যযুগীয় কাহিনী থেকে উপন্যাস অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু মধ্যযুগীয় কাহিনীর মতোই আমরা আধুনিক উপন্যাসকে কতকগুলি মৌলিক চরিত্রে ভাগ করতে পারি। উপন্যাস যেখানে প্রকৃত শিল্প হয়ে ওঠে, যেখানে লেখকের কাছে কল্পনালব্ধ বাস্তব-সত্যকে অবিকলভাবে রূপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তখন তা myth-এর সঙ্গে তুলনীয়। উপন্যাসের উদ্দেশ্য যখন পাঠকের মনোরঞ্জন করা, যখন লেখক সুপরিকল্পিত আঙ্গিকের সাহায্যে তীব্র নাটকীয় আবেগ জাগাতে চান, তখন তার সঙ্গে রূপকথার তুলনা চলে। উপন্যাসের ভিতর দিয়ে অনেক বাস্তব বা নৈতিক উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা হয়, তখন তা উপকথার সমগোত্রীয়। আবার, ব্রতকথা বা মঙ্গলকাব্যের মতো উপন্যাসের মধ্যে বাস্তব জীবনের সামাজিক কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ সঞ্চার করা যায়। অনেক myth-কে আত্মসাৎ করে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল; তেমনি epic উপন্যাসও সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক যুগে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । বাংলা উপন্যাসের পূর্বপুরুষ

দ্রুত পরিবর্তনশীলতার যুগে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রাধান্য লাভ করে। চিরাচরিত নৈতিক মান ও মূল্যবোধে যখন ফাটল ধরে, সমাজ শৃঙ্খলায় শিথিলতার ফলে যখন সমাজে যথেচ্ছাচারের ঢেউ বয়ে যায়, তখন মনে এই আশঙ্কা জাগা স্বাভাবিক যে সৎ ও সুন্দর জীবনের ভিত্তিই বুঝি ভেঙে পড়ল। এই সময় পুরনো বিশ্বাসগুলি যাঁর মধ্যে অপরিম্লান তাঁর পন্থা খুব সরল। তিনি তীব্র ভাষায় গালাগাল দেবেন, উচ্ছৃঙ্খলতার বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে নির্মমভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করবেন। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় শুরু করলেও কটূক্তিতে শেষ করবেন। কিন্তু মুশকিল এই যে পরিবর্তনশীলতার যুগের ধর্ম এই যে মানুষের মনে নিজের অজ্ঞাতসারে নৈতিক বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে সংশয় দেখা দেয়। তখন তীক্ষ্ণ তিরস্কারের ভাষার বদলে সরস ব্যঙ্গ লেখকের অবলম্বন হয়ে ওঠে। সরস উপভোগ্য ব্যঙ্গের পিছনে লেখকের খানিকটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বা তারও কিছু আগে থেকে শুরু করে ১৮৬৫ অব্দে প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের, বিশেষ করে কলকাতার সমাজ ও ভাব-জগতের উপর দিয়ে এক বিপুল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বহু বিবাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ ও বৈধব্য-প্রথার কল্যাণে সারা দেশ বারবনিতা-বৃত্তিতে ছেয়ে গিয়েছিল। ভদ্রসমাজের মধ্যে মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি প্রায় সমাজে স্বীকৃতি-যোগ্য অনাচার বলে পরিগণিত হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতায় ইংরেজ বেনিয়ার সাহায্যকারী হিসাবে মুৎসুদ্দী-মহাজন শ্রেণী বিত্তবান হয়ে উঠেছিল; তাছাড়া বেশ কিছু বিত্তবান, দেশীয় ব্যবসায়ী ও জমিদারও তখন কলকাতায় বসবাস করছিলেন। এই নব্য বিত্তবান শ্রেণীর আদরে লালিত সন্তানরা এক ধরনের অদ্ভুত মানুষ নামধারী

পশুত্বে পরিণত হয়েছিল। জীবনের কোথাও তাদের কোনো মূল ছিল না। না ছিল তাদের দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ, না তারা পেয়েছিল উল্লেখযোগ্য রকমের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। ভোগ-বিলাসিতার দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তারা উৎসন্নে যাওয়ার একটা সোজা সরল রাস্তা রচনা করেছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে পাশাপাশি দেশে আর এক ধরনের ভাঙনের ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার, ডিরোজিও-পন্থী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়, জ্ঞানান্বেষণ তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে অতীতের যুক্তিহীন বিচারহীন যান্ত্রিক অনুবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটি যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হচ্ছিল। এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রেও অনাচার ও আতিশয্যের অভাব ছিল না। প্রকাশ্যে মদ্যপান, গো-মাংস-ভক্ষন, ইওরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীকে অনুসরণ, মেম বিয়ে করা, প্রভৃতি নানা উপায়ে সেকালের বিদ্রোহী তরুণসম্প্রদায় রক্ষণশীলদের কোমল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করার আয়োজন করেছিল। এই শেষোক্ত বাবু-সমাজ প্রথমোক্ত বাবু-সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশি বিপজ্জনক ছিল, কারণ তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে ছিল উচ্চ শিক্ষা ও তত্ত্বচিন্তার শক্ত ভিত্তি। প্রথমোক্ত দল সামাজিক অরাজকতা ও নতুন-গড়ে ওঠা শহরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; তারা সমাজদেহে কোনো স্থায়ী ক্ষত-চিহ্ন রেখে যাবে এমন সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু শেষোক্ত দল একটি স্থায়ী ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেন যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এমন আশঙ্কা করা কষ্টকর ছিল না।

'বাবু' নামক যে ব্যক্তিটি দীর্ঘকাল ধরে উনিশ শতকীয় ব্যঙ্গরচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল, সে কাদের প্রতিনিধি? প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের? না, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের? বাবুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তার মিল বেশি। কিন্তু আমরা জানি ব্যঙ্গের গতি ঈষৎ তির্যক; কাজেই প্রথমোক্ত সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে যে আসলে শেষোক্ত সম্প্রদায়কেই আক্রমণের বিষয়ীভূত করা হয়েছে এমন অনুমান একেবারে অমূলক নয়। 'বাবু'র যে কটি বিবরণ পাওয়া যায়, সর্বত্রই তার সামান্য ইংরাজি শিক্ষা এবং ইংরাজিয়ানার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তাতে এই অনুমান সমর্থিত হয়।

১৮২১ অব্দে 'সমাচার দর্পণে'র দুটি খণ্ডে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রচিত

'বাবুর উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়। এই উপাখ্যানেই আমাদের 'বাবু' চরিত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আফিম কুঠির দেওয়ান অতুল ঐশ্বর্যের মালিক পিতার একমাত্র পুত্র তিলকচন্দ্র কি করে মোসাহেব পরিবৃত হয়ে আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়ে পৈতৃক অর্থের অপব্যয় করে এবং কী করে ইংরেজ সরকারের চাকরির প্রত্যাশায় ঘোড়ায় চড়া বক্সিং প্রভৃতি শেখে ও বাংলা নামের ইংরাজি উচ্চারণ আয়ত্ত করে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে গল্পটিতে। গল্পটি চিত্রধর্মী, কাহিনীর অংশ খুব সামান্য এবং তার কোনো পরিণতি নেই। তারপর ১৮২৫ অব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা' এই ছদ্মনামের অধীনে 'নববাবু বিলাস' নামে একটি কাহিনী প্রকাশ করেন। 'বাবু' চরিত্র এখানে অনেক বেশি সুবিকশিত। প্রথমে এক আধা সাহেবের কাছে বাবুগণ গ্লাসকেল, বেরিগুড্, গোটেহেল প্রভৃতি কথা বলা ও দু-একখানি ইংরাজি চিঠি লেখা শিখলেন। তারপর নানাবিধ বাবুয়ানা শিখে বাবু যখন ফুলবাবু হলেন, তখন খলিপা নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় বাগান-বাড়িতে বারবনিতা নিয়ে কেলি করে সর্বস্বান্ত হলেন।

উপরোক্ত কাহিনী দুটি মূলত সাংবাদিকতাধর্মী। তখনকার সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাগুলি সংগ্রথিত হয়ে এখানে একটি অখণ্ড শিল্পরূপ লাভ করেনি। বিভিন্ন অধ্যায়গুলি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তথাপি 'নববাবু বিলাসে'র 'ফুলবাবু' ও 'খলিপা' চরিত্র দুটির মধ্যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিমূলক প্রতিভার প্রথম অঙ্কুর দেখা যায়। ফুলবাবু বাস্তবের কোনো বিশেষ বাবু নয়। 'খলিপা'ও কোনো বিশেষ মোসাহেব নয়। তারা রূপ পেয়েছে লেখকের কল্পনায়। বলা চলে তারা type চরিত্র। কাজেই এই দুটি চরিত্রের পরিকল্পনায় চরিত্র সৃষ্টির রহস্য-বীজ নিহিত রয়েছে। এদের মধ্যে যত দুর্বলতাই থাকুক বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এরা অমর হয়ে থাকবে।

ভবানীচরণ যখন 'নববাবু বিলাস' লেখেন তখন বাংলা গদ্যের প্রায় শৈশব অবস্থা। গল্প-উপন্যাস তখন লেখা আরম্ভ হয়নি বলে সাহিত্যের ভাষা তৈরি হয়নি। তার ফলে ভবানীচরণের যেমন অসুবিধে হয়েছিল, তেমনি সুবিধেও হয়েছিল। ভাষার কোনো সংস্কার সৃষ্টি না হওয়ার তিনি অনায়াসে চলতি ভাষা, এমন কি ইতর সমাজের মধ্যে প্রচলিত অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই কোনো উচ্চ শিল্প-নৈপুণ্য না থাকলেও তাঁর ব্যঙ্গ বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ; নিছক পরিহাস রস ছাড়া এই ব্যঙ্গের পিছনে কোনো

উদ্দেশ্যমূলকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি আগেই বলেছি উপভোগ্য ব্যঙ্গের পিছনে প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকা আশ্চর্যের নয়। তার মানে এই নয় যে ভবানীবাবু উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করেছেন। তবে ভবানীবাবুর মধ্যে এই চেতনা সুপ্ত রয়েছে যে প্রাচীন রক্ষণশীলতায় আর ফিরে যাওয়া যায় না; পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এ-সব উন্মার্গগামিতা তারই ইঙ্গিত। তবে পরিবর্তন কোন্ দিকে ঘটবে সে সম্পর্কে ভবানীচরণের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। লেখকের এই নৈতিক ও আদর্শগত অনিশ্চয়তা 'নববাবু বিলাসে'র প্রায় উদ্দেশ্যহীন ব্যঙ্গের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ভবানীচরণের 'বাবু' এবং 'খলিপা'ই আবার ফিরে এসেছে 'মতিরাম' এবং 'ঠকচাচা'র মধ্যে—টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে (১৮৫৮); কিন্তু বইখানি পড়লেই বোঝা যায় মাঝখানে ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের উগ্র বিদ্রোহাত্মক উন্মার্গগামিতার বছরগুলো পার হয়ে গিয়েছে; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (সাহিত্য সন্দর্ভ) পত্রিকা এবং অক্ষয়কুমার দত্তের (তত্ত্ববোধিনী) পত্রিকা অপেক্ষাকৃত সুস্থির মন নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে অনিশ্চয়তা-দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে যে দিশাহারা ভাব অথবা উৎকট ইংরেজিয়ানার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে তা অনেকখানি পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী মানসে মোটামুটিভাবে এই চেতনা জেগেছে যে তাঁরা বাঙালী এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাঙালীই থাকতে হবে। কাজেই ধীর-স্থিরভাবে তত্ত্বচিন্তায় প্রবৃত্ত হতে হবে এবং ইতিমধ্যে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই শতকের গোড়ার দিকে কেরী মার্শম্যান প্রমুখ সাহেবরা যে ভাবে বাঙালীদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতেন, সামাজিক রাজনৈতিক আলোচনায় বাঙালীদের ডাকাডাকি করতেন ক্রমশ তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের ভাষায় "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষিত বাঙালী ও বেসরকারী ইওরোপীয় সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল। তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক হইয়া স্ব-সমাজের ও ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনে রত থাকিতেন। ...গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই কিন্তু সাধারণের অলক্ষিতে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের ব্যবধান সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়।...তখন হইতে (১৮৪৮) উভয়ের স্বার্থ এক হইয়া যায়, এবং ভারতবাসীর

সঙ্গে এতদুভয়ের স্বার্থ সংঘাত অনিবার্য হইয়া পড়ে।" (উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—পৃঃ ২৫)

প্রভুত্ব-সচেতন ইংরাজরা একটি দৃঢ় সামাজিক ব্যবধান রচনা করার ফলে বাঙালীদের ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে আসতে হল যে তাঁদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

কাজেই 'আলালের ঘরের দুলালে' একটি সুস্পষ্ট নৈতিকতার সুর আছে। কাহিনীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে ব্যঙ্গধর্মী দৃশ্যের অবতারণা করে তিনি কাহিনীর শেষাংশে একটি পারিবারিক মিলনাত্মক উপসংহার টেনেছেন। উন্মার্গগামী মতিরামকে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করতে পারেননি; তাকে মুণ্ডিতমস্তক করে ফিরিয়ে এনেছেন গৃহস্থাশ্রমে। মতিরামের প্রত্যাবর্তন প্যারীচাঁদের নিজের ডিরোজিওর কাছে শিক্ষাগ্রহণান্তে প্রত্যাবর্তনের সামিল।

'আলালের ঘরের দুলাল'কে ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে স্বীকার করলেও প্রায় সকল সমালোচকই বইখানিকে পুরোপুরি সংজ্ঞানুযায়ী উপন্যাস বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ হিসাবে বইখানির শিথিল-বদ্ধ প্লট এবং মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়নের অভাবের কথাই সাধারণত উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রচলিত উপন্যাসের মাপকাঠিতে বইখানিকে বিচার করা চলে না এই জন্য যে বইখানি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। ব্যঙ্গ উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়ন সম্ভব নয়, বিশেষ করে যেখানে নায়ক নিজেই ব্যঙ্গের লক্ষ্যবস্তু। যে কোনো লোকের মানসলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি বোধ না করে পারা যায় না; ব্যঙ্গ-রচয়িতা তাই সব সময় চরিত্রের সঙ্গে নিজের খানিকটা ব্যবধান বজায় রাখতে বাধ্য হন যাতে শুধু তার বাহ্য ব্যবহারের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাসের চরিত্র-সমূহ fixed বা পরিবর্তনহীন চরিত্র হতে বাধ্য; কারণ চরিত্রের যে বিশেষ প্রবণতা আক্রমণের বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল চরিত্রে তা বরাবর থাকতে পারে না। তৃতীয়ত, ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাস মূলত situation-প্রধান বা চিত্রধর্মী; ঘনসংবদ্ধ প্লট তাতে থাকা সম্ভব নয়। সার্ভেন্টিসের বিশ্ববিখ্যাত 'ডন কুইক্সোট' থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড় পর্যন্ত সমস্ত ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীতে এই বিশেষত্বগুলি দেখতে পাওয়া যাবে। কাজেই 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পর্কিত প্রচলিত সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

বইখানির ব্যঙ্গ-রস অবশ্য 'নববাবু বিলাসে'র মতো অবিমিশ্র নয়; লেখক একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবহার-বিধির মাপকাঠিতে মতিরাম ও ঠকচাচাকে সমালোচনা করেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে মতিরামের ভাই বাবুরামকে আদর্শ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এই অতি-স্থূল বৈপরীত্যের উপস্থাপনা যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মিতা ব্যঙ্গরসের মূল উপজীব্য তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বইয়ের দ্বিতীয় ত্রুটি হল থীমের অনিশ্চয়তা। মতিরাম যখন বৈদ্যবাটিতে পিতৃভবনে পিতার অযোগ্য শাসনে দুর্দান্ত বালক হয়ে উঠেছে, তখনকার থীম হল শৈশবকালীন বিপথগামিতা। এ সমস্যা কোনো বিশেষ কালের সমস্যা নয়। তারপর সে যখন কলকাতায় ইংরাজি শিক্ষালাভ করতে এসে অসৎ সংসর্গে পড়ে উন্মার্গগামী হল তখন তার মধ্যে যুগ সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিতার দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে লেখক যে বৃহৎ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, সেখানে আবার ব্যঙ্গের বিষয় হল একটি মধ্যযুগীয় সামাজিক কুপ্রথা। বস্তুত, থীমের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই বইখানি আমাদের যথেষ্ট শৈল্পিক পরিতৃপ্তি যোগায় না। কাহিনীর শেষাংশে লেখক ব্যঙ্গাত্মক পদ্ধতি ত্যাগ করে নায়ককে যন্ত্রণার শেষ সীমায় নিক্ষেপ করে কাশীতে পাঠিয়ে শোধন করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন। নৈতিকতায় প্রাবল্য ব্যঙ্গ-রসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অবশ্য এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও আলালের লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তিনি যে শহুরে কক্‌নি ভাষা ব্যবহার করেছেন তা ব্যঙ্গাত্মক রচনার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী; সংলাপ রচনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; সর্বোপরি আতিশয্য বর্জন করে তিনি ব্যঙ্গের স্বধর্ম রক্ষা করতে পেরেছেন। তদুপরি সংবাদিকতার ছাপ থাকলেও লেখাটি নিতান্তই চিত্রধর্মী স্কেচ হয়ে ওঠেনি; এর মধ্যে উপন্যাসের একটি বহুল প্রচলিত প্যাটার্ন আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বাল্য জীবন, প্রলোভন, অধঃপতন, চরম দুর্দশার ভিতর দিয়ে চৈতন্যলাভ, এবং পরিশেষে নৈতিক পুনর্জন্ম। কাজেই ঢিলে-ঢালা গ্রন্থন সত্ত্বেও কাহিনীটির মধ্যে যে একটি শিল্পসঙ্গত সম্পূর্ণতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

'আলালের ঘরের দুলাল'কে অবশ্য ঠিক ঠিক ঐতিহাসিক কালানুক্রমের বিচারে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস বলা চলে না। এ বইখানি প্রকাশের বছর দুই আগে হানা ক্যাথারিণ ম্যালেন্স নাম্নী জনৈকা বিদেশিনী ক্রিশ্চিয়ান মহিলা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। দুটি

খ্রীষ্টীয় পরিবারের বিপরীত চিত্র উপস্থিত করে লেখিকা খ্রীষ্টীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ফুলমণি আদর্শ খ্রীষ্টান মহিলা; সে তার নিয়ম নিষ্ঠার ফলে দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটি সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে করুণার নিষ্ঠা নেই বলে তার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। তার স্বামী মাতাল এবং অত্যাচারী। অবশেষে লেখিকার উপদেশে সে তার পারিবারিক জীবনকে পুনর্গঠিত করতে পারল। বইখানিতে খ্রীষ্টীয় আদর্শ প্রচারের অভিসন্ধি থাকলেও লেখিকা মহিলা বলে কার্যত পারিবারিক জীবনে গৃহিণীর দায়িত্বের প্রসঙ্গকেই কাহিনীর উপজীব্য করে তুলেছেন। বিদেশিনী মহিলা যে এদেশের গ্রাম জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার পরিচয় আছে কাহিনীটির মধ্যে। ধর্মীয় বা নৈতিক ভিত্তিতে চরিত্র বিচার করেছেন বলে তাঁর চরিত্র-চিত্রন অবশ্য কিছুটা নির্জীব বলে আমাদের কাছে বোধ হয়। আলাল পর্যন্ত বাংলা দেশের কাহিনী রচনার যে ধারাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গে এই বইখানি নিঃসম্পর্কিত। কিন্তু কোনো সাহিত্যকর্মেরই একেবারে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরবর্তীকালে বাঙালী লেখিকারা পারিবারিক জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণে যে দক্ষতার পরিচয় দেবেন এ বইখানিতে তারই পূর্বাভাস দেখা যায়। তাঁদের কাছে বইখানি হয়তো অপরিচিত ছিল; কিন্তু তাঁরা একই মানসিকতার উত্তরাধিকারী।

উপরে আলোচিত বইগুলি ছাড়া ভবানীচরণ 'নব বিবি বিলাস' নামে আর একখানি ব্যঙ্গধর্মী কাহিনী-চিত্র রচনা করেছিলেন একালের বিপথগামী এক নারী চরিত্রকে অবলম্বন করে। কিছুকাল পরে 'আলালে'র লেখক প্যারীচাঁদ 'মদ খাওয়া বড দায়, জাত রাখার কি উপায়' (১৮৫৯) এবং 'অভেদী' (১৮৭১) নামে একখানি নীতিমূলক উপাখ্যান রচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি বইয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' উপন্যাস নয়; কিন্তু ব্যঙ্গরচনার যে ধারাটির কথা উপরে আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলে বইখানিকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। তখনকার নতুন-গডা কলকাতার জীবন যাত্রার বাস্তব চিত্রকে একটি প্লট-বদ্ধ কাহিনীর মধ্যে গ্রথিত করার চেষ্টা না করার ফলে কালীপ্রসন্ন তখনকার কলকাতার এমন একটি পূর্ণাবয়ব বিবরণ দিতে পেরেছেন যা অন্যত্র দুর্লভ। অবশ্য ইতিপূর্বে ভবানীবাবু 'কলিকাতা কমলালয়' নামক বইতে কতকটা এই ধরনের প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু অজু

শাণিত অনমনীয় বিদ্রূপের ভাষায় কালীপ্রসন্ন যে ভাবে সেকালের অর্থহীন অপচয়বহুল নিম্নরুচির পরিচায়ক বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান-সমূহের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন তা তুলনা-রহিত। চড়ক-দুর্গোৎসবের উৎকট স্ফূর্তির আয়োজন থেকে শুরু করে বাবুদের বৈঠকখানার মোসাহেবী কাল্‌চারের বিবরণ পর্যন্ত কোনো কিছুই সিংহ মশাইয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। সাহিত্যের চলিত ভাষা ব্যবহারের যে প্রবণতা 'বাবুর উপাখ্যান' থেকে শুরু হয়েছিল, হুতোমী ভাষায় তা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। ঠিক উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত চলিত ইডিয়মটি ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রতিটি চিত্র যে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার মূল রহস্য এই ভাষার মধ্যে। কোথাও একটিও অতিরিক্ত মন্তব্য সংযোজন না করে শুধু বর্ণনার গুণে লেখক ব্যঙ্গধর্মী তাৎপর্যকে পরিস্ফুট করেছেন। এখানেই লেখকের সংযম ও কুশলতার পরিচয়।

প্রকৃত কাল্‌চারের একনিষ্ঠ সেবক কালীপ্রসন্ন অসহায়ভাবে এই কাল্‌চারের নিম্ন গতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন; এই অসহায়তার অনুভূতি দারুণ বিক্ষোভের মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করে সংযত ব্যঙ্গের মধ্যে রূপ পেয়েছে। এতে প্রমাণ হয় তিনি শুধু শিল্পী নন, তাঁর মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাও পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। গায়ের জোরে বা ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি মানুষকে সুসংস্কৃত করতে চান না; তিনি চান মানুষকে তার নিজের কাজের অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ | বাংলা উপন্যাসের ভূমিকা

উনিশ শতকের প্রারম্ভে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল। ততদিনে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কায়েম হয়ে গেছে। কি ভাবে, কোন্ দিক দিয়ে সমাজ ও শিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত করলে এদেশে তাদের স্থিতিকাল দীর্ঘতর হবে তাই নিয়ে তখন গবেষণা চলছে। আমরা জানি এই গবেষণার একটা ফল এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন। প্রাক্তন সামাজিক আইন-কানুনের বিচারালয়ে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি-লাভ তার আর একটা ফল।

এক সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে দু-রকমের মত দেখা গিয়েছে। অনেকে বলেছেন, আমাদের দেশে এই যে অধুনাতন পরিবর্তন, এর জন্য ইংরেজের আগমন মোটেই দায়ী নয়। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এদেশ নিয়ে অত মাথা না ঘামালেও ভারতীয়রাই ওদেশের সঙ্গে আপন যোগাযোগ স্থাপন করে পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রযুগের ভারতীয় সংস্করণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলত। ইংরেজের চাপ না থাকার জন্য সেটা হত আরও সম্পূর্ণ, এবং আমাদের এই যে আধুনিক সাহিত্য, তাও এই রকমই উন্নতি লাভ করত, শুধু অন্ধ অনুকরণ না থাকার দরুন বরং আরও জোরালো হত। আর একদলের মত এই ছিল যে, আমাদের সাহিত্য সম্পূর্ণই ব্রিটিশ শাসনের ফল। অনেক নজির সামনে এনে তারা প্রমাণ করতে পারেন যে আমাদের দেশের সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যেরই একটা সুলভ সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বঙ্কিম ওদের স্কট, আমাদের মাইকেল ওদেশের মিল্টন। এবং তার মানে হল এই যে, আমাদের দেশের সবাই ওদেশের কাউকে না কাউকে অনুকরণ করে লিখেছেন। এঁদের কাছে, ইংরেজ রাজত্ব না হলে আধুনিক সাহিত্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এর কোনো মতই বিচারে টেঁকে না। প্রাক্-বিটিশ যুগের গ্রামগুলি ছিল আত্মসর্বস্ব, বাইরের সঙ্গে সম্পর্কহীন; আর রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বহুধা-বিভক্ত, যার মধ্যে কোনো সময়ে কলহের অভাবটাই ছিল ব্যতিক্রম। এরকম কূপমণ্ডুক আত্মকলহলিপ্ত জীবনযাত্রার মধ্যে এমন কাউকেই কল্পনা করা যায় না যে ইওরোপে গিয়ে তার সভ্যতাকে ভারতে আমদানী করতে পারত। আর আমাদের সমাজ যদি ইওরোপীয় সমাজের অনুরূপ না হয়ে উঠত তো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মতো ইওরোপীয় ছাঁচে ঢালা সাহিত্যের আবির্ভাব সম্ভবই হত না, তার পরিপূর্ণতর বিকাশ তো দূরের কথা। পক্ষান্তরে এ কথা বলাও একেবারে ভুল যে আমাদের সাহিত্য নেহাৎই বিলেতের অনুকরণ। যদি তার উপযুক্ত মাল মশলা যথার্থই আমাদের সমাজে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়ে না থাকত, তবে সহস্র অনুকরণেও বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা উপন্যাসও রচনা সম্ভব হত না। বাইরের প্রভাব কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্য একেবারেই আমাদের নিজস্ব জিনিস, যেমন বাইরের প্রভাব ছিল বলেই প্রাক্-সামরিক রুশ সাহিত্যকে একান্তভাবে রাশিয়ার বলতে কেউ আপত্তি করবেন না।

বাস্তবিক, আধুনিক বাংলা সাহিত্য যখন শুরু হল সেই সময়ে এবং তার আগের কয়েকটা বছর পরিবর্তন যে আমাদের দেশে কী রকম ঝড়ের মতো চলে গেছে তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। গ্রামের আত্মসর্বস্বতাকে খান খান করে ভেঙে ফেলা হল, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে স্থাপিত হল তার যোগসূত্র। অজস্র রকমের গৃহশিল্পের কেন্দ্রগুলি ভেঙে পড়ল বণিক-সভ্যতার চাপে। সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে সহস্র নিরীহ প্রাণীকে বলি দেওয়া হল। এ সব ভাঙনের সঙ্গে তৈরি হল একটি ভারতীয় বণিক সমাজ যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হয়েছিল বলে সম্পূর্ণরূপে এই শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া সরকার আপন সুবিধার্থে যে-সব উচ্চ-কর্মচারী নিয়োগ করেছিল, অল্প দিনের মধ্যেই অর্থনৈতিক স্ফীতি তাদের এত বেড়ে উঠল যে সমাজে তারাও একটি বিশিষ্ট সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হল। আর সৃষ্ট হল সরকারের বিশ্বস্ততম বন্ধু একটি জমিদার শ্রেণী। এই তিন রকমের নতুন সৃষ্ট জীবেরা কালে কালে সমাজে একটা বিশিষ্ট সম্মানজনক আসন দখল করে বসল এবং তার ফলেই পুরনো যে বর্ণ-বৈষম্যের কাঠামো ছিল তার অন্তত অর্থনৈতিক ভিত্তিটা ধ্বসে পড়ল। এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যাই

থাক, আধুনিক কালে খুব ছোট করে এদের জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণীর একটি ছায়ারূপ বলে আখ্যা দিলে খুব বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি সামন্ততান্ত্রিক মূল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক জমিদারদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে বুর্জোআর সঙ্গে মিল খুব বেশি। মেকলে সাহেব ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে বক্তৃতা দিলেন, রামমোহন তার জন্য খুবই চেষ্টা করলেন, তার ফলে একদিন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদিক মূল্য স্বীকৃত হল। প্রধানত, যাঁরা এই শিক্ষা নিতে অগ্রসর হলেন তাঁরা উপরোক্ত বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। পুরনো সামন্ততন্ত্রের উপর যে যবনিকা নামিয়ে দেওয়া হল তা আরও ভালো করে প্রমাণ করার জন্য ইংরেজি আইন নিজের চক্ষুকে পক্ষপাতহীন বলে ঘোষণা করল। ভারতবর্ষে নকল ইওরোপীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা হল, পুলিসের সঙ্গীনের সামনে অসহায় বিক্ষিপ্ত জনসাধারণ আত্মসমর্পণ করল। এর আগে সামন্ততন্ত্র এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে দেশে প্রথম শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় এই নতুন রীতিটির প্রতি জনসাধারণের ভয়ের সঙ্গে সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট।

তারপর হঠাৎ একদিন বাংলা সাহিত্যে গদ্য দেখা দিল। এটা একেবারে আশ্চর্য ব্যাপার। বাংলা দেশের প্রাণ ছিল কাব্যে। টপ, কীর্তন, যাত্রা ছিল প্রধান আমোদ-প্রমোদ। জনসাধারণের ভিতর থেকে যে সব লেখকের অভ্যুদয় হত তাদের প্রতিভা স্ফুরণের একমাত্র মুখ ছিল কবিতা—সাধারণত গাঁথা কবিতা। অবশ্য সমাজের বৈচিত্র্যহীনতার জন্য একটার সঙ্গে আর একটার বিষয়গত মিল থেকে যেত। হয়তো তবু এর মধ্যেই একটা লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল। সমস্ত সাহিত্য প্রচেষ্টাতেই, যে অবস্থার লেখকের কাছ থেকেই তার অভ্যুদয় হোক না কেন, জনসাধারণের উপভোগের বস্তু ছিল। এই অচলায়তন ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ দেখা দিল গদ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটো জিনিস অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল। প্রথম প্রমাণ হল যে আমাদের দেশে অপরিষ্কার জলের উপর ইওরোপীয় সমাজের প্রতিবিম্ব হিসাবে এক কিম্ভূত-কিমাকার সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সমাজের কর্ণধার যে দেশীয় উচ্চ শ্রেণী তারা এরই মধ্যে জনসাধারণের থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের সাহিত্যের বাহন ছিল পয়ার ছন্দের পদ্য। তাতে শ্রেষ্ঠতর বিদ্যাবত্তা প্রকাশের সুযোগ কম বলে তখন মনে করা হল। তাঁরা গদ্য রচনা পদ্ধতি গঠন করে তোলার জন্য

স্বাতন্ত্র্যকামী হলেন। বাংলায় সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব যে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর ভিতর দিয়ে এখনকার লেখকরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন।

যত দিন না উপন্যাসের আবির্ভাব হয় ততদিন পর্যন্ত গদ্য প্রধানত ব্যবহারিক প্রয়োজন বা দর্শন এবং ধর্মালোচনাতেই ব্যবহার হচ্ছিল। এই বিষয়বস্তু ছাড়া রামমোহনের বাংলা গদ্য নিয়ে টানাটানি করারই কোনো দরকার ছিল না। তারপর প্রথম উপন্যাসের আবির্ভাব হল প্রচলিত গদ্য রীতির উপর একটা প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে। রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় বা বিদ্যাসাগর, এঁদের সকলের হাতেই বাংলা গদ্য সংস্কৃতের অনুগমন করেছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' এসেই এই ভাষার উপর কঠিন আঘাত হানল। মানুষের চলতি কথাবার্তার মধ্যে যে-সব শব্দ ঘোরা-ফেরা করে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র কাছে সেগুলিই হল বেশি গ্রহণযোগ্য, আর সংস্কৃত শব্দগুলি হল অব্যবহার্য। ইংরেজি সাহিত্যে ল্যাটিন ইংরেজি এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংরেজির একটা বিরোধ মাঝে মাঝেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাংলায় এই আন্দোলনের একটা বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে ক্রিয়াপদকেও কথ্য ভাষায় রূপদান করতে লেখকদের একটা অদ্ভুত ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে, এটা হয়তো ইংরেজিতে দেখা যায়নি। এর কারণ হয়তো এই যে ইংরেজি গদ্যের মতো বাংলা গদ্য দীর্ঘ দিন গির্জা বা ধর্মযাজকদের নিরঙ্কুশ অধিকারে থেকে একটা ঋজু সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে যায়নি। অতি নবীন অবস্থাতেই বাংলা ভাষায় লৌকিক বিষয় স্থান পেয়েছিল বলে তার অভিজাত-করণের বিরুদ্ধে গোড়াতেই আঘাত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং তা এতটা কৃতকার্য হয়েছিল যা ইংরেজি ভাষায় কোনো দিনই হতে পারেনি।

আমাদের সমাজের এবং সাহিত্যের পরিবর্তন যে ইওরোপীয়দের পরিবর্তনের চেয়ে অনেক দ্রুততর হয়েছে, তার প্রমাণ এদেশে ইংরেজের অধিকারের মাত্র কয়েক বছর পরেই 'আলালের ঘরের দুলালে'র মতো বইয়ের আবির্ভাব। সে বইয়ের বিষয়বস্তু ধর্ম তো নয়ই, ধর্মপ্রাণ কোনো চরিত্রও নয়। ইংরেজি সাহিত্যের পুরনো লেখকদের মধ্যে সুইফটের ব্যঙ্গ রচনার খুব খ্যাতি আছে। অত তীব্র ব্যঙ্গ বিরল। কিন্তু তার মধ্যেও সুইফট রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের ব্যঙ্গে কোনো আবরণ নেই—তা সহজ তীব্র

আক্রমণ। এরকম ব্যঙ্গ একমাত্র পরিণত বুর্জোআ সমাজেই সম্ভব। ফিউডাল সমাজে কোনো ব্যক্তিবিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ শাসিত হয়। বুর্জোআ যুগে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক পরিমাণে আইন-সঙ্গত। তাকে সংযত করার জন্য একমাত্র প্রতিষেধক আছে সমালোচনা করার অধিকারে। আমাদের দেশের তদানীন্তন সমাজে এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুবই বেড়ে গিয়েছিল বলেই 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের দেশে গদ্য এবং উপন্যাসের আবির্ভাব কি করে সম্ভব হয়েছিল তা বোধ হয় এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের সাদৃশ্যের কথাই বলেছি। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। এই পার্থক্যের জন্য আমাদের সাহিত্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এসেছে যেগুলির কথা আমাদের দেশের উপর বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা অনেক সময়ে মনে রাখলে উপকৃত হবেন।

প্রথম এবং বোধ করি প্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানটায় যে, যে-সামন্ততন্ত্র থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হয়ে এসেছে, তারই অনেক নীতি এবং প্রথা একরকম বিনা ছাড়পত্রেই উপন্যাসে প্রবেশ করেছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে 'আলালের ঘরের দুলালে'র আলোচনাতেই আবার ফিরে আসতে হয়। একটি বড়লোকের ছেলে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে এসে অতিরিক্ত বিলাসিতা এবং অসৎ সঙ্গের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কি ভাবে চরম দুর্দশায় পতিত হল, তার জ্বলন্ত ছবি লেখক উপস্থিত করেছেন। প্রথমত, প্রবল আক্রমণ করা হয়েছে বিলাসিতার বিরুদ্ধে, অথচ শহর জীবনে পরিমিত বিলাসিতা একটা পালনীয় ধর্ম। তারপর তদানীন্তন শিক্ষায় লেখক ধর্মের অভাবটা তীব্রভাবে বোধ করেছেন, অথচ ধর্ম বলতে তিনি বিলিতি অক্সফোর্ডের মতো বিশুদ্ধ ধর্ম বোঝেননি। তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন গঙ্গাজলের পবিত্রতার উপর, মদ-মুরগী বর্জনের উপর, এমন-কি জাতিভেদ, পৈতা—এই সমস্ত নিতান্তই যেগুলি আচারগত সংস্কার তার উপর। এ সমস্তই সেই যুগের ব্যাপার যে যুগে আপন বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপনের কোনো অধিকার ছিল না। এর সঙ্গে সুইফটের ব্যঙ্গের তুলনা করলে দুজনের মধ্যেকার অপরিমিত পার্থক্যটা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সুইফটের ব্যঙ্গ আক্রমণ করেছে তাদের যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েও আপন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, কোনো

ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভাকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ নেহাৎই বুর্জোআধর্মী ব্যক্তির মূল্যের উপর শ্রদ্ধার অভাবই তাঁর আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়েছে।

আর একখানি বইয়ের নাম করা চলে—'হুতোম প্যাচার নক্শা'। কোনো ধারাবাহিক গল্প নয়, এক একটি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে নতুন ধনিক শ্রেণীর উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালানো হয়েছে। আক্রমণের হেতু টেকচাঁদেরই অনুরূপ। একজন ছোট ঘরের ছেলে হয়তো অর্থবান হয়ে বাবুগিরি করছে, লেখকের চোখে তা একান্তই অসহ্য। অথচ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকেরই বড়লোক হবার অধিকারই হচ্ছে বুর্জোআ তন্ত্রের একেবারে গোড়ার কথা। এই লেখকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ রচনার সঙ্গে এডিসনের তুলনা চলে। এডিসনও সমাজকে ব্যঙ্গ করে ছোট ছোট নিবন্ধ লিখতেন। অথচ বিষয়বস্তুর অদ্ভুত পার্থক্য। এডিসন জনসাধারণকে আক্রমণ করেছেন তারা শহর জীবনে যথেষ্ট উপযুক্ত হয়ে উঠছে না বলে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভদ্রতা শিখছে না বলে। বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা তাদের মধ্যে যথেষ্ট রয়ে গেছে বলে। এই তুলনা-মূলক আলোচনা করতে বসলে অনুভব করতে হয় যে এদেশের বুর্জোআ তন্ত্রের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের পূর্বে কোনো লুথার এসে ধর্ম-সংস্কারের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলেননি।

যে ভদ্রলোকের এখানে উল্লেখ করলাম তাঁরা নিজেরাই কিন্তু তাঁদের লেখার মূর্তিমান প্রতিবাদ এবং এইখানেই অদ্ভুত স্ব-বিরোধের পরিচয় রয়েছে। তাঁরা ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে, সমাজের চিরাচরিত নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে, প্রবলভাবে মসী-যুদ্ধ চালিয়েছেন—কিন্তু তাঁরা নিজেরাই কী করেছেন? তাঁরা চিরাচরিত ভাষা পদ্যকে বাদ দিয়ে গদ্যকে বাহন করেছেন। তাই শুধু নয়, গদ্যের মধ্যেও এমন শব্দসমূহ অনুপ্রবিষ্ট করলেন যা সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে হুতোমী ভাষা এত বেশি আত্ম-স্বতন্ত্র, এমন কি অশ্লীলতা এবং প্রাদেশিকতা-দোষ গ্রহণে অবিচলিত, যে পরে যখন চলিত ভাষার আন্দোলন প্রবলতর হয়ে ফিরে আসে তখনও এই ভাষা গ্রহণের কথা কেউই বলেননি। এক কথায় এই লেখকরা মূর্তিমান বিদ্রোহ, পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী। বিস্ময়কর ব্যাপারটার এইখানেই শেষ নয়। তাঁরা যে আন্তরিকভাবে বুর্জোআ সমাজ চান না, এ কথাও তাঁরা কোনো জায়গায় ইঙ্গিতেও বলেননি। সহজেই লক্ষ্য করা যায়,

যে-চরিত্রগুলি মধ্যযুগীয় নয় বলে তাঁদের কোপের বস্তু হয়েছে, যে-সব গুণের দ্বারা বুর্জোআ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব তারা সে সব গুণ থেকেও বঞ্চিত, যেমন, পরিশ্রম করার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা, সহস্র লোকের শ্রমের অংশ অপহরণ করে বড়লোক হবার ক্ষমতা, ক্রেতাকে ঠকিয়ে ব্যবসায়ে লাভবান হবার ক্ষমতা, এবং এমনি আরও বুর্জোআ তন্ত্রের বড় বড় ধর্ম। এর দ্বারা কি এ কথাই বোঝায় না যে, সত্যিই বুর্জোআ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝা যায়, তার প্রতি এই লেখকদের কোনো আক্রোশ নেই? বরং এই তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তাঁদেরও কাম্য, এমন ইঙ্গিতও একেবারে দুর্লভ নয়। শুধু এই তাঁদের কাম্য যে, এই তন্ত্রের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিরাজ করুক। নাইবা থাকল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভুঁইফোড় বড়লোক কেউ না হয় না-ই হল। ধর্মের আচার নিয়মগুলির পরিবর্তন না হয় বাদই পড়ুক। এই লেখকদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল কিন্তু এই দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোনো সামঞ্জস্য হয় না, একথা চিন্তা করার উপযুক্ত অবকাশ তখনও আসেনি।

বলা চলতে পারে, একেবারে প্রথমে যাঁরা লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে স্ববিরোধ থাকা স্বাভাবিক,—চিন্তাধারার সম্পূর্ণতা কি হঠাৎ-ই আসে? কিন্তু ব্যাপারটা এর চেয়েও অনেক জটিল, এর মূল এবং বিস্তার অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। প্রথমে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসরে নামলেন তাঁর কথাই ধরা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরও এই স্ব-বিরোধের দর্শন মেলে। ব্যাপারটা বিচার করতে গেলে একেবারে অদ্ভুত মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো চিন্তাশীল ব্যক্তিও যে এরকম একটা অসঙ্গতির উর্ধ্বে উঠতে পারেননি, এটা হঠাৎ ভাবাই যায় না। 'দেবী চৌধুরানী' বইখানিই ধরা যাক। নায়ক ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে যা করে বসল, কোনো রকম মানবতার আদর্শ থেকেই তাকে সমর্থন করা যায় না। মধ্যযুগীয় বংশানুগত্য সব কিছুকেই অতিক্রম করে গেল। এমন-কি যদিও পিতার চরিত্রে এমন কিছুই লেখক দেখাননি যা সহানুভূতি আকর্ষণ করার যোগ্য। আবার নায়িকা কিছুদিন মানব কল্যাণের একটা মহান ব্রত গ্রহণ করেও অল্পকাল পরেই আবার স্বামীগৃহে ফিরে এল, কারণ সেই জায়গাটিই নাকি স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় কর্মস্থল। এই মেয়ে উচ্চতম শিক্ষা পেয়েছে, নিষ্কাম কর্মের গৎ শিখেছে এবং পরোপকার বৃত্তিতে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রমাণিত হয়ে গেছে; তবু সামান্য প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে সে অনায়াসে চলে গেল স্বামীর ঘরে ক্ষুদ্র গৃহজীবনের মধ্যে পচে মরতে।

কেন ? কারণ মধ্যযুগীয় সমাজ কোনো গঠনমূলক কাজে মেয়েদের কোনো স্থান নির্ণয় করেনি। অথচ এই বইয়েই ইংরেজ রাজত্বের আগমনকে শুভ ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও জানা কথা এই নতুন তন্ত্র অনেক কিছুকেই ভেঙে চুরমার করে দেবে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন চিন্তা যাকে বলে এই বইয়ে তার প্রচুর পরিচয় মেলে। ভবানী পাঠক সে-সময়ের সমাজের বিরুদ্ধে একজন রীতিমতো বিদ্রোহী। বড়লোকের সম্পত্তি অপহরণ করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করায় সে একটা প্রচণ্ড গৌরব বোধ করে, তার মন এমনি সংস্কারমুক্ত। প্রফুল্লের ভিতরও স্বাধীন চিন্তা প্রবল। গুরুস্থানীয় ভবানী পাঠকের সঙ্গে তার মতবিরোধ আছে। অথচ মজা এই যে স্বাধীন চিন্তার বলেই তারা সেই সমাজকে মেনে নিল যার মধ্যে ও জিনিসটি পাপ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রেমের পরিচয় মেলে। যে সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আদান প্রদান সবই কোনোরকম বংশানুক্রমিক প্রথার দ্বারা নয়, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে সমাজে বিবাহের বেলাতেও অতি স্বাভাবিকভাবে চুক্তির প্রাধান্য এসে গেছে। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে যা বঙ্কিমী উপন্যাসেও তারই প্রতিচ্ছবি। অন্য বইগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, রাধারানী, যুগলাঙ্গুরীয় এবং রজনী,—এই তিনটি গল্প একেবারেই প্রেমমূলক, যে প্রেম পরে বিবাহে রূপান্তরিত হয়ে আপন মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, এ-সব প্রেমের গোড়ায় স্বাভাবিক আকস্মিকতা রসবোধকে জাগ্রত করলেও শেষটায় দেখা গেছে, সেজন্য পঞ্জিকার নিয়ম-কানুন কিছু ভাঙতে হয়নি। মদন দেবতার জাতি-বিশুদ্ধির দিকে অসাধারণ মনোযোগ। এমন-কি ঠিকুজী-কুষ্ঠী মিলিয়ে নেওয়ার ব্যাপারও আছে। এর সঙ্গে গরিব লোক হঠাৎ ধনী হয়ে গিয়ে সমাজের বুর্জোআ পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র একাই নন, সমসাময়িক বা পরবর্তী অন্য লেখকদেরও ঐ একই দশা। স্বর্ণকুমারী দেবী একজন পুরোপুরি রোমান্টিক লেখিকা। তাঁর প্রায় বই-ই প্রেমমূলক ও প্রেমজনিত বিরহে ভরপুর। এবং এখানেও সেই পাঁজি-পুঁথির অন্যায় সমন্বয়। আরও এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের সময়ে পর্যন্ত এমন লেখক পাচ্ছি যাঁরা এই স্ব-বিরোধকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যেমন সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আর উদাহরণ না বাড়ালেও বোধকরি একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের স্ব-বিরোধের ধাঁধায় এত বেশি

লেখক আটক পড়েছেন যে শুধু অসম্পূর্ণ চিন্তাধারার ফল বা অমনি কিছু বলে জিনিসটিকে এড়ানো যায় না। এর একটা গভীর অর্থ আছে এবং সেটা হয়তো এই সময়কার সময়ের বিচার করলে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসতে পারে।

অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি হিসাবে যে নতুন সমাজ এল, তার প্রতি প্রায় সকল শ্রেণীরই অল্পবিস্তর সহানুভূতি ছিল, একথা আগেই বলেছি। কোম্পানীর হাত থেকে রানী ভিক্টোরিয়ার নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণের যে চাল, তার দ্বারা কোম্পানী-কৃত বীভৎস অত্যাচারের সব স্মৃতি অনেকটা চাপা পড়ে গেল। বিশেষ করে যে নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর পত্তন হল, তা স্বভাবতই এই তন্ত্রের দীর্ঘায়ু এবং নিজেদের উন্নতির আরও ক্রমবিকাশ আশা করতে লাগল। কিন্তু তবু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের অন্যায় আবির্ভাবের একটা কারণ অন্তত এই যে নতুন সমাজেও সুবিধা যারা পেয়েছিল, তারা প্রধানত বর্ণহিন্দু। ভয় ছিল যে তারা হঠাৎ একটা ইওরোপীয় সমানাধিকারবাদী সমাজ সৃষ্টি করলে নিম্নবর্ণ থেকেও অনেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং সে আশঙ্কা অচেতনভাবে তাদের আর্য রক্তকে উষ্ণ করেছে। এই ভুলের মূলে একটা ব্যাপার ছিল।

বাস্তবিকই বর্ণহিন্দুরা যাতে একচ্ছত্র না হয়ে ওঠে তার জন্য ইংরেজ প্রভুর কল্যাণে গোড়াতেই নিম্ন শ্রেণীর কতগুলি বিত্তশালী পরিবারের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। স্বভাবতই এই স্তরের সমাজ থেকে যে সাহিত্যিকদের উদ্ভব হল, তারা বিগত যুগের বৈষম্যমূলক সমাজের সমস্তরকম আচার ব্যবহার অনুসরণ করার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে কারণটা এর চেয়েও বেশি লক্ষ্য করবার, সেটা এবার বলা চলে। যে নতুন সমাজ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল তাতে না ছিল আমাদের কোনো দান, না আমরা তাতে কোনো অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যেন দাঙ্গা দেখতে দেখতে অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঙ্গার কার্য-কলাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। সুবিধা যারা পেয়েছিল, আপন কৃতিত্বহীনতার ক্ষোভ তারাও এড়াতে পারেনি। বিলেত থেকে যখন রেলওয়ে থেকে শুরু করে অজস্র যন্ত্র দানবের সৃষ্টি বিলাস এবং প্রয়োজনের উপকরণ এসে এদেশকে শিল্পহীন করে তুলল, তখন সুবিধা যারা পেয়েছিল তাদেরও একটু লজ্জা হয়েছিল বৈকি। নিজের দেশের রিক্ততার পথে তারা সাহায্য করেছিল, কিন্তু তার বদলে দেশে নতুন উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন

করতে পারেনি। তারা ইওরোপীয় সমাজের ছায়া হয়েই রইল; সে সমাজের কায়ারূপ, যন্ত্রের অলংকার, তা তাদের থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেল। ফলে অনেক ব্যাপারেই অনেক লজ্জাহীন কাজ করলেও ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে নিজেদের যে প্রচণ্ড পার্থক্য, এটা তারা একেবারে ভুলে যেতে পারল না। যে জাতীয়তার শব্দাতিরিক্ত কোনো অর্থ আমরা কোনোদিনই জানতাম না, পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে এসে সেই জাতীয়তা চাড়া দিয়ে উঠল। আমাদের উপর ইওরোপীয়দের প্রবল ঘৃণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের মধ্যে ইওরোপীয়দের উপর একটা প্রবল ঘৃণা জন্মাল। ইংরেজরা আমাদের কোনো জিনিস গ্রহণ করল না, সামান্যতম একটা আচার-ব্যবহারকে, সামান্যতম একটু সামাজিক রীতি-নীতিকেও তারা আমল দিল না। ধনী হয়ে যাদের মর্যাদাবোধ বেড়ে গিয়েছিল তারা ক্ষুব্ধ হল, ভাবল, ইংরেজ আমাদের কিছুই নেবে না—কেন, আমাদের কিছুই কি ভালো নেই? না থাকে না-ই থাকল, কিন্তু আমরাও অত ইংরেজের অনুকরণ করতে যাচ্ছি না। আমাদের আচার নিয়ম যা ছিল, তাকেই আমরা ধরে থাকব, বাদ দেব না ফোঁটা-তিলক, চলতে থাকবে প্রাতঃকালীন গঙ্গাস্নান। এক সময় মুসলমানরাও তো এদেশে এসেছিল, কিন্তু তারা তো এমন করে আমাদের অপমান করেনি, আমাদের সংস্কৃতির অনেক জিনিস তারা গ্রহণ করেছিল। এরকম যে ভাবনা যার ভিতর খানিকটা প্রচ্ছন্ন গর্বও আছে, তাকে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করেছিল হিন্দুদের দীর্ঘ ঐতিহ্য, তাদের বহুধা-বিস্তৃত ইতিহাস এবং দর্শন। এইটেই হচ্ছে কারণ যার জন্য একসময়ে বিবেকানন্দ বেদান্তের ধর্ম নিয়ে এসে ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে তুলতে পেরেছিলেন,—কারণ তার মধ্যে ছিল আত্মাদরের সুযোগ, এবং এই জন্যই বঙ্কিমী সাহিত্যে হিন্দুদের সুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য করুণ আবেদন প্রকাশ পেয়েছে এবং সর্বতোভাবে প্রাচ্য দর্শনকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। অথচ পুরনো বৈষম্যমূলক এবং বংশানুগামী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যে আধুনিক অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির কোনো সামঞ্জস্য হয় না, এ সামান্য কথাটা এত বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করতে পারেননি। এই যে অন্ধ জাতীয়তা একে আমি অজ্ঞান জাতীয়তাবোধ বলে উল্লেখ করতে চাই। কারণ এই জাতীয়তা শুধু বালকোচিত মর্যাদাবোধকেই স্বীকার করেছিল, জাতির সত্যিকারের উন্নতি কোন্ দিকে সে দিকে কোনো দৃষ্টি দেয়নি। সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থ নতুন অর্থনীতি এবং নতুন সামাজিক রীতিকে স্বীকার করে নিয়ে এই অর্থনীতির

প্রতিরোধক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। রবীন্দ্রনাথের সময়ে আমরা এই জাতীয়তার উন্মেষ লক্ষ্য করতে পারি। কাজেই প্রাক্-রাবীন্দ্রিক যুগকে আমরা সাহিত্যে অজ্ঞান বা অচেতন জাতীয়তার যুগ বলে অভিহিত করতে পারি।

অজ্ঞান জাতীয়তাবোধের যে যুগ তার চূড়ান্ত মীমাংসা এইখানেই হয়ে গেল না। একটা প্রশ্ন খুব সহজেই ওঠে: তা হচ্ছে যখন এ যুগে সবাই ইংরেজ শাসনকে মঙ্গলপ্রসূ বলে ধরে নিচ্ছে, তখন তার কি এই অর্থই করা যায় না যে আমাদের তদানীন্তন দাসমনোবৃত্তি এতই বেড়ে উঠেছিল যে স্বাধীনতা, ভিন্ন জাতির বন্ধন থেকে মুক্তি—তাও লেখকরা চাননি? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লেখক ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতকে চরম এবং পরম বলে ভাবতে পেরেছিলেন এ কথাটাকে কোনোক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না। আলোচনাটিকে সবচেয়ে সংক্ষেপ করে ফেলা যায় যদি আমরা তিনখানি উপন্যাসের আলোচনার মধ্যে জিনিসটিকে সীমাবদ্ধ রাখি। একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', আর একখানি রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত' আর তৃতীয়টি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'। 'আনন্দমঠে' হিন্দুরাজ্যের স্বপ্ন প্রকাশ পেয়েছে—এমন হিন্দুরাজ্য যার মূলনীতি সনাতন উপনিষদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাপ্তিতে সেই হিন্দুরাজ্যের স্বপ্ন ভেঙে গেল, তার বদলে রইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। আরও আশ্চর্যের বিষয়, লেখকের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল যে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কাছে মঙ্গলের অগ্রদূত। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে বইটি যাতে বাজেয়াপ্ত না হয়, সেইজন্য বঙ্কিম বাধ্য হয়ে ওইটুকু জুড়ে দিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার হচ্ছে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভই যে আমাদের একমাত্র পন্থা তা বঙ্কিমও জানতেন, এবং 'আনন্দমঠ' একটু ভালো করে পড়লেই তা বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এইটুকু স্বীকার করেছেন যে শতধা-বিভক্ত ভারতবর্ষে জাতীয়তা বলে কোনো জিনিসের এতদিন পর্যন্ত কোনো অস্তিত্বই ছিল না, ব্রিটিশ তার উন্মেষের পথ খুলে দিয়েছে এবং তা যেদিন পুরোপুরি বিকাশ লাভ করবে সেদিন আর ব্রিটিশ-অধীনতার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসন জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের যে চিত্র বঙ্কিমের মনে ছিল 'আনন্দমঠে' তারও

খানিকটা আভাস আছে। এক কথায় সে ভারত প্রাচীন ভারতের প্রতিচ্ছবি মাত্র। দীর্ঘকাল পাশ্চাত্ত্য প্রভাবাধীন থেকেও আমরা সুপ্ত সনাতনত্বকে ফিরে পেতে পারি, এ সভ্যতা তার এতটুকু চিহ্ন রেখে যাবে না আমাদের জীবনযাত্রায়, এরকম ভাবনার মধ্যে অন্ধ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় হয়তো আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আত্ম-প্রতারণাও আছে এ কথা মানতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের, তথা সাধারণভাবে তখনকার জাতীয় চিন্তার মধ্যে আর একটা মস্ত অসামঞ্জস্য ছিল এইখানটায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে বিশেষ করে মুসলমানদের মতো জনপুষ্ট ধর্মের সঙ্গে, হিন্দুদের অতি প্রয়োজনীয় এবং অতি অবধারিত জাতীয় সংহতির কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ধর্ম থেকে জাতীয়তাকে আলাদা করে দেখবার শিক্ষা আমাদের দেশে আরও অনেক পরে এসেছে।

রমেশচন্দ্রের বইয়ের পটভূমিকাও ঐতিহাসিক—আধুনিক যুগের পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আধুনিক কালের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তার মধ্যে আছে। শিবাজীর উত্থানে লেখকের অপরিমিত আনন্দ এবং রাজপুতদের পতনে লেখকের ঐকান্তিক দুঃখ অপরিহার্যভাবে লেখকের স্বাধীনতা-প্রীতির পরিচয় দেয়। কিন্তু এখানেও সেই সংকীর্ণতা লক্ষ্য করা যায়,—স্বাধীনতা বলতে লেখক হিন্দু স্বাধীনতাই বুঝেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নয়। এবং শিবাজীর আদর্শ প্রাচীন ভারতের আদর্শ plus জঙ্গীবাদ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'র মধ্যে আর একটু নতুনত্ব আছে। প্রাচীন ভারতে বণিক-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এই চিত্র উপস্থিত করে তিনি ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে বণিক-সভ্যতার সামঞ্জস্যের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেছেন।

প্রাক্-রবীন্দ্র যুগকে তাহলে অচেতন জাতীয়তার যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এই যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন চিন্তার নির্বিশেষ অধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে একটি জাগ্রত জাতীয় চেতনা। সেদিনকার জাতীয় চেতনার লক্ষ্য প্রসারিত ছিল, ভবিষ্যতের দিকে নয়, অতীতের দিকে; কিন্তু তা কার্যত আমাদের ঠেলে দিয়েছে ভবিষ্যতের দিকেই। সমাজ সংস্কারের প্রবণতা ছিল এ-যুগের বিশেষ লক্ষণ এবং সাহিত্যে তার প্রকাশ অপ্রতুল নয়।

পরবর্তী যুগের পুরোধা হয়ে এলেন বিরাট প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর 'চোখের বালি'র প্রকাশকালকে বোধ করি নতুন যুগের সূত্রপাত বলে

চিহ্নিত করা যায়। এ যুগের বিশেষত্ব হিসাবে লক্ষণীয়, দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সন্তানসম্ভবা জননীর মতো অতি মন্থর পদে অগ্রসর হচ্ছে। বিদেশী মালিকানায় কিছু কলকারখানার পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে থাকলেও, যে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে, তা যে শান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশের সহযোগিতায় পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে এ মোহ দ্রুত ভেঙে যেতে শুরু করেছে। তারই ফল, বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিরোধ, যা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে প্রথম সক্রিয় সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করল। দ্রুত অর্থ নৈতিক পরিবর্তন নয়, প্রতিশ্রুত পরিবর্তনের অভাবই আমাদের নতুন করে চিন্তায় প্ররোচিত করেছে এবং রাজনীতিতে, সাহিত্যে নতুন যুগের জন্ম দিয়েছে। আমাদের নবগঠিত নাগরিক উচ্চ শ্রেণী একটি শিল্পপ্রধান ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রকৃত শিল্পপতি শ্রেণীতে রূপান্তর লাভের আশায় ব্রিটিশের সাহায্যে আস্থাহীন হয়ে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে হস্ত প্রসারিত করেছিল ব্রিটিশ-বিরোধী অভিযানের শরিক হওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রমশ দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সাহিত্য-রথীদের চিন্তার ব্যবধান স্পষ্টতর হতে শুরু করেছে এই যুগে।

নতুন করে চিন্তা করা, এবং পুরনো চিন্তাকে সংশোধন করার প্রয়াসের প্রথম বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই 'গোরা'র মধ্যে। 'আনন্দমঠে'র আদর্শ আর 'গোরা'র আদর্শে অনেক তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, আমরা পুরোপুরি প্রাচীন আদর্শে ফিরে যাব এ-কথা ঠিক নয় : সেই আদর্শ গণতন্ত্র এবং মানবীয় আদর্শ অনুযায়ী সংস্কার করে নিতে হবে। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ না থাকলেও তাকে তার আনুষঙ্গিক জাতি-বৈষম্য ও অনুষ্ঠান-প্রাধান্য থেকে বিমুক্ত করে নিতে হবে। এইভাবে ধর্মীয় এবং জাতীয় আদর্শকে বিচ্ছিন্ন না করেও তিনি উভয়েরই বিশুদ্ধীকরণ সাধন করলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের মূল যুক্তিকে তিনি সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রচার করলেন সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে।

সমাজনীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমের রোহিণী সমস্যাকে আবার নতুন করে পর্যালোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে। মামুলী নৈতিকতার ভিত্তিতে কি বিধবা নারীর বঞ্চিত জীবনের স্খলন-পতনের সমস্যার বিচার করা চলে? মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার অন্তর্লোকের ঘাত-প্রতিঘাত এবং যন্ত্রণার খোঁজখবর নিলে কি একটি ভিন্নতর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় না?

সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নারীর সমানাধিকারের দাবি প্রভৃতি প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথ গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করলেন। এই ভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে গণতন্ত্র এবং মানব ধর্মকে প্রয়োগ করতে চাইলেন তাতে সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের অনিচ্ছাই সেদিন রাজনৈতিক কর্ম ও সাহিত্যচিন্তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চিন্তার এতখানি বিশুদ্ধতা শরৎচন্দ্রের মধ্যে না থাকলেও তিনি স্নেহ-ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির আবেগসমূহকে বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের ভিতর দিয়ে অতি উচ্চ মূল্যে স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পরিপূরক হিসাবে আপন আসন নির্দিষ্ট করেন। তা ছাড়া চিন্তার অনেক স্ব-বিরোধ সত্ত্বেও নর-নারীর প্রেম সমস্যার প্রশ্নে শরৎচন্দ্র নব্য নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন এবং অনমনীয়ভাবে তাকে সাহিত্য রূপ দিয়েছিলেন।

এই সময়কার অন্যান্য লেখকেরাও—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি—সমাজ-জীবনে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রয়োগ করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কাজেই সমস্ত মিলিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে জাতীয়তা-বোধ এখন গণতন্ত্র আর মানব ধর্ম এই জোড়া বলদের বলিষ্ঠ কাঁধের উপর চেপে দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই যুগকে আমরা সচেতনতার যুগ বলে আখ্যাত করতে পারি।

এতকাল পর্যন্ত সাহিত্যের গতি ছিল প্রধানত একমুখী। বিভিন্ন লেখকের মধ্যে বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ-রীতির দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ক্রমশ ক্রমশ সাহিত্য বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। শিল্পকৈবল্যবাদ-ভিত্তিক, বাস্তববাদী, মনস্তত্ত্ব-মূলক, সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাসী প্রভৃতি বিভিন্ন রীতি এবং চিন্তাধারা প্রসূত সাহিত্য-কর্মসমূহের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের প্রসারকে পূর্ববর্তী কাল থেকে বহুগুণে বর্ধিত করে তুলেছে।

রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বাংলা দেশের সাহিত্য-চিন্তার ব্যবধানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশরাজের অব্যাহত বিক্রমে জয়লাভ এবং তারপর কংগ্রেসী অসহযোগ আন্দোলনের পরাজয়ে এই ব্যবধান এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এবং নজরুলের কাব্য রচনায় সন্ত্রাসবাদের পথে বাঙালী আশার আলোর সন্ধান পেল। কিন্তু প্রায় সমস্ত নবাগত ঔপন্যাসিকই সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম সম্পর্কে

দারুণভাবে আস্থাহীন হয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না। তখন যুদ্ধ-পরবর্তী ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকটের যুগ। ইতিমধ্যে একটি দেশীয় শিল্পপতি শ্রেণীর পত্তন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বাঙালীরা যে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখতেন, সেই শিল্পে ক্রমসম্প্রসারণেও কোনো অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল না। বরং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশা কোনো কোনো লেখককে তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলল।

এতকাল ধরে অনুসৃত নানা রকম সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা দেখে একালের লেখকেরা দেশের জনসাধারণের প্রতিও আস্থাহীন হয়ে পড়লেন।

এই সর্বব্যাপক হতাশার মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ব্যাখ্যাত শিল্পকৈবল্যবাদের নীতিকে আধুনিক লেখকরা পরম আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করলেন। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি লেখকেরা 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই নীতি অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দিলেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শিল্পের দায়িত্ব অস্বীকার করলেও এই লেখকেরা গণতান্ত্রিক জগতের ইব্‌সেন-পরবর্তী চিন্তা-বিপ্লবের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবচেয়ে বেশি সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত বলে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু শিল্পকৈবল্যবাদের প্রভাবে সাহিত্য যেন তার জাতীয় লক্ষ্য অনেকখানি পরিমাণে হারিয়ে ফেলল। এখন থেকে এক শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব হতে লাগল পাঠকের মনোহরণ করাই যাঁরা নিজেদের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করলেন। হাল্‌কা মিষ্টি রোমান্টিসিজম্‌, সামাজিক তাৎপর্যহীন বিদ্রূপ, সময় বা কোনো অগভীর আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে প্রধানত বিন্যাসগত নৈপুণ্যের সাহায্যে তাঁরা পাঠকের তৃপ্তিদানে সচেষ্ট হয়েছেন। এইভাবে এসেছেন বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতি লেখকেরা এবং আরও পরে বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি।

কিন্তু হতাশার পঙ্কের মধ্যে ডুবে থেকেও অত্যন্ত গভীরভাবে কারণ নির্ণয় এবং পন্থানুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনজন উল্লেখযোগ্য লেখক—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক মানুষের মনোজগতে, বিভূতিভূষণ ব্যক্তির কবি সত্তায়, এবং তারাশঙ্কর বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর পরিবর্তনের ধারার মধ্যে এই অনুসন্ধানের কাজ

চালিয়েছেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসাবে উল্লেখ করা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতিকে।

আগেই বলেছি, বর্তমান সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর অসাধারণ গুরুত্ব এবং তাদের অমানুষিক জীবনযাত্রার প্রতি লেখকদের দৃষ্টিনিক্ষেপ এ-যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রমিক এবং নিম্নতর শ্রেণীদের নিয়ে প্রথম গুরুতরভাবে লিখতে আরম্ভ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁদের ধারাকে অনুসরণ করে কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে মানিক, তারাশঙ্কর, মনোরঞ্জন হাজরা প্রভৃতি লেখকেরা লিখতে শুরু করেন। সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাসী প্রায় অধিকাংশ লেখকই কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। গোপাল হালদার, সুশীল জানা, গুণময় মান্না, অমরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কৃষকদের জীবনযাত্রার উপর উল্লেখ-যোগ্য বই লিখেছেন। শ্রমিক জীবনের উপর ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু প্রভৃতিরও লেখা আছে। তবে মোটের উপর হয়তো বলা চলে বাংলা সাহিত্যে কৃষক সমাজ যেটুকুও বা প্রতিনিধিত্ব পেয়েছেন, শ্রমিক সমাজ তাও পাননি।

এ যুগের সাহিত্যে তাহলে আমরা বিভিন্ন দিকে একটা অভূতপূর্ব প্রসার দেখতে পাচ্ছি। দেশের বিভিন্ন অবহেলিত শ্রেণী এবং উপশ্রেণীর জীবন-সত্তা, চরিত্র এবং সমস্যা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে চিন্তাশীলতার অভাব, বাস্তবানুগত্য এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে অনিচ্ছা প্রভৃতির বাহুল্য দেখে মনে হয় সাহিত্য তার সত্যানুসন্ধিৎসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। ক্লান্তিকর নাগরিক জীবনে প্রচুর পরিমাণে লঘু রচনার প্রয়োজন স্বীকার করেও এ কথা বলা যায় যে লঘু রচনা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শক্তির মর্যাদা লাভ করলে তাতে সাহিত্যের সাধর্মচ্যুতিই প্রমাণিত হয়। কাজেই এ-যুগকে সম্প্রসারণ ও ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এ-যুগের মধ্যে তিনটি স্তরকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়—কলাকৈবল্যবাদের স্তর, অনুসন্ধানের স্তর এবং পঞ্চাশোত্তর রম্যরচনার স্তর। বলা বাহুল্য, এ যুগের সাহিত্য জটিল এবং বহুমুখী; কাজেই এই ধরনের নামকরণ শুধু কোনো সময়ের অধিকতর শক্তিশালী সুরটিরই পরিচয় দিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনবার স্রোত পরিবর্তন অসাধারণ গতি এবং চাঞ্চল্যের পরিচায়ক। এই গতি এবং চাঞ্চল্য আর কিছুর না হোক, অন্তত প্রচণ্ড জীবনীশক্তির পরিচায়ক।

বস্তুত, বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার গতিশীলতা। ইংরেজি সাহিত্যে রিচার্ডসন থেকে শুরু করে তিনশো বছরের মধ্যে যতগুলি প্রধান প্রধান ধারা এসেছে তার প্রায় সবগুলিই ভিন্নরূপে বাংলা সাহিত্যে একশো বছরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই অসাধারণ দ্রুততার কারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের দেশে ধাপে ধাপে যে বৈপ্লবিক কর্ম ও চিন্তা জন্মলাভ করেছে তার মধ্যে নিহিত। অবশ্য ঐতিহ্য সূত্রে আমরা যে প্রচণ্ড জীবনশক্তির অধিকারী তার কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | বঙ্কিম যুগ বা আত্মানুসন্ধানের যুগ

প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই বাংলাদেশে অশান্তি, উপদ্রব আর অরাজকতার সীমা ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলে অরাজকতার নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল মাত্র। অবশেষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশে তুলনামূলক ভাবে কিছুটা শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে ইংরেজ সরকার তার শাসনব্যবস্থাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিল।

ইংরেজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুলাংশে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করেছিল। স্থিতিস্থাপক গ্রামীণ অর্থনীতির বদলে গতিশীল বাণিজ্যিক অর্থ-নীতি প্রাধান্য লাভ করেছিল; শহর ক্রমশ গুরুত্বলাভ করছিল। দেশে এক নতুন বিত্তবান শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ বণিকদের শাকরেদী করে অথবা জমিদারী ব্যবস্থার রদবদলের ফলে।

রাজশক্তির ভাঙাগড়ার এই দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে বাঙালী জনসাধারণ কোনোদিন কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করেনি। নিজের ভাঙা ঘরখানির দরজাটি শক্ত করে বন্ধ করে দিয়ে গণ-মানস দরজার ফাঁক দিয়ে ভয়ে-আতঙ্কে-বিস্ময়ে বিপুলায়তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ঝড় বা ভূমিকম্পের আক্রমণ থেকে প্রতিকার বা প্রতি-বিধানের কথা আমরা যেমন আজও ভাবতে পারি না, আমরা কেবল যার যার সুযোগ সুবিধা মতো আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারি মাত্র, বাঙালী গণ-মানসের কাছে রাষ্ট্রবিপ্লব সেদিন তেমনি এক প্রতিবিধানের অতীত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে গণ্য হয়েছিল।

কিন্তু বহিরাক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে জনতার যে কিছু ভূমিকা থাকতে পারে এ চেতনা বাঙালী বা ভারতবাসীর ছিল না বটে,

তবে একটি জিনিস সম্পর্কে সে খুব ভালো করে শিক্ষালাভ করেছিল—ঘর সামলানোর শিক্ষা। হিন্দুধর্ম এক আশ্চর্য ধর্ম। যদিও কতকগুলি মোটামুটি সামাজিক বিধানের দ্বারা এই ধর্ম নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু এই ধর্ম প্রধানত পরিবার-কেন্দ্রিক। এই ধর্মের কোনো নিয়মিত সমবেত বা সামাজিক অনুষ্ঠান নেই। প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়িতে পূজা-অর্চনা ও অন্যান্য আচার নিয়ম পালন করে থাকে। এমন কি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আচার নিয়মের যথেষ্ট বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সেই জন্যই হিন্দুদের সামাজিক সংঘশক্তি খুব দৃঢ় নয়, তবে তাদের পরিবারিক সংহতি খুব দৃঢ় (আমি অবশ্য আধুনিক কালের কথা বলছি না)। যে-সব আচার নিয়ম ধর্মবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর একটি পারিবারিক জীবন দাঁড়িয়ে থাকে কালক্রমে তা এক দুর্ভেদ্য বর্মে পরিণত হয়ে সমস্ত বাইরের প্রভাবের সংক্রমণ থেকে পরিবারকে রক্ষা করেছে। এই বিশেষত্বের নাম দেওয়া চলে **insularity** বা অভেদ্যতা।

কী করে এই পারিবারিক সামাজিক অভেদ্যতা বা প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে উঠেছিল তা সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। আমার মনে হয় মুসলিম রাজত্ব-কালে এই প্রতিরোধ-শক্তি চরম কাঠিন্য লাভ করেছিল। ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম এই যে বিজয়ী শক্তি যদি বিজিত শক্তির চেয়ে উন্নততর সংস্কৃতির বাহক হয় তবে বিজিত শক্তি কালক্রমে বিজয়ী শক্তির ধর্মকে গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি কোনোক্রমেই মুসলিম সংস্কৃতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না বলে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হতে পারেনি। পক্ষান্তরে বিজয়ী শক্তি বিজিত শক্তি অপেক্ষা সাংস্কৃতিক দিক থেকে হীনতর হলে কালক্রমে তা বিজিতের সমাজদেহের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রক্রিয়ার একটিও কার্যকরী হয়নি। সম্ভবত তার কারণ এই যে (১) হিন্দু আর ইসলাম সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে সহজ মিলনের কোনো সাধারণ ভূমি খুঁজে পাওয়া যায়নি, এবং (২) ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ধর্ম; জন্মলাভের অল্প পরেই সে বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হয়েছিল; আক্রমণাত্মক চরিত্র কখনও সহজে অপরের প্রভাবকে স্বীকার করে না। কারণ যাই হোক, দুটি সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করেছে এবং অত্যন্ত সচেতনভাবে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে চলেছে; এই সচেতন প্রয়াসের ফলে উভয় সম্প্রদায়েরই স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে শিলীভূত হয়ে গিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইংলণ্ডের ষোড়শ শতকীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক

অবস্থার সঙ্গে বাংলা দেশের উনিশ শতকীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট মিল ছিল। পরিবর্তনকালীন অগ্রগতিশীল অর্থনীতি, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের রদবদল, শহরকেন্দ্রিক জীবনে ভোগ-বিলাসিতার প্রতি আগ্রহ,—উনিশ শতকীয় বাংলাদেশে এ-সব বিশেষত্বগুলি চোখে পড়বে। এই আবহাওয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, গতিশীল জীবনযাত্রায় বিশ্বাস, ঐহিকতা প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। বাংলাদেশে এই বিশেষত্বগুলি দেখা দিয়েছিল; কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে।

ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার তফাৎ ছিল দুটি ব্যাপারে। প্রথমত, ওদেশের মতো এ দেশে প্রধানত আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ভিতর দিয়ে পরিবর্তন আসেনি; এসেছিল বহিঃশক্তির প্রভাবে ও প্রয়োজনে। আমরা ভালো করেই জানতাম এ দেশের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে আমাদের চেষ্টা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। দ্বিতীয়ত, পূর্বাকাশে যখন নবজীবনের সংকেত দেখা দিয়েছে, তখন পল্লীগ্রামের ঘন পত্র-পল্লবের ছায়ায় ঘেরা অঙ্গনে তার এতটুকু রেশও গিয়ে পৌছায়নি। দেশের কোটি কোটি হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ দীর্ঘ শতাব্দীর চেষ্টায় যার যার ধর্ম ও সংস্কৃতির চারপাশে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল তার আড়ালে তারা ছিল নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন।

আমরা দেখতে পাই রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্মের আন্দোলন উচ্চ সমাজকে ছাড়িয়ে গণচিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রীতি-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কাছে আপামর জনসাধারণ প্রণতি জানিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর শাস্ত্র-বিচার কণ্টকিত সংস্কার আন্দোলন গণমানসের উপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। যাঁরা ইওরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি আরও অনুরক্ত ছিলেন, বলা বাহুল্য, তাঁরা জনচিত্ত থেকে আরও দূরে অবস্থান করছিলেন।

বিজিত-বিজয়ীর যে ঐতিহাসিক নিয়ম তা এক্ষেত্রেও বাংলাদেশে (তথা ভারতবর্ষে) কার্যকরী হয়নি, অথবা মাত্র আংশিকভাবে কার্যকরী হয়েছিল। ইংরেজ এ দেশে যে ধর্ম নিয়ে এসেছিল তা কোনো ভারতীয় ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না; কাজেই বিজয়ী জাতির ধর্মগ্রহণের প্রশ্ন দেখা দেয়নি। ইংরেজ যে সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল তা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর না হলেও তা ছিল নিঃসন্দেহে জীবন্ত, সচল, অধিকতর কর্মক্ষম এবং অধিকতর যুগোপযোগী। দুঃখের বিষয় যে-সব ইংরেজ এ দেশে এসেছিল তাদের মধ্যে

পনের আনাই ছিল বঙ্কিম-কর্তৃক চিত্রিত লরেন্স ফস্টর জাতীয় চরিত্র ; তারা ওদেশের সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এবং স্বভাবতই ওদেশের সংস্কৃতিকে তারা বহন করে আনেনি। ওদেশের সংস্কৃতি বহন করে এনেছিল ওদেশের সাহিত্য এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন। স্বভাবতই বৃহত্তর জনসাধারণ সেদিন এই সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর রাখত না। যাঁরা খোঁজখবর রাখলেন তাঁরা বুঝতে পারলেন বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে এবং অগ্রসর হতে হলে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু কী ভাবে কতখানি পরিমাণে গ্রহণ করা যায়, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কী ভাবে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এই ছিল সেদিনকার শিক্ষিত মানসের সামনে প্রশ্ন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এক ধরনের মানসিক অনিশ্চয়তা ছিল। তার মানে এই নয় যে সুস্পষ্ট মতামতের কিছু অভাব ছিল। এই সময়ের মধ্যে রক্ষণশীল সংস্কারপন্থী, উদারনৈতিক ও চরমপন্থী প্রভৃতি কয়েকটি সুস্পষ্ট মনোভাবকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু যাঁরা বিভিন্ন মনোভাব পোষণ করতেন তাঁদের কারও সামনেই কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তা সকলেই জানতেন ; কিন্তু পরিবর্তন কোন্ পথে আসবে এবং কী ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এ বিষয়ে কারও মনে কোনো পরিচ্ছন্ন চিন্তা ছিল না।

অবশেষে পঞ্চাশের পরে বোধ করি শিক্ষিত মানসে ধীরে ধীরে এই চৈতন্য দেখা দিয়েছিল যে বাঙালী জনসাধারণ তাঁদের সঙ্গে নেই, এবং মত পথ ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁরা যত বাগ্‌বিতণ্ডাই করুন জনসাধারণের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত-ভাবে তা সবই অর্থহীন। যেদিন শিক্ষিত সমাজ গণমানস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন, সেদিন প্রথম তাঁরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছলেন যে বাংলা দেশ এবং বাঙালী গণসমাজ তাঁদের একমাত্র নিয়তি। বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার সংকল্প ত্যাগ করে মাইকেল ১৮৬১-তে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' এবং বঙ্কিম ১৮৬৫-তে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যেই উক্ত উপলব্ধির প্রমাণ রয়েছে। পঞ্চাশের পরেও মত বা আদর্শ নিয়ে বাদানুবাদের অবধি ছিল না ; কিন্তু এ বিষয়ে কারও মনে কোনো সংশয় ছিল না যে সমস্ত বাদানুবাদের লক্ষ্য হল বাঙালী গণ-সমাজ। (সর্বভারতীয় চেতনা তখনও পুরোপুরি দেখা দেয়নি।)

বঙ্কিম যুগের সাহিত্যের প্রথম চরিত্রগত লক্ষণ এইটি—গণমানস থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং তার দরুন গণসমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। এইখানেই ইংরেজি সাহিত্যের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে বঙ্কিম যুগের মৌলিক পার্থক্য। এলিজাবেথীয় যুগে কিছু কিছু আভিজাত্যগর্বী নাট্যকার যে ছিলেন না এমন নয়; কিন্তু অধিকাংশ নাট্যকারের সঙ্গে গণমানসের নিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। স্বয়ং সেকস্‌পীয়রও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁদের ধ্যানধারণা রুচি-বোধ নৈতিক চেতনা হয়তো জনসাধারণের থেকে উন্নত ছিল, কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল না। সেইজন্যই গণমানসের প্রতি শিক্ষকসুলভ বা অভিভাবকসুলভ মনোভাবের দ্বারা এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের সৃজনী কল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়নি। কল্পনার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ বিস্তার complete freedom of the imagination—এলিজাবেথীয় রেনেশাঁসের বিশেষত্ব কিন্তু বঙ্কিম যুগ সম্পর্কে এ কথা কোনোক্রমেই বলা চলে না। এ যুগের প্রত্যেক লেখক দেশ এবং জাতির প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি সজাগ। বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা বা বিশুদ্ধ সাহিত্যসাধনা এ যুগে অভাবনীয়।

এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে বঙ্কিম যুগের তুলনা করছি বটে, কিন্তু এই দুই যুগের মধ্যে প্রায় তিন-শো বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে হব্‌স্ লক্ নিউটন ডারউইন হার্বার্ট স্পেন্সার কোম্‌ত মিল বেন্থাম প্রভৃতি চিন্তানায়কদের ভিতর দিয়ে ওদেশে জড়বাদী প্রত্যক্ষতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে; এবং বঙ্কিমের কালের লেখকরা স্বভাবতই এই অগ্রসর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছেন। লক্ষণীয় এই যে ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক রিভাই-ভ্যালের যুগের ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ প্রমুখ কবি বা লেখকদের কোনো উল্লেখ-যোগ্য প্রভাব বঙ্কিম যুগের সাহিত্যে পাই না; অথচ তার পূর্ববর্তী অষ্টাদশ শতকীয় নীতি ও রীতি প্রাধান্য এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা বঙ্কিম যুগমানসকে প্রভাবিত করেছে। কোল্‌রিজের রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শকে বঙ্কিম উপেক্ষা করেছেন; এবং এদেশীয় রসতত্ত্বকে তো তিনি অর্বাচীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকীয় সাহিত্য-চিন্তা যে বঙ্কিম যুগকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল তার কারণ সহজেই অনুমেয়। দেশ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, শিক্ষক এবং প্রচারকসুলভ মনোভাব স্বভাবতই নীতিমূলক এবং শিক্ষামূলক সাহিত্যাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

বিপরীতক্রমে বঙ্কিম যুগে আমরা রেনেশাঁসসুলভ মনস্তত্ত্বেরও সাক্ষাৎ লাভ

করি। রেনেশাঁস মনস্তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব হল নতুন করে জীবন আরম্ভ করার অনুভূতি। বাংলাদেশের উনিশ শতকে এ অনুভূতি খুব স্বাভাবিক ছিল। বাংলা গদ্য থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত অনেক কিছুই একালে নতুন করে শুরু করা হয়। নতুন করে জীবন আরম্ভের মনস্তত্ত্ব অন্তহীন আশাবাদের জন্ম দেয়, সামনে দীর্ঘ ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত একটানা অগ্রগতিশীল পথ-রেখার কুয়াশাচ্ছন্ন দূর দিগন্ত অস্পষ্টভাবে মনের কল্পনায় ভেসে ওঠে। এই আশাবাদ জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং রোমান্টিসিজমের জন্ম দিয়েছে। রেনেশাঁসকালীন রোমান্টিসিজম্ তত্ত্বমূলক নয়, স্বতঃস্ফূর্ত; তার জন্ম উৎসাহ থেকে, নিরাশা বা বিতৃষ্ণা থেকে নয়; তা জীবনের স্বীকৃতি, জীবন থেকে পলায়নের আকৃতি নয়। এই রোমান্টিসিজমের বিশেষত্ব অতিরঞ্জন; কল্পনার সূক্ষ্মতা নয়, বিশালতা; গভীরতা নয়, ব্যাপ্তি। সেই জন্যই বঙ্কিম যুগে ইতি-হাসাশ্রিত অতিশয়োক্তি-প্রধান কাহিনীর প্রাচুর্য; এবং সে দিক থেকে এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে তার মিল রয়েছে।

রেনেশাঁসী মনস্তত্ত্বের আর একটি বিশেষত্ব হল—পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সহাবস্থান। যুগসন্ধির মনোভাব উনিশ শতকীয় মানসে অত্যন্ত স্পষ্ট। পুরাতন প্রাচ্যের সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্য-বিধানের চিন্তাই এ যুগের প্রধান চিন্তা। সেই জন্যই এ যুগের সাহিত্যে এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলবে যে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সনাতন জীবনধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যের মতোই বঙ্কিম যুগের সাহিত্যে কঠোর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সাধু-সন্ন্যাসী এবং অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস স্থান পেয়েছে অনায়াসে; এবং কোম্‌ত বা মিলের শিক্ষা তাতে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

বিপুল আশার পাশাপাশি গভীর আশঙ্কা ও হতাশা জন্মলাভ করে। মানুষ চোখের সামনে যে ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনাকে দেখতে পায়, বাস্তব ক্ষেত্রে তার পরিপূর্তির পথে অনেক বাধা তাকে ভগ্নোদ্যম করে, জীবনের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাগুলি তাকে বিক্ষুব্ধ করে। সেই জন্যই রেনেশাঁসের যুগে যখন মূল্য-বোধগুলি স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে তখন ট্রাজেডিমূলক চিন্তা প্রাধান্য পায়। এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যে যদিও প্রচুর কমেডি রচিত হয়েছিল, তবু ট্রাজেডিতেই শিল্প-প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেছিল। বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে এবং নাটকেও ট্রাজেডি বা প্রায়-ট্রাজেডিমূলক কাহিনীতেই অধিকতর সার্থকতা দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিম যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে যে কী অফুরন্ত উৎসাহ ছিল তার বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে অর্থের বেশ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বঙ্কিম যুগের সাহিত্যসাধনার পিছনে অর্থকরী প্রত্যাশা প্রায় ছিল না বলাই ভালো। অনেকের পক্ষেই সাহিত্য বাতিকের অর্থ ছিল নিজের স্বল্প আয়ের উপরে নতুন করভার সাধ করে চাপিয়ে দেওয়া। তথাপি তখনকার ক্ষুদ্রায়তন শিক্ষিত সমাজের তুলনায় সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপকতা বিস্ময়কর। কত নতুন নতুন পথে পরীক্ষামূলক প্রয়াস চালিয়েছেন সেকালের লেখক সমাজ। এক বঙ্কিমের রচনাতেই—রজনী, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড প্রভৃতিতে—বিশিষ্ট রীতিমূলক পরীক্ষার নজির পাওয়া যায়।

এই পর্যন্ত আলোচনায় আশা করি এ-কথা স্পষ্ট হয়েছে যে বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা কাজ করেছে। এক দিকে গণ-বিচ্ছিন্ন লেখক সমাজ গণমানসের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদে নীতিমূলক শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টি-কল্পনাকে যুক্তি ও বুদ্ধির শাসনে সংযত করতে চেয়েছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পিছনে ছিল বলেই ইংরেজি সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকীয় সাহিত্য চিন্তা ও যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—এক কথায় ক্লাসিক্যাল সাহিত্য নীতি—এ যুগের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে; অথচ পরবর্তী যুগের ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কোলরিজের রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। অবশ্য এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাব হয়তো অনুভব করতে পারি; কিন্তু স্কট যতখানি রোমান্টিক, ততখানি ক্লাসিক্যাল। অপর দিকে এ-যুগের উপন্যাসে আমরা রেনেশাঁসসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত রোমান্টিসিজম্, আশাবাদ, নতুন ও পুরাতনের সহাবস্থান প্রভৃতি বিশেষত্বগুলির সাক্ষাৎ পাই। এই কারণে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে এ-যুগের উপন্যাসের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে সেকস্পীয়রীয় প্রাকৃত-বাদী (naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মোহিতলালের এই অভিমত মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এখন প্রশ্ন এই: উপরোক্ত দুটি বিপরীতধর্মী প্রবণতা একই যুগের সাহিত্যে কী করে স্থান লাভ করতে পারল? এর উত্তর খুব সহজ,—উভয় প্রবণতাই আপন আপন বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে একটা নতুন কিছুর জন্ম দিয়েছিল। কল্পনার অবাধ মুক্তি জগৎ-জীবন সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতাকে অকুণ্ঠভাবে

প্রকাশের সৎসাহস জোগায়। এলিজাবেথীয় যুগের সেকসপীয়র, মার্লো প্রভৃতি নাট্যকারদের মধ্যে আমরা এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আবার মুক্ত কল্পনা অধঃপতিত হলে তা শুধু দর্শক বা পাঠক মানসে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসে পর্যবসিত হয়, এবং এমন দৃষ্টান্তেরও এলিজাবেথীয় যুগে অভাব নেই। বঙ্কিম যুগে আমরা কিন্তু একটু স্বতন্ত্র দৃশ্য দেখতে পাই। কখনও দেখতে পাই, লেখকের জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সামাজিক কর্তব্যবোধের সংঘাত একটি সূক্ষ্ম দ্বৈতভাব (dualism) সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনায় যা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। স্বয়ং বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে শিল্পী বঙ্কিম আর প্রচারক বঙ্কিমের দ্বৈত-উপস্থিতিকে অনুভব না করে পারা যায় না। অন্যত্র আমরা দেখতে পাই নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আদর্শায়িত চরিত্র সৃষ্টি, নীতির জয়-সূচক দৃশ্যাদির অবতারণায় সৃজনী কল্পনাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

বঙ্কিম যুগ যত এগিয়ে গিয়েছে তত আমরা দেখতে পাই বাধাপ্রাপ্ত রোমান্টিসিজম্ প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ চিত্র ও চরিত্রাদি রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। উনিশ শতকের দুই নবাগন্তুক শিশু যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদ শতাব্দী যত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই ভাবাতিশয্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র অবশ্য ভাবালুতা থেকে বিস্ময়করভাবে মুক্ত। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের উন্মার্গগামী ভাবালুতা কাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ('বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র লেখক), যোগেন্দ্রচন্দ্র ('শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র লেখক), স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রভৃতি লেখক-লেখিকাদের মধ্যে ভাবাতিশয্যের প্রাধান্য আধুনিক পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্যকেই প্রকৃত সাহিত্য রস বলে গণ্য করা হত এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য রচিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'। বইখানি উপন্যাস নয়; স্ত্রী-বিয়োগের ফলে লেখক যে শোকোচ্ছ্বাস অনুভব করেছিলেন তারই বর্ণনায় তিনি একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ ব্যয় করেছেন। আমাদের নাট্যসাহিত্যের অতি প্রিয় কর্ণ-চরিত্র ভাবালুতার সার্থকতম উদাহরণ। প্রতিকূল নিয়তির বিরুদ্ধে বীরোচিত ভাবাদর্শকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কর্ণ-চরিত্র বাঙালী পাঠকমানসে অমরত্ব লাভ করেছে। ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবালুতা অবশ্য আমাদের নাট্যসাহিত্যেই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। আমাদের নাট্যসাহিত্য যে আজ পর্যন্ত inferior art-এর স্তরে থেকে গিয়েছে তার কারণ এই ভাবাতিশয্য। দেশপ্রেম, ধর্মবোধ, বীরোচিত

গুণাবলী, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি যে-সব গুণগুলি বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছিল, কালক্রমে সে সমস্তই ক্রমশ সহজ বাস্তব সম্পর্ক ত্যাগ করে শুধু বিশেষণ আর অলংকার ভারাক্রান্ত কথার ফেনায় পর্যবসিত হয়।

এইভাবে যেমন একদিকে সত্যপ্রিয়তার বদলে ভাবোচ্ছ্বাস, বাস্তব-বোধ-জাত মূল্যবোধের বদলে কৃত্রিম আদর্শায়িত ভাবালুতা এ যুগের উপন্যাসকে রোমান্টিসিজমের পথ থেকে সেন্টিমেণ্টালিজমের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথে নিয়ে গিয়েছে; অপরদিকে তেমনি বাস্তবতার বেনামীতে এক ধরনের সস্তা রোমান্টিসিজম অনুপ্রবেশ করেছে। রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসে যার আভাস পাই, বঙ্কিমের 'রাধারানী' ও 'ইন্দিরা'তে যার সূচনা, তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', নগেন্দ্রনাথ সেনের 'লীলা' প্রভৃতি উপন্যাসে তা একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। পারিবারিক বাস্তবতার মধ্যে যে প্রচুর কৌতুক আর রোমান্সের অবকাশ আছে এ বইগুলিতে তা-ই প্রধান উপজীব্য। এগুলিতে নিঃসন্দেহে বাঙালীর সংসার জীবনের প্রীতিকর অম্লমধুর অংশের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায়। এলিজাবেথীয় রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে এগুলির তুলনা করা অমূলক নয়।

মোটের উপর সমস্ত মিলিয়ে বঙ্কিম যুগের লেখকরা নতুন যুগে বাঙালী জাতির সত্তা, আদর্শ এবং জীবন-রস আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ যুগের সমস্ত রচনায় বাঙালীর বিশেষ চরিত্র, তার আবেগ অনুভূতি ও পছন্দ-অপছন্দের বিশেষত্বগুলি কোনো না কোনো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা বঙ্কিমের রচনায় কখনও হয়তো জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে নিছক ব্যক্তির কোনো সর্বজনীন জীবন-দর্শনে উপনীত হওয়ার চেষ্টা আছে, হয়তো তাঁর জগৎ সিংহ, কতলু খাঁ প্রভৃতি কিছু কিছু চরিত্র চিত্রণে বিশেষভাবে বাঙালীত্বের ছাপ পড়েনি, তথাপি সমগ্রভাবে বঙ্কিম বাঙালীত্বের চেতনায় সমাচ্ছন্ন। উনিশ শতকে বাঙালী যে বাঙালীত্বকে নতুন করে উপলব্ধি করেছিল তার মধ্যে প্রাদেশিকতার বাষ্পবিন্দুও ছিল না। সর্বভারতীয় চেতনা যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি তার কারণ জাতিগত সংকীর্ণতা নয়, তার কারণ অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের স্বল্পতা। ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক কাহিনীতে সর্ব-ভারতীয় আদর্শ আর বাঙালী আদর্শ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মোটের উপর এ যুগের সাহিত্য দীর্ঘকালের জন্য বাঙালীর জাতীয় নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়ে গেল: বাঙালী সাহেব হয়ে যাবে না, ভিন্ন কোনো ধর্ম বা

আদর্শকে গ্রহণ করবে না, অথচ খোলা মন নিয়ে বিদেশী অনুকরণযোগ্য প্রভাবকে আত্মস্থ করে জাতীয় চরিত্র ও ভাবনাকে সমৃদ্ধতর করবে। কাজেই বঙ্কিম যুগ প্রকৃতপক্ষেই আত্মানুসন্ধানের যুগ, নিজের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ।

বঙ্কিম যুগ থেকেই বাংলা দেশের সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব নজরে পড়ে। কিছু কিছু বাঙালী লেখক এসেছেন যাঁরা সাহিত্যের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে সচেতন বা অচেতনভাবে জাতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যেই আমরা প্রথম এই বিশেষত্বের সূচনা দেখতে পাই। তাঁর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা ও সমাজ-সংস্কার ও সমাজশিক্ষার কর্ম-নীতি একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পর বঙ্কিম এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিনিধিত্বকে সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন লেখকদের মধ্যেও সাহিত্যের মারফৎ জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়। বর্তমান-কালেও তারাশঙ্করের মধ্যে আমরা এই ঐতিহ্যের অনুবর্তন দেখতে পাই। এইভাবে বাংলাদেশের সাহিত্য আর বাঙালী-জাতীয় জীবনযাত্রা ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে। ঠিক এই ধরনের ঘটনা আমরা ফরাসী সাহিত্যে দেখতে পাই। কিন্তু ইংলণ্ডে কুত্রাপি এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। সেকস্‌পীয়র ড্রাইডেন জনসন কোলরিজ প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের কালে যত সমাদর ও সম্মানই লাভ করে থাকুন, কোনো ইংরেজ কখনও মনের ভুলেও তাঁদেরকে জাতীয় জীবনের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করেননি। ইংলণ্ডের বিশেষত্ব এই যে সেখানে বরাবর রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবধান রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ফরাসী, রুশ বা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ভিন্নরকমের। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি আদর্শ হিসাবে শ্রেষ্ঠ তা আমি ঠিক জানি না; আমি শুধু দুটি বিপরীতধর্মী তথ্য উপস্থিত করছি মাত্র।

রূপ ও রীতির দিক থেকে বঙ্কিম যুগের সাহিত্যে ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। রোমান্সের বিশেষত্ব এই যে এতে লেখক কাহিনীকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রিত করে নিজের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে উপস্থিত করতে পারেন। এ জাতীয় রচনার দূরবর্তী পূর্বপুরুষ হল রূপকথা। ঘটনা এখানে তার নিজস্ব **logic** অনুসারে চলে না, আকস্মিকতার ধাক্কায়

থাকায় চলে; অথচ তার মধ্যে দিয়ে কাহিনীতে পাঠকের মনে যে সব প্রত্যাশাগুলি জাগ্রত করা হয় সে প্রত্যাশাগুলি অবশ্যই পূরণ হবে। নৈতিক ন্যায়বোধের বিচারে যাদের মধ্যে মিলন হওয়া দরকার তাদের মধ্যে অবশ্যই মিলন ঘটবে; যাদের শাস্তি পাওয়া দরকার তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে। কোথাও কখনও দু-একটি করুণ রসাত্মক ব্যাপার যে না ঘটে এমন নয়, (যেমন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপের মৃত্যুবরণ) কিন্তু লেখক তার উপস্থিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখেন। কাজেই রোমান্সের জগৎ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। পাঠক পাঠ শেষ করার পর আবেগ অনুভূতি-সমূহের পুরোপুরি পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং তিনি এই মনোভাব নিয়ে আসন ত্যাগ করেন যে—**All's right with the world**। রোমান্সের কাহিনীতে **make believe**-এর এবং অতিপ্রাকৃতের স্থান আছে; দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে যে তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পাঠক যাত্রা করেন তার ফলে এই অসামান্য ঘটনাগুলি প্রত্যয়বোধকে বিশেষ ক্ষুন্ন করে না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ভিন্ন জাতের। লেখক এখানে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে একটি ঐতিহাসিক কালের বাস্তবকে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হন। অতীতের কোনো আদর্শায়িত রূপকে নয়, অতীতের বাস্তব সত্যকে তিনি সাহিত্যে বিধৃত করতে চান। সাম্প্রতিককালের প্রবণতা হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীকে যথাযথভাবে উপন্যাসের মধ্যে সংগ্রথিত করা; এবং সেইজন্য আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক দস্তুরমতো গবেষণার কাজে লিপ্ত হন। সত্যি বলতে কি, আমি এই প্রবণতার যাথার্থ্যকে ঠিক অনুধাবন করতে পারি না। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটিই তো সোনার পাথরবাটির মতো একটি অসম্ভব ঘটনা। ইতিহাসের কাজ হল বাস্তবে সংঘটিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহকে কার্য-কারণ সূত্রে সংগ্রথিত করে কোনো এক অতীতের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের অবিকল আলেখ্য তুলে ধরা; আর উপন্যাসের কাজ হল সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যে জীবন বাস্তবের একটি প্যাটার্নকে পুনর্গঠিত করা। কাজেই ঐতি-হাসিক উপন্যাসের মধ্যে আমরা ইতিহাসও চাইব, উপন্যাসও চাইব—তা হয় না। সেটা ফটোগ্রাফি জাতীয় একটা জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। লেখক সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যেই হোক, অথবা কল্পনার প্রয়োজনে তথ্য বিকৃত করেই হোক, যদি এমন একটি কাহিনী উপস্থিত করতে পারেন যা আমাদের অতীত সম্পর্কীয় কল্পনাকে (যদি কিছু থাকে) সন্তুষ্ট করতে পারে, তবেই তাঁর

রচনাকে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব বিচার করতে পারেন একজন ঐতিহাসিক; সাহিত্যের সমালোচক ঐতিহাসিক গবেষণার কতটুকু খোঁজ রাখতে পারেন? 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে আমরা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে জানতাম, তারপর বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমাণ করেন যে বইটি ভুল ইতিহাসের ভিত্তির উপর রচিত। এই আবিষ্কারের ফলে আমাদের কাছে 'রাজসিংহে'র মূল্য কি হ্রাস পেয়ে গেছে?

আমার মনে হয় কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীকে রোমান্স বলব না উপন্যাস বলব তা নির্ভর করে লেখকের লক্ষ্যের উপর। যদি মনে হয় লেখকের উদ্দেশ্য হল নিজের কোনো আদর্শকে রূপায়িত করা এবং পাঠকের রোমান্স-পিপাসাকে (কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণের পিপাসা) পরিতৃপ্ত করা, তবে কাহিনীটি রোমান্স। আর যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় পাঠকের সত্যনিষ্ঠাকে পরিতৃপ্ত করা তবে কাহিনীটি উপন্যাস। প্রকৃত তথ্যের উপস্থাপনার বিচারে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'কে এবং রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত'কে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ বইগুলিতে লেখকদ্বয় যথাযথভাবে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে অনুসরণ করতে পেরেছেন শুধু এইজন্য যে তাঁদের কল্পনার আদর্শ সামাজিক প্যাটার্নের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি হুবহু মিলে গিয়েছে। ইতিহাস এবং রোমান্স এখানে এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

কাজেই বঙ্কিম যুগ মূলত রোমান্স রচনার যুগ। উদ্দেশ্য-বিরহিত হয়ে নির্মমভাবে জীবনের উপলব্ধি-জাত অপ্রিয় সত্যকে উপস্থাপিত করার জন্য অনুকূল আবহাওয়া তখনও তৈরি হয়নি। এমন কি সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাসেও এ-যুগে রোমান্সপ্রবণতা দেখা যায়। এ-সব ক্ষেত্রেও কাহিনীর প্রধান উপজীব্য ঘটনা ও আকস্মিকতা। ঘটনার অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা বা কৌতুক রস সরবরাহ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কাহিনীর শেষে মিলনান্ত পরিণতি অবধারিত।

কাহিনী রচনায় লেখক সর্বজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ করেন। চরিত্রসমূহের মনের খবর তিনি জানেন, কিন্তু কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য চরিত্রের উদ্দেশ্য বা প্রতিক্রিয়ার সামান্য বিবরণ দেওয়া ছাড়া তিনি চরিত্রের অন্দরমহলের গতি-প্রকৃতির বিস্তৃত পরিচয় দেন না আধুনিক লেখকের মতো। লেখক অবশ্য যখন তখন চরিত্র বা

ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য হাজির করে পাঠকের মনোভাবকে তৈরি করেন। ছোট ছোট দৃশ্য পরপর সাজিয়ে তিনি কাহিনীর ইমারত তৈরি করেন। স্কট বা ডিকেন্সের মতো কোনো নাটকীয় ঘটনার বিস্তারিত আনুপূর্বিক সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার অবকাশ তার কম। তা ছাড়া কাহিনীর শুরুতে কিছু পূর্ব-কথা এবং দৃশ্যের মাঝে মাঝে কিছু সংযোজক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া ছাড়া তিনি **summary** বিবরণ যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন ; কারণ তিনি জানেন **summary** সাধারণত নাটকীয় নয় বলে পাঠকের প্রিয় নয়। কিন্তু তিনি প্রকৃতির বা রমণীর রূপ বর্ণনায় খুব উৎসাহী ; সেখানে তিনি বাছা বাছা তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন। তেমনি তিনি খুব উৎসাহী ভাবোচ্ছ্বাসের বর্ণনায়। যদিও বর্ণনার সময়ে কাহিনী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বলে তা নাট্যরস ব্যাহত করে।

এ যুগের লেখকরা প্রায়ই থীম সম্পর্কে খুব অবহিত নন। তাই একটি উপন্যাসে অনেক সময় একাধিক কাহিনী নিতান্ত ঢিলে-ঢালা-ভাবে সংগ্রথিত হয়েছে। চরিত্রগুলি সাধারণত **fixed**, অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ; অনেক সময় কাহিনীর সমাপ্তির কাছাকাছি এসে তাদের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে, যেন মানুষ খুব অনায়াসে নিজের চরিত্রকে পরিবর্তিত করতে পারে। চরিত্র পরিচিতির উপায় কোনো ব্যবহারিক বিশেষত্ব অথবা কিছু সৎ বা অসৎ গুণের সমাবেশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও সমাজচিন্তা

(রবীন্দ্রনাথের কাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা শুরু হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সমঝদারই ছিলেন। ঠিক ঠিক বঙ্কিম-বিরোধী জেহাদ শুরু হয় শরৎচন্দ্র থেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী যে আকস্মিকভাবে চপলমতী বারবনিতাসুলভ হয়ে উঠল শরৎচন্দ্রের মতে এতে সমাজনীতি হয়তো বহাল ছিল কিন্তু সাহিত্যনীতি বলে যে একটা স্বতন্ত্র নীতি আছে তা লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পায়নি। সাহিত্যনীতির উপর সমাজ-নীতিকে স্থান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপরাধ করেছিলেন শরৎচন্দ্র তা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি (শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য)। আধুনিক সমালোচনা পড়লে শরৎচন্দ্র জানতে পারতেন সাহিত্যনীতি বলে যে জিনিসটিকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আসলে সেটি স্বতন্ত্র কোনো বস্তু নয়, সেটি হল তাঁর সময়ের পরিবর্তিত সমাজনীতিরই সাহিত্যিক প্রকাশ। শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করে 'কল্লোল'-কালীন লেখকরা বঙ্কিমকে সনাতনপন্থী ও নীতিবাগীশ বলে বিদ্রূপ করেছেন। দু-একজন মার্কসবাদী সমালোচক বঙ্কিমকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উল্লেখ করতে ইতস্তত করেননি। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর যে সমালোচনার পাহাড় জমে উঠেছে আজ এতদিনে সেগুলি পাঠকসাধারণের উপর ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। কাজেই বঙ্কিম সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণায় পৌঁছতে হলে এই সমালোচনার প্রভাব থেকে আমাদের মন মুক্ত হওয়া দরকার। সেই জন্যই এইগুলির উল্লেখ করতে হয়েছে এবং

বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনায় আমরা অগ্রসর হব এই সমালোচনাগুলিকে কেন্দ্র করেই।

এই সমালোচনাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আজকের দিনের বঙ্কিমের আলোচনায় দুটি প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে। এক হল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সমাজ-চিন্তার প্রকৃতি নির্ণয়। আর দ্বিতীয় হল বঙ্কিমের উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ এবং তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার সম্পর্ক।

প্রথম এবং প্রধান প্রশ্নটি নিয়েই আগে শুরু করা যাক। কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে বঙ্কিমের সময়ের প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বঙ্কিমের সময়ে এক শ্রেণী ছিল যারা অনুকরণের উগ্রতায় একেবারে পুরোপুরি সাহেব-ভাবাপন্ন হয়ে সাহেবী জীবনযাপনের পথে এগিয়ে গেল। সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এত শিথিল হয়ে এল যে তাবা দেশের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই আবার একটা বৃহত্তর সম্প্রদায় নতুন পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও নিজেদের ভারতীয়ত্ব ভুলে গেল না, বরং সেটা এই প্রথম অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুভব করল। ফলে অত্যন্ত সহজে তারা শিক্ষিত সমাজে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে বসল।

এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। রেনেশাঁস কাল পর্যন্ত মানুষের চিন্তাধারার এক আশ্চর্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। চিরদিনই মানুষ বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশার উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেবেছে যে তার অতীত ছিল অনেক বেশি সুখের, তার অতীতের 'সত্যযুগে' এসব দুঃখ কষ্ট ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। কাজেই বিপ্লব যখন বর্তমানকে ভেঙে-চুরে নতুন করে জীবনধারা সৃষ্টি করার তাগিদ নিয়ে আসে, মানুষ অমনি ভাবতে শুরু করে এবার আর কোনো ভাবনা নেই, এবার অনতিবিলম্বে আমাদের 'চমৎকার পুরনো দিনগুলি' ফিরিয়ে আনতে পারলেই সমস্ত সমস্যা আর দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রুশো অতি প্রাচীন যুগের সামাজিক চুক্তি বা social contract (সেটা কাল্পনিকই হোক আর বাস্তবই হোক) আবিষ্কার করেছিলেন যাকে কেন্দ্র করে আসলে কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ঠিক তেমনিভাবে রামমোহন রায় তখনকার ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে উপনিষদ পাঠ করেন ও তার ভিত্তিতে প্রাচীনের

পুনঃ-প্রবর্তনের নামে আসলে জাতিভেদহীন গণতন্ত্রসম্মত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করে ভবিষ্যতের পথ তৈরি করলেন। এর পর আমরা দেখব একই প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়ে বঙ্কিম স্বাধীনভাবে শাস্ত্রপাঠে ব্রতী হন এবং জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ আমাদের উপহার দিয়ে যান।

এইবার বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমাদের সকলের আগে মনে রাখা দরকার যে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ তাঁর একটা অতিরিক্ত গুণ নয়, সেটাকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকে ভাবাই যায় না। সেটাকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্যকে বিচার করতে যাওয়া মানে প্রাণটুকু বাদ দিয়ে কাঠামোর কথা ভাবা। বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার সবল সজীব জাতীয়তাবাদ।

এই প্রাথমিক সত্যকে বুঝতে না পারার ফলে আমরা বরাবর বঙ্কিমের সঙ্গে স্কটের তুলনা করে এসেছি। অথচ স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা করা আর কৃত্তিবাসের সঙ্গে মাইকেলের তুলনা করা একই কথা। স্কটের উপন্যাসের কাঠামো বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন। তেমনি তো মাইকেলও কৃত্তিবাসের ছন্দ (যদিও অমিল) এবং বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের সঙ্গে মাইকেলের তফাৎ এত স্পষ্ট যে তাঁদের তুলনা কারও মনে আসেনি। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা-পুষ্ট কৃত্তিবাস আর্যদের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবিস্তারের যুদ্ধের প্রশংসায় মুখর হতে এতটুকু ইতস্তত করেননি। মাইকেল করেছিলেন। শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার দূত ইংরেজের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেও তিনি তাদের ভারত-বিজয়ের অন্তর্নিহিত গভীর অন্যায়কে অন্তত অন্তর্মনে স্থান না দিয়ে পারেননি। সেই জন্যই আমাদের দেশের দেব-প্রীতির এত প্রবল ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে আততায়ী রামচন্দ্রের যুদ্ধের অন্যায্যতা, যুদ্ধ-নীতি লঙ্ঘন করার হীন মনোবৃত্তি। রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার দূত হলেও তাঁর পররাজ্য-লোভে হস্তপ্রসার অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। এইখানেই মাইকেল আর কৃত্তিবাসের পার্থক্য—মূলগত চিন্তাধারার পার্থক্য। বঙ্কিম আর স্কটের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এতখানি বিরাট, কিন্তু সেটা এমনভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়েনি।

ইংলণ্ডের রোমান্টিক আন্দোলনের পিছনে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য এবং মানব-মুক্তি অভিযানের যে বিরাট প্রেরণা ছিল তা স্কটকে স্পর্শও করেনি। এই যুগের প্রকৃতি-প্রেম এবং মধ্যযুগের পুনরুজ্জীবনের প্রবণতা এই দুটি বিশেষত্ব

মাত্র স্কটের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে ছিল। কাজেই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম হয়তো ছিল কিন্তু মানুষ বা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর কোনোই বক্তব্য ছিল না। বঙ্কিমের মতো স্কটও অবশ্য ঐতিহাসিক মালমশলার সঙ্গে অনেক কল্পনার খাদ মিশিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কল্পনার জাল বিস্তার করার উদ্দেশ্য ছিল একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মধ্যযুগীয় আবহাওয়া তৈরি করা। তার শিভ্যালরি, তার অপ্রাকৃতে বিশ্বাস, এমন কি গির্জার অমানুষিক শাসন,—সব কিছু মিলিয়ে দূর অপরিচয়ের গর্ভ থেকে এক বর্ণাঢ্য চিত্র উপস্থিত করা। নিছক অতীতকে ফিরিয়ে আনা কিন্তু বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল না। নির্বীর্য দেশেপ্রেমের দ্বারা চালিত হয়ে অতীতের ঔজ্জ্বল্যের এক অতিরঞ্জিত রূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর জাতীয়তা-বোধ ছিল সক্রিয়। অতীতের মধ্যে তিনি বর্তমানের সমস্যা, লক্ষ্য এবং স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার উপযোগী উপকরণ খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বরং সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে বঙ্কিমের খানিকটা মেলে (আমি এখানে শিল্পগত তুলনার কথা বলছি না)। সেকস্‌পীয়রও তাঁর সমকালীন জীবনযাত্রা থেকে জাত জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা এবং মূল্যবোধকে অতীতের কাহিনীর মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন, বোধকরি এইটেই রেনেশাঁসের প্রকৃতি। বঙ্কিম এবং সেকস্‌পীয়রের তফাৎ অবশ্য অনেক। এবং তার মধ্যে একটি এই যে যুগকে গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস তো তাঁর ছিল না। তাঁর সময়ে রাজধানীর রঙ্গ-বিলাসীদের জন্য রঙ্গালয়ের উপভোগ্য বস্তু হিসাবেই তিনি তাঁর অমূল্য নাটকগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের ভূমিকা ছিল আলাদা। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো ছিলই, কিন্তু সেইটেই সব নয়। বঙ্কিম একদিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আর একদিকে তাঁর সময়ের সমাজ-শিক্ষক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার জনক। শিক্ষা এবং প্রচারের সচেতন ইচ্ছা থাকার ফলে বঙ্কিম-সাহিত্য জাতীয়তাবাদের খুব উপযুক্ত আধারে পরিণত হয়েছিল। অতীত ইতিহাস এবং অতীত সমাজাদর্শের ভাষায় তিনি আসলে আমাদের দেশের ভবিষ্যতের বিস্তীর্ণ গতিপথটিই চিত্রিত করেছিলেন।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের এই বাস্তব-প্রকৃতি ভালো করে বুঝতে গেলে তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া দরকার। তার মধ্যে প্রধান হল এই কয়টি: 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'অনুকরণ' প্রভৃতি। এইসব প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের

একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা চলে। 'স্বতন্ত্র' ও 'স্বাধীনতা' এই দুটি শব্দের মধ্যে একটু পার্থক্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারত ছিল 'স্বতন্ত্র' ও 'স্বাধীন', আধুনিক ভারত 'পরতন্ত্র' ও 'পরাধীন'। তার মানে এই নয় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ একেবারে আদর্শস্থল ছিল। সেই সময়কার ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে পক্ষপাতিত্ব এবং অত্যাচারের সীমা ছিল না; সেই হিসাবে বর্তমানের পরাধীন ভারতে বরং বর্ণনির্বিশেষে ন্যায়পরায়ণতার একটু প্রচেষ্টা এসেছে। তা ছাড়া প্রাচীন ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে আভ্যন্তরীণ ভেদ-বোধ এত বেশি ছিল বলে জাতি হিসাবে স্বাধীনতা রক্ষার্থ দাঁড়ানো সে সমাজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ ছিল রাজারাজড়ার কারবার—তার মধ্যে জনসাধারণের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ইংরেজাগমণের ফলে রাজার জাত হিসাবে আমাদের সমাজকে তারা নিজেদের সমাজের গণতান্ত্রিক ছাঁচে এবং আইনকানুনের ব্যাপারে বৈষম্যহীন করে তুলেছিল। তা ছাড়া ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা (আধ্যাত্মিক না হোক, ব্যবহারিক দিক দিয়ে তো বটেই) চোখের কাছে থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র ধরে নিয়েছিলেন যে তার অনুকরণ করে আমরা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সামরিক বল প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে উন্নত হওয়ায় সুযোগ পাচ্ছি। ফলে জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় আমরা এসে গেছি। কেউ যদি মনে করে যে বাঙালী জাতি হিসাবে হীনবীর্য, তার কোনোদিন তেমন বাহুবল হওয়া সম্ভব নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সে-কথা স্বীকার করতে রাজী নন। বাঙালীর মনে যদি জাতি হিসাবে বড় হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মায়, এবং তজ্জনিত অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং কর্মানুরাগ এসে উপস্থিত হয়, তবে দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে বাঙালীর অগ্রাভিযানে বাধা দিতে পারে। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর পথে বাঙালীর এখন আর কোনো অন্তরায় নেই। একবার যদি বাঙালীর জাতীয় জাগরণ হয় তবে আর পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার না করে আমরা ছাড়ব না, কারণ অতীত ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা বংশানুক্রমে পেয়েছি আধুনিক জাতীয়তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তা সর্বাঙ্গসম্পন্ন শক্তিতে পরিণত হবে। যা ছিলাম তা আমরা সহজেই হব, যা ছিলাম না কোনোদিনই, তাও হব, জাতীয় ভাবাপন্ন হব। কিন্তু মানুষের মন হল অতীতের মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধ। শুধু বর্তমানের ইংরেজের থেকে অনুকরণ করেই কোনো জাতির পক্ষে বড় হওয়া সম্ভব নয়, যদি না অতীতের ইতিহাস এই প্রতীতি জন্মায় যে তার

উৎপত্তি শক্তিশালী পূর্বপুরুষদের থেকে, যদি না অতীতের শ্রেষ্ঠতর সমাজ-চিত্র মনের কাছে জাগরুক থাকে। রেনেশাঁসের ইওরোপের কাছে এই আদর্শের স্থান গ্রহণ করেছিল গ্রীক্ এবং রোমক সভ্যতা। বঙ্কিম এই আদর্শের প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং তা পেলেনও প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে। অতীত ভারতে আধ্যাত্মিকতাও ছিল, আবার ব্যবহারিক গুণাবলীরও অভাব ছিল না। কিন্তু তবু তো সে পৌরাণিক কালের কথা। তারপর দীর্ঘকাল ধরে যে ভারতবাসী মুসলমান শাসনাধীনে কালাতিপাত করেছে তার পরিণতিতে এই দেখি যে, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব নিঃশেষিত হয়ে হিন্দুজাতি শুধু ক্লীবত্বে পর্যবসিত হয়েছে। অনেক ইতিহাসকার তাই বলেন। তারা বলেন যে সতেরোজন মুসলমান বাংলা জয় করেছিল। তখনকার সামান্য নথিপত্রের উপর নির্ভর করে বঙ্কিম ঘোষণা করলেন, একথা সত্যি নয়, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।

ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্য, তেজস্বিতা, মনুষ্যত্ব—এগুলির অভাব বাঙালীর কোনো-দিনই হয়নি। একটা জিনিস শুধু ছিল না, তার জন্য সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। জাতি হিসাবে চিন্তার অভাবে, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার অভাবে, আমাদের পরাধীনতা এমন কায়েম হয়ে বসেছিল (বঙ্কিমের একবারও খেয়াল হয়নি যে জাতীযতা ইওরোপেও নেহাৎই হালের আমদানী, বণিক-তন্ত্র তার জন্ম দিয়েছে)। ভারতবর্ষে মাত্র দু-তিনবার জাতীয় গণজাগরণ হয়েছে, শিবাজীর মহারাষ্ট্রে, প্রতাপ সিংহ-রাজসিংহের রাজপুতানায় এবং রণজিত সিংহের পাঞ্জাবে (সবগুলিই আসলে 'ক্রুসেডের' মতো ধর্মজাগরণ, আধুনিক জাতীয় জাগরণ ভিন্ন জিনিস)। বঙ্কিমের ধারণা, একমাত্র এই জাতীয়তা আমাদের বিদেশের কাছ থেকে ধার করতে হবে, তা ছাড়া আমরা সর্বগুণসম্পন্ন পূর্বপুরুষদের সন্তান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ-সংশয় বঙ্কিমের মনে ছিল না। ইতিহাসের উপাদান সামান্যই ছিল ; কিন্তু তাতে তাঁর প্রত্যয় কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। তিনি দৃঢ়হস্তে এই প্রত্যয়কে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে।

কিন্তু প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক হল বুদ্ধির, আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রধান কারবার হল হৃদয় নিয়ে, কাজেই ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার খাদ মিশিয়ে বঙ্কিম আধা-ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নেমে গেলেন। খাদ মিশাতে হল, না হলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেক্‌স্‌পীয়রের মতো তিনি পুরনো তথ্য ধার নিতেও

ইতস্তত করলেন না ; আবার তা বিকৃত করতেও সঙ্কোচ করলেন না। এইভাবে স্কট প্রবর্তিত নীতিকে লঙ্ঘন করে তিনি সৃষ্টি করলেন এক একটি জাতীয় বীর। ঠিক সেক্‌স্‌পীয়রের বীরদের মতো তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতা ধর্মে রেনেশাঁসী আদর্শেরই অনুকূল। বিরাট তাদের শক্তি, কিন্তু তেমনি আবার তারা অদ্ভুত দুর্বলতার বশীভূত হয়ে পড়ে, রক্ত-মাংসের মানুষের যেমন হয়ে থাকে। 'সীতারামে'র সীতারাম, 'মৃণালিনী'র হেমচন্দ্র, 'রাজসিংহে'র রাজসিংহ, 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ, 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎ সিংহ, প্রভৃতি সবাই সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতেও এক একজন জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদকে এতখানি বাস্তব ভিত্তিতে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন বলে বঙ্কিমবাবুকে অনেক সময় নিছক ঔপন্যাসিক হিসাবে না ভেবে বিপ্লবী নেতা হিসাবে ভাবতে ইচ্ছে করে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে বাস্তবিকই মনে হয় একটি মহান্ জাতির জীবনের এক বিরাট উজ্জ্বল দিনের সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। সকালের লোহিত সূর্য এত অফুরন্ত আশা আর সাহস, বিশ্বাস আর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যে তার প্রেরণায় মানব মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, হাস্যরস, প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছে তার কর্ম-প্রেরণা। এত সব বিভিন্ন বিভাগে বঙ্কিম নিজেও উৎসাহের আতিশয্যে অল্পবিস্তর এগিয়ে এসেছেন অংশ গ্রহণ করতে (বিজ্ঞানরহস্য, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি তার প্রমাণ)। বাধা-ভয়ের আশঙ্কা নেই, তাড়াহুড়ার কোনো প্রয়োজন নেই ; সামনে প্রসারিত রয়েছে প্রগতির দীর্ঘ দিন। এইভাবে বিস্তৃততর জীবনের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় শক্তি গড়ে উঠবে তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে একদিন স্বাধীনতা আসবে। বঙ্কিমের কাছে স্বাধীনতা ক্ষণকালের জিনিস ছিল না ; তার জন্য প্রস্তুতির উপরই তিনি জোর দিয়েছেন বেশি। এবং তার কারণও খুব স্পষ্ট ; সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় সাম্রাজ্যবাদের বাধা সত্ত্বেও তখন জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প সম্প্রসারণের প্রচুর অবকাশ ছিল ; আগে বরং এ সুযোগ ছিল অনুপস্থিত। কালে কালে সাম্রাজ্যবাদ যখন আমাদের ক্রমবর্ধমান জাতীয় জীবনের একেবারে কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে স্বাধীনতার প্রয়োজন তখন হয়ে পড়েছে সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্কিমের বেলায় তা ছিল না। সেটা হৃদয়ঙ্গম করে এতটা উপযুক্ত কর্মপন্থা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন যে, একমাত্র সাংগঠনিক ক্ষমতা এর সঙ্গে যোগ হলে তিনি হতে পারতেন একজন পুরোপুরি বিপ্লবী নেতা। কিন্তু সাংগঠনিক

ক্ষমতার অভাব থাকলেও তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ যায়নি। এবং একথা বলা চলে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রথম তার যাত্রা শুরু করে তখন বঙ্কিমের কর্মপন্থার প্রায় সবটাই তারা গ্রহণ করেছিল; বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিই হয়েছিল তাদের মূল মন্ত্র।

সুদূর অতীতের সুন্দর জীবনকে ফিরিয়ে আনাই যখন থাকে নতুন বিপ্লবের মূল মনস্তত্ত্ব তখন স্বভাবতই বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল প্রাচীন হিন্দু জাতির ধর্মাদর্শ। পাছে এই ধর্মাদর্শের কথা ভুলে যাই এই ভয়ে বঙ্কিম বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় গণতান্ত্রিক জাতীয়তা এবং তার বিভিন্নমুখী সাধনা, এ সবই হল সেই আধ্যাত্মিক আদর্শে পৌছনোর পথ মাত্র। আধ্যাত্মিকতার বাড়াবাড়ির জন্যই অনেক অনেক অসাবধান প্রগতিপন্থী সমালোচক বঙ্কিমকে অবজ্ঞা করে থাকেন। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র যাকে পথ মাত্র হিসাবে উপস্থিত করেছেন অল্পস্বল্প রদবদলের সঙ্গে সেই বুর্জোয়া জাতীয়তার আদর্শই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের লক্ষ্য হয়ে রয়েছে, বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা থাকবেও। বঙ্কিম এই লক্ষ্যকে পথ হিসাবে ভুল করেছিলেন অপরিহার্য ঐতিহাসিক কারণে। বুর্জোয়া বিপ্লব জড়বাদ-নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতির জন্ম দিলেও তার প্রথম উদ্যোক্তারা লুথার বা রামমোহন, কেউই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। পুরনো ধর্মাদর্শকেও নতুন কায়দায় গ্রহণ করার ফলেই তাঁরা ভবিষ্যতের নতুন জীবনের জন্ম দিয়েছিলেন। কাজেই একথা সত্যি, 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরাই হোক, বা 'দেবী চৌধুরানী'র ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানীই হোক, প্রত্যেকেরই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ধর্মজীবন। তারা ধার্মিক, তারা শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক। কিন্তু এই ধর্মকে গ্রহণ করার প্রণালীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বঙ্কিম তাঁর সময়ের পুরোহিতকুল বা কুলীনদের থেকে ধর্মের বিধান নিতে যাননি কোনোদিন। ধর্মের মধ্যেও বিকৃতি এসেছে, বিপ্লব তাঁর মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। কাজেই কারও 'গুরুত্ব' বা অভিভাবকত্ব না মেনে স্বাধীনভাবে শাস্ত্রানুশীলন করে নিজের যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি, এ সবের পরিপূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি নিজের ধর্মাদর্শকে নিরূপণ করলেন। এইভাবে যে ধর্ম তৈরি হল তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগে তা সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধকে অনেকখানি অতিক্রম করতে সক্ষম। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চিন্তার স্বাধীনতা একান্তভাবেই

নতুন বিপ্লবের দান। এই নতুন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে রামমোহন রায় আদর্শ হিসাবে আবিষ্কার করেছিলেন উপনিষদকে, বঙ্কিম আবিষ্কার করলেন গীতাকে। গীতাকে অবলম্বন করতে পেরেছিলেন বলেই বঙ্কিমের চিন্তাধারা এতখানি বাস্তব-পন্থী হতে পেরেছিল। বঙ্কিমের আর এক বিশেষত্ব হল, তিনি তাঁর নতুন ধর্মের সঙ্গে এক নতুন আদর্শ চরিত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। আদর্শ চরিত্র হল শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে এই মর্যাদা দেওয়ার মধ্যে অনেকখানি তাৎপর্য আছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্য, সমাজাতিরিক্ত জীবনাদর্শের প্রাবল্য বড বেশি। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ তার ব্যতিক্রম। সমাজকে, সংসারকে এবং সমাজে সংঘবদ্ধ জীবনের কর্ম-পদ্ধতিকেই তিনি প্রচার করেছিলেন ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ নীতি হিসাবে। বিশ্বের দরবারে জাতি হিসাবে যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিতে হয়, তবে উপনিষদের বৈরাগ্য নয়, গীতার কর্মযোগই বঙ্কিমের কাছে বিশেষ উপযোগী বোধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়যুদ্ধ পরিচালনায় কূটনীতির আশ্রয় নিতে ইতস্তত করেননি। আমাদের জাতীয়তাবাদও তো আসলে ন্যায়যুদ্ধ; সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার নিরঙ্কুশ অভিযান। তার জন্য সকল কর্মনীতি এবং তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক বুদ্ধি দুয়েরই দরকার। বঙ্কিমের উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের দর্শন অনেক সময় বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে, এই নিষ্কাম কর্ম বিশ্লেষণ করলে তা হৃদয়হীন মমতাহীন কর্মবৈরাগ্য হিসাবে দাঁড়ায় না, তা আসলে আধুনিক মানবতাবাদের হিন্দু সংস্করণ। সমাজের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের সবচেয়ে ভালো যাতে হয় আত্মস্বার্থশূন্য হয়ে সেই আদর্শ গ্রহণ করা কি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ নয়? সে পরোপকারও কখনো যান্ত্রিক নয়, হৃদয়ের উৎসারিত ভালবাসার তা অভিব্যক্তি মাত্র। আশ্চর্য এই যে মিল, বেন্থাম প্রভৃতি ইওরোপীয় মানবতাবাদ প্রচারকদের নাম সেই সময়ে আরও অনেকের মতো বঙ্কিমও উল্লেখ করেছেন, এবং যুক্তিবলে সেইগুলিকে নস্যাৎ করে দিয়ে নিষ্কাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

প্রসঙ্গত, মুসলমানদের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার। 'রাজসিংহ' নামক উপন্যাসের পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত হয়ে এ বই লেখা হয়েছে এমন কথা কেউ যেন না মনে করেন। বইয়ের উদ্দেশ্য শুধু রাজসিংহের মহৎ চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করা —যা অনেক ইতিহাসকারই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর লেখায় পাছে মুসলমানের আত্মাভিমানে ঘা লাগে

এ আশঙ্কায় তিনি ভীত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই প্রবন্ধ লেখার বেলায়—যেখানে লেখকের মনোভাব পুরোপুরিভাবে সচেতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে—তিনি মুসলমানদের উপর কোনো কটাক্ষপাত তো করেনইনি, বরং কোনো কোনো জায়গায় তিনি তাদের উপর সহানুভূতিও দেখিয়েছেন। 'বাঙ্গালাদেশের কৃষক' এই নাম দিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু জমিদারের হাতে মুসলমান প্রজার উৎপীড়নের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সমাজের প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে যে নতুন অর্থনীতির আওতায় হিন্দু মুসলমানকে আর আলাদা করে দেখার উপায় নেই, এ বোধ তাঁর মনে খুব সচেতনভাবে না থাকলেও তাঁর লেখায় তা প্রকাশ পেয়েছে। তবু শুধু 'রাজসিংহ'ই নয়, আরও কয়েকখানি বই যে অনেকের মনে হয় পক্ষপাতদুষ্ট, এ অনুভূতিও মিথ্যা নয়। তার কারণ স্পষ্টতই অনেক জায়গায় হিন্দু বীরের তুলনায় মুসলমানগণ সামরিক বীরত্বে হীন, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বুদ্ধির অভাব,—এগুলি প্রকাশ পেয়েছে (দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী প্রভৃতি)। এই যে বঙ্কিমের ভিতরকার স্ববিরোধ এর নিরসন করা যায় যদি আমরা বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের আদর্শের কথা মনে রাখি। আজকে আমাদের কাছে একথা খুবই স্পষ্ট যে জাতীয়তাবাদের আসল কারবার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে, অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু কোনো কারবার নেই। বঙ্কিমের মধ্যে যদি এ বোধ উপস্থিত থাকত তো গোলমালের কোনো কারণ থাকত না। বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থায় হিন্দু এবং মুসলমানের যে একই গতি তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু মুশ্‌কিল বেধেছে এই নিয়ে যে জাতীয়তার প্রথম উন্মেষের সময় এমন অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের কাজ চলেছে যে মানুষ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ছেড়ে অতীতের কথাই ভেবেছে বেশি, অতীতের আদর্শকে ফিরিয়ে আনার জন্যই চলেছে তার একান্ত সাধনা; যদিও তার ফলে সে নতুন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। অতীতের প্রশ্ন যেখানেই এল সেখানেই আর হিন্দু মুসলমান এক ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে নেই; সেখানে মুসলমান পরদেশ অপহরণে লোলুপ-হস্ত প্রসারিত করেছে, আর হিন্দু তার স্বদেশ রক্ষায় ব্যস্ত। আরও অতীতে এগিয়ে গেলে দেখা যায় হিন্দু আর মুসলমানে কোনো সংযোগ কোনো সম্পর্ক নেই; হিন্দুরা গড়ে উঠেছে হিন্দুস্থানে আর মুসলমান সভ্যতার ভিত্তি সুদূর আরবভূমিতে। কাজেই মুসলমানহীন 'মহাভারতের' রাজ্যে বঙ্কিম চলে গেছেন তাঁর জাতীয়

আদর্শের খোঁজে, আবার জাতীয় বীরের সন্ধানে মুসলমানের হাতে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হিন্দুদের ইতিহাসই তিনি হাতড়িয়ে বেড়িয়েছেন। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বঙ্কিমকে এ না করে উপায় ছিল না। আমাদের মনে রাখা দরকার বঙ্কিমের অতীত আদর্শ তো নয়, তিনি যে অতীতের ভাষায় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আদর্শকে চিত্রিত করেছেন : স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, তার ভিত্তিতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতির অনলস সাধনা, তার ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিণত হওয়া—তিনি এই আদর্শ ই আমাদের গ্রহণীয়। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানের স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত, অতীত ভারতে সে স্বার্থ ছিল অল্প-বিস্তর বিপরীতমুখী।

উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমের জাতীয়তার তত্ত্ব এবং আদর্শ দু-রকমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'আনন্দমঠে' এবং 'দেবী চৌধুরানী'তে বঙ্কিম তাঁর জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব এবং লক্ষ্যকে রূপায়িত করেছেন ; এবং শুধু চরিত্র ও ঘটনার ভিতর দিয়ে যখন তত্ত্বকে প্রকাশ করার অসুবিধা বোধ করেছেন তখন কাহিনীর মধ্যে সরাসরি বিতর্কমূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন। অথচ তা সত্ত্বেও বই দুখানির সাহিত্য-রস খুব বেশি ব্যাহত হয়নি। তার কারণ মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ অন্তর্জ্ঞান, কৌতুকপ্রিয়তা আর রোমান্টিক ঘটনা-বিন্যাসে তাঁর অদ্ভুত নাটকীয়তা এবং উৎকণ্ঠা সৃষ্টির দক্ষতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি তাঁর জাতীয়তার আদর্শকে উপস্থিত করেছেন জাতীয় বীরের চরিত্র চিত্রায়ণের মধ্যে, যেমন 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ, 'সীতারামে' সীতারাম, 'রাজসিংহে' রাজসিংহ। রাজসিংহ নিঃসন্দেহে বঙ্কিম-মানসের ঐতিহাসিক জাতীয় চরিত্র এবং চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অন্যতম সার্থকতম প্রয়াস। অসাধারণ সাহস, শক্তি ও রণকৌশলের সঙ্গে একাধারে নিষ্কাম কর্মাদর্শ এবং মানবীয় মাধুর্য, সদাশয়তা ও কৌতুকপ্রিয়তার সাযুজ্য ঘটায় রাজসিংহ বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন আদর্শ চরিত্রের এতখানি জীবন্ত রূপায়ণ দুর্লভ। বঙ্কিম বোধ করি প্রতাপকেও আদর্শ চরিত্র হিসাবেই চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু অবরুদ্ধ মানবীয় প্রেম তার মধ্যে প্রায় নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তাকে পাঠকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে।

সব সময়ে যান্ত্রিকভাবে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করাই বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল না। নানা গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও কোনো না কোনো ত্রুটির জন্য কোনো ব্যক্তি যে আদর্শ বীর হতে পারে না বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন। বঙ্কিম শুধু তাঁর আদর্শের রোমান্টিক প্রচারকই ছিলেন না, তিনি বাস্তবের বাস্তববাদী সমালোচকও ছিলেন; এবং তাঁর এই প্রকৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রকট। 'মৃণালিনী'তে তিনি দেখিয়েছেন হেমচন্দ্রের ত্রুটি, সে দেশপ্রেমের চেয়েও নারী-প্রেমকে মনে মনে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। 'সীতারামে' বঙ্কিম দেখিয়েছেন, নারী যদি পুরুষের মনে মোহ সৃষ্টি করে, অথচ অন্ধ ধর্মীয় আদর্শের মোহে তাকে তার স্বামী হিসাবে প্রাপ্য পরিমিত দৈহিক সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করে তবে শক্তিমান পুরুষেরও আদর্শ থেকে স্খলন ঘটে। রাজনীতিতে যেমন, নৈতিকতার ক্ষেত্রেও তেমনি বঙ্কিম মূলত মধ্যপন্থী ছিলেন।

মহৎ লেখকের একটি বিশেষত্ব এই যে মানব চরিত্রের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে অনেক সময়ে তাঁর মনগড়া আদর্শের বিপরীত সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। 'আনন্দমঠে'র জীবানন্দ এবং শান্তির মতো বলিষ্ঠ নিষ্ঠাবান অথচ মানবোচিত দৌর্বল্যের বশীভূত চরিত্রের চিত্রায়ণ এই কথাই প্রমাণ করে। 'আনন্দমঠে'র আদর্শ গাণিতিক হিসাবে যত উচ্চ আদর্শই হোক তা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু বোধ করি এ-সিদ্ধান্ত লেখকের প্রতিপাদ্য ছিল না। সীতারামের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি,—সেখানেও হয়তো পাঠককে লেখকের অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়। উপরোক্ত উদাহরণগুলি (সবগুলিই কাল্পনিক কাহিনী, ঐতিহাসিক নয়) আসলে সমকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের ধ্যান-ধারণা ও মূল্য-বোধকে অতীতের মধ্যে প্রক্ষেপ করার উদাহরণ। তেমনি প্রতাপ-শৈবলিনীর ঘটনা বা হেমচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বও বর্তমানের সমস্যাকে অতীতের কাহিনীতে প্রক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের মধ্যে যেমন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি) পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি তাঁর মানবীয় চিন্তাও আত্মপ্রকাশ করেছে পরোক্ষভাবে, হয়তো বা লেখকের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। এখানে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পনীতি এবং সমাজনীতির মধ্যে যে বিরোধ আবিষ্কার করেছেন, তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। শরৎচন্দ্রের অভিযোগ যে মিথ্যা তা আমি বলছি না;

কিন্তু তবু বলব, এ-অভিযোগ সত্য হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিম যে কত মহৎ তা শরৎচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

প্রাচীন সমাজ-চিন্তায় সতীত্ব এবং ব্রহ্মচর্য-সংক্রান্ত ধারণাগুলি মানুষের জৈবিক বৃত্তিসমূহের গতি-প্রকৃতির উপর কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তার ফলে প্রাচীন এবং, আরও বিশেষ করে, মধ্যযুগীয় সমাজনীতি সাধারণত মানব-প্রকৃতি বিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে। ইওরোপীয়দের রেনেশাঁসে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন তাঁদের ঘোষিত আদর্শ হলেও তাঁরা মানবীয় বৃত্তিসমূহকে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বিরুদ্ধ-গতি সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে, ইওরোপীয় রেনেশাঁসের একটি প্রধান গুণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা।

বাংলা দেশের রেনেশাঁসে এই অকুণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ছিল; অন্তত তখনকার লেখকরা স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবণতাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

সেই সময়কার শিক্ষিত সমাজের একটি বৃহৎ অংশ উৎকট ইংরেজিয়ানার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যা কিছু দেশীয় তারই বিরুদ্ধে একটা তীব্র অবজ্ঞা প্রদর্শনকেই সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও এই শ্রেণীর উন্নাসিকতার অন্ত ছিল না। এই অন্ধ মোহগ্রস্ত অনুকরণ-প্রবৃত্তির মূলে ছিল মানসিক হীনম্মন্যতা; এবং এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জাতীয় আত্মমর্যাদাজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে তখন আর জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আর বাস্তবিক অনুকরণবৃত্তির গড্ডলিকা-স্রোতের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আজ আমরা নানা রক্ষণশীলতা আবিষ্কার করতে পারলেও, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এমন-কি মাইকেলও স্রোতের বিরুদ্ধে উজানে চলতে আরম্ভ করে তবেই তাঁর অমর কাব্যগুলি রচনা করতে পেরেছিলেন। কাজেই তখন মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবনের রেনেশাঁসসঙ্গত প্রেরণা ছাড়াও অনুকরণের স্রোতের গতিরোধ করার জন্যও প্রাচীন সমাজাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রথম প্রেরণাটি রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে প্রাচীনকে দেখার চেষ্টা, রোমান্টিক আবেগ, অনুভূতির প্রাধান্য এবং অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশেচ্ছার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত প্রয়োজনটি সমকালীন সমাজের প্রতিটি গতি-প্রকৃতিকে তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য করেছে, এবং সে কাজ বাস্তববাদের কাজ। কাজেই ইওরোপীয় রেনেশাঁসে

প্রাচীনের পুনরুজ্জীবনের নামে যে ভাবে রোমান্টিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং মানবতন্ত্র অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করেছে বাংলা দেশের বিশেষ অবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে সদর দরজা দিয়ে রোমান্টিকতা যদি ঢুকে পড়েছিল, তবে তেমনি খিড়কি দরজা দিয়ে বাস্তববাদ এসে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল।

কাজেই বাস্তববাদের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-প্রতিভার অবদান কি এবং তার বিশেষত্ব কি তার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে তিনটি জটিল সামাজিক সমস্যাকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথম, বালবিধবার জীবনের বঞ্চনা এবং রিক্ততা এবং তাদের অবরুদ্ধ কামনার শোকোচ্ছ্বাস (রোহিণী এবং কুন্দ); দ্বিতীয়, বিবাহিত পুরুষও যে-কোনো সময়ে পর-নারীতে আসক্ত হতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই পুরুষদের বিবাহ প্রেমজ বিবাহ না হয় (গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র); তৃতীয়, নিরপরাধা স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীর মর্মজ্বালা (ভ্রমর, সূর্যমুখী)। প্রথম দুটি আবেগই মানুষের স্বাভাবিক জৈব-প্রকৃতি-জাত হলেও রক্ষণশীল বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। শরৎচন্দ্র প্রমুখ সমালোচকরা বঙ্কিমের এই রক্ষণশীলতার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর উপর দোষারোপ করেছেন। যে জিনিসটিকে তাঁরা উপেক্ষা করে গেছেন সেটি হল, বঙ্কিমের হাতে কতকগুলি অত্যন্ত আধুনিক সমস্যার অত্যন্ত যথাযথ এবং সহানুভূতিশীল উপস্থাপন। বঙ্কিমের পূর্বতন বা সমকালীন সাহিত্যে সমাজ-বিগর্হিত আসক্তির (একে কেউ প্রেম বলে স্বীকার করেননি) যারা বশীভূত হয়েছে তারা নরকের জীব। বঙ্কিম কিন্তু সে ভাবে সমস্যাকে উপস্থিত করেননি। তাঁর রোহিণী বা গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্র নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত স্তরের চরিত্র, ব্যক্তিত্বে, সত্যবাদিতায়, পরোপকারে তারা খুব আকর্ষণীয় চরিত্র। তবু যে তারা প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ল তার পিছনের মানসিক ইতিহাসও বঙ্কিম অত্যন্ত দরদ এবং বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। সমস্যার এরকমের মানবীয় এবং বাস্তবানুগ উপস্থাপন বঙ্কিমের যুগে প্রায় দুর্লভ ব্যাপার। তার নজির বাংলা সাহিত্যে এক আধটির বেশি তো ছিলই না এমন-কি সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যেও ঠিক এই ধরনের কোনো নজির ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

বঙ্কিমের সময়ে চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ আশা করা যায় না। তখনো ফ্রয়েড দেখা দেননি ; এবং তা ছাড়া উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিকতার পথে পদক্ষেপের

জন্য সাহিত্যের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন বঙ্কিমের সামনে তা-ও ছিল অনুপস্থিত। তবু বঙ্কিমের শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েডের মনোলোকের ইমারতের যে মূল ভিত্তি, জৈবিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নৈতিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব—তাকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। সেই জন্যই বঙ্কিম-সাহিত্যের দ্বন্দ্ব শুধু বহির্জগতেই নয়, তা মানুষের অন্তর্লোকেও প্রসারিত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কত যন্ত্রণাদায়ক গোবিন্দলাল এবং নগেন্দ্রের চরিত্রে লেখক তাকে পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। যে-পুরুষ বিয়ে করেছে, কিন্তু কোনো আবেগবান প্রেমের বশীভূত হয়নি, সে-পুরুষের পক্ষে প্রেমের আবির্ভাব যে কত স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য শিল্পী-বঙ্কিম তাও অবিচল বাস্তব সততার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু তারপরই লেখক সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং বুদ্ধির অহংকারে দীপ্ত মন নিয়ে ভেবেছেন যে স্বতঃস্ফূর্ততায় ভেসে যাওয়া তাঁর কাজ নয়—তিনি জাতির শিক্ষক। কাজেই রোহিণীর হীনতার পথে পদস্খলন ঘটেছে; এবং তখনকার দিনে স্বামীর একাধিক পত্নীগ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সূর্যমুখীকে পতিগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছে। শিক্ষক-বঙ্কিমের আকস্মিক আবির্ভাব 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে শিল্পগত বিচারে ত্রুটি বলে গণ্য হবে; কিন্তু সে-অংশটুকু বাদ দিয়েও আমরা যেটুকু পাই তা একেবারে খাঁটি সোনা। এ-কথাও আমাদের ভোলা উচিত নয় যে রোহিণী সমস্যার মতো বাস্তব এবং মানবীয় সমস্যার উপস্থাপন সামনে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের বিমলার ('চোখের বালি'তে) এবং শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর ('চরিত্রহীনে') বা রাজলক্ষ্মীর ('শ্রীকান্তে') আবির্ভাব একেবারেই সম্ভব ছিল না।

হয়তো নৈতিকতার আদর্শকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম ভ্রমর আর সূর্যমুখীর ট্রাজেডির অপরিহার্যতাকে খুব দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নিজের অগোচরে বঙ্কিম এদের মধ্য দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের আর একটি দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেটি এই যে পুরুষ যেমন নারীর কাছে একনিষ্ঠতা দাবি করে, নারীরও তেমনি পুরুষের কাছে একনিষ্ঠতার দাবি যুক্তিসঙ্গত। কোনো মর্যাদাসম্পন্ন নারীই পাঁচজনের সঙ্গে ভাগে পুরুষের ভালবাসা পেয়ে খুশি হয় না।

কাজেই ভ্রমর এবং সূর্যমুখীর ট্রাজেডিকে শিক্ষক-বঙ্কিম তাঁর প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছেন বটে; কিন্তু শিক্ষক এখানেও শিল্পীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। শিল্পী

বঙ্কিম তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যা অনুভব করেছেন, পুরনো সমাজনীতি মানবীয় বৃত্তিসমূহের যে-ভাবে কণ্ঠরোধ করে বলে তাঁর চেতনায় ধরা পড়েছে, তাকে তিনি সার্থক চরিত্র-চিত্রায়ণের ভিতর দিয়ে আবেগমণ্ডিত করেছেন। কাহিনীর শেষে শিক্ষক-বঙ্কিম এসে যে-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছেন, তাকে আমরা অনায়াসে চিনে নিতে পারি। সমগ্র শিল্পকর্মের মধ্যে এই অনধিকার প্রবেশকে হয়তো একটি ত্রুটি হিসাবে গণ্য করতে হয়, কিন্তু স্থানকালের বিচারে তা নিতান্ত নগণ্য এবং অনুল্লেখযোগ্য বলে প্রতিভাত হবে। পক্ষান্তরে নানা কূটযুক্তিবলে শিক্ষক-বঙ্কিম আর শিল্পী-বঙ্কিমের মধ্যে পুরোপুরি বোঝাপড়া ছিল বলে যদি প্রতিপন্ন করা যায়, তাতে বঙ্কিমের শিল্পকীর্তির আসল আবেদনকেই অস্বীকার করা হয়। এ সমালোচনা শুধু কষ্টকল্পনা নয়, এক জড় সমাজনীতির বিরুদ্ধে মানবাত্মার যে আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে বঙ্কিম-সাহিত্যে তার গুরুত্বকেও তা ম্লান করে দেয়।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে জাতীয়তাবাদ এবং সমাজনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের বুদ্ধি-দীপ্ত তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পীসত্তায় অনুভূত গণতন্ত্র এবং মানবীয় বৃত্তিসমূহের জয় ঘোষণা। বঙ্কিম আমাদের আঙুল দিয়ে পিছন দিকে নির্দেশ করেছেন বটে কিন্তু হাত দিয়ে আমাদের ঠেলে দিয়েছেন সামনের দিকে।

দুই

বঙ্কিমের উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে দু-ভাগে ভাগ করা চলে: ঐতিহাসিক কালের সমাজ-ভিত্তিক উপন্যাস এবং বর্তমান কালের সমাজ-ভিত্তিক উপন্যাস। এই ভাবে ভাগ করার তাৎপর্য এই যে সাধারণত ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে বলে আমরা মনে করি, অন্তত বঙ্কিম-যুগের অন্যান্য লেখক-কর্তৃক রচিত এই দু-জাতের উপন্যাসে যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়, বঙ্কিমের সাহিত্যে তা প্রায় অনুপস্থিত। বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের মতো সামাজিক উপন্যাসেও রোমাঞ্চমূলক উপাদানের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়—রোমান্টিক প্রেমের প্রাধান্য, আকস্মিক ঘটনার ভিড়, অতিপ্রাকৃত, সাধু

সন্ন্যাসী, ইচ্ছাপূরণমূলক পরিসমাপ্তি প্রভৃতি। অবশ্য পার্থক্য যে নেই তা আমি বলছি না। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে তিনি তাঁর যুগের বীরোচিত ও দেশপ্রেমাত্মক ভাবাদর্শকে অতীতের ঘটনার উপর প্রক্ষেপ করার অধিকতর সুযোগ পেয়েছেন ; দূরত্বের সুযোগ নিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর স্বাধীনতার অবকাশ পেয়েছেন।

তথাপি এই পার্থক্যের উপর আমি চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে চাই না এই জন্য যে একই মানসিক তাগিদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে বঙ্কিম এই দু-জাতের উপন্যাসই লিখেছেন। একালের আর কোনো লেখক সম্পর্কে ঠিক এ-কথা বলা চলে না : যেমন, রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পিছনে প্রধান তাগিদ ছিল দেশ-প্রেম, আর সামাজিক উপন্যাস রচনার পিছনে তাগিদ ছিল সমাজ-সংস্কার—অবশ্য এই উভয় তাগিদই জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও বঙ্কিম সাহিত্যকে অনুকরণাত্মক কর্ম বলে গণ্য করতেন, এবং যদিও আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের সাহিত্যাদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি আমরা দেখতে পাব সমস্ত উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন। সেই জন্যই তাঁর পূর্বাপর উপন্যাসসমূহের মধ্যে একটি মানসকর্মের ধারাবাহিক অগ্রগমন দেখতে পাই। এই ভাবে তাঁর সমস্ত উপন্যাসকে একত্র করে আমরা একটি অখণ্ড সমগ্রতা বা ঐক্যের অনুভূতি লাভ করি।

যে মূল মানসিক তাগিদ এই ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল তা তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের একটি উক্তি থেকে জানতে পারি :

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কী করিব ?' 'লইয়া কী করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহাবই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি···এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি, যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" [বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ সং, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬২২]

সাধারণত মনে করা হয় যে বঙ্কিমের শেষ জীবনের ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতার

ফল হল 'ধর্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা। বিষয়টিকে এমন সরলভাবে বিচার না করা ভালো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বঙ্কিমের সারা জীবনের মানস-প্রস্তুতি তাঁকে শেষ পর্যন্ত 'ধর্মতত্ত্ব' রচনার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই বইতে reformation-এর মনোভাব—নিজে শাস্ত্র পাঠ করে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্তে পৌছব—প্রাধান্য পেয়েছে। বইটিতে বঙ্কিমের কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতার স্বাক্ষর রয়েছে। ধর্মকে তিনি দৃঢ়ভাবে যুক্তিবাদের উপর স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং এইখানে রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অমিল। সার সংগ্রহ করলে দেখা যাবে স্বার্থশূন্যভাবে সামাজিক কর্ম করাকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করেন।

কাজেই তিনি যে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে ধর্মতত্ত্বের শেষ মীমাংসায় গিয়ে পৌছেছিলেন এমন অনুমান নেহাৎ অমূলক নয়। ধর্মতত্ত্বের মূল ভিত্তি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ; এবং নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই যে গীতার আদর্শের প্রতি তাঁর মনের অনুরক্তি ছিল তার প্রমাণ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-তেই পাই। কপালকুণ্ডলার উক্তি অনুসারে আকর্ষণহীন গৃহজীবনে তার একমাত্র অবলম্বন গীতার আদর্শ। পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরানী'তে গীতার তত্ত্ব আরও গুরুত্বলাভ করেছে। তা ছাড়া বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই কিছু কিছু সন্ন্যাসী চরিত্র আছে; তাদের কাজ ভবিষ্যৎ গণনা করা এবং পরের উপকার করা; দু-একটি ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত। কাজেই এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি যে সাহিত্য-জীবনের প্রায় শুরু থেকেই গীতার আদর্শের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি ছিল সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস। এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানবাদী চিন্তা থেকে। চোখের উপর তিনি এক বিপুল বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতাকে অনাবৃত হতে দেখেছেন যা কেবল জাগতিক কর্ম, জাগতিক সুখ এবং জাগতিক শক্তিতেই বিশ্বাসী। তিনি অনুভব করেছিলেন এই জাগতিক সুখ এবং শক্তির সাধনা না করলে নিছক আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা দেশের উন্নয়ন বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসায় তাঁর সত্যানুসন্ধানী মন দুটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে: এক, অনুভূতির পথে, যার প্রকাশ হয়েছে উপন্যাসে; দুই, তত্ত্ব চিন্তার পথে।

যুক্তি এবং বিজ্ঞানে বিশ্বাস ছিল বলে তিনি সহজেই অনুভব করেছিলেন যে মানব-প্রকৃতি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন ; জড়-জগতে যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম অপ্রতিরোধ্য, মনুষ্য জগতেও হয়তো তাই। কাজেই খেয়াল-খুশি মতো কোনো নীতি বা আদর্শ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না ; আগে মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য জানা দরকার। কাজেই তাঁর উপন্যাসে শুধু নৈতিকতা আর আদর্শের প্রচারই প্রাধান্য পায়নি, বরং প্রাধান্য পেয়েছে সত্যানুসন্ধান। আমি আগেই বলেছি, হয়তো শিক্ষক-বঙ্কিমের তাড়নায় তিনি সত্যকে পুরোপুরি অনাবৃত করতে পারেননি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)-তে এই সত্যানুসন্ধানের পরিচয় নেই। বইখানিকে বিশুদ্ধ রোমান্স বলে গণ্য করা যায় ; এবং সেইজন্যই স্কট-কৃত প্যাটার্নের সঙ্গে বইটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অনেকে তো বইখানির উপর 'আইভান-হো'র ছায়া পড়েছে বলে অনুমান করেছেন, যদিও বঙ্কিম স্বয়ং সে-কথা অস্বীকার করে গিয়েছেন। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বঙ্কিম স্বল্প পরিসরের মধ্যে রোমান্সের প্রায় সমস্ত উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং সেই জন্যই কাহিনীটিতে কৃত্রিমতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। বীরেন্দ্রকিশোরের আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞান জগৎসিংহের বীরোচিত আদর্শ, তিলোত্তমার প্রেম-নিষ্ঠা, আয়েষার প্লেটনিক প্রেম, বিমলার পতি-হত্যার মহৎ প্রতিশোধ গ্রহণ—সব যেন ছবির মতো একই বাড়িতে সাজানো ছিল বঙ্কিমের লেখনীর প্রতীক্ষায়।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)-তে তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বের অনস্বীকার্য স্বাক্ষর রয়েছে। বইখানিতে বঙ্কিমের সংশয়াচ্ছন্ন মনের ছাপ পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য বইখানিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে। কেউ কেউ মনে করেন অবাধ স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত বনবালা কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে বন্দী বিহঙ্গের জীবনকে স্বীকার করতে না পেরে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিল ; উনিশ শতকের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে রূপ পেয়েছে। এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেওয়া যায় না এই কারণে যে বন্দী জীবনের দুঃসহতাকে বঙ্কিম কোথাও চিত্রিত করেননি ; কপালকুণ্ডলা কোথাও অপরের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। আসল কথা, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মধ্যে অতি যত্নের সঙ্গে দেখিয়েছেন যে মানুষের প্রকৃতিজ কামনার যে কী রূপ তা আমরা ঠিক জানি না, আমরা যে চারপাশে

স্বর্ণতৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, প্রসাধনতৃষ্ণা, আর এসবের পরিণাম হিসাবে হিংসা ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রভৃতির প্রচণ্ড কলরব দেখি,—এ সবই সামাজিক জীবন থেকে উদ্ভূত। এই সামাজিক শিক্ষা যে লাভ করেনি, সাংসারিক কামনা-বাসনার মধ্যে যে কী রস তা যে অনুভব করেনি, তার কাছে সুখ-মরীচিকার পিছনে মানুষের অনন্ত পশ্চাদ্ধাবন অর্থহীন বলে বোধ হবে। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে বলেছিলেন যে পুরুষ নামক পরশপাথর নারীর চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার কোনো আকর্ষণ জন্মাল না। এইখানেই শকুন্তলা বা মিরাণ্ডার সঙ্গে তার পার্থক্য। কামনা-বাসনা আছে বলেই জীবন আমাদের কাছে মধুময়। আশা আছে বলেই জীবনের দুঃখ-কষ্টকে আমরা স্বীকার করি অনায়াসে। কিন্তু যার মনে কামনা-বাসনার অঙ্কুর মাত্র জন্মায়নি, যার জীবনে আশা করার কোনো উপলক্ষ্য নেই, জীবন তার কাছে এক অর্থহীন বোঝা। অস্তিত্বের এই অর্থহীনতার অনুভূতিই কপালকুণ্ডলার মনের স্থায়ী বিষণ্ণতার কারণ। যে-মুহূর্তে সে জানতে পারল কাপালিক তার মৃত্যু কামনা করেন, সেই মুহূর্তে সে মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুত হল; ভৈরবীর প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস সেই স্বাভাবিক মৃত্যু-কামনায় নৈতিক সমর্থন জোগাল মাত্র। ব্রাহ্মণবেশিনী পদ্মাবতীর অনুরোধে সে অনায়াসে নবকুমারকে তার হাতে সমর্পণ করতে রাজী হল। কপালকুণ্ডলার প্রকৃত মানসিক অবস্থাটা বঙ্কিম নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যখন চরম রাত্রে পদ্মাবতীর সঙ্গে কথা বলে কপালকুণ্ডলা গৃহাভিমুখে ফিরছে এবং নবকুমার এবং কাপালিক তাকে অনুসরণ করছে। বঙ্কিম বলছেন :

"তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া তাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসার মধ্যে ঘুরিতেছি দুঃখের প্রত্যাশায় নহে।···তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্বত্র সুখ, সেই সুখে আমরা সংসারে বদ্ধমূল ছাড়িতে চাই না। কিন্তু এ সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সে বন্ধন ছিল না—কোনো বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?" (ব-র, সা-স-স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬)

এই বইটির মধ্যে গীতার আদর্শ সম্পর্কে বঙ্কিমের শিল্পী-মানসের সংশয় ব্যক্ত হয়েছে। গীতার আদর্শ হল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করা। কিন্তু কামনা-বাসনা আছে বলেই এ জগৎ সংসার চলছে। যার মনে কামনা-

বাসনা নেই, অপরের কামনা পূরণের জন্য কাজ করে সে কী আনন্দ পাবে? কপালকুণ্ডলা একটি hypothetical (অনুমানমূলক) চরিত্র; লেখক ধরে নিচ্ছেন তার মধ্যে কামনা-বাসনার আদৌ জন্ম হয়নি। সংসারে সুখ না পেলেও অপরের সুখের জন্য কাজ করার গীতোক্ত আদর্শ তাকে কর্তব্যের নিশানা দিয়েছে। কিন্তু যে সুখের মূল্য জানে না, অপরের সুখের জন্য কাজ করার আদর্শ তাকে কতদিন ধরে রাখবে? অস্তিত্বের অর্থহীন বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পেলে সে ছাড়বে না। এক নেতিমূলক শূন্যতার উপলব্ধিই কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে।

শিল্পকর্ম হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা' একটি অসাধারণ সার্থকতার নিদর্শন। এই সার্থকতার কারণ থীমের ঐক্য; বিষয়বস্তু এবং শিল্পরূপের মধ্যে এখানে কোনো বিরোধের অনুভূতি জাগে না। কাহিনী যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে একটি অপরিহার্য পরিণতির দিকে গিয়েছে। তীব্রতম নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টিতে লেখক অদ্ভুত কুশলতা দেখিয়েছেন। বইখানির মূল দ্বন্দ্ব কামনার সঙ্গে কামনাহীনতার দ্বন্দ্ব। লেখক নানা জাতের কামনা দেখিয়েছেন: কাপালিকের কামনা ফাউস্টের মতো অনন্ত শক্তি লাভ; পদ্মাবতী বা লুৎফউন্নেসার মধ্যে বল্গাহারা কামতৃষ্ণা প্রবল, মোগল পরিবেশে থেকে সে এই তৃষ্ণার অধিকারী হয়েছে; নবকুমার কেবল ধর্মানুমোদিত কামনা চরিতার্থতার পথ গ্রহণ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে কামনা যে-রকমই হোক, তার পরিণাম ব্যর্থতা এবং দুঃখ। তেমনি কামনাহীনতার পরিণাম শূন্যতাবোধ। এক সর্বাত্মক ট্র্যাজেডি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপজীব্য।

'মৃণালিনী' উপন্যাসটি উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়নি থীমগত ঐক্যের অভাবে। ব্যর্থতার আর একটি কারণ সংশয়াচ্ছন্ন লেখক বইয়ের শেষে কোনো পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। হিন্দু রাজত্বের পতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রধান মন্ত্রী পশুপতি নিজে রাজা হওয়ার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং যবন বিজয়কে সহায়তা করেছে। পশুপতির উপর লেখক তেমন জোরের সঙ্গে দোষারোপ করতে পারেননি, কারণ প্রকৃতির নিয়মাধীন মানুষের উপর কামনার আধিপত্য খুব স্বাভাবিক। অবশ্য নীতিবিরুদ্ধ কামনার জন্য লেখক তার শাস্তিবিধান করেছেন। আবার হেমচন্দ্রকে নিয়ে লেখক আরও অসুবিধায় পড়েছেন। মৃণালিনীর প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত; বঙ্কিম এই গভীর প্রেমের উচ্চ

মানবিক মূল্যকে স্বীকার না করে পারেন না। হেমচন্দ্রের মধ্যে বীরোচিত দেশরক্ষার আবেগও খুব প্রাণবন্ত, দেশের জন্য সে সাময়িকভাবে প্রেমাস্পদার থেকে দূরে থাকতেও রাজী। কিন্তু এই দুটি জীবনধর্মী আবেগ একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। হেমচন্দ্র যখন দেশরক্ষায় ব্রতী, তখন নিরুদ্ধ প্রেম-চিন্তা তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে; যখন নবদ্বীপ জ্বলছে, তখন হেমচন্দ্র প্রেমাস্পদার কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তায় মৃতপ্রায়। তবু বঙ্কিম তার উপর দোষারোপ করতে পারছেন না; কারণ পবিত্র প্রেমের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। লেখকের এই মানসিক অনিশ্চয়তার দরুন কাহিনীর বিপরীত-ধর্মী পরিণতি পাঠককে বিভ্রান্ত করে। দেশ যখন পরপদানত হল, তখন হেমচন্দ্র তার ঈপ্সিতাকে লাভ করে ধন্য হল। পশুপতির স্ত্রী মনোরমার প্রহেলিকাময় চরিত্র, তার রহস্যময় অতীত ও তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণের করুণ পরিণাম আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে; কিন্তু কাহিনীতে তা অপ্রাসঙ্গিক। মনোরমার মধ্যে জীবনের এক রহস্যময় জটিলতাকে লেখক উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন; কিন্তু উপস্থাপনা অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটিতে লেখক কি বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করেছেন? আমার তা মনে হয় না। তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য কী ছিল ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁর শিল্পী-মানস সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে কুন্দ যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, কুন্দের বৈধব্য সেখানে কোনো ব্যাপার নয়। কুন্দ অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে হলেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারত; কারণ সূর্যমুখীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে সে ভাগ বসাতে চেয়েছে এবং সেখানে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। শ্রীশচন্দ্রের কাছে নগেন্দ্র যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে এ-কথা প্রতিপন্ন করেছিলেন, যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং পুরুষের একাধিক বিবাহ সমাজে অনুমোদিত; কাজেই কুন্দকে বিবাহ করা নীতিবিগর্হিত নয়। সূর্যমুখী স্বয়ং সক্রিয় হয়ে স্বামীর সন্তোষবিধানের জন্য বিবাহ সম্পাদনে অগ্রণী হয়েছিলেন। অথচ যে বিবাহ সমাজানুমোদিত, যে বিবাহে স্ত্রীর সম্মতি আছে, সেই বিবাহ জীবনে দারুণ বিপর্যয় ডেকে আনল। এর জন্য দায়ী কে? প্রকৃত অপরাধী কে? বঙ্কিম বলছেন, অপরাধী বিধবা-বিবাহ নয়, কামনাই অপরাধী। কামনাই বিষবৃক্ষ, "রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মানুষ নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদির অস্পৃশ্য।

জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। ......চিত্ত-সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই।" (ব-র ১ম, পৃঃ ৩০৯-১০)

এই উক্তির শেষাংশে যে শিক্ষক-বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটেছে তা সহজেই লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে কুন্দ আর নগেন্দ্রের মধ্যে চিত্ত-সংযমের অভাব নেই। কুন্দ অপাপ-বিদ্ধ কুসুম-কোরক। নগেন্দ্র গড়পড়তা মানুষের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, তাঁর নীতিজ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞান উদাহরণস্থল। পাশাপাশি অসংযত ও কামাসক্ত নগেন্দ্র ও হীরার চরিত্রকে উপস্থিত করে লেখক তাদের সঙ্গে কুন্দ-নগেন্দ্রের তফাৎকে আরও প্রকট করে তুলেছেন। তবে নগেন্দ্র তো কামনা-ত্যাগী সন্ন্যাসী নন, সমাজস্বীকৃত কামনাকে তিনি চরিতার্থ করবেন না কেন? বস্তুত নগেন্দ্রের কর্ম যদি বিচারসম্মত না হত, তা হলে বইখানি ট্রাজেডি হত না, একখানি সস্তা উপদেশাত্মক কাহিনী হত। ট্রাজেডির তাৎপর্য এই যে ঘটনার গতি ও পরিণাম মানুষের যুক্তি বিচার ও সাধ্যের আয়ত্তাধীন নয়। প্রকৃত-পক্ষে 'বিষবৃক্ষ'-এর কাহিনীটিতে এই তাৎপর্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে মানুষ যতক্ষণ কামনা-বাসনার অধীন. ততক্ষণ সে এক ধরনের প্রকৃতিজ নিয়তিবাদের করায়ত্ত। ততক্ষণ সে ন্যায় ও ধর্মের স্বীকৃত পথে চলতে চেষ্টা করলেও তার জীবন-পথের মোড়ে মোড়ে অভাবিত বিপর্যয় অপেক্ষা করে থাকবে।

একই থীমের একটি **vulgar** বৈচিত্র্য হিসাবে হীরা-দেবেন্দ্র উপাখ্যান মূল কাহিনীর পক্ষে কতখানি সহায়ক হয়েছে বলা শক্ত। হীরা স্বতন্ত্রভাবে একটি চিত্তাকর্ষক মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র. কিন্তু মূল কাহিনীর পক্ষে সে অত্যাবশ্যক নয়। দেবেন্দ্র একটি গতানুগতিক লম্পট-চরিত্র; বৈরাগিনীর ছদ্মবেশে তার কুন্দকে অপহরণের চেষ্টা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি স্থূল রুচির পরিচায়ক। কাজেই এই উপকাহিনীটি কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর কাহিনীর গাম্ভীর্যকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করেছে, এবং পাঠকের মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করেছে। অনিচ্ছাবশতই হোক বা যে কারণেই হোক বঙ্কিম কুন্দ-নগেন্দ্রের-প্রেম-কাহিনীর ক্রমবিকাশটি না দেখিয়ে শুধু সংবাদ হিসাবে আমাদের জানিয়েছেন। শুধু সূর্যমুখীর প্রতিক্রিয়াকে তিনি খানিকটা বিস্তারিতভাবে চিত্রিত করেছেন। তার ফলে যে ফাঁকটি সৃষ্টি হয়েছে সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য হীরার উপকাহিনীটি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কুন্দ-নগেন্দ্রকে প্রায়শ পর্দার অন্তরালে রাখার ফলে তাদের ব্যর্থ স্বল্পকালীন

দাম্পত্য জীবনের চিত্র লেখক তাঁর নৈতিক উপদেশাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী খুব সংক্ষেপে চিত্রিত করতে পেরেছেন ; কিন্তু সেখানে নৈতিকতার চড়া সুর শিল্পানুভূতিকে পীড়িত করে। কাহিনীর শেষে সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনও ঘটনার অপরিহার্য পরিণাম নয়, লেখকের রোমান্সপ্রবণতার ফল।

হয়তো 'বিষবৃক্ষে'র এই সব সাংগঠনিক ত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই বঙ্কিম প্রায় একই থীমের উপর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখেন। এই কাহিনীটির উপস্থাপনায় লেখক অনেক বেশি মুন্‌শিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রেমের মধ্যে যে সকরুণ গভীরতা আছে গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রেমের মধ্যে তা নেই। এখানে একটি অগভীর রূপজ আকর্ষণই চিত্রিত হয়েছে। গোবিন্দলাল নগেন্দ্রের মতো বয়স্ক এবং দায়িত্বশীল পুরুষ নয় ; এমন কি গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্যজীবনও কিশোরসুলভ চাপল্যকে অতিক্রম করে যায়নি। বস্তুত, রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তিই ট্রাজেডির কারণ হিসাবে দেখা দিত না, যদি না গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কিশোরসুলভ অপরিণামদর্শিতা একটি লঘু জিনিসকে গুরুতর করে তুলত। উভয়ের মধ্যেই একটি গুণ একটু মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে উপস্থিত ছিল—আত্মাভিমান বোধ। অভিমানবশতই ভ্রমর অত্যন্ত সংকটজনক সময়ে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিল ; এবং অভিমানবশতই কৃষ্ণকান্ত সম্পত্তি ভ্রমরকে দিয়ে গেলে সে-সম্পত্তি গ্রহণে গোবিন্দলাল অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেছে। বস্তুত, হাসতে হাসতে মাথায় ব্যথার মতো দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র সঙ্গত ভুল-বোঝাবুঝির ফলে একটি নিদারুণ ট্রাজেডি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কাজেই সুষ্ঠু ঘটনা-সংস্থাপনের ফলে কাহিনীটি যদিও খুব উচ্চ নাটকীয় গুণসমন্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে, তথাপি মানব-প্রকৃতির কোনো গভীরতম সমস্যা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। কাহিনীটি প্রায় মনস্তত্ত্বমূলক ট্রাজেডির পর্যায়ে পড়ে।

রোহিণী চরিত্রটি নিয়ে শিক্ষক-বঙ্কিম খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি রোহিণীকে নীচ-প্রকৃতি ও লোভী বলে চিত্রিত করেছিলেন। পরে তাঁর শিল্পীসত্তা বুঝতে পেরেছিল যে রোহিণী পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে না পারলে ট্রাজেডি রস সৃষ্টি হবে না, এবং বিভিন্ন সংস্করণে তিনি ক্রমশ রোহিণীকে উজ্জ্বলতর করে চিত্রিত করেন। রোহিণীর বিধবা জীবনের বঞ্চনাকে লেখক সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গোবিন্দলালের প্রতি আকর্ষণ তার চরিত্রের মূল কথা নয়, তার চরিত্রের মূল কথা পুনর্বিবাহের ইচ্ছা। সেই জন্যই

সে হরলালের প্রলোভনে একটি অন্যায় কর্মে প্ররোচিত হয়েছিল ; এবং আমরা অনুমান করতে পারি সেই আশাতেই সে গোবিন্দলালের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল তার সে আশা পূরণ করেনি ; সে তাকে রক্ষিতার মতো পালন করেছে, বিবাহিতার মর্যাদা দেয়নি। কাজেই গোবিন্দলাল সম্পর্কে রোহিণীর ক্রমশ আশাভঙ্গ হয়েছিল,—এ পর্যন্ত বঙ্কিম রোহিণী চরিত্রকে মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু রোহিণী তার শেষ দৃশ্যে যে একটি অপরিচিত পুরুষকে দেখামাত্র তার সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি করার জন্য পুকুর পাড়ে দেখা করতে গেল—এ কাহিনী মোটেই রোহিণী চরিত্রের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি নয়। একজন প্রকৃত বারবনিতাও কারও রক্ষিতা হয়ে থাকার সময় এরকম অবিমৃশ্যকারিতার কাজ করে না। এখানে শিক্ষক-বঙ্কিম অসহিষ্ণুভাবে একটি অপ্রীতিকর অধ্যায় সংক্ষেপে শেষ করার জন্য রোহিণীর এরকম আকস্মিক বিভ্রান্তি দেখিয়েছেন।

তবে কাহিনীর শেষে গোবিন্দলালের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটা সমর্থনযোগ্য। জীবনে হতাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছে মানুষ দু-এর এক পন্থা গ্রহণ করে—হয় সে আত্মহত্যা করে, নয় ছন্নছাড়া হয়ে যায়। আমাদের দেশে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার একটা প্রচলিত ঐতিহ্য আছে বলে গোবিন্দলাল সেই পথে গিয়েছে।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমের অন্যতম সার্থক উপন্যাস। তবে শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের কাহিনীর পাশাপাশি দলনী-মীরকাশেমের উপকাহিনীটি কাহিনীর ভারসাম্য খানিকটা নষ্ট করেছে বলে আশঙ্কা হয়। অনেকের ধারণা দলনীর কাহিনী শৈবলিনী-কাহিনীর বিপরীত হিসাবে উপস্থাপিত হয়ে শৈবলিনীর অপরাধকে আরও জাজ্বল্যমান করে তুলেছে। বঙ্কিমের মনে এরকমের কোনো অভিপ্রায় থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু কার্যত দুটি কাহিনী বৈপরীত্য-জ্ঞাপক না হয়ে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিম হয়তো শৈবলিনীর অপরাধকে খুব প্রকট করে তুলতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু শৈবলিনী শিক্ষক বঙ্কিমকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেছে। দলনীর মতোই শৈবলিনী অমলিন সতীত্ব নিয়ে যে-স্বামীকে সে ভালবাসে না সেই স্বামীর সঙ্গে একটা মিথ্যা সম্পর্ক নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়ার অনিচ্ছাবশত প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের অসম্ভব আশা নিয়ে লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছিল। অসাধারণ সাহস এবং আত্মবিশ্বাস ছিল বলে সে ভরসা করেছিল যে সাহেবের নৌকোতেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে। কার্যত, সে নিজেকে অক্ষত রেখে

অসীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে প্রতাপকে তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিল। অবশেষে দলনী যেমন স্বামীর ইচ্ছা জানতে পেরে স্বেচ্ছায় বিষ গ্রহণ করে প্রাণত্যাগ করেছিল, তেমনি শৈবলিনীও প্রতাপের কাছে তাকে বিস্মৃত হওয়ার শপথ গ্রহণ করে সেই অসম্ভব শপথ-বাক্য পালন করার জন্য প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ঝড়-বাদলের মধ্যে বনপথে গমন করেছিল। প্রেমে একনিষ্ঠতাকে যদি সতীত্ব বলে গণ্য করা যায়, তবে শৈবলিনী অতুলনীয়া; একমাত্র দলনীর সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে। বঙ্কিম কোনোক্রমেই শৈবলিনীকে অপরাধিনী বলে প্রতিপন্ন করতে না পেরে অবশেষে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করলেন। যুক্তিটা এই যে যার ফাঁসি হয় সে নিশ্চয় খুনী।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব। সে যত তেজস্বী মেয়েই হোক, যত অকুতোভয়েই সে সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অনুসরণ করুক, তবু সে হিন্দুর মেয়ে, স্বামী-সংস্কার তার মজ্জাগত। স্বামীকে ত্যাগ করার দরুন তার মনের গভীরে নিশ্চয়ই অপরাধবোধ জমা হয়ে ছিল; প্রতাপ তার প্রেমকে স্বীকৃতি না দিয়ে তার অপরাধবোধকেই সত্য বলে জানিয়ে দিয়ে গেল। মনস্তত্ত্ব বলে যে অপরাধ-বোধের ফলে মানুষ অনেক সময় নিজেকে নিজে কঠিন শাস্তি দেয়। কিন্তু শুধু মনস্তত্ত্বের খাতিরেই যে বঙ্কিম শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়। শৈবলিনীর মতো একনিষ্ঠ তেজস্বী মেয়েকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনতে হলে তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মের ব্যবস্থা দরকার। সেইজন্যই এই শাস্তির ব্যবস্থা।

বঙ্কিমের সত্যানুসন্ধিৎসু মনের আর একটি অতুলনীয় সৃষ্টি প্রতাপ। অপরিসীম আত্মনিগ্রহ বলে সে সমাজনীতির খাতিরে শৈবলিনীকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। যথারীতি বিবাহাদি করে সে নিখুঁতভাবে প্রতিটি কর্তব্য পালন করে গিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড আত্মনিগ্রহের ফলে সে জীবনে কোনোদিন সুখ পায় নি। তার মৃত্যুর পূর্বের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে শৈবলিনীর প্রতি অপরিম্লান ভালবাসাকে স্বীকার করতে না পেরে তার সারা জীবন ব্যর্থতায় ভরে উঠেছিল। যে সমাজনীতি প্রতাপের মতো মানুষের জীবনে এই ধরনের ট্রাজেডি ঘটতে দেয় সেই সমাজনীতির অভ্রান্ততা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে।

(‘সীতারাম’ বঙ্কিমের দুখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্যতম। অপরটি হল ‘কপাল-

কুণ্ডলা'। 'কপালকুণ্ডলা'র মতো 'সীতারাম' বইখানিও নিখুঁত; এখানে শিক্ষক বঙ্কিমের শাসানি যেমন অনুপস্থিত, তেমনি রোমান্সের নিয়ম অনুযায়ী অপরিহার্য ট্রাজেডিকে জোর করে ভিন্ন পথে চালিত করার চেষ্টা নেই। সাহসী, বীর যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক, সাংগঠনিক নৈপুণ্যে অদ্বিতীয় সীতারাম কী করে রমণীর প্রতি আকর্ষণবশত এবং সেই রমণীর অপ্রাপ্যতার দরুন কী করে অনায়াসে নিজের সাজানো রাজ্যকে ছত্রখান হয়ে যেতে দিল শিল্পীসুলভ নির্মমতার সঙ্গে বঙ্কিম সেই মর্মন্তুদ কাহিনীটি ব্যক্ত করেছেন। ভাগ্যের পরিহাস এই যে-স্ত্রী স্বামীকে পাওয়ার জন্য এত আগ্রহী ছিল সে-স্ত্রী এক ভ্রান্ত ধর্মাদর্শের খাতিরে স্বামীর কাতর আহ্বানকে উপেক্ষা করল। জয়ন্তী শেষে স্ত্রীর ভুল দেখিয়ে দিয়েছিল : স্ত্রী যখন নিষ্কাম ব্রতধারী, তখন প্রজাদের খাতিরে, রাজ্যের খাতিরে, কামনারহিতভাবেই সে অনায়াসে সীতারামের আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে পারত। কিন্তু আসল সত্য এই যে স্ত্রীর পক্ষে তা কখনই করা সম্ভব ছিল না, কারণ স্বামীর প্রতি সে আসক্তিরহিত নয়। স্বামীর প্রতি তার আসক্তি রয়েছে বলেই, স্বামীর দাবিকে বড় বড় ধর্মীয় উক্তির আড়ালে অস্বীকার করে সে আত্মনিপীড়ন করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। বইখানি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর রচিত। আমরা আর একবার জানতে পারি মানুষ যতক্ষণ কামনার বশীভূত ততক্ষণ সে নিয়তির অধীন; অথচ কামনাকে অতিক্রম করে যাওয়া খুবই দুরূহ কাজ; স্ত্রী পারেনি, খুব সম্ভব জয়ন্তীও পারেনি।

বস্তুত, নিয়তি-চিন্তা বঙ্কিমের শিল্পী কল্পনার গভীরে প্রোথিত। 'কপাল-কুণ্ডলা'র হাতের বিল্বপত্র দেবতার চরণ থেকে স্খলিত হয়ে পড়া, কুন্দের আপন ভবিষ্যৎকে স্বপ্নে দর্শন, বিড়াল মারতে গিয়ে ভ্রমর কর্তৃক নিজের কপালে আঘাত করা ইত্যাদি প্রতীকধর্মী ঘটনাগুলির মধ্যে বঙ্কিম তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের নিয়তিবাদী তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বস্তুত, বঙ্কিম সারা জীবন ধরে মানব-প্রকৃতির মধ্যে এই সত্যই আবিষ্কার করেছেন যে মানুষ যতক্ষণ কামনার বশীভূত ততক্ষণ সে নিয়তির অধীন। সেই জন্যই বঙ্কিমকে নীতি-বাগীশ বলে মনে করা ভুল; নৈতিকতা তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসের বাইরের প্রলেপ মাত্র। নিয়তিবাদের মূল কথাই হল যে মানুষ ইচ্ছে করলেই তার নিয়তিকে এড়াতে পারে না। বিষবৃক্ষে, কৃষ্ণকান্তের উইলে, সীতারামে, বঙ্কিম বারবার দেখিয়েছেন যে কামনা আছে বলেই মানুষ অন্যায় করে না, কিন্তু কামনার সুযোগ নিয়ে ঘটনাচক্র মানুষকে গুরুতর অন্যায় ও আরও গুরুতর

পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এখানে আমরা সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে বঙ্কিমের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। সেকস্‌পীয়র দেখিয়েছেন, শৌর্যেবীর্যে নানাবিধ নৈতিক ও মানসিক গুণে অমিত শক্তিধর মানুষের মধ্যে তবু কোনো না কোনো জায়গায় দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বলতার রন্ধ্রপথে নিয়তি তাকে পর্যুদস্ত করে। সেকস্‌পীয়র মানুষের নানারকম দুর্বলতা দেখিয়েছেন; বঙ্কিমের মতে নারীর প্রতি পুরুষের বা পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।)

কাজেই ভারতীয় ঐতিহ্যে পুষ্ট বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত নিয়তির হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় খুঁজে পেয়েছেন গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মাদর্শের মধ্যে। এই বক্তব্য তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'দেবী চৌধুরানী'তে দেবীর শিক্ষার অধ্যায়টি বাদ দিলেও বইটি একটি চমৎকার রোমান্স হিসাবে আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে। তবে শিক্ষার অংশটি বাদ দিলে বইখানি আর বঙ্কিমের উপন্যাস থাকে না। মাত্র পাঁচ বৎসরের শিক্ষার ফলে মানুষ সত্যি সত্যি মনে-প্রাণে নিষ্কাম আদর্শ গ্রহণ করতে পারে, এ বড়ই সরল-রেখাত্মক কল্পনা বলে মনে হয়। বস্তুত, দেবীরানীর রানীগিরি ত্যাগ করে স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা একটি সহজ মনস্তত্ত্বের প্রকাশ দেখতে পাই। মানুষ যেখানে সবচেয়ে বড় পরাজয় লাভ করে সেখানে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা তার মন থেকে কখনও যায় না। দেবীরানী জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয় লাভ করেছিলেন স্বামীর ঘরে। সেই স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় কামনা তার আর কিছু নেই। কাজেই দেবীর নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা তাকে সাধারণ মনস্তত্ত্ব থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত করেনি।

/একমাত্র রাজসিংহের চরিত্রের মধ্যেই আমরা নিষ্কাম কর্মাদর্শের অনেকটা সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাই। রাজসিংহ শুধু কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত, তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই বা লক্ষ্য নেই। তিনি শক্তিমান হলেও শিবাজীর মতো হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনা তাঁর নেই। চঞ্চলকুমারীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ না হলে ঔরঙ্গজীবকে অত্যাচারী জেনেও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন না। চঞ্চলকুমারীকে সুখী করার জন্যই তিনি তাকে বিবাহ করতে রাজী; তাঁর নিজের মন এ ব্যাপারে নির্বিকার। বস্তুত, আমরা রাজসিংহের মধ্যে এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা বা passivity আবিষ্কার করতে পারি, এবং তা নিষ্কাম আদর্শের ফল। 'রাজসিংহ' বইয়ের জেবউন্নিসা চরিত্রে আমরা নিয়তিরূপী কামনার লীলা দেখতে পাই।/

গম্ভীর-রসাত্মক উপন্যাসগুলি ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকখানি লঘু-রসের কাহিনীও রচনা করেছিলেন, যথা, 'ইন্দিরা', 'রাধারানী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রজনী' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। এগুলির মধ্যে একমাত্র 'রজনী' ব্যতীত আর কোনোটিই উপন্যাসোচিত পরিসর লাভ করেনি। তথাপি এগুলিকে একটু বৃহদায়তনের ছোট গল্প বলে আখ্যাত করাও মুশ্‌কিল। অনেকগুলি ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহিনী একটি সুখ-সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সূচনা, জটিলতা এবং জটিলতার গ্রন্থি মোচনান্তে সমাপ্তি মিলিয়ে প্রত্যেকটি কাহিনীতে দীর্ঘ সময় অতিবাহনের আভাস আছে। এ ধরনের রচনারীতি উপন্যাসেরই বিশেষত্ব। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র রচনারীতি হিসাবে ছোট গল্পের আবির্ভাব ঘটেনি। যে-সব ক্ষুদ্রকায় কাহিনীর সন্ধান পাই সেগুলিকে ছোট গল্প না বলে ক্ষুদে উপন্যাস বলাই অধিকতর সঙ্গত।

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিমের এই হাল্‌কা মেজাজের কাহিনীগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কাহিনীগুলির মধ্যে বঙ্কিমের মানস-প্রকৃতির একটি স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করা যায়। একমাত্র 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ব্যতীত আর সবগুলি কাহিনীই রোমান্টিক প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে-বঙ্কিম জীবনের গভীরতম সমস্যা ও প্রশ্নকে দার্শনিক-সুলভ মননশীলতার সঙ্গে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন, সেই বঙ্কিম যে-সব ছোটখাটো কৌতুক, ছোটখাটো সুখ ও মিলনের ঘটনা জীবননাট্যকে সৌন্দর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত করে তোলে তার সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তাঁর গম্ভীর-রসাত্মক উপন্যাসগুলির মধ্যেও আমরা কৌতুক এবং হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতা এবং প্রবণতা লক্ষ্য করে থাকি। সেখানেও তিনি নরনারীর প্রেমমূলক বা দাম্পত্য জীবনের চিত্র রচনার সময় শালীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হয়েছেন; তথাপি সেগুলির মধ্যে মাধুর্য-রসের অভাব ঘটেনি। অবশ্য বড় বইগুলিতে জীবনের বৃহত্তর সমস্যা ও প্রশ্নের চাপে এই মাধুর্য ও সৌন্দর্যের খণ্ড দৃশ্যগুলি ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছোট কাহিনীগুলি পাঠককে সাময়িক আনন্দদানের উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত বলে সেখানে জীবনের উপভোগ্য চিত্রগুলি অনাবিল স্বচ্ছতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলোচ্য কাহিনীগুলির মধ্যে একমাত্র 'রজনী'ই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের উপন্যাস। সামগ্রিক বিচারে এটিকে রোমান্টিক কমেডির শ্রেণীভুক্ত করা চলে বটে; কিন্তু

জীবনের সমস্যা এখানে উপেক্ষিত নয়। কাহিনীটিতে মিলনান্তক পরিসমাপ্তি থাকলেও তার মধ্যে ট্রাজেডির ছোঁয়াচ অনুভব করা যায়। বইখানি সামাজিক পটভূমিকায় পরিকল্পিত হলেও আসলে এটি একটি পুরোদস্তুর রোমান্স। কল্পনার অবাধ জাল বিস্তার করে বঙ্কিম সম্ভাব্যতার ক্ষীণ সূত্র বজায় রেখে এই বইতে অসম্ভব, অভাবনীয় এবং অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এইভাবে পাঠকের রোমান্স-পিপাসাকে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করেও বঙ্কিম কিন্তু আসলে এ বইয়ে মানুষের হৃদয়জ দ্বন্দ্বের একটি অত্যন্ত বাস্তব চিত্রকেই উপস্থিত করেছেন। হৃদয়জ দ্বন্দ্বের উপস্থাপনাই প্রধান লক্ষ্য বলে বঙ্কিম এখানে একটি অভিনব রচনারীতি অবলম্বন করেছেন। লেখক নিজে এখানে সর্বজ্ঞ বক্তা হিসাবে উপস্থিত না হয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন; বিভিন্ন প্রধান চরিত্র স্বগত ভাষণে কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিবৃত করছে, এবং তা করতে গিয়ে নিজের নিজের আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করছে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার ফ্যাসান সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে বঙ্কিম তাঁর চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং একটি কল্পনা-প্রধান কাহিনীর মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এইভাবে সবকিছুকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেও তার মধ্যে পরিপূর্ণ বাস্তবতাকে অন্তর্নিহিত রাখা দুর্লভ শৈল্পিক সার্থকতার নিদর্শন।

'রজনী' রোমান্স হলেও তার মধ্যে যে সমস্যা আলোচিত হয়েছে তা বাস্তবতা প্রধান উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমস্যার অনুরূপ। এই শেষোক্ত উপন্যাস-দ্বয়ের উপজীব্য বিষয় হল নরনারীর ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব। বিধবা বিবাহের আন্দোলনের সময়ে রচিত হয়েছিল বলে আমরা ধরে নিই যে এই উপন্যাসদুটিতে বিধবার সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশের সঙ্গে বই দুখানি পড়লে বোঝা যায় যে কুন্দ এবং রোহিণী যদি বিধবা না হয়ে কুমারী হত তা হলেও কাহিনীতে উক্ত ট্রাজেডি ঘটতে পারত। ট্রাজেডির মূল কারণ কুন্দ-রোহিণীর বৈধব্য নয়, বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি। কামনা, বিশেষ করে, অবৈধ কামনা মানুষকে ক্রূর নিয়তির বশীভূত করে তোলে এবং ঘটনার যোগাযোগ তাকে সাংঘাতিক পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। বঙ্কিম তাই এ দুখানি বইয়ে মানুষের কামনাকেই অপরাধী বলে গণ্য করেছেন। 'রজনী'তে জীবনের এই নির্মম সমালোচনা অনুপস্থিত। এখানেও সেই ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব; অন্ধ রজনীকে ঘিরে দুটি পুরুষের কামনা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। অমরনাথ

দারুণ বিপদের মুহূর্তে রজনীকে রক্ষা করেছিল বলে রজনী তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার জন্য সে অমরনাথকে বিবাহ করতেও রাজী। কিন্তু রজনী ভালবাসে শচীন্দ্রকে। লেখক অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে শচীন্দ্রের মনকে রজনীর প্রতি নিবদ্ধ করিয়েছেন এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত করেছেন। লেখক এখানে কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে প্রেমকে, অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কামনাকে স্থান দিয়েছেন। অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে যদি বৈধ প্রেম জন্মলাভ করে তবে উভয়ের মধ্যে মিলন আকাঙ্ক্ষিত এবং সুখকর। নারীর প্রেম যে-পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, তার সঙ্গে তার মিলনই বাঞ্ছনীয়। যে-পুরুষ নারীকে ভালবেসেও তার প্রেম আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি, তার পক্ষে কর্তব্য হল সরে দাঁড়ানো, প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে মিলন সংঘটনে সাহায্য করা; তাতেই তার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়। এইভাবেই অমরনাথ জীবনে ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়ে মহত্ত্ব অর্জন করেছে। এখানে বঙ্কিম শিভ্যালরির নীতিকে অনুসরণ করেছেন; কিন্তু সামাজিক জীবনে অবিবাহিত নর-নারীর প্রেমকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'রজনী'তে বঙ্কিম জীবনের সমালোচক নন, জীবন-রসিক। কামনাকে অপরাধী বলে গণ্য করে কামনাত্যাগকে ধর্ম বলে প্রতিপন্ন করেননি; বরং স্বাভাবিক কামনার পরিপূর্ণতায় জীবনে যে স্বর্গ নেমে আসে, এমন কি অন্ধ পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় (রজনী দৈবশক্তি বলে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিল), তার চিত্র দিয়েছেন।

'ইন্দিরা' বইখানি অনাবিল ও অফুরন্ত কৌতুকের উৎস। স্বামী-গৃহে গমনের কালে ইন্দিরা দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিল। তাদের কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে সে এক গৃহস্থ বাড়িতে রাঁধুনী বামনীর কাজ নেয়। তারপর সেই বাড়ির বৌ সুভাষিণী ও তার স্বামীর সহায়তায় কী করে ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল তার কাহিনী বইতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমেই স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় দিলে স্বামী দস্যু কর্তৃক অপহৃতা স্ত্রীকে না-ও গ্রহণ করতে পারেন। এই আশঙ্কা বশত ইন্দিরা অন্য নারী হিসাবে স্বামী উপেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে এবং তার হৃদয়রাজ্যে দৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করে তবে আত্ম-পরিচয় দান করে। এ কাহিনীতে উপেন্দ্র পর-নারী বলে জেনেই নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছেন; এবং ইন্দিরা যে-স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে সে ঘর করেনি সেই পরপুরুষের তুল্য স্বামীর সঙ্গে বেহায়ার মতো আচরণ করেছে। সুতরাং সেকালের নীতিবাগীশ

পাঠকদের কাছে যে এই কাহিনীটি খুব রুচিকর বলে বোধ হয়নি তার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। আইন বাঁচিয়ে বঙ্কিম কার্যত নারী কর্তৃক পুরুষকে প্রলুব্ধ করার কাহিনী বিবৃত করেছেন; ইন্দিরা একজন 'সিডিউসার' বা মোহিনী নারী। অবৈধ প্রেমের মাধুর্যকে বঙ্কিম এভাবে চিত্রিত করেছেন, এবং আমাদের বুঝতে দিয়েছেন সে অন্যত্র তিনি কামনা-বাসনা ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সুপারিশ করলেও কামনা-বাসনার অধীন এই জগতে ছোটখাটো কৌতুক ও সুখের ঘটনার ভিতর দিয়ে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিত্য ক্ষরিত হচ্ছে বঙ্কিম তার মূল্যকে অস্বীকার করেন না। 'ইন্দিরা' একখানি আশ্চর্য সার্থক রোমান্টিক কমেডিমূলক কাহিনী এবং এই সার্থকতার মূলে আছে কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বঙ্কিমের আশ্চর্য দক্ষতা।

'রাধারানী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' দুখানিই রোমান্টিক প্রেমমূলক ক্ষুদ্র কাহিনী। প্রথমটি সামাজিক পটভূমিকায় এবং দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পরিকল্পিত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নারীর একনিষ্ঠ প্রেম সার্থক হল, সে তার দয়িতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল—উভয় কাহিনীতেই এই মামুলী রূপকথাসুলভ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সরস সংলাপ সংযোজনের গুণে যে-কোনো পাঠকের কাছে গল্পদুটি খুব মিষ্টি গল্প বলে বোধ হবে।

'বাবু'-মূলক উপাখ্যানগুলির মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। লেখকের ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধি সত্ত্বেও প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ব্যঙ্গের ধার নষ্ট হয়ে গেছে। মুকুন্দরামের ক্ষমা-সুন্দর ব্যঙ্গের আদর্শ অনুযায়ী বঙ্কিম মুচিরামকে বিদ্রূপ করেছেন, তাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি করেননি। গরিবের ঘরের নির্বোধ স্বল্পবুদ্ধি সর্বগুণবর্জিত ছেলে মুচিরাম কী করে ঘটনার পায়ে পায়ে ফুটবলের মতো তাড়া খেতে খেতে অবশেষে ইংরাজ রাজপুরুষদের কৃপা-লাভ করে 'বাবু' শ্রেণীভুক্ত হল এবং জমিদারীর মালিক হল লেখক তারই এক কৌতুককর চিত্র উপস্থিত করেছেন। বইখানির ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধির আসল মূল্য এইখানে যে 'বাবু' সম্প্রদায় ব্যঙ্গের আসল লক্ষ্য নয়; ব্যঙ্গের আসল লক্ষ্য 'বাবু'-সমাজ সৃষ্টিকারী ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাহিনীতে প্রায় অনুক্ত বা নিতান্ত অপ্রধান। নির্বোধ অক্ষম এবং নির্লজ্জ তোষামোদকারীরাই যে ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রিয়পাত্র হয় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে এই বাস্তব তথ্যমূলক চিত্রই বঙ্কিম কাহিনীতে

উপস্থাপিত করেছেন। অথচ ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাহিনীতে নিতান্তই অপ্রধান। ব্যঙ্গরচনায় বঙ্কিম যে কতখানি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই পরোক্ষ প্রণালীই তার প্রমাণ। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ, এবং এর তুল্যমূল্য বই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

গম্ভীর ও ট্রাজেডি-রসাত্মক উপন্যাসগুলির পাশাপাশি এই ক-খানি হাল্‌কা কমেডিমূলক কাহিনীর উপস্থিতি বঙ্কিমের মানস-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের নতুন অন্তর্দৃষ্টি দান করে। জীবনের দুঃখ সংকট ট্রাজেডির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা যিনি লাভ করেছিলেন, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কামনা-বাসনার অধীন মানুষ নিয়তির অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র, এবং প্রতিকার হিসাবে যিনি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মাদর্শকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বনযোগ্য ধর্ম বলে গণ্য করেছিলেন, তিনি কিন্তু তাই বলে জীবন-বিতৃষ্ণা বশত জীবন বৈরাগ্যের বাণী শোনাননি। কামনা-বাসনাময় এই পৃথিবীতে ছোটখাটো কৌতুক, ছোটখাটো সুখ, সামান্য মিলনের ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য উৎসারিত হচ্ছে তিনি তার মূল্যকে সর্বত্র স্বীকার করেছেন, বিশেষ করে লঘু কাহিনীগুলির মধ্যে। আসল কথা, অতি তরুণ বয়সে বঙ্কিম যদিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে জগৎ-জীবন সম্পর্কে তিনি একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌছবেন, তথাপি তিনি ছিলেন মূলত সেন্‌সুয়াস (sensuous) প্রকৃতির। রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর সহজ আকর্ষণকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তার ফলে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সামাজিক ও লৌকিক চিন্তা, কামনা-বাসনার সমালোচনামূলক চিন্তার পাশাপাশি জীবনের ভোগের আয়োজনকে অকুণ্ঠিত-ভাবে স্বীকার করা বঙ্কিমের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দ্বিমুখী মনোভাবের মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধ কল্পনা করার আবশ্যকতা দেখি না। মহৎ মনের বিশেষত্ব এই যে তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দুই-ই বেশি। এরকম মন জীবনকে বিভিন্ন স্তর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। আমরা দেখতে পাই জীবনের মুগ্ধ ভক্ত হিসাবে বঙ্কিম উদার রোমান্সমূলক কল্পনার সাহায্যে মানব-সমাজের এক সুন্দর মাধুর্যময় চিত্র রচনা করেছেন। আবার জীবনের সমালোচক এবং উপযোগিতার বিচারক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রশ্ন এবং চারিত্রিক মূল্যকে বাস্তবসম্মত চিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। আবার জগৎ-জীবনের মৌল সত্যের অনুসন্ধিৎসু পথিক হিসাবে তিনি জীবনের গভীরতম প্রদেশে দার্শনিক মননশীলতার আলোক নিক্ষেপ করেছেন। এই তিনটি স্তরের

মধ্যে প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে অনুস্যূত, এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তরের মধ্যে অনুস্যূত। এই জন্যই বঙ্কিম সম্পর্কে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে তিনি প্রত্যেক পাঠকের মনের মাপের সমান। শিক্ষিত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত—প্রত্যেক পাঠক নিজের নিজের মনের প্রয়োজন ও সীমা অনুযায়ী বঙ্কিম-সাহিত্য থেকে উপাদান গ্রহণ করতে পারে ও উপভোগ করতে পারে। বঙ্কিম শুধু বাংলা দেশের রেনেশাঁস কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নন, তিনি বাংলা-দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। একই সঙ্গে এতখানি ব্যাপ্তি এবং গভীরতা আর কোনো বাঙালী ঔপন্যাসিকের মধ্যে দুর্লভ। একালের উপন্যাসের উন্নততর আঙ্গিকের তুলনায় বঙ্কিমের আঙ্গিক সেকেলে বলে মনে হতে পারে, বঙ্কিমের সংলাপের ভাষার তুলনায় একালের সংলাপের ভাষা হয়তো অধিকতর উজ্জ্বল এবং সাবলীল। (অবশ্য বঙ্কিমের সংলাপ অনেক বেশি চরিত্রানুগ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী)। কিন্তু এ-সব বিচার নিতান্ত বাহ্যিক। কাহিনী, থীম এবং লেখকের বক্তব্যের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য যদি রচনারীতির উৎকর্ষের পরিমাপক হয়, তবে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বঙ্কিমের উপন্যাস অতুলনীয়। বঙ্কিমের প্রকৃত বক্তব্য তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিধৃত, কোনো বিচ্ছিন্ন উক্তি বা বিতর্কমূলক সংলাপের মধ্যে নয়। বঙ্কিমের দার্শনিক বা সামাজিক মতামত এবং তাঁর সাহিত্য-চিন্তা অপেক্ষা তাঁর সাহিত্যের তাৎপর্য মহত্তর এবং মূল্য বৃহত্তর—এই কথাটি মনে রেখে বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করা উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | বঙ্কিম-যুগ ঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস

(আমার তো বিশ্বাস ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা কতখানি আছে তা নিরূপণ করা ঐতিহাসিকের কাজ, সাহিত্য-সমালোচকের কাজ নয়। সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্ত্য দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি আনুগত্যের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। যাঁরা এরূপ জোর দেন তাঁরা একটা কথা ভুলে যান যে ইতিহাস আর উপন্যাসের মধ্যে কিছু স্বাভাবিক বিরোধ আছে। ইতিহাসকার বাস্তব তথ্য আহরণ করে সেগুলিকে একটি কার্য-কারণের সূত্রের মধ্যে সংস্থাপিত করে কোনো বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জ্ঞান-লাভ করতে চান। পক্ষান্তরে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য সম্ভাব্য সত্য, অর্থাৎ কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে তিনি জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিজাত সত্যকে রূপ দিতে চান; এবং তাঁর সত্য নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব উপযোগিতা-সম্পন্ন জ্ঞান নয়। একজনের লক্ষ্য তথ্য এবং বিশ্লেষণ; আর একজনের লক্ষ্য মানস-অভিজ্ঞতা। কাজেই একজন প্রকৃত তথ্যকে সর্বাধিক মূল্য দেন; আর একজনের কাছে তথ্য দারুণ বিঘ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে, তা হয়তো তাঁর মানস-কল্পনাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

আমরা যদি ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্কট-কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেলটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি তা হলে দেখতে পাই নিছক ঐতিহাসিক কালের বাস্তব সত্যকে বিধৃত করা তাঁর লক্ষ্য নয়। যা ঘটেছিল তার সঙ্গে যা ঘটা উচিত ছিল—লেখক অনায়াসে এ দুয়ের মিলন ঘটিয়েছেন। আবার শুধু বাস্তবের সঙ্গে ঔচিত্যবোধের মিলন ঘটিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি; ঘটনা যে ভাবে ঘটলে জীবনের কাছে আমাদের অন্তরের জৈবিক ও মানসিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্তি লাভ

করে তিনি তাও উপেক্ষা করেননি। কাজেই স্কটের উপন্যাসে বাস্তবের সঙ্গে শ্রেয়বোধ এবং প্রেয়বোধের অনায়াস সহাবস্থান ঘটেছে। বাস্তবের সমস্যা-সমূহের যে ধরণের সমাধান ঘটলে আমাদের অন্তর খুশি হয় স্কটের উপন্যাসে আমরা সেই ধরনের সমাধানই দেখতে পাই। কাজেই এই উপন্যাস পড়ার পর পাঠকের মনে জীবন সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বা আপসোস বা অপ্রিয় চিন্তা স্থান পায় না—এর নাম ঐতিহাসিক রোমান্স।

সেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকে আমরা যে মডেলটি দেখতে পাই তা একটু স্বতন্ত্র। বাস্তবের অপ্রিয় সত্য বা জীবনের নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি ইতস্তত করেননি। কিন্তু তাই বলে ঐতিহাসিক কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি ইতিহাসের পাতায় বাস্তব কর্ম-জীবনে মানুষের কর্মাদর্শকে অনুসন্ধান করেছেন। মানুষের যে কর্মাদর্শকে তিনি মনে মনে পোষণ করতেন তা মূলত তিনি তাঁর কালের সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব চিন্তা থেকে লাভ করেছিলেন এবং তা-ই তিনি ঐতিহাসিক কালের উপর প্রক্ষেপ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় স্কট এবং সেকস্‌পীয়র কর্তৃক প্রদর্শিত মডেল ছাড়া ভিন্ন মডেলও সম্ভবপর। কিন্তু মডেল যা-ই হোক এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ঐতিহাসিক কালকে সমকালীন পাঠকের অভিজ্ঞতার সীমায় জীবন্ত করে তোলাই লেখকের কাজ। যদি ঐতিহাসিক কালের মানব মন ও মানব সমাজ বর্তমান কালের মন ও সমাজ থেকে খুব দূরবর্তী হয় তবে তার চিত্র আমরা বুদ্ধি দিয়ে হয়তো বুঝতে পারব, কিন্তু তা আমাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রী হয়ে উঠবে না। আবার যদি ঐতিহাসিক চিত্র বর্তমানের খুব নিকটবর্তী হয় তবে তা ইতিহাসের ভ্রান্তি (illusion) সৃষ্টি করবে না। কাজেই লেখকের কাজ হল ইতিহাসের কালের বাস্তবের সঙ্গে বর্তমানের মানুষের জীবন সম্পর্কে সত্যবোধ ধ্যান-ধারণা আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতির সংযোগ স্থাপন করা। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য লেখক যদি তথ্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটান অথবা তথ্য বিকৃত করেন, তবে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় বলে আমি মনে করি না। যাঁরা এতে আপত্তি করেন তাঁরা অনায়াসে ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে কালক্ষেপ না করে সরাসরি ইতিহাসের বই পড়তে পারেন।

শুধু ইতিহাসের তথ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচিত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৮৪)। এই বিপুলকলেবর বইখানিতে প্রতাপাদিত্যের জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এমন কি এতে সেকালের সমাজ জীবনের অনেক তথ্যও আমরা জানতে পারি। তথাপি ইতিহাস এখানে একটি অখণ্ড শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়নি বলে বইখানি উপন্যাস হিসাবে সার্থক নয়। আবার বঙ্কিম যুগে এমন কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপাদান থাকলেও কোনো বিশেষ কাল ও বিশেষ স্থানের অনুভূতি আমাদের মনে জাগ্রত করে না। রূপকথার কাহিনীর মতোই এ-সব উপন্যাসের কাহিনীগুলি স্থান-কালের সীমারেখার ঊর্ধ্বে স্থাপিত। উদাহরণ হিসাবে বিনোদবিহারী গোস্বামী কর্তৃক কাশ্মীরের রাজপুত্রের সঙ্গে উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের উপাখ্যানকে অবলম্বন করে রচিত 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫), হারানচন্দ্র রাহা কর্তৃক নবদ্বীপ-রাজ কর্তৃক কাছাড় আক্রমণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬), কেদারনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখ করা যায়। এমন কি রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসটিতে টোডরমল্ল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেও এ-কাহিনীকে নাম-ধাম পরিবর্তিত করে দিয়ে ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যে যে কোনো কালে স্থাপন করা যায়। আবার একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উদাহরণ বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি। এককালে আমরা জানতাম যে এ উপন্যাসটি ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক। তারপর যদুনাথ সরকার মশাই প্রমাণ করে দিলেন যে বঙ্কিম এ-বইয়ে একটি ভুল ইতিহাসকে অনুসরণ করেছিলেন। তা বলে কি আমাদের কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এই বইটির মূল্য হ্রাস পেয়েছে ? এ বইটি আমাদের মনে যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান ও কালের অনুভূতি জাগ্রত করে তাকে আমরা অস্বীকার করব কী করে ? সর্বশেষে উল্লেখ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'বেনের মেয়ে'-তে একটিও ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান না পেলেও তা ঐতিহাসিক উপন্যাস, কারণ তা একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান ও কালের ভ্রান্তি সার্থকভাবে উৎপাদন করতে পেরেছে।

কাজেই কোনো একটি বইকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব কিনা তা নির্ভর করে সে বই সমকালীন পাঠকের অভিজ্ঞতায় কোনো ঐতিহাসিক স্থান-কালের ভ্রান্তি জাগায় কি না, এবং তা উপন্যাস হিসাবে সার্থক কি না—এই দুটি শর্তের উপর।

বঙ্কিম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা করতে হলে আমাদের এই যুগটির কথা মনে রাখতে হবে। বিজ্ঞানী বুদ্ধির সাহায্যে নিজেকে কিছুটা পরিমাণে স্থান ও কালের উর্ধ্বে স্থাপন করতে পারেন কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর কালের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে অতীতকে দেখেন, তাঁর কালের পাঠকের অভিজ্ঞতায় ইতিহাসকে সত্য ও জীবন্ত করে তুলতে চান। বঙ্কিম যুগের সামনে সবচেয়ে বড প্রশ্ন ছিল দেশপ্রেম; প্রায় সাত-আট শো বছরের পরাধীনতার ফলে অধঃপতিত জডতাগ্রস্ত একটি জাতির জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার ফিরিয়ে আনা। এ যুগে জাতীয় জীবনে যে গুণগুলির অভাব ছিল, অথচ যে গুণগুলি একটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য—তা হল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান, বীরোচিত আদর্শ এবং কঠিন নৈতিক ভিত্তি। স্বভাবতই এ কালের লেখক ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এই গুণ ও আদর্শ-গুলি অনুসন্ধান করেছেন এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে তা-ই চিত্রিত করেছেন। অবশ্য আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের যে সাহিত্যাদর্শ এ-যুগে গৃহীত হয়েছিল, তার সূত্র অনুযায়ী লেখকগণ কাহিনীর মধ্যে ঘটনার চমৎকারিত্ব এবং নাটকীয়তা, এবং রোমান্সমূলক প্রেমের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। নির্বিকার সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে ঐতিহাসিক কালের বাস্তবকে উপস্থাপিত করার আদর্শ নিয়ে এ যুগের কোনো লেখক লেখনী ধারণ করেননি।

এইখানেই স্কটের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এ যুগের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। স্কট অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন রোমান্টিক অতীতের প্রীতি বশত। মধ্যবিত্ত রুচিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি যদিও বীরোচিত ও নৈতিক আদর্শকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, তথাপি তাঁর কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল দূর থেকে দেখা অতীতকালের বাস্তব। মাটির উপরকার অবিন্যস্ত গাছপালা যেমন পাহাড়ের উপর থেকে সুশৃঙ্খল ও শ্রেণীবদ্ধ বলে মনে হয়, তেমনি বর্তমানের দূরত্ব থেকে অতীতকে দেখতে গেলে তার চারপাশে স্বাভাবিক ভাবেই একটি মহিমার বলয় চোখে পড়ে। এই আরোপিত মহিমাটুকু সমেত অতীতের বাস্তবকে তুলে ধরাই স্কটের উদ্দেশ্য ছিল। এবং স্কট জানতেন যে-অতীতে ফিরে যাওয়া চায় না, অথচ আমাদের মনের কল্পনার কাছে যে-অতীত অত্যন্ত প্রিয়, পাঠক সেই অতীতকে ভালবাসে। কাজেই পাঠককে আনন্দ দান করা ছাডা আর কোনো সচেতন উদ্দেশ্য স্কটের সামনে ছিল না। পক্ষান্তরে বঙ্কিম যুগের লেখকরা ছিলেন স্পষ্টতই উদ্দেশ্যবাদী। অতীতকে ফিরিয়ে আনা

যায় না তা তাঁরাও জানতেন ; কিন্তু তাঁরা বর্তমানের ভাবাদর্শকেই অতীতের উপর প্রক্ষেপ করেছেন এবং আশা করেছেন এই প্রয়াস ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত হতে সাহায্য করবে।

স্কটের উপন্যাসে মধ্যযুগীয় স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য শিভ্যালরির চিত্র, নরম্যান্ প্রভুত্বাধীন ইংলণ্ডের চিত্র বা রাজতন্ত্রের যুগের ফরাসী দেশের চিত্র বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু স্কট যদিও বঙ্কিম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্সের মডেল ছিলেন, তবু এ যুগের ঐতিহাসিক রোমান্সে ঐতিহাসিক বাস্তবতার বড় অভাব। আমাদের দেশের ইতিহাসজ্ঞানের অভাব এ জন্য খানিকটা দায়ী, এ কথা স্বীকার করেও বলব যে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বাস্তবতার চিত্রায়ণ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তার ফলে এ যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে একটি সহজ ফর্মুলার রূপায়ণ আবিষ্কার করা যায় : বীরোচিত আদর্শে অনুপ্রাণিত নায়ক, প্রেমপূর্ণ সতী-সাবিত্রীর আদর্শ-পুষ্ট নায়িকা, কুচক্রীর বিশ্বাসঘাতকতা, এবং মহৎ প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, এই ফর্মুলাটি এতই সাধারণ যে অতীতের প্রায় যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়। এর সঙ্গে অবশ্য আনুষঙ্গিক রোমান্সের উপকরণ—যথা নিরুদ্দিষ্টের পুনঃপ্রাপ্তি, হঠাৎ অর্থলাভ বা রাজ্যলাভ, পথের ছেলের রাজপুত্র বলে প্রমাণিত হওয়া, কাব্যোচিত পরিবেশে, প্রথম দর্শনেই প্রেম প্রভৃতি যে জড়িত থাকবে তা বলাই বাহুল্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক কাহিনীতে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের কন্যা রোশেনারার অসার্থক প্রণয় কাহিনী এই বইয়ের আখ্যান-বস্তু। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এই নতুন রীতি সার্থকতার বন্দরে পৌঁছয় এবং পরবর্তীকালে এই রীতি অনুযায়ী বহু গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করে।

নানা কারণে এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসে সার্থকতার পরিমাণ খুব বেশি না থাকলেও অন্তত তিনজন লেখক আধুনিক পাঠকদের কাছেও নিঃসন্দেহে সমাদর লাভ করবেন : বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্র।

কিন্তু এঁদের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে প্রথমেই দু-একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। কেউ কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক রোমান্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিরূপণ করার পক্ষপাতী। আমার মনে হয় অন্তত উনিশ শতকীয় উপন্যাসের আলোচনায় এ পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা অনাবশ্যক। উনিশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যে জর্জ এলিয়টের পূর্ব পর্যন্ত ঠিক ঠিক আধুনিকধর্মী

উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেনি। ডিকেন্স ও থ্যাকারে-কে আমরা বাস্তববাদী বলে গণ্য করি বটে, কিন্তু তাঁদের উপন্যাসেও আকস্মিকতার প্রাধান্য এবং পূর্বে উল্লিখিত রোমান্সের অন্যান্য অনুষঙ্গের অভাব সেই। স্বভাবতই বঙ্কিম যুগের বাংলা উপন্যাসেও রোমান্সমূলক উপাদানের ছড়াছড়ি। এমন কি বঙ্কিমের বাস্তবধর্মী উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও এ-সবের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রোমান্সের স্কট-প্রদর্শিত মডেলের সঙ্গে বঙ্কিম যুগীয় মডেলের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। স্কটের উপন্যাসের বৃহৎ কলেবরের মধ্যে প্রধান নাটকীয় দৃশ্যগুলির খুঁটিনাটির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে একটি অবলুপ্ত যুগের জীবনযাত্রার এক পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা পাঠক লাভ করেন, বাংলাদেশের স্বল্পায়তন উপন্যাসের মধ্যে বাঙালী লেখকরা তা সরবরাহ করতে পারেননি। স্কটের উপন্যাসে বিশিষ্ট অভিজাত শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার পাশে কিছু কিছু সাধারণ শ্রেণীর মানুষের চরিত্র-লিপি পাওয়া যায়। বাংলা উপন্যাসে সাধারণ মানুষ প্রায় উপেক্ষিত। তৃতীয়ত, স্কটের উপন্যাস পড়ে যে মনোভাব জন্মে তাকে খুব সহজে ব্রাউনিং রচিত দুটি পঙ্‌ক্তির সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় :

God's in his heaven,
All's right with the world.

স্কট শুধু জীবনের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেই সন্তুষ্ট নন, জীবনে যে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার (poetic justice) প্রতিষ্ঠিত এ কথা প্রতিপন্ন না করে তিনি তাঁর কাহিনী শেষ করেন না। প্রত্যেক চরিত্র অবশ্যই তার কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সৎ মানুষের ন্যায়সঙ্গত কামনা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তার পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা শেষ পর্যন্ত কর্পূরের মতো উবে যাবে। কাজেই স্কটের উপন্যাসের পরিসমাপ্তি মিলনান্ত। পক্ষান্তরে বাংলা দেশের অনেক ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে করুণ রসের প্রাচুর্য ; poetic justice মাত্র সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্যকরী। মহৎ আবেগ আর মহত্ত্বের জন্যই নায়ক বিয়োগান্ত পরিণতির সম্মুখীন হয়—এই থীম বাঙালী মানসের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এখানে আমরা বুঝতে পারি বঙ্কিম যুগের উপর স্কট ব্যতীত সেকস্‌পীয়র ও অষ্টাদশ শতকীয় commonsense-এর প্রতি আনুগত্য প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালীর করুণরস-প্রীতি অনেকটা ঐতিহাসিক কারণেও প্রাধান্য লাভ করেছে। আমাদের অতীত ইতিহাসে গৌরবের পরিচয় থাকলেও তা প্রায় একটানা পরাজয়ের ইতিহাস। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে করুণরসই

প্রধান ; শাক্ত পদাবলী আরও অগ্রসর হয়ে দুঃখবাদকে আশ্রয় করেছে। বঙ্কিম যুগেও আমরা অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার স্বাদ পাইনি। কাজেই করুণরসের প্রাচুর্য স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিয়েছে।)

বঙ্কিমচন্দ্র

(যে-কারণে সেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ্, জুলিয়াস সীজার, আণ্টনি অ্যাণ্ড্ ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি নাটককে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, ঠিক সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উপন্যাসকেই সঠিকভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস (বা রোমান্স) বলে গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ। সেকস্‌পীয়রের উক্ত নাটকগুলি ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এগুলিতে তিনি মানবপ্রকৃতির এবং মানবিক মূল্যবোধের এত গভীরে দৃষ্টিপাত করেছেন যে এগুলিকে আর নিছক ঐতিহাসিক বাস্তবের বাহক বলে গণ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে বঙ্কিম তাঁর কোনো উপন্যাসেই নিছক ঐতিহাসিক কালের বাস্তবতার রূপায়ণের মধ্যে নিজের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। প্রায় প্রতিটি প্রধান বইতেই তিনি মানুষের মৌল প্রকৃতির অনুসন্ধানে এবং ব্যক্তি মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি কোনো বিশেষ কালের চরিত্র এবং সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত না থেকে চিরকালের মানুষ আর তার সমস্যার গভীরে অবতরণ করেছে।

অবশ্য তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ব্যতিক্রম। এটিকে একটি ঐতিহাসিক রোমান্স বলে গণ্য করায় আপত্তির কোনো কারণ নেই। 'কপালকুণ্ডলা'র ঐতিহাসিক অংশ অতি সামান্য ; কপালকুণ্ডলা কোনো বিশেষ কালের কন্যা নয়, তার সমস্যা কোনো বিশেষ কালের সমস্যা নয়। 'মৃণালিনী'তে লেখক হেমচন্দ্রের দেশরক্ষার সংকল্প আর প্রেমকে পরস্পরের বিপরীত হিসাবে স্থাপন করে ঐতিহাসিক চিন্তার বাইরে ব্যক্তি চিন্তাকে স্থান দিয়েছেন। 'চন্দ্রশেখরে' ঐতিহাসিক বাস্তবের চিত্র মোটেই উপেক্ষণীয় নয় ; কিন্তু বইয়ের প্রধান উপজীব্য চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ প্রসঙ্গ মোটেই কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কালের সমস্যা নয়। এই প্রসঙ্গের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর নিজের মনের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন। 'আনন্দমঠে'র ঐতিহাসিক ভিত্তি এতই দুর্বল যে তা উল্লেখ না করাই ভালো। যে-কালে দেশপ্রেমের আদৌ জন্ম হয়নি, সে-কালের পটভূমিকায় তিনি একটি দেশপ্রেমাত্মক কাহিনীকে প্রক্ষেপ করেছেন। এ কাহিনীতেও

দেশপ্রেমকে অতিক্রম করে ব্যক্তির জীবন-জিজ্ঞাসা প্রধান হয়ে উঠেছে। 'দেবী চৌধুরানী' সম্পর্কেও কম বেশি একই কথা প্রযোজ্য। 'সীতারামে'র নাম ভূমিকায় একটি ঐতিহাসিক চরিত্র আছে বটে কিন্তু এ-বইতে মানব চরিত্রের রহস্য সন্ধানই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য।

অবশিষ্ট রইল একমাত্র 'রাজসিংহ'। বইখানিতে ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের বাস্তবতা অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে, এবং প্রায় সকল সমালোচকই এটিকে বঙ্কিমের একমাত্র সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবু এ বইটিকে নিছক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। রাজসিংহ চরিত্রটিতে বঙ্কিম ঐতিহাসিকতাকে অতিক্রম করে নিজের কল্পনার আদর্শ পুরুষকে চিত্রিত করেছেন। রাজসিংহ নিষ্কাম কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত পুরুষ। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা নেই, কোনো জাগতিক উচ্চাশা নেই। তিনি শক্তিশালী; কিন্তু শিবাজীর মতো হিন্দু রাজ্য স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেন না। তিনি মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন শুধু আশ্রিতাকে রক্ষা করার রাজ-কর্তব্য হিসাবে। নিজের কোনো কামনা না থাকলেও শুধু চঞ্চলকুমারীকে সুখী করার জন্য তাকে বিবাহ করতে রাজী হন। এক কথায়, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বে ব্যাখ্যাত আদর্শ পুরুষ রাজসিংহ। কাজেই এ বইখানিও ঠিক ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবি পূরণ করে না।

সব বইতেই বঙ্কিমের লক্ষ্য মানুষ, ঐতিহাসিক মানুষ নয়। যে জীবন-জিজ্ঞাসা ও আত্মিক প্রশ্নে তাঁর নিজের মন ভারাক্রান্ত ছিল, ঐতিহাসিক কালের চিত্রে তিনি তারই উত্তর খুঁজেছেন। কাজেই তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন; নিজে ঐতিহাসিক উপন্যাসকার ছিলেন না।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিম যুগের সার্থকতম প্রতিনিধি বোধ করি রমেশচন্দ্র। স্বয়ং বঙ্কিমকে এই মর্যাদা দেওয়া যায় না; কারণ তিনি যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা। এ যুগের সমস্ত বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হলেও তাঁর শিল্প-দৃষ্টি যুগের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। পক্ষান্তরে রমেশচন্দ্রের মধ্যে যুগের চিন্তা ও যুগের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাধিক প্রকাশ লাভ করেছে।

রমেশচন্দ্রের শিল্পীমানসের সঙ্গে রোমান্সের খুব সহজ অন্তরঙ্গতা ছিল। সেই জন্যই তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কষ্ট-কল্পনা এবং কৃত্রিমতার আভাস খুব কম।

একটি সংযত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাঁর রোমান্সমূলক প্রেমচিত্র এবং দেশ-প্রেমাত্মক চিত্রকে বিধৃত করে রয়েছে। তিনি তাঁর যুগের ভাবাদর্শকে ঐতিহাসিক কালের উপর প্রক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু এমন জায়গায় করেছেন যেখানে কোনো বিরোধের সম্ভাবনা না ঘটে। দেশপ্রেমের চিত্র উপস্থিত করার জন্য তিনি শিবাজী ও প্রতাপ সিংহের কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন; এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে একমাত্র শিবাজী ও প্রতাপের কর্মাদর্শের মধ্যেই আধুনিক যুগের দেশপ্রেমের আদর্শের নিকটতম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় ঐতিহাসিক কালের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর একটি সহজ অথচ অভ্রান্ত অনুভূতি ছিল। এ যুগের অন্যান্য লেখকের মতো তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবের ব্যাপক চিত্র দিতে চেষ্টা করেননি। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য ও কাল্পনিক চিত্রকে একটি সুসংহত কাহিনীর মধ্যে সংগঠিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র মধ্যে অবশ্য অপটু হস্তের নিদর্শন রয়েছে। কাহিনীটি বিশেষত্ববর্জিত গতানুগতিক রোমান্সের কাহিনী। মহাশ্বেতার স্বামী সমরসিংহ সতীশচন্দ্র নামক জনৈক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির প্রতারণায় রাজ দরবারে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছিলেন ও জমিদারীচ্যুত হয়েছিলেন। বিধবা মহাশ্বেতা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সমর সিংহের অনুগৃহীত জমিদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আদর্শবাদী পুরুষ। সে ইন্দ্রনাথের ছদ্মনাম গ্রহণ করে মহাশ্বেতাকে খুঁজে বার করে, এবং তাঁর কন্যা সরলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে টোডরমল্লের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁর প্রীতিভাজন হয় এবং সতীশচন্দ্র ও তার মন্ত্রণাদাতা শকুনির শাস্তিবিধান করে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সরলার মিলন ঘটে এবং সরলা পৈত্রিক জমিদারী ফিরে পায়। সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা আদর্শনিষ্ঠ; ইন্দ্রনাথের প্রতি তার অপ্রকাশিত আকর্ষণ 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাশ্বেতার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পও 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার স্বামী-হন্তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ়তার অনুরূপ।

বইখানির প্রধান দুর্বলতা এই যে জীবনভিত্তিক চরিত্র রচনার কোনো চেষ্টা করেননি লেখক। বিভিন্ন চরিত্র রোমান্সের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মনোবৃত্তির বাহক-মাত্র। কেউ-বা বীরোচিত প্রতিহিংসাকামী, কেউ-বা প্রতারক কিন্তু অনুতপ্ত, কেউ-বা দেহধারী শয়তান, তরুণী নারী চরিত্র দুটি সতী-সাবিত্রীর

আদর্শপুষ্ট পুতুল মাত্র। এক কথায় লেখক পাঠককে শুধু রোমান্সই উপহার দিতে চেয়েছেন, আর কিছু নয়।

তুলনায় পরবর্তী বই 'মাধবীকঙ্কনে' রমেশচন্দ্রের শিল্পীসত্তার বিস্ময়কর অগ্রগতি চোখে পড়ে। তিনি এ বইতে একটি অভিনব শিল্পকৌশল অবলম্বন করেছেন। একটি কাল্পনিক চরিত্রের চোখ দিয়ে তিনি কয়েকটি প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। একজন বহিরাগতের বিস্ময়বিমূঢ় চোখ দিয়ে দেখা অপূর্ব বীরত্বের, বা অত্যুজ্জ্বল ভোগবিলাসিতার, বা ক্রুর স্বেচ্ছাচারিতার এই সব ঐতিহাসিক চিত্রগুলি স্বাভাবিক কারণেই সত্যের গভীরে পদার্পণের দাবি করতে পারে না। তথাপি এ দেখার সঙ্গে আমরা যে ভাবে দীর্ঘ সময়ের দূরত্ব থেকে ইতিহাসকে এক দুস্তর রহস্যলোক হিসাবে দেখি তার যথেষ্ট মিল আছে। সেই কারণেই বইয়ের নায়ক নরেন্দ্রনাথ যখন অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে একটি ঐতিহাসিক দৃশ্য থেকে আর একটি দৃশ্যের দিকে যাত্রা করছে তখন পাঠক অনায়াসে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারেন এবং তার সহগামী হতে পারেন।

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হলে পিতৃবন্ধু নবকুমার তার পিতার সম্পত্তি গ্রাস করে তাকে গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই সময় নবকুমারের একমাত্র কন্যা হেমলতার সঙ্গে তার বাল্যপ্রণয় ঘটে। নবকুমার কিন্তু তাঁর দুষ্কর্মের এই মূর্তিমান সাক্ষীকে চোখের সামনে রাখতে অনিচ্ছুক বোধ করে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন এবং শ্রীশচন্দ্র নামক এক পালিত পুত্রের সঙ্গে হেমলতার বিয়ে দিলেন। হৃত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক অস্পষ্ট সংকল্প নিয়ে ব্যর্থ প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে যুদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হল, এবং এক জটিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সামান্য অংশীদার হিসাবে দিল্লী থেকে মেবার পর্যন্ত এক বিপুল অঞ্চলের রাজনৈতিক আলোড়নের সাক্ষী হল। সেই সময় ঔরঙ্গজীব ভাইদের একে একে পরাজিত করে সিংহাসন দখলের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যশোবন্ত সিংহের অধীনে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয় এবং বন্দী অবস্থায় মোগল হারেমে নীত হয়। সেখানে সে জুলেখার প্রণয়ভাগী হয়। জুলেখা আয়েষার উত্তরপুরুষ, এবং উত্তরপুরুষ বলেই তার উচ্চ আদর্শবাদের বাহক নয়। নরেন্দ্রনাথকে পাওয়ার জন্য সে বালকবেশে তার অনুসরণ করে। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও হেমলতার চিন্তায় মগ্ন নরেন্দ্রনাথের হৃদয় জয় করতে সক্ষম না হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে। কাহিনীর শেষে হেমলতা

নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি বড় করুণ। অপরের গৃহলক্ষ্মী হেমলতা নরেন্দ্রের প্রতি আসক্তিকে অপরাধ বলে মনে করে, কিন্তু তাকে ভুলে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদত্ত উপহার শুকিয়ে-যাওয়া মাধবীকঙ্কনটিকে সে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিল। বঙ্কিমের শৈবলিনী বিদ্রোহিনী; কিন্তু হেমলতা সাধারণ বাঙালী ঘরের বধূ, বিদ্রোহ করার ক্ষমতা তার নেই।

বইখানির গুণ এই যে এর মধ্যে কাল্পনিক ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা খুব সঙ্গতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এবং জড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ দুয়ের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান ঘোচেনি। সাধারণ মানুষের মনোজীবনের উপরে বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব যে কত সামান্য লেখক তা দেখিয়েছেন। রোমান্সের কৃত্রিম চাকচিক্য ও কৃত্রিম আদর্শের জালে লেখক কাহিনীর স্বাভাবিক মানবিক আবেদনকে সঙ্কুচিত করে ফেলেননি। নবকুমার, হেমলতা, জুলেখা—সবাই জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

এই বইতেই রমেশচন্দ্র তাঁর শিল্পীমানসের নিজস্ব ভূমিকাটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। নিজে একাত্ম বোধ করতে পারেন এমন একটি চরিত্রের সঙ্গে কোনো ইতিহাসের গহন অরণ্যে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সহজতর; তার ফলে তাঁর ইতিহাস-দর্শন আংশিক হলেও সত্য ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তী দুখানি বইতে—মহারাষ্ট্রের 'জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-তে—তিনি যুগন্ধর ঐতিহাসিক পুরুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। এই বিরাট পুরুষদের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে রমেশচন্দ্র কোনো অসুবিধা বোধ করেননি আদর্শগত অভিন্নতার জন্য। প্রথম বইটিতে শিবাজীর সঙ্গে লেখক তাঁর কর্ম-জীবনকে অনুসরণ করেছেন এবং শিবাজীর চোখ দিয়ে ঐতিহাসিক কালকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য শঠে শাঠ্যং-এর নীতি অবিধেয় নয় শিবাজীর এই নীতির সঙ্গে লেখকের আদর্শবাদের কোনো ব্যবধান নেই। তেমনি পরের বইতে একইভাবে তিনি প্রতাপকে অনুসরণ করেছেন, প্রতাপের সঙ্গে তাঁর স্বাধীনতার জন্য অসীম কষ্টবরণের ভাবাদর্শকে লেখক আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই একাত্মতার জন্যই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের চরিত্র চিত্রণেও লেখক একটি সহজ অন্তরঙ্গতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। পাঠক শিবাজী এবং প্রতাপকে আপনার জন বলে ভাবতে কোনো অসুবিধা বোধ করেন না।

এইখানেই বঙ্কিমের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পার্থক্য, বঙ্কিম বিচারকের উচ্চ ভূমি থেকে তার সৃষ্ট চরিত্রদের পর্যবেক্ষণ করেন ; রমেশচন্দ্র সহানুভূতির সমভূমি থেকে তাঁর কল্পিত জগৎকে দেখেন। বঙ্কিম অবশ্য মানব প্রকৃতির অনেক দূরবর্তী কোণগুলি পর্যন্ত তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভার সন্ধানী আলোয় আলোকিত করতে পারেন, রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি অতদূর অবধি পৌঁছায় না ; কিন্তু যত দূর অবধি পৌঁছায় ততটুকুকে তিনি একেবারে আপনার করে নিতে পারেন। বঙ্কিমের মনোভাব বিচারকের ; রমেশচন্দ্রের মনোভাব ভক্তের, অন্তত শেষ দুখানি বইতে।

'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'-তে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছে ; লেখক শুধু এই ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে মানবিক আবেগ অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংযোজন করেছেন মাত্র। 'জীবন-প্রভাত' উপন্যাসে শিবাজীর ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধির কাহিনী এমনি কৌতূহলোদ্দীপক যে তা একটি দুঃসাহসিক কাহিনীর আমেজ সৃষ্টি করেছে। 'জীবন-সন্ধ্যা'তে কৌতূহলের অবকাশ কম ; কিন্তু সে অভাবের ক্ষতিপূরণ করেছে অফুরন্ত করুণরস। বীরের অপরিসীম দুঃখবরণের জন্য অশ্রুমোচন করতে কার না ভালো লাগে ! 'জীবন-প্রভাত' যেমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিবাজীময় ; 'জীবন-সন্ধ্যা' তেমনি প্রতাপময়। অন্যান্য যে সব চরিত্র দেখা দিয়েছে তারা সবাই নায়ক-চরিত্রের ছায়া মাত্র। লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে বিরুদ্ধ পক্ষকে অস্পষ্টতার কুহেলিকার আড়ালে রেখে দিয়েছেন, তাদের বিস্তারিত চিত্র দিতে গিয়ে পাঠকের মনোযোগকে স্থানান্তরিত করেননি। এই ভাবে তিনি যে কাহিনীর ঐক্য সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। রমেশচন্দ্রের ভাষা সহজ এবং সাবলীল ; অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত, অথচ ঐতিহাসিক আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ দুখানি বইতে লেখক ঐতিহাসিক দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে নিজে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। তার ফলে ঐতিহাসিক আবেগ ব্যক্তিগত আবেগের অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনচিত্রের অভাব আমাদের পীড়িত করে না। লেখক 'জীবন-প্রভাতে' রঘুনাথ ও সরযূবালার মধ্যে, এবং 'জীবন-সন্ধ্যা'তে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর মধ্যে রোমান্সসুলভ প্রেমচিত্র উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই দুটি রোমান্স কাহিনী মোটেই গুরুত্ব লাভ করেনি। পাঠকের মন ঐতিহাসিক

আবেগের জোয়ারে রুদ্ধশ্বাসে ভেসে চলে, এজন্য কোনো আপসোস বোধ করে না। বস্তুত, বই দুখানিতে রোমান্সের কোনো কৃত্রিম উপাদান প্রায় অনুপস্থিত।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঞ্জীবচন্দ্রকে উপন্যাস রচনায় সার্থকতার বন্দরে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। মনে হয় যেন নিজের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ এবং তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ না করে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য খানিকটা স্থান রেখেছেন। এই খেয়ালিপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি উপন্যাসের মাঝে মাঝে কাহিনীকে দাঁড করিয়ে রেখে নানা অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পোশাকে ও প্রসাধনে লাল ও সাদা রঙের প্রাদুর্ভাব কেন ঘটেছে, গোঁফ-দাড়ি না রাখার সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য, বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের সম্পর্ক নির্ণয়, চিত্র ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি নানা প্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে ভরাট করেছেন। এই খেয়ালিপনার দিক থেকে আঠারো শতকের ইংরেজ লেখক জোনাথান স্টার্ণ (Jonathan Sterne)-এর সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে। কিন্তু উপন্যাসের বঙ্কিম যুগীয় প্যাটার্নের মধ্যে এই অপ্রাসঙ্গিকতা বডই বেমানান।

মোটামুটিভাবে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিম যুগের সামাজিক নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'কণ্ঠমালা' বইতে তিনি পাপ-পুণ্যের গুরুত্ব অনুসারে রোমান্সের রীতি অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কারের আয়োজন করতেও কুণ্ঠিত হননি। তথাপি তাঁর উপন্যাসে এক ধরনের মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ দেখে অনুমান না করে পারা যায় না যে যুগ চিন্তার বিরুদ্ধে কোথায় যেন তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের মনোভাব লুক্কায়িত ছিল। এই বিদ্রোহের কোনো স্পষ্ট রূপ বা উপকরণ না থাকায় তা ভাষায় প্রকাশ লাভ করে নি। পিতম পাগলার উক্তিগুলির মধ্যে একটি তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, স্বীকৃত সত্য ও বিশ্বাসগুলিকে সে অদ্ভুত কল্পনার সাহায্যে বিকৃতভাবে উপস্থিত করতে পারে। 'কণ্ঠমালা'য় উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক এই অদ্ভুত চরিত্রটির উপস্থাপনা আমাদের সন্দেহকে দৃঢ় করে।

অথচ কাহিনীবিন্যাসে ও বাস্তবধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রের যে দুর্লভ

ক্ষমতা ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর দুখানি বই 'মাধবীলতা' ও 'কণ্ঠমালা'তে বিষয়বস্তু ও সাংগঠনিক বৈচিত্র্য লেখকের শক্তির পরিচয় দেয়। 'মাধবীলতা'য় স্বাধীন নৃপতি ইন্দ্রভূপের কাহিনীর মধ্যে কোন্ ঐতিহাসিক কালের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে বলা খুব মুশকিল। রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা; একমাত্র প্রজাবৃন্দের নৈতিক সমর্থন ছাড়া আর কোনো সাহায্যের প্রত্যাশা করেন না; তাঁর আশেপাশে যে কোনো প্রবল বৈদেশিক শক্তির অস্তিত্ব আছে তা-ও আমরা অনুভব করি না। বইখানিকে একটি ঐতিহাসিক ফ্যাণ্টাসি বলে মনে হয়। এই কাহিনীরই ধারাবাহিক সূত্রে পরবর্তী পুরুষের জীবনযাত্রা নিয়ে 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসটি পরিকল্পিত হয়েছে। অথচ এই বইয়ে এক ভিন্ন সামাজিক জীবন যা ইংরাজ প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে তারই বিবরণ দিয়েছেন লেখক। ধারাবাহিক কাহিনী হিসাবে দুখানি বইয়ে যে অসঙ্গতি চোখে পড়ে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে লাভ নেই। খেয়ালী লেখকের এও এক ধরনের খেয়াল বলে গণ্য করা ভালো। 'কণ্ঠমালা' বইয়ের কাহিনীবিন্যাসও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। 'মাধবীলতা'র কাহিনীতে যে স্বাভাবিকতা আছে, এ বইয়ে তা অনুপস্থিত। শম্ভু কয়েদী এক অসম্ভব চরিত্র; সে ইংরেজ রাজত্বের এক প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন ব্যবস্থা রচনা করেছে। ভূগর্ভ গৃহ, জেলখানা থেকে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা, প্রভৃতি আশ্চর্য ব্যাপার শম্ভু কয়েদীর কীর্তি। রহস্য ভেদ করে সে অনায়াসে পাপীদের শাস্তি বিধান করে। অথচ ঐতিহাসিক বিচারে অসঙ্গত এই কাহিনীটি লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করেছেন। আসলে ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিত্তিতে শম্ভু কয়েদীকে বিচার করা চলে না; সে এক খেয়ালী দার্শনিক ভাবাপন্ন লেখকের খেয়ালী সৃষ্টি।

সামাজিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো সামাজিক উপন্যাস রচনারও সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাসের ভিতর দিয়ে।
বঙ্কিম যুগের সামাজিক উপন্যাস অনেকখানি পরিমাণে এ-দেশের সমাজ বাস্তবের নিজস্ব সৃষ্টি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন স্কটকে মডেল হিসাবে দেখতে পাই, সামাজিক উপন্যাসের বেলায় তেমন কোনো মডেলের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ফীল্ডিং, জেন অস্টেন, ডিকেন্‌স্ প্রভৃতি বাস্তবধর্মী লেখকদের সঙ্গে বঙ্কিম যুগের বাঙালী লেখকরা নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন; কিন্তু ও-দেশের সমাজ

বাস্তবের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজের দুস্তর ব্যবধান বশত আমাদের দেশের লেখক একটি নিজস্ব পাটার্ন উদ্ভাবন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বঙ্কিম রচিত সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে রোমান্সের যোগ খুব স্পষ্ট। নগেন্দ্র কর্তৃক কুন্দকে আশ্রয়দান, রোহিণীর উইলচুরি প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে রোমান্স-সুলভ কল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তথাপি বঙ্কিম বাস্তবকে যত গভীরভাবে দেখেছিলেন এত গভীরভাবে এ যুগের আর কোনো লেখক দেখেননি। আবেগের তীব্রতম দ্বন্দ্ব, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু সেই কারণেই মানুষের মৌল প্রকৃতি যে পরিমাণে বঙ্কিমের শিল্পী-দৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে সে পরিমাণে আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটির বিশেষত্ব ধরা পড়েনি।

ব্যবহারিক জীবনের এই বহিরঙ্গের বাস্তবতা এ-যুগের বঙ্কিম ব্যতীত অন্যান্য লেখকদের সামাজিক উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করল। সাধারণ বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এ জাতীয় উপন্যাস রচনায় লেখকদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল; এবং এ দুটি গুণকে তাঁরা অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে লাভ করলেন। রেনেশাঁসসুলভ রোমান্টিক কল্পনা ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে সুযোগ ছিল না। 'বিষবৃক্ষ' রচনা করেই বঙ্কিমকে যথেষ্ট প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; কাজেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিত্বের লেখকদের আরও সাবধানে সামাজিক উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিতে হয়েছিল। সামাজিক উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়ার অসুবিধা ছিল বলেই সেখানে ভাবাবেগের বা আবেগের দ্বন্দ্বের তীব্রতার অভাব আমরা অনুভব করি। তার ফলে বিদ্রূপ, পরিহাস মানুষের ব্যবহারিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যঙ্গ বা সহজ আনন্দজনিত রঙ্গরস এ যুগের সামাজিক উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হয়েছে। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের ট্রাজেডি আর কমেডির মধ্যে যে তফাৎ, বঙ্কিম যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে অনেকটা সেই তফাৎ দৃষ্ট হয়। অবশ্য এলিজাবেথীয় কমেডিতে যে হাল্‌কা রসের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের অবাধ চিত্রায়ন দেখা যায় এ যুগের সামাজিক উপন্যাসে স্বাভাবিক কারণেই তা অনুপস্থিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন এ যুগের ভাবাদর্শকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সামাজিক উপন্যাসে তেমনি সমাজ-সংস্কারমূলক চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরার' মতো নিছক হাল্‌কা ধরনের রস সরবরাহ করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায় না। হাল্‌কা রসের পিছনে প্রায় সর্বত্রই লেখকের উদ্দেশ্যবাদী প্রবণতা উঁকিঝুঁকি মেরেছে। যৌথ পরিবারের সমস্যা, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক প্রসঙ্গগুলি ঔপন্যাসিকদের বাস্তবধর্মী কল্পনাকে আলোড়িত করেছে। কিন্তু শুধু উদ্দেশ্যবাদই যে লেখকদের সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণে প্ররোচিত করেছে এ কথা মনে করা ভুল। আমাদের দেশের সমাজ-জীবনের আভ্যন্তরীণ নিস্তরঙ্গতার মধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, তা সমাজ-জীবনে সেই সংঘাত সৃষ্টি করেছে যা সাহিত্য-রচনার পক্ষে অপরিহার্য। ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি. সুদীর্ঘ ঐসলামিক শাসনের যুগে হিন্দু-সমাজের উপর বাইরে থেকে যত বেশি আঘাত এসে পড়েছে তত বেশি এই সমাজ ঋজু অনমনীয় রীতি-নীতির বেড়াজাল রচনা করে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সম্ভাবনা রোধ করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। সমাজের উপজীব্য সংস্কার সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এইটিকেই একমাত্র উপায় বলে গণ্য করা হয়েছিল। নিছক আত্মরক্ষার তাগিদ যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, মানুষ তখন আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়ে,—এইটেই বোধ করি স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, বা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব না থাকলে সাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে উপন্যাস রচনার পথ প্রস্তুত করেছিল।

কঠোর সামাজিক অনুশাসন দেশের নারীসমাজকে অসীম নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা, প্রভৃতির কোনো মূল্য এ সমাজে স্বীকৃত হয়নি। তাদেরও সুখী হওয়ার অধিকার আছে পুরুষ-প্রধান সমাজ এ-কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছিল। কাজেই নারীর মর্মবেদনা এ যুগের সাহিত্যিকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, এবং করুণরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করেছে।

বঙ্কিম যুগের সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) বইখানি উল্লেখযোগ্য। Manners-মূলক চরিত্র সৃষ্টিতে, অর্থাৎ কোনো একটি ব্যবহারিক লক্ষণ দ্বারা চরিত্রকে চিহ্নিত করার কৌশলে তারকনাথ উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বইখানি যে এককালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এবং 'গডাডর টণ্ডর', 'ভুঢও খাব

টামাকও খাব' প্রভৃতি কথা যে এক কালে চলতি সামাজিক কথোপকথনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গত কারণ আছে। প্রধানত, গদাধর আর নীলকমল নামক দুটি উৎকেন্দ্রিক চরিত্রকে নিয়েই এ বইয়ের রঙ্গরস জমে উঠেছে। গদাধরের মধ্যে যথেষ্ট দুষ্টবুদ্ধি আছে; নীলকমল প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সে নিরীহ। নীলকমলের পথিকবৃত্তির মধ্যে বাঙালী মানসের গভীরে যে বাউল-মনোবৃত্তি আছে তার প্রকাশ ঘটেছে।

এই সহজ অনাবিল স্থূলবর্জিত হাস্যরসের পাশাপাশি যৌথ পারিবারিক সমস্যার চিত্রায়ন গভীর রসের সৃষ্টি করেছে। কত তুচ্ছ কারণে যে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে শশিভূষণ আর বিধুভূষণের দ্বন্দ্বের মধ্যে লেখক তা পরিস্ফুট করেছেন। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পিছনে স্ত্রীদের ভূমিকাও লেখক অনাবৃত করেছেন কুটিলমতি প্রমদা ও সরলমতি সরলার চরিত্রদ্বয়ের ভিতর দিয়ে। গোপাল আর স্বর্ণলতার প্রেম ও বিবাহ এ-বইয়ে নিতান্ত গুরুত্বহীন ঘটনা। একটি অবধারিত ট্রাজেডিকে লেখক এই রোমান্টিক বিবাহ সংগঠনের দ্বারা এবং দৈব উপায়ে পাপীদের শাস্তিবিধান করে সুখকর পরিসমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই লেখকের উপর রোমান্সমূলক মনোভাবের প্রভাব। বাংলা উপন্যাসের উপর রোমান্সের প্রভাব আমরা দীর্ঘকাল পরেও দেখতে পাব।

বলা বাহুল্য সমাজের বহিরঙ্গের পরিচয়দানই এই উপন্যাসের লক্ষ্য; সেই জন্য চরিত্রগুলি সরলরেখাত্মক। বঙ্কিমের মতো জীবন রহস্যের গভীরে দৃষ্টিক্ষেপের চেষ্টা লেখকের পরিকল্পনায় ছিল না। এবং সেইজন্য কাহিনীটির মিলনান্ত পরিসমাপ্তি শিল্পসঙ্গত হয়েছে; ট্রাজেডির গভীর রস বহন করার শক্তি এ কাহিনীতে নেই। তবে নীলকমলের জীবন, শশিভূষণ-বিধুভূষণের দ্বন্দ্ব এবং স্বর্ণলতার বিবাহ—তিনটি শিথিলভাবে সংগ্রথিত বিভিন্ন থীম। তা একালের উপন্যাসের সাংগঠনিক দুর্বলতার স্বাক্ষর বহন করছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর শেষ জীবনে দুখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন—'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩)। 'সংসারে' নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের খুঁটিনাটি বাস্তবের নিখুঁত বিবরণ শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যেও যে নাটকীয়তা আছে তা আবিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পী-দৃষ্টি রমেশচন্দ্রের ছিল। চরিত্রগুলি সরলরেখাত্মক; তবে লেখক সার্থকভাবে চরিত্রগুলির মধ্যে বিভিন্নতাকে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

কাহিনীর মধ্যে শরৎ ও সুধার বিবাহপর্ব সমাধা করে লেখক বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

'সমাজ' উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ কাহিনীর স্বাভাবিক বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সংসারের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন তারিণীচরণকে নিয়েই বইখানির সূত্রপাত হয়েছে। বৃদ্ধের পুনর্বিবাহের ব্যাপার নিয়ে লেখক যথেষ্ট কৌতুক রসের সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছেন। কাহিনীর পরবর্তী অংশে রমাপ্রসাদ সরস্বতী নামক এক বেপরোয়া সংস্কারপন্থীকে অবলম্বন করে লেখক তৎকালীন সমাজে সংস্কার আন্দোলন যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল তার বিস্তৃত পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছেন। বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ স্বভাবতই কাহিনীর স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। তবে রমেশচন্দ্র এ-বইতে যে সৎসাহসের সঙ্গে বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের চিত্র উপস্থিত করেছেন তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের এই চড়া সুরের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবটি যে-সব উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি, সে-সব উপন্যাসেই তৎকালীন নারীসমাজের অসহায় নিগৃহীত রূপটি আরও বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'লীলা' (১৮৯২) উপন্যাসটিতে বিভিন্ন চরিত্রের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনচিত্রের পাশাপাশি বিধবা লীলার বঞ্চিত অবহেলিত অর্থহীন জীবনযাত্রার বোঝা বেশ মর্মস্পর্শী ভাবে ফুটে উঠেছে। তেমনি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'জ্যোতির্ময়ী' নামক উপন্যাসে পণপ্রথা যে বাঙালী নারীর জীবনে কী নিদারুণ অভিশাপ তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অবশ্য উক্ত দুখানি বইতেই শিথিল গ্রন্থনের অভিযোগ অতি সঙ্গত-ভাবেই উত্থাপন করা যায়।

এ যুগে যে-সব অজস্র উপন্যাস রচিত হয়েছে, এক কথায় বলা চলে যে, তার অধিকাংশই জীবনের বুদ্ধিগ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ-যোগ্য অংশের পরিচয় দান করে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও গভীর আবেগের দ্বন্দ্বজাত নাটকীয়তার অভাবের ফলে লেখকেরা কৌতূহল ও কৌতুক সৃষ্টিতে অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। উপদেশাত্মক পরিসমাপ্তি এ যুগের বিশেষত্ব। কিন্তু এই বাস্তবের চিত্রায়ন অগভীর হলেও যথাযথ। বঙ্কিম যুগের উপন্যাস পড়ে তৎকালীন সমাজকে যতখানি জানা যায় সাম্প্রতিক উপন্যাসে একালের সমাজের সে জ্ঞান আমরা পাই না।

একালের বহু বইতেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কিছু স্থান আছে। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক রচনায়

বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন দুজন লেখক—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' (১২৮১) উপন্যাসে সেকালের প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মানুরাগীরা উপহাসের পাত্র হয়েছেন। সাধারণত পরিবর্তনশীল সমাজে যাঁরা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ব্যঙ্গধর্মী রচনা তাঁদের আতিশয্যকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে থাকে এবং রক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থন সূচিত হয়। ইন্দ্রনাথ এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁর সরস ব্যঙ্গের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস যতখানি তীব্র, আঘাত করার প্রবণতা তত তীব্র নয়। আসলে পরিবর্তনশীলতাকে সরস ব্যঙ্গে জর্জরিত করার মধ্যে পরিবর্তনশীলতার অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নেওয়ার মনোভাব সুপ্ত থাকে। কাজেই লেখকের প্রকাশ্য বক্তব্যকে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বলে এসব ক্ষেত্রে গণ্য করা চলে না।

ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু খোলাখুলিভাবেই যুক্তিবাদী এবং পরিবর্তনকামী। তিনি যে-সব বিচিত্র কুটিল যুক্তির সাহায্যে সনাতনপন্থী চিন্তাধারা আধুনিক সমাজেও দৃঢ়ভিত্তিক বনিয়াদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট, তাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধি যাই থাক, তিনি যে আশ্চর্য কল্পনা-শক্তির সাহায্যে এক উদ্ভট অসম্ভবের রাজ্য রচনা করেছিলেন তাতে প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে ব্যঙ্গের হুল ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিনি ব্যঙ্গরচনায় হাত দিয়েছিলেন, সে প্রয়োজন আজকে হয়তো আর উপস্থিত নেই, কিন্তু যে অসম্ভবের রাজ্য তিনি রচনা করেছিলেন, আর যে-সব উদ্ভট অথচ অর্থপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে তিনি অসম্ভবকে প্রত্যয়গ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন, তার আবেদন চিরকাল থাকবে।

সেকালের যাবতীয় ভণ্ডামি ও যুক্তি-বিরোধী প্রবণতাসমূহকে তিনি আক্রমণের বিষয় হিসাবে গণ্য করেছিলেন। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চার নামে পুনর্জন্মবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা, সংবাদপত্রসেবীদের অসাধুতা, নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি অনেক কিছুই তাঁর সর্বাত্মক ব্যঙ্গাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। 'মুক্তামালা'য় বর্ণিত নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ কর্তৃক দু-আনা অতিরিক্ত দামের লোভে জ্যান্ত পাঁঠার চামড়া ছাড়িয়ে ব্যবসা করার কাহিনীটি বীভৎস রসের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ব্যঙ্গ এখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি; ব্যঙ্গের ভিতর যে তীব্র জ্বালা আছে তা সুইফ্‌ট্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে 'কঙ্কাবতী'তে এবং 'লুল্লু' নামক গল্পে

থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চার বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গ আছে তাতে উৎকট পরিহাসপ্রিয়তাই প্রাধান্য পেয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একঠেঙো-মুল্লুক নিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঁঘো ভূতের সঙ্গে শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভ বিবাহের খবর বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত গম্ভীর স্বভাবের পাঠকদের কাছে রুচিকর হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা বাস্তবিকই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই আশ্চর্য শক্তিধর লেখকটি বাংলাদেশে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি।

ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডমরু চরিত'। ডমরুর পরিকল্পনা ডন কুইক্সোটের কল্পনার মতোই উদ্ভট; কিন্তু তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। যমরাজের সমীপে ডমরুর যখন বিচার চলছে, তখন ডমরুর বহুবিধ অন্যায় কর্মের বিবরণ শুনে যম তাকে কৌরব নরকে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে যম শুনলেন যে ডমরু একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করত না, তৎক্ষণাৎ তিনি তার জন্য একটি নতুন স্বর্গ নির্মাণের আদেশ দিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের যুক্তিহীনতা যে ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে তা তুলনারহিত।

'ডমরু চরিতে' অসংখ্য গল্প, এবং সে-সব গল্পের আক্রমণের লক্ষ্যও বিচিত্র। একবার ডমরুর সর্বাঙ্গ চুন-লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল; সেই অবস্থায় এক দন্তহীন সিংহ তাকে আস্ত গিলে ফেলে। সিংহের উদরে চুনের সঙ্গে পাচকরসের রাসায়নিক সংযোগে লবণ প্রস্তুত হওয়ায় সিংহের দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হল। অবশেষে সিংহের বমনের সঙ্গে ডমরু অক্ষত দেহে মাটিতে অবতরণ করল। এই উপভোগ্য কাহিনীটির আক্রমণের লক্ষ্য কি বলা মুশ্‌কিল। হয়তো বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে নানাবিধ কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখার যে-প্রয়াস এককালে দেখা গিয়েছিল লেখক তাকেই আঘাত করতে চেয়েছেন।

মোটের উপর রেনেশাঁসের সৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য প্রতিভা যাঁর তুলনা নেই। তাঁর যথাযোগ্য সম্মান বাঞ্ছনীয়।

এই সময়কার বাংলা সামাজিক উপন্যাসে কৌতূহল, কৌতুক, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের প্রাধান্যের ফলে বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের চাহিদার পরিপূর্তি ঘটছিল না। এই অভাব পূরণ করার জন্য একজাতের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয় যার প্রধান গুণ ভাবাতিশয্য (sentimentalism)। ভাবাতিশয্যের বিশেষত্ব হল কোনো মানবিক বা নৈতিক আবেগ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে চরিত্রের সমস্ত সত্তাকে প্লাবিত করে ফেলে। একটি নিদারুণ শোকার্তের মনোভাবের

বাইরে আর কোনো অস্তিত্ব নজরে পড়ে না। এই জাতীয় ভাবাতিশয্যের চিত্র উপস্থিত করেছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন। বাংলা উপন্যাসে আর এক জাতের ভাবাতিশয্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছে : ঘটনাবিন্যাসের দ্বারা যে আবেগের উচ্চ নাটকীয় পরিণতিকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত করে তোলা হয় নি, সেই ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য আবেগ শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষার সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক রোমান্সের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বল্পতা লেখককে এই শেষোক্ত জাতীয় ভাবাতিশয্য স্থষ্টিতে প্ররোচিত করেছে। প্রথমোক্ত জাতের ভাবাতিশয্য মহিলা লেখকদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে।

রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ লেখককে মানুষের অন্তর্লোক যা অনির্দেশ্য বা অস্পষ্ট ও বুদ্ধির অগম্য, তার উপর গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম যুগের সাহিত্যচিন্তায় মানুষের সমাজ ও মনের সব কিছুই সরল, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং স্পষ্টরেখাঙ্কিত। এ যুগের চিন্তায় মানুষের শোক দুঃখ প্রেম প্রভৃতি আবেগের মধ্যে নানাবর্ণ রঞ্জিত ইন্দ্রধনুচ্ছটা নেই; মানুষ খুব স্পষ্টস্পষ্টিভাবে ভালো এবং মন্দে বিভক্ত, তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে কালের চিন্তায় কোনো অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা, অনির্দেশ্যতা বা অনিশ্চয়তার অবকাশ ছিল না, সে কালের পাঠকমানসে আবেগ স্থষ্টির জন্য অতিরঞ্জন এবং আতিশয্য ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। স্বভাবতই ভাষার সাহায্যে উচ্ছ্বাস স্থষ্টি এ যুগে একটি স্বীকৃত শিল্পকৌশল বলে গৃহীত হয়েছিল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' (১৮৯৪) উপন্যাসখানিতে ছায়াচ্ছন্ন পল্লীজীবনের চিত্র প্রশংসার্হ। কিন্তু তিনি যে উপযুক্ত প্রস্তুতি ব্যতীত উচ্ছ্বাসপ্রধান রোমান্টিক পরিবেশ স্থষ্টি করেছেন তা ভাবালুতা দোষে দুষ্ট।

আর এক ধরনের ভাবাতিশয্যের দোষ আমরা দেখতে পাই যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী' (১৯০২-৩) নামক সেকালের বৃহত্তম উপন্যাসটিতে। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র ইন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে 'মডেল ভগিনী' নামে একখানি ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন এবং বইখানি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী' বইখানিও সেকালে ঘরে ঘরে স্থান লাভ করেছিল এবং তার কারণও খুব দুর্বোধ্য নয়। একশ বছর পূর্বের বাংলাদেশের এক বিস্তারিত চিত্র দিতে গিয়ে লেখক ভৃত্যের প্রভুভক্তি, রমণীর সতীত্ব প্রভৃতি কতকগুলি নৈতিক আবেগকে এমন অতিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত করেছেন যে তা অসম্ভাব্যতার সীমা স্পর্শ করেছে।

মানব মনের বাস্তবকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে এই ধরনের আদর্শানুরক্তির অতিরঞ্জিত প্রকাশ ভাবাতিশয্যের পর্যায়ে পড়ে।

রিচার্ডসন প্রদর্শিত ভাবাতিশয্যের পরিচয় পাই স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর 'ছিন্নমুকুল' নামক বইখানিতে কনকলতার চরিত্রের মধ্যে একটি খুব স্বাভাবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র লেখিকা উপস্থিত করেছেন। এক দিকে প্রভুত্বকামী ভাই প্রমোদের প্রতি তার অনুরক্তি ও আনুগত্য এবং অপর দিকে হিরণকুমারের প্রতি তার গভীর প্রেম। হিরণের প্রতি কতকগুলি মিথ্যা সন্দেহের বশীভূত হয়ে প্রমোদ কনকের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিতে রাজী নয়; আর কনকও প্রমোদের বিরুদ্ধতা করে হিরণকে গ্রহণ করতে অসমর্থ। এই চমৎকার অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনীটিকে বাস্তবসম্মতভাবে বিস্তার করার সুযোগ লেখিকার সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু লেখিকা দেখিয়েছেন যে একটি শোকগ্রস্তের মনোভাব কনকের সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে বসেছে এবং তারই চাপে এই কুসুমকোমল প্রাণটি অকালে নষ্ট হয়ে গেল। ভাষার মধ্যে উচ্ছ্বালপ্রবণতা যে কী পর্যায়ে পৌঁছেছে তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। একটি চিঠিতে হিরণকুমার লিখছে—

"কনক, প্রেমময়ি, আমার কনক,

কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইল না। তবুও একবার—তবুও এই শেষবার তোমাকে 'আমার' বলিয়া চিরজীবনের অতৃপ্ত স্বাদ মিটাইব। কনক, আমার হৃদয়ের কনক, কোনো সম্বোধনেই আমার আশ মিটিতেছে না, পৃথিবীতে আমার ভালবাসার মতো কোনো সম্বোধনই খুঁজিয়া পাই না, আমার সর্বস্ব ধন। আমি চলিলাম।"

এই জাতীয় ভাবাতিশয্যের বিপদ এই যে তা নিষ্ক্রিয় এবং প্রতিকার চেষ্টায় বিমুখ। ভাবাতিশয্যগ্রস্ত চরিত্র শোকগ্রস্তের মনোভাবকে বিধাতা-নির্দিষ্ট বলে গণ্য করে তাকে একধরনের বিলাসে রূপান্তরিত করে এবং সক্রিয় প্রয়াসের বিকল্প হিসাবে জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে এই ভাবাতিশয্য আরও পল্লবিত আকারে দেখা দিয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী 'কাহাকে?' 'স্নেহলতা' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস এবং 'দীপনির্বাণ', 'মিবার-রাজ', 'বিদ্রোহ' প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ | রবীন্দ্র-শরৎ যুগ বা রোমাণ্টিক পরিণতির যুগ

(বঙ্কিম-যুগে যার সূচনা, রবীন্দ্র-শরৎ যুগে তার পরিণতি; বঙ্কিম যুগে যা পরিকল্পিত রবীন্দ্র-শরৎ যুগে তা বাস্তবে রূপায়িত। কোনো বিদেশী পাঠক যদি এই দুই যুগের উপন্যাসকে পাশাপাশি রেখে পড়েন তো অনায়াসে লক্ষ্য করবেন যে বঙ্কিম-যুগে যেন সাহিত্য-সাধনা মধ্যপথে এসে থেমে গিয়েছিল, এবং তাকে সুসমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়েছিল রবীন্দ্র-শরৎ যুগ। আমরা খুব কাছাকাছি আছি বলেই এই দুই যুগের সাহিত্য-সাধনার নিকট সম্বন্ধকে হয়তো সব সময় অনুভব করতে পারি না।

জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। সমগ্র বঙ্কিম যুগ ধরে জাতীয় জাগরণের প্রস্তুতি-পর্ব চলছিল; অবশেষে বিশ শতকের প্রারম্ভে তা একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের মতো বিপুল বিক্রমে ফেটে পড়ল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এই বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এল তখনই শিক্ষিত বাঙালী সমাজ আত্মস্থ হতে পেরেছিল। সেদিন সে বুঝেছিল যে শেষ পর্যন্ত এই বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতিই তার ভরসাস্থল। কিন্তু গণমানস বুঝতে পারে এমন ভাষা সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর জানা ছিল না। যতদিন যুক্তি ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি তার একমাত্র অবলম্বন ছিল ততদিন গণচিত্তকে সে স্পর্শ করতে পারেনি। সেইজন্যই জাতীয় জীবনে সেদিন আবেদন-নিবেদন ছাড়া আর কোনো পথ উন্মুক্ত ছিল না। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'ও ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। এই নির্ভরতার অন্তত একটি কারণ দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা, গণশক্তির সমর্থনের অভাবের সচেতনতা।

অবশেষে উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রবল বেগে দেখা দিল হৃদয়োচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসের বিপুল বন্যায় যুক্তি ও বিজ্ঞান-বুদ্ধির ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ ভাষা ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেল। সাহিত্যের মতো জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই উচ্ছ্বাসপ্রবণতা দেখা দিয়েছিল। সুরেন ব্যানার্জী, বিপিন পাল প্রভৃতি জাতীয় নেতাদের বক্তৃতায় ক্রমশ বস্তুর চেয়ে অলংকারের, যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য ঘটতে থাকে। ঠিক একই সময়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন, এবং তা-ও ছিল মূলত ভাবাবেগ-প্রধান। জাতীয় ও ধর্মীয় আন্দোলনের এই বিপুল জোয়ার এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছিল—প্রথমে তিলকের মধ্যে এবং পরে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে, সুপ্ত বাসুকি নাগ হঠাৎ নড়ে উঠল, আর পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসন কেঁপে উঠল থরথর করে।

এমনি হয়ে থাকে। যুক্তি আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার বটে, কিন্তু প্রবল প্যাশন ছাড়া বিপুলসংখ্যক মানুষকে বৃহৎ কর্মে নিয়োজিত করা যায় না। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মানুষকে কিছুতেই আত্মদানের পথে প্রবুদ্ধ করা যায় না; কিন্তু আবেগের ভাষায় তাকে উত্তেজিত করতে পারলে সে অনায়াসে আত্মত্যাগ করে। মানুষের মনের গভীরে যে বিপুল জৈব-শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তা মূলত irrational; কাজেই irrational-এর আবেদনই তার কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছয়।

বুদ্ধির সাধনা ছেড়ে এবার শক্তির সাধনা শুরু হল। ইতিমধ্যে দেশে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়েছে। কলকাতার আশেপাশে বিরাটাকার চটকলগুলির দিকে তাকিয়ে মানুষ একথা ভাবেনি যে এদের উদ্‌ভাবনার পিছনে মানুষের বুদ্ধি কাজ করেছে; বরং ভেবেছে যন্ত্র এক বিরাট শক্তি যাকে সেবা করার জন্য হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োজিত হয়। ইংরাজ জাতিও ভারতবাসীর কাছে এক বিরাট অতি-মানবিক শক্তি বলে অনুভূত হয়েছিল। এই শক্তিকে পরাভূত করতে হলে তেমনি বিপুল শক্তি দরকার এবং জাতীয়তা বোধ যে একটি শক্তি তা আমরা বুঝেছিলাম। এই জাতীয়তার শক্তিকে আরও ব্যাপক আরও শক্তিশালী করার জন্য ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আবশ্যকতা আমরা অনুভব করেছিলাম; কারণ ধর্মীয় আবেগও একটি বিপুল শক্তি। অবশ্য জাতীয়তার সঙ্গে ধর্ম-বোধ যুক্ত হওয়াতে হিন্দু-মুসলমানের পুরনো বিবাদটা আবার নব-কলেবরে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিকল্প পথ যে কী ছিল তা বলা খুব মুশকিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে

বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেশজননীকে দুর্গা-মূর্তি-রূপে কল্পনা করেছিলেন বা বিবেকানন্দ যখন ভারতীয় ধর্ম হিসাবে বেদান্তকে আশ্রয় করেছিলেন তখন তাঁদের মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। এ দেশে যে বিপুলসংখ্যক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে তা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন এ কথাও বলা চলে না। কিন্তু তাঁরা জানতেন কোন্ ভাষায় কথা বললে হিন্দু জনসাধারণের থেকে সাড়া পাওয়া যায়; কোন্ ভাষায় কথা বললে মুসলমান জনসাধারণের থেকে সাড়া পাওয়া যায় না তা তাঁরা জানতেন না। বুদ্ধির ভাষার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক, হৃদয়াবেগের ভাষার ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

ঠিক একই সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হৃদয়াবেগের নবজাগরণ ঘটল। বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে এমন এক অনিশ্চিত হৃদয়াবেগকে কাব্যরূপ দিলেন যার সুসঙ্গত বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই থেকে এই দাবি স্বীকৃত হল যে কাব্যে-সাহিত্যে আবেগেরই অগ্রাধিকার। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়াবেগকে অভিষেক করতে গিয়ে উচ্চারণ করলেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের যে কবিরা বঙ্কিম যুগে প্রায় উপেক্ষিত, রবীন্দ্র-যুগে তাঁরাই পরম আদরে গৃহীত হলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের উপর শেলী-কীটসের প্রভাব অনায়াসেই অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করলেই দুটি যুগের উপজীব্য সাহিত্যতত্ত্বের তফাৎ বোঝা যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ সাধারণ বুদ্ধির জগৎ থেকে স্বতন্ত্র নয়, বহির্জগৎ তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর যে ভাবে আঘাত করে তিনি তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেন, শুধু তার উপর কিছু উচ্ছ্বাসের প্রলেপ বুলিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথের তাজমহল যে-কোনো সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দেখা তাজমহল থেকে ভিন্ন নয়। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ চোখ দিয়ে দেখা বহির্জগৎ-কে নিজের অন্তরের কবি-দৃষ্টির সাহায্যে রূপান্তরিত করে কাব্য-রচনা করেন। তাঁর তাজমহলের সঙ্গে আমাদের পরিচিত তাজমহলের সামান্যই সম্পর্ক আছে, তাজমহল তাঁর কাছে একটি উপলক্ষ-মাত্র যার সাহায্যে তাঁর বিশিষ্ট জীবন-ভাবনা প্রকাশ লাভ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-কর্ম imitation—অনুকরণাত্মক, রবীন্দ্রনাথের কাব্য recreation—পুনঃসৃজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যচর্চার প্রথম ঊষায় কোল্‌রিজীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত

হয়েছিলেন আমি এমন ইঙ্গিত করছি না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবি-ধর্ম ঐ পথে যাত্রা শুরু করেছিল।

সাহিত্যকর্মে আবেগ-অনুভূতি এবং ব্যক্তি-ভাবনা প্রাধান্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় রসতত্ত্ব কবি-সমাজে সমাদর লাভ করেছিল। রসতত্ত্বের ক্রম-বর্ধমান স্বীকৃতির ফলেই অতুলচন্দ্র গুপ্ত সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ লেখেন, অবশ্য অনেক পরে।

কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দিল। বঙ্কিম যুগের উপন্যাসে ঘটনারা যেন স্বয়ম্ভু এবং সপ্রধান। দৈবক্রমে কোনো ঘটনার মধ্যে ব্যক্তিরা জড়িয়ে পড়েছে, এবং তাদের আবেগ-অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তির হৃদয়ের দিকে বেশিক্ষণ নজর দেওয়ার অবকাশ লেখকের নেই, তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘটনার পিছনে ছুটেছেন, কারণ তাঁর মতে ঘটনার জটিল গতি-পরিণতিই উপন্যাসের আসল কথা। ঘটনার মধ্যে কোন্ চরিত্র কী ভাবে ব্যবহার করছে তা থেকেই তার মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। লেখক নির্মম নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট। পক্ষান্তরে রবীন্দ্র-শরৎ যুগের উপন্যাসে ব্যক্তিই প্রধান, বরং বলা চলে ব্যক্তির আবেগ বা আবেগজনিত সমস্যাই প্রধান। এই আবেগের গতি-প্রকৃতি, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হ্রাস-বৃদ্ধি বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করার জন্যই লেখক বিভিন্ন ঘটনা উদ্ভাবন করেন। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়জ আবেগকেই লেখক সৎ বলে স্বীকার করেন, নৈতিক বিচারে তা সমর্থনযোগ্য হোক বা না হোক। ব্যক্তির সৎ আবেগের সঙ্গে সমাজ যখন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয় লেখক তখন ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করেন।

কাজেই লেখক **neutral angle** ত্যাগ করে—বিচারকের ভূমিকা ত্যাগ করে কোনো একটি চরিত্রের সমান্তরালে নিজেকে স্থাপন করে তার দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিবরণ দিলেন। এই চরিত্রটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে **neutral angle**-এর বদলে **dramatic angle**-এ এ যুগের কাহিনী পরিবেশিত হল। তার ফলে ঘটনার নিজস্ব আকর্ষণ বা চমৎকারিত্ব গৌণ হয়ে পড়ল, তার বদলে প্রধান হয়ে উঠল হৃদয়জ দ্বন্দ্ব বা হৃদয়জ বৃত্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব। এত দীর্ঘ 'গোরা' উপন্যাসের বোধ করি প্রায় বারো আনা অংশই নিছক ড্রয়িংরুমের দৃশ্যে পূর্ণ। দুঃসাহসিক অভিযান, রোমাঞ্চকর যুদ্ধ, পাহাড়, অরণ্য, নদীবক্ষ প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস থেকে প্রায় বিদায় নিল, বা কচিৎ কোথাও উপস্থিত থাকলেও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল।

হৃদয়জ আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস লেখার রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হৃদয়জ বৃত্তির মুক্তির দাবি উঠল। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে যেমন ক্রমবর্ধমান বেগে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দাবি সোচ্চার হয়ে উঠছিল, তেমনি উপন্যাসের মধ্যে লেখকগণ সামাজিক জীবনে ব্যক্তির স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতির মুক্তি দাবি করলেন। বঙ্কিম যুগে সমাজ সমালোচনার উর্ধ্বে, যত দোষ সব ব্যক্তির। রবীন্দ্র যুগে সমাজ যত দোষের মূল; সমাজ নিবর্তনমূলক, সমাজ ব্যক্তির স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-অনুভূতির স্বাধীনতাকে স্বীকার না করে অবাধে নিপীড়ন চালায়, কারণ সমাজনীতি যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজের শিরোমণিরা স্বার্থপর, কলুষপূর্ণ; দুর্বল অসহায় ব্যক্তিকে অপরিসীম নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করাতেই তাদের আনন্দ।

কাজেই ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করার এবং তার স্বাভাবিক বিকাশের অবাধ সুযোগ দাবি করার রোমান্টিক প্রেরণা থেকেই রবীন্দ্র যুগের লেখকরা বাস্তবতায় অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উপন্যাসের পক্ষে সমকালীন সমাজ-বাস্তবের অপরিহার্য লজিককে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলে এ যুগের লেখকরা মূলত রোমান্টিকধর্মী হলেও ফরাসী লেখক গতিয়ের-এর মতো অবাধ রোমান্টিক কল্পনার রাজ্যে পক্ষ-বিস্তার করার সুযোগ পাননি, কারণ আমাদের দেশের তখনকার সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে এধরনের কল্পনা-বিলাসের অসঙ্গতি খুব প্রকট হয়ে উঠত। আমাদের দেশের সমাজের তখনকার অবস্থায় রোমান্টিকধর্মী সামাজিক উপন্যাস লেখার অসুবিধা ছিল বলেই, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকেও বাস্তববাদী উপন্যাস লিখতে হয়েছিল।

কিন্তু বঙ্কিম-যুগ আর রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান সত্ত্বেও একটু গভীরভাবে ভাবলে মনে হবে আসলে রবীন্দ্র-যুগ আমাদের নতুন-কিছু পরিবেশন করেনি। বঙ্কিম যুগেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছিল; বস্তুত, উপন্যাস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগেরই বিশেষ শিল্প মাধ্যম। বিবাহপূর্ব রোমান্টিক প্রেম বঙ্কিম-যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক উপন্যাসেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিধবার হৃদয়জ সমস্যা, বিবাহাতিরিক্ত প্রেমের সমস্যা, এমন কি স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্ন পর্যন্ত বঙ্কিম-যুগের উপন্যাসে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। ব্যক্তি জীবনের এই সব প্রশ্নের আলোচনায় অধিকদূর অগ্রসর হলে সমাজের নিপীড়নমূলক নীতির সমালোচনা অপরিহার্য

হয়ে পড়ে; কিন্তু বঙ্কিম-যুগ অতদূর অগ্রসর হতে চায়নি। এই অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছিল রবীন্দ্র-যুগ। উপরোক্ত নৈতিক সামাজিক সমস্যাগুলিই রবীন্দ্র যুগে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য-লাভ করেছে, এবং সেই সঙ্গে এসেছে সমাজের সমালোচনা। তার ফলে একদিকে যেমন এসেছে সমাজ-বাস্তবের ব্যাপকতর বিশ্লেষণ, তেমনি মানব মনের অনেক অনাবিষ্কৃত ভূমিতে আলোক-সম্পাতের প্রয়োজন ঘটেছে। লেখক দেখেছেন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব নিতান্তই বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নয়, সেই দ্বন্দ্বের অনেকখানির ঘটনাস্থল ব্যক্তির নিজের মন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্যক্তির দাবি যত সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সমাজের সমালোচনায় যত আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে, তত ব্যক্তির শক্তি পেয়েছে হ্রাস। বঙ্কিম-যুগের সেই অমিত শক্তিধর ব্যক্তিরা বোধ করি বাংলা সাহিত্য থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। বাল্য প্রণয়িনীকে না পাওয়ার দরুন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপের কর্মজীবন এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; কিন্তু পার্বতীকে না পাওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের দেবদাস ক্ষোভে-অভিমানে অনায়াসে নিজের জীবনটাকেই অপব্যয় করে ফেলল। বঙ্কিমের গ্রাম্য মেয়ে রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করতে হয়েছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অত বড় ইণ্টেলেক্-চুয়েল কিরন্ময়ী বাইরের কোনো আঘাত ছাড়া শুধু নিজের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বেই পাগল হয়ে গেল। ব্যক্তির অধিকার নিয়ে আমরা যত বেশি সজাগ হয়ে উঠছি, ব্যক্তির সহস্রবিধ দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা তত বেশি সচেতন হতে পারছি। আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রোত্তর যুগে ব্যক্তির দুর্বলতার চেতনা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

উপন্যাসে অসাধারণ মানুষদের বদলে ক্রমশ দুর্বল ভীরু সাধারণ মানুষদের ভিড় বাড়ছে। এরা ভুল করে, অন্যায় করে, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করে; তবু লেখকের সহানুভূতি থেকে এরা বঞ্চিত নয় এই জন্য যে, লেখক জানেন এরা ইচ্ছে করলেই অধঃপতনের হাত এড়াতে পারত না। বঙ্কিম-যুগের লেখক ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচনের ক্ষমতায়—ফ্রি উইলে—অনেক বেশি আস্থাশীল ছিলেন। আধুনিক লেখক যত বেশি ব্যক্তির স্বাধীনতার দাবি তুলছেন, তত বেশি তিনি অনুভব করছেন মনস্তত্ত্বের নিয়মে আবদ্ধ মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করার, চিন্তা করার, এমন-কি ইচ্ছা করার শক্তিও খুব সীমাবদ্ধ। গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির ফলে উপন্যাসে সাধারণ মানুষদের ভিড় বেড়েছে এ কথা ঠিক

নয়,—গণতন্ত্রের সঙ্গে অসাধারণত্বের কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই; মানুষ আদৌ অসাধারণত্ব অর্জন করতে পারে এ বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে বলেই আধুনিক উপন্যাসে সাধারণ মানুষদের ভিড।

মানব চরিত্রের এই অধোগতির কারণ হয়তো মূলত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। রোমান্টিক লেখক মানুষকে তার কর্মের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেষ্টা না করে তাকে তার মনের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং তার ফলেই বিপত্তি ঘটেছে। মানুষের কাজের দিকে তাকালে মানুষকে যত বড বলে মনে হয় আসলে সে তত বড় নয়। আমরা আজ জেনেছি মানুষ সেনাপতির আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় সাহসের জন্য নয়, সাহসের অভাবের জন্য।

মানুষের অন্তর্লোকের সত্য আবিষ্কারের যে প্রবণতা আধুনিক উপন্যাসে দেখা যায়, রবীন্দ্র-শরৎ যুগে তা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। এখনও লেখকদের দৃষ্টি কেবলমাত্র মানুষের আবেগ-অনুভূতির স্তরে নিবদ্ধ। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী আবেগ-অনুভূতির স্তরের গভীরে মানব-মনে যে সব অন্ধকার গুহাবাসী শক্তি লুক্কায়িত থাকে এ-যুগে লেখকরা তার সন্ধান নেননি। কামনার অপরিতৃপ্তির জন্য বা কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তির জন্য মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তার নাম দেওয়া যায় আবেগ। আবার, সুদূরবর্তী ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ যখন কোনো কর্মোদ্যমে লিপ্ত হয় তখন তার পিছনে কিছু স্থায়ী আবেগ কাজ করে। এই আবেগ মানুষকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, অনেক সময়ে মানুষের আপাত যুক্তিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে; এর নাম দেওয়া যায় প্রবণতা বা **attitude**। আবার, প্রত্যেক ঘটনাই মানুষের মনে প্রিয় বা অপ্রিয় অনুরূপ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; তার নাম অনুভূতি। অনেক সময় পরস্পরবিরুদ্ধ আবেগ-অনুভূতি মনের মধ্যে বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। মোটামুটিভাবে এই কয়েকটি মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণেই রবীন্দ্র-শরৎ যুগের উপন্যাস সীমাবদ্ধ। মনের গভীরতর শক্তির পরিচয় লাভের জন্য আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আসল কথা, যদিও বঙ্কিম যুগের পরে রবীন্দ্র-যুগের উপন্যাসে দুস্তর ব্যবধান আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি, তথাপি পরবর্তী যুগ যে পূর্ববর্তী যুগের ধারাবাহিক পরিণতি মাত্র এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই রেনেশাঁসকালীন আশাবাদ এবং ভবিষ্যতের উপর আস্থা এ যুগেও আমরা দেখতে পাই (যদিও বাস্তবের বাধা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চেতনার ইঙ্গিত পাই)। গণমানস এবং জাতীয়

আন্দোলনের প্রতি দায়িত্ববোধ এ যুগেও আমরা দেখতে পাই। ইংলণ্ডের রোমান্টিক রিভাইভ্যাল এবং রসতত্ত্বের প্রভাব সত্ত্বেও এখনও লেখক খুব কম ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যবিরহিত হয়ে শুধু নিজের মানস-দর্শনের প্রকাশে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন শিল্প অপ্রয়োজনীয়, শরৎচন্দ্র যদিও এবিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন যে উপন্যাস শিল্পকর্ম, সমাজতত্ত্ব নয়; তথাপি তাঁদের উপন্যাসে যে জাতীয় কর্মোদ্যম এবং সমাজনীতির সংস্কারের প্ররোচনা আছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। এমন-কি বঙ্কিম-যুগের অতিমানবরা যে এ যুগে একেবারে অন্তর্হিত তাও বলা যায় না, যখন চোখের সামনে আমরা গোরা এবং সব্যসাচীর মতো চরিত্র দেখতে পাই।

কাজেই বঙ্কিম-যুগে যার সূচনা রবীন্দ্র-যুগে তার পরিণতি এ কথার পুনরাবৃত্তি করে এ অধ্যায় শেষ করছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ | রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

১। দৃষ্টিভঙ্গি এবং থাম

(রবীন্দ্রনাথ এক অনন্য এবং নিঃসঙ্গ প্রতিভা। তাঁর শিল্পদৃষ্টি সমসাময়িকদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে এত উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল যে আর কেউ তাঁর নাগাল পান নি। আমার তো মনে হয় যদি তিনি সময়মতো বৈদেশিক স্বীকৃতি লাভ না করতেন তবে সামাজিক আভিজাত্য সত্ত্বেও এ দেশে তাঁর প্রতিভার উপলব্ধি বিলম্বিত হত। তথাপি তাঁর ভাবনা ও অনুভূতির সূত্র সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যাবে না এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়; কিন্তু সেগুলি তাঁর বিভিন্ন বয়সের লেখা। ভাষায়, রচনারীতিতে এমন কি বিষয়বস্তুতে সেগুলির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তাঁর প্রথম বয়সের রচিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' বঙ্কিম-যুগকে স্পর্শ করেছে। 'চোখের বালি' থেকে শুরু করে তাঁর মধ্যবয়সে রচিত উপন্যাসগুলি তাঁর স্ব-নামে চিহ্নিত কালের অবদান। দেশে যখন শিল্পকৈবল্যবাদী এবং শ্রমিককেন্দ্রিক বাস্তববাদী সাহিত্যচিন্তার আলোড়ন শুরু হয়েছে, তখন শেষ বয়সে তিনি নতুনতর রূপ ও রীতি অনুযায়ী 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস লেখেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করে তিনটি বিভিন্ন যুগে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধারার উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি যেন প্রত্যেকটি যুগেরই সমসাময়িক। সাধারণত যাঁরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন ও একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর যাঁদের মানসিক বয়স আর বাড়ে না, রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁদের নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি ক্রমাগত নিজেকে নিজে অতিক্রম করে গিয়েছেন, পর্যায়ে পর্যায়ে পুরাতন রবীন্দ্রনাথ নতুন রবীন্দ্রনাথের কাছে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই নিত্য নবায়নকে একটু বক্রভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। বলা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্য যেন মরসুমী ফুল; ঋতুতে ঋতুতে মানুষের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী তা ক্রমাগত নতুন নতুন কলেবর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ব্যাখ্যা যদি মানতে বাধা থাকে, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে। একটি মৌল শিল্পী-প্রকৃতি নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী ক্রমাভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে; সেই শিল্পী-প্রকৃতির এমন আশ্চর্য শক্তি আছে যে যে-কোনো যুগের চিন্তা-ভাবনা রীতি-নীতিকে সে অনুধাবন করে তা থেকে নিজের পুষ্টিসাধন করতে পারে। দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-কথা কতখানি প্রযোজ্য। আমরা ধারাবাহিক-ভাবে তাঁর উপন্যাসের পরিবর্তনশীলতার হিসাব নেব, এবং অপরিবর্তনীয় কী আছে তার খোঁজ করব।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' প্রকাশিত হয়, এবং তার বছর তিনেক পরেই দেখা দেয় 'রাজর্ষি'। এই সময়টিকে বঙ্কিম-যুগের শেষ পাদ বলে উল্লেখ করা চলে; বঙ্কিম তখনও জীবিত। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমী চিন্তা-রাজ্যের সংকীর্ণ পরিসরে প্রবল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। খুব সংক্ষেপে বলা চলে, বঙ্কিম-যুগের চিন্তার মূল সূত্র ছিল—যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, স্বাদেশিকতা, এবং এ দুই বিদেশ থেকে আমদানী করা আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের অতীত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া। সে যুগে দক্ষিণ ও বামের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তা এই দেশী ও বিদেশী উপাদানের মাত্রাভেদ নিয়ে। সেকালে যিনি গোঁড়া সনাতনপন্থী ছিলেন তাঁকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিশুদ্ধ প্রতীচ্য যুক্তি প্রয়োগের রীতিকে অনুসরণ করতে হত। বস্তুত, বঙ্কিম-যুগের চিন্তা-ভাবনায় সাহিত্য সৃষ্টিতে যুক্তিবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিম নিজে অত্যন্ত প্যাশনেট (passionate) প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদা প্যাশনকে যুক্তির আয়ত্তে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। স্বভাবতই এই যুক্তিপ্রধান সাংস্কৃতিক জগতে সর্বসাধারণের অনু-প্রবেশের কোনো সহজ রাস্তা ছিল না। এ যুগের সর্বস্বত্ব বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ যামে অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হল; এবং পৌরাণিক ও স্বাদেশিকতামূলক নাটকে আবেগ এবং উচ্ছ্বাস একটু বাড়াবাড়ি রকমেই আত্মপ্রকাশ করল। এই

আতিশয্যটুকু স্বল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে সহজেই আকর্ষণ করতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি ঘটনা ঘটল। প্রথমে ভারত সভা স্থাপিত হল, এবং তার কিছুদিন পরে ১৮৮৫ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম যুগে কংগ্রেসের মধ্যে অবশ্য যুক্তিপন্থী মডারেটদের ভিড বেশি ছিল; কিন্তু বিপিন পাল, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে স্বাদেশিকতার সঙ্গে উচ্ছ্বাসপ্রবণতার সংমিশ্রণ ঘটছে। / অপরদিকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ দেবের কাছে কিছু সংখ্যক নবীন-প্রবীণ ধর্মপাগল অথবা সংশয়ক্লিষ্ট ব্যক্তির যাতায়াত শুরু হয়েছে। এক কথায়, এই সময়ে ধর্ম ও স্বদেশচিন্তায় এক প্রবল উচ্ছ্বাসপূর্ণ অগ্রগতির জন্য পরিবেশ রচিত হচ্ছে বলে অনুভব করা যায়। সাধারণ মানুষ যুক্তি অপেক্ষা আবেগের ভাষা তাডাতাডি বোঝে। নেতারা এবং লেখকরা এখন দ্রুত গণ-সমর্থন লাভ করার জন্য আবেগের গুরুত্বকে অনুভব করতে পারছেন। এই সময়কার উপন্যাসে sentimentalism বা ভাবাতিশয্যের আমদানী লক্ষণীয়। আর কিছু দিন পরেই সারা দেশ এক অন্ধ তীব্র আবেগের জোয়ারে আপ্লুত হবে। প্রতি পদে পদে যুক্তি বিচারের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে যাত্রা নয়, অকুণ্ঠ নির্বাধ প্রবল ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে চলা। কালক্রমে ধর্মীয় আবেগ এবং স্বাদেশিকতার আবেগ এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুর্বার শক্তি অর্জন করবে বিবেকানন্দ-তিলক প্রভৃতি চিন্তানায়কদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মধ্যে তার সাহিত্যিক প্রকাশ দেখা যাবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগে একটি নির্জীব জডতাগ্রস্ত জাতিকে কর্মোদ্যমে মাতিয়ে তোলার জন্য যে ভাবাতিশয্যের আবশ্যকতা ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভাবাতিশয্য সব সময়ই অন্ধ এবং বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই জনতার অন্ধ ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি ছিলেন জন্ম রোমান্টিক; তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ যদি তার সহজ স্বাভাবিক আবেগ-ধর্ম অনুযায়ী চলে তবে তা দোষের নয়। কিন্তু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আবেগের সমর্থক হয়েও তিনি সামাজিক ভাবাবেগের সঙ্গে কোনোদিনই নিজেকে একাত্ম করে ফেলতে পারেননি। তার কারণ হয়তো এই যে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বলে হিন্দু ধর্মীয় আবেগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে একটু দূর থেকে দেখতে পেরেছেন এবং তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন। সম্ভবত, এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে এমন ধারণা

সৃষ্টি হয়েছিল যে আমাদের দেশের মতো দেশে যুক্তির নির্ভরযোগ্য হাতিয়ারকে বিসর্জন দেওয়া বিপজ্জনক। কাজেই বঙ্কিম-যুগকে ছাড়িয়ে যেতে গিয়েও বঙ্কিম যুগের প্রধান হাতিয়ার যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভরতাকে তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্কিম প্রকৃতিগতভাবে আবেগপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি আসক্ত (sensuous) ছিলেন ; কিন্তু প্রত্যয়ের দিক থেকে তিনি ধর্মীয় বা ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রকৃতিজ কামনা-বাসনা আবেগ-অনুভূতিগুলি সর্বদাই তাকে নিম্নগামী করতে সচেষ্ট, কাজেই কঠোর ধর্মবুদ্ধি এবং কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতিজ কামনা-বাসনাকে সংযত রাখা আবশ্যক। পক্ষান্তরে একদিকে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব বশত এবং অপরদিকে ফরাসী লেখক রুশো এবং ইংরেজ রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর প্রভাব বশত রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক মানবিক আবেগ ও কামনা-বাসনাকে মূল্য দিতে শিখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণ তাঁদের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। এই বিরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোথাও নেই। তাঁর রোমান্টিক ধর্ম মূলত রেনেশাঁসী রোমান্টিক ধর্মের অনুরূপ ; যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। কাজেই বঙ্কিমের ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির বদলে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও বঙ্কিমের যুক্তিবাদকে তিনি ত্যাগ করেননি।

আমার বিশ্বাস রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ কী করে বাস্তবধর্মী সমস্যামূলক উপন্যাস রচনা করতে পেরেছিলেন এ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা অনেক সমালোচকই খুঁজে পাননি। কিন্তু মীমাংসার জন্য খুব বেশিদূর যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এটুকু বুঝেছিলেন যে আমাদের দেশে যুক্তির ভিত্তি খুব দুর্বল, অনেক অযৌক্তিক আবেগের প্রাবল্যে এই সমাজ ক্ষতবিক্ষত। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ মূল্যবান, কিন্তু আবেগমাত্রই মূল্যবান নয়। এমন আবেগ আছে যা অশুভকে ডেকে নিয়ে আসে, যা এই সুন্দর পৃথিবীতে অসুন্দরের লীলা প্রকাশ করে। এই ধরনের আবেগের প্রকোপ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে যুক্তি বিচারের প্রয়োজন আছে বৈকি। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন কিছু কিছু সামাজিক

অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল যা তাঁর শিল্পী-সত্তাকে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু যাকে শিল্প-রূপ দিতে হলে বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

যে মৌল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার আভাস তাঁর প্রথম দুখানি উপন্যাসের মধ্যেই রয়েছে। স্বাদেশিকতা যখন ভাবাবেগ হিসাবে জনচিত্তকে অধিকার করতে শুরু করেছে, তখন তিনি 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মধ্যে স্বাদেশিকতা ও বীরত্বের আদর্শকে নতুনভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দুখানি বই ই বঙ্কিমী রচনা-রীতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহস এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তিনি অনায়াসে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকে উপস্থিত করার জন্য ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন-মাত্র বলে গণ্য করেছিলেন। তখনকার স্বদেশী চিন্তার যুগে প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীর বলে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে প্রতাপাদিত্যের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও বীরোচিত আদর্শ শুধু স্বৈরাচারী দম্ভ ও নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতাপ যে স্বাধীন বাংলা গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে জন্য প্রতাপের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি। খুল্লতাত বসন্ত রায়, পুত্র উদয়াদিত্য, পুত্রবধূ সুরমা ও কন্যা বিভা মিলে যে শান্তি ও ভালবাসাব নীড় গড়ে তুলেছিলেন, প্রতাপের নিষ্ঠুরতায় তা ভেঙে গেল—এই ঘটনাটুকুই কাহিনীর অবলম্বন। সহজ মানবিক হৃদয়ধর্মের প্রতি তরুণ লেখকের পক্ষপাত এখানে খুব স্পষ্ট। অনুরূপভাবে 'রাজর্ষি' উপন্যাসে দুই ভাই, গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে লেখক একদিকে লোভ ও হিংসা, এবং অপরদিকে ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শকে স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমের রচনারীতিকে লেখক অনুসরণ করেছেন কিন্তু বঙ্কিমের কাছে কর্তব্যবুদ্ধি বড ; রবীন্দ্রনাথের কাছে হৃদয়ধর্ম বড।

কিন্তু লোভ হিংসা প্রভৃতিও হৃদয়াবেগ, এবং প্রকৃতিজাত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হয়নি যে প্রকৃতির সাহচর্যে থাকলে এসব কুপ্রবৃত্তিগুলির জন্ম হয় না। যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে একই সমাজের মধ্যে সু আর কু দু-রকম মনোবৃত্তিরই জন্ম হয়। ঐতিহাসিক রোমান্সের কাঠামোর মধ্যে তিনি সু আর কু-কে দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আসলে বাস্তব জীবনে তো একই মানুষের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতার সহাবস্থান ঘটে। কাজেই সমাজে সুস্থ হৃদয়বৃত্তির

প্রাধান্য কী করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এই যদি অনুসন্ধানের বিষয় হয় তা হলে বাস্তবের গভীরতর বিশ্লেষণ দরকার। যে উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্যের পক্ষে ঐতিহাসিক রোমান্সের কাঠামোটি মোটেই উপযুক্ত নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ দুখানি উপন্যাসের পরেই বাস্তববাদী উপন্যাস রচনার দিকে অগ্রসর হলেন। উপন্যাস রচনার পিছনে তাঁর যুক্তিবাদী সত্তাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল বলেই তিনি বাস্তববাদের দিকে ঝুঁকলেন। (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'চোখের বালি' আত্মপ্রকাশ করে।) এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভরা মরসুম চলছে। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক কর্ম একটি প্রচণ্ড রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রকাশ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই ভাববন্যার আবহাওয়াতে রোমান্টিক কবি কেন বাস্তববাদী উপন্যাস লিখলেন তা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নিশ্চয়ই কবির শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় এমন কিছু ছিল যা রোমান্টিক রীতিতে প্রকাশ করা যায় না। আমাদের সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনে এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা ভাবনা ও বক্তব্য জমা হয়েছিল যা তখনকার দিনে ব্যাপক গণস্বীকৃতি লাভ করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই বাস্তব বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্যকে তুলে ধরাই একমাত্র পথ যা কবির সামনে উন্মুক্ত ছিল। প্রত্যয়গ্রাহ্যভাবে সত্যকে যদি তিনি পাঠকের দরবারে হাজির করতে পারেন তবে একদিন না একদিন তা স্বীকৃতি লাভ করবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। অবৈজ্ঞানিক সমাজনীতি এবং সামাজিক সংস্কার সুস্থ হৃদয়ধর্ম বিস্তারের প্রতিবন্ধক। এই সমাজনীতি যে হৃদয়গতির স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী তা দেখানো দরকার। (সমাজনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের হৃদয়াবেগ চলে না; হৃদয়াবেগের নিজস্ব নিয়ম আছে এবং তাকে আমাদের খেয়াল-খুশিমতো পথে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।) সে রকম চেষ্টা করতে গেলে ব্যক্তিকে শুধু অসুখী করা হয়, সমাজদেহে নানা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করা হয়। যে হৃদয়ধর্ম সমাজকে সুন্দরতর করতে পারত, তার গতিকে অকস্মাৎ নিরুদ্ধ করার ফলে তা অনেক অবাঞ্ছিত বিকৃতির জন্ম দিতে পারে। আবার হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যেও কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ আছে, যেমন মাতৃস্নেহ, পত্নী-প্রেম আর বন্ধুপ্রীতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। তার ফলে ঈর্ষা অবিশ্বাস সন্দেহ প্রভৃতি নানা অবাঞ্ছিত আবেগের জন্ম হয় যার কোনো সহজ সমাধান নেই। বাস্তববাদী লেখক হৃদয়ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার সমস্ত দিকগুলিই দেখবেন।) (কারণ মানবিক সমস্যাসমূহের কোনো চূড়ান্ত সমাধান

আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। এইগুলিই হল মোটামুটিভাবে 'চোখের বালি' উপন্যাসের থীম। আরও সংক্ষেপে বলা চলে—সমাজ-নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগের গতি-প্রকৃতি, সমাজ-নির্দিষ্ট হৃদয়াবেগের গতি-প্রকৃতি, এবং এ দুয়ের মধ্যে সংঘাতের জটিলতা।

'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস, কারণ এই বইতে সর্বপ্রথম নৈতিকতার উর্ধ্বে হৃদয়ধর্মকে স্থান দেওয়া হয়েছে। হৃদয়ধর্মের পরিপূর্ণতাতেই জীবন সুখের হয়। কাজেই যে সমাজনীতি বা প্রথা তাতে বাধা দেয় তার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। উপন্যাসের কাজ—মানুষের কর্মের নৈতিকতা বিচার নয়, মানুষের হৃদয়াবেগের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। 'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস রচনার নতুন পথনির্দেশ রয়েছে। তথাপি পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ের সঙ্গে এর ধারাবাহিকতা যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে তা বোধ করি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ এবং চার অধ্যায় এক গোত্রের, যদিও রচনারীতির দিক থেকে এদের মধ্যে প্রচুর বিভিন্নতা আছে। এই বইগুলিতে কোনো না কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার উপর আলোকসম্পাতের আয়োজন ও প্রয়াস আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে সমস্যা সামাজিকই হোক আর রাজনৈতিকই হোক, আসলে তা হৃদয়-ধর্মের সমস্যা। যে নীতি হৃদয়ধর্মের সহজ সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই নীতিই সমালোচনার যোগ্য। 'চোখের বালি' বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছি তা এ সব ক-খানি বইয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কবির অভিজ্ঞতা এবং ভাবনা যখন অধিকাংশের স্বীকৃত চিন্তাধারার বিপরীতে গিয়েছে, তখনই তিনি উপন্যাস রচনার তাগিদ অনুভব করেছেন। গণ আবেগের যাথার্থ্য তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন অসীম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে।

আমাদের দেশে ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে স্বাদেশিকতার আবেগ যুক্ত হয়ে যে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল তার পরিণাম ভালো হয়নি। তারই ফলে সাত-শ বছরের ঐতিহ্য-পুষ্ট হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায়ে আমাদের জড়তাগ্রস্ত জনচিত্তে সাড়া জাগানো সম্ভব ছিল কি না আমি ঠিক জানি না। তিলক এবং গান্ধিজীর মতো ধর্মপ্রাণ লোকদের হাতেই জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চাবিকাঠি

ছিল। যাই হোক, ধর্ম-ভিত্তিক স্বদেশচিন্তার মধ্যে যে বিপদের বীজ ছিল রবীন্দ্রনাথ তা অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন 'গোরা' উপন্যাসে। গোরা চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ খুব যত্নের সঙ্গে গঠন করেছেন; তার শেষ রূপান্তরের জন্য তিনি আগে থেকে প্রস্তুতি করে রেখেছেন। গোরা যে প্রকৃতই গোঁড়া তা নয়, সে যে প্রকৃতই তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতি ভক্তিমান তা নয়; তার একমাত্র ধর্ম হল ভারতবর্ষ। সে মনে করে যে ভারতীয় জনতার অন্তরকে স্পর্শ করতে হলে ভারতেরই একজন হতে হবে। ভারতের একজন হওয়ার অর্থ হল ভারতীয় ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) সব-কিছুকে আপনার বলে গ্রহণ করতে হবে। হিন্দু ধর্মের মধ্যে সংস্কারযোগ্য অনেক কিছু থাকতে পারে, আছে; কিন্তু আগে সেই ধর্মকে আপনার বলে গ্রহণ করে তবে ভিতর থেকে সংস্কার করতে শুরু করলে তা কার্যকরী হবে। যত সংস্কারক এসেছেন তাঁরা বহিরাগতের মতো বাইরে থেকে সংস্কার চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। গোরার এই যুক্তির মধ্যে সাত কোটি মুসলমানের সমস্যাকে অবশ্য আলাদা করে দেখানো হয়নি; কিন্তু সেটুকু সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে গোরার যুক্তি প্রায় অকাট্য, এবং রবীন্দ্রনাথও গ্রন্থ মধ্যে কোনো বিকল্প পন্থার নির্দেশ দিতে পারেননি। উনিশ শতক থেকেই এ সমস্যা দেখা গিয়েছিল। শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের সুবিধামতো সামাজিক অনুশাসনগুলিকে কাটছাঁট করে গ্রহণ করেছেন, সহানুভূতি বশত তাঁরা দেশের উপর কিছু সংস্কারমূলক চিন্তা চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন; কিন্তু দেশবাসী তাঁদের আপন জন বলে গ্রহণ করেনি বা তাঁদের কথায় কান দেয়নি। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন তা একটু ভিন্ন—সমাজ (বা ধর্ম, আমাদের দেশে দুটো কথা প্রায় সমার্থক) বড, না ব্যক্তি বড। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল; কাজেই সমাজ কখনও ব্যক্তিকে ছাডিয়ে যেতে পারে না। সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্য সমাজের অনুশাসন মেনে চলতে হয়; কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। যদি কখনও দেখা যায় যে সামাজিক অনুশাসন মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মকে আঘাত দিতে উদ্যত হয়েছে, বুঝতে হবে সমাজের অনুশাসনগুলির পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই যুক্তিতেই পরেশবাবু বিনয়ের সঙ্গে কন্যা ললিতার হিন্দু মতে বিয়ে দিতে রাজী হলেন ব্রাহ্ম সমাজের ঘোরতর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। আবার গোরা যখন জানতে পারল যে সে জন্মগত দুর্ঘটনার কারণে শত চেষ্টা করেও হিন্দু হতে পারে না,

তখন সে উপলব্ধি করল তার কোনো ধর্ম বা সমাজ-বন্ধন নেই, তবু সে নিঃসন্দেহে ভারতবাসী। এই উপলব্ধির তাৎপর্য এই যে ধর্ম বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাদেশিকতার আদর্শকে গ্রহণ করা উচিত; একমাত্র তা হলেই স্বাদেশিকতার আদর্শ ব্যক্তির হৃদয়ধর্মের উপর উৎপীড়নে পর্যবসিত হবে না। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ অনুযায়ী গোরার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত; তবে তখনকার দেশের অবস্থায় এ সিদ্ধান্ত কতখানি বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল বলা শক্ত।

'গোরা' 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসকে ভাবপ্রধান উপন্যাস বা novel of ideas বলা চলে। 'গোরা' উপন্যাসে যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব-সংঘাত কাহিনীর থীম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা আগে দেখেছি। এমন কি এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রও কোনো না কোনো ভাবের বাহক মাত্র। যেমন গোরার মধ্যে সমাজ ব্যক্তি ও দেশের অবিভাজ্যতার ভাবরূপ প্রকাশ পেয়েছে; ললিতার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ রূপ পেয়েছে; বিনয় এই দুই বিপরীত আদর্শের মধ্যে আন্দোলিত হতে হতে শেষে দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে নিয়েছে; আনন্দময়ী সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বগামী স্নেহ ও প্রীতির আদর্শের বাহক; সুচরিতার মধ্যে ভক্তির আদর্শ; পানুবাবুর মধ্যে স্বার্থপরতার নামান্তর সংস্কারান্ধতার আদর্শ। এবং সর্বশেষে পরেশবাবুর মধ্যে সংস্কারবিহীন দার্শনিক প্রজ্ঞা। অবশ্য ভাবের বাহক হওয়া স্বত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কারণ রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব-সম্মত ব্যবহারকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

'ঘরে বাইরে'র মধ্যেও প্রধান উপজীব্য বিষয় ভাবদ্বন্দ্ব। নিখিলেশ ত্যাগ, স্বাধীনতা ও কল্যাণবোধের প্রতীক; সন্দীপ ভোগ ও অধিকার অর্জনে শক্তি প্রয়োগের আদর্শে বিশ্বাসী; বিমলা সাধারণ মানুষদের প্রতীক: যে শক্তিমান তার কাছেই সে আত্মসমর্পণ করতে ব্যগ্র। প্রথমটায় বিমলার মনে হয়েছিল নিখিলেশ অত্যন্ত দুর্বল, তার আদর্শ ক্লীবের আদর্শ; সে যে বিমলাকে সন্দীপের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার স্বাধীনতা দেয় তাও তার শক্তির নয়, দুর্বলতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে সন্দীপ যেন দেশের ও সমাজের যোগ্য প্রতিনিধি। গায়ের জোরে সে বিদেশী প্রভুকে দেশছাড়া করার স্বপ্ন দেখে। তার মনে যে বিভিন্ন রকমের কামনা আছে তাকে সংযত করার নির্বীর্য আদর্শ তার নয়; কামনার বস্তুকে গায়ের জোরে সে দখল করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল স্বদেশী

আন্দোলনের নাম করে সে গরিব ব্যবসায়ীর বিলিতি কাপড় নিয়ে বহ্ন্যুৎসব করে। গরিব মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা না করে এবং সে জন্য অপেক্ষা না করে সে জুলুমবাজির পথ গ্রহণ করছে। অথচ শক্তিশালী বিবেকহীন জমিদারের সঙ্গে আঁতাত করতে তার আটকায় না। টাকার জন্য সে তার অতি প্রিয় মক্ষিরানী (বিমলার আদরের নাম)-কে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনে প্ররোচিত করে। সন্দীপের জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে বিমলা দেখল তার এই অসৎ দেবতা তাকে মনুষ্যত্বের পক্ষে অমর্যাদাকর কার্যে প্ররোচিত করছে। বলপ্রয়োগের নীতি আসলে মানুষের শুভ হৃদয়ধর্মের উপরই আঘাত করেছে। বিমলা বুঝতে পারল নিখিলেশ যে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার আদর্শ গ্রহণ করেছে তা ক্লীবের আদর্শ নয়। তা-ই মানুষের সুস্থ হৃদয়ধর্মকে জাগ্রত করার উপায়; তাতে মানুষের পদস্খলনের আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সন্দীপ বাইরে শক্ত, ভিতরে দুর্বল; নিখিলেশ বাইরে দুর্বল, ভিতরে শক্ত।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে অনেক হিংসার সম্ভাবনা ও প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। সন্দীপের চরিত্র ও স্বদেশী আন্দোলনের নামে গ্রামের গরিবদের উপর জুলুমবাজির মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনেরই কিছু কিছু অপ্রীতিকর চিত্র বিধৃত হয়েছে। জমিদার শ্রেণীর পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে গ্রামের গরিব সম্প্রদায় ঠিক নিজেদের আন্দোলন বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এই স্বাধীনতার দাবির মধ্যে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পায়নি। এই অক্ষমতাকে সন্দীপ শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমার চোখে দেখেনি। কংগ্রেসী আদর্শের প্রচারিত গান্ধীবাদের খদ্দর-পরা বৈরাগ্য-পূত অহিংস রূপ আর তার বাস্তব ব্যবহারিক রূপের মধ্যে কিছু পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন। এই ব্যবহারিক রূপটাই সন্দীপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে: তার মধ্যে বৈরাগ্য নেই, ত্যাগ নেই, ক্ষমা নেই; ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার জন্য মূল্য দেওয়ার ইচ্ছা নেই। পক্ষান্তরে নিখিলেশের মনোভাব এই যে আদর্শ কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। স্বাধীনতার আদর্শ যত কাম্য জিনিসই হোক, জনসাধারণের মধ্যে তা স্বাভাবিক ভাবে উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে দরকার অর্থনৈতিক

পুনর্গঠনের কাজ; কারণ অর্থনৈতিক স্বাধিকার ভিন্ন কোনো স্বাধীনতারই কোনো দাম নেই।

'বৌঠাকুরানীর হাটে' তরুণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যে স্বাদেশিকতা যদি হৃদয়ধর্মের বিরুদ্ধে যায় তবে তা স্বৈরাচার মাত্র। 'ঘরে বাইরে'তে অনেক পরিণত অভিজ্ঞতা ও মননশীলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই বক্তব্য অনেক গভীরতর প্রত্যয় নিয়ে হাজির করেছেন। স্বাধীনতার আদর্শ যদি হৃদয়ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়, যদি তা দেশের প্রত্যেকটি লোকের স্বাধীন স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে তবেই তা মূল্যবান।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদন হচ্ছে অধিকার প্রমত্ততার প্রতীক; কুমুদিনী নারীর স্বাধিকার রক্ষার আদর্শের বাহক। কুমুর চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত কৌশলে সংগঠিত করেছেন। তার দাদা পুরোপুরি আধুনিকতন্ত্রে বিশ্বাসী; কিন্তু কুমু ছিল সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। স্বামীকে সে দেবতা বলে মনে মনে কল্পনা করেছে, তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন যখন তাকে বুঝিয়ে দিল স্বামীর ঘরে তার কোনো স্বতন্ত্র অধিকার নেই, সে স্বামীর ইচ্ছাদাসী মাত্র, তখন সে স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় বিদ্রোহ করে বসল। বংশধারা থেকে, দাদার কাছ থেকে যে মর্যাদাবোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই মর্যাদাবোধে যখন আঘাত লাগল, তখন এক মুহূর্তে তার স্বামী-সংস্কার ভেঙে গেল। সে বুঝতে পারল একমাত্র সমান মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই হৃদয়ধর্মের আদান-প্রদান চলে।

মধুসূদন খাঁটি বুর্জোয়া। সে মালিক, তার বাড়ি-ঘর সম্পত্তির, অধীনস্থ মানুষ জনের, এমন-কি স্ত্রীর। লোভ তার দুর্দান্ত বলে সহজেই সে কুসংস্কারের শিকার হয়। স্ত্রীকে সে জীবন্ত পুতুল হিসাবে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখল সে জীবন্ত মানবী। গায়ের জোরে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে সে হার মানল। কুমুর মানসিক শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি, সে অনায়াসে আরাম শয্যা ছেড়ে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুতে পারল, অনায়াসে ঝি-চাকরদের মধ্যে বসে বাসন মাজতে শুরু করল। মধুসূদনের অন্তরস্থ কামনাদীপ্ত পুরুষ অধৈর্য হয়ে উঠল; বিশেষ করে সে শুনল কুমু পয়মন্ত। কাজেই কুমুর কাছে সে দীন ভাবে সন্ধি প্রার্থনা করল। এ আবেদন স্বীকার করা কুমুর পক্ষে আরও কষ্টকর হয়ে উঠল কারণ এর মধ্যে তো হৃদয়ের পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই।

কুমু দাদার কাছেই ফিরে গিয়ে আর অমর্যাদাপূর্ণ স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে না

বলে সংকল্প করল। এখন গণতান্ত্রিক আদর্শে পুষ্ট দাদার আদর্শ সে গ্রহণ করল। কিন্তু স্বামীর ঘরে তাকে ফিরে যেতে হল, যখন সে জানতে পারল স্বামীর সন্তান তার গর্ভে। পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের সংগ্রামে নারী অনেক বেশি মানস শক্তির পরিচয় দেয়; কিন্তু প্রকৃতি তাকে একটি জায়গায় অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছে। কাজেই সত্যি সত্যি কবে যে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করবে তা রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টির অগোচর।

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ সমস্যামূলক উপন্যাস। 'ঘরে বাইরে'তে কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে যে গোপন হিংসা আপন দেশবাসীর বিরুদ্ধে উদ্যত রয়েছে কবি তার অশুভ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। 'চার অধ্যায়ে' তিনি দেখিয়েছেন যে, অক্ষম হিংসা অনেক বেশি শক্তিশালী হিংসার বিরুদ্ধে যখন গোপনচারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে লিপ্ত হয়, তখন তা অনেক অশুভের জন্ম দেয়। দুঃসাহসিক কর্মের প্রতি তরুণ মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। বিশেষ করে এলার মতো যে-সব পুরুষ বা মেয়ে যথেষ্ট স্নেহচ্ছায়ার আচ্ছাদন পায় না তারাই এদিকে বেশি ঝোঁকে। আদর্শভঙ্গের মোহে তারা অনায়াসে চিত্ত-সংযম ও ত্যাগব্রতের নামে নিজেদের হৃদয়ধর্মের প্রতি আঘাত করে। প্রকৃতি ধর্মের উপরে উৎপীডনের ফল ভালো হয় না। বুভুক্ষু স্নেহ আতঙ্ক আর আশঙ্কার চাপে বিকৃত হয়ে পরস্পরের প্রতি হিংসা আর ঈর্ষায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক কৌশলের নামে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগেব সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের দলের ছেলেদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করার কুটিল প্রবণতা দেখা দেয়। এলা এবং অতীনের মতো দুটি অমূল্য হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ এই কুটিল চক্রান্তের মধ্যে পড়ে অকালে শুকিয়ে গেল কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তাই দেখিয়েছেন।

উপজীব্য বিষয় বা থীমের বিচারে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহকে দু-জাতিতে ভাগ করা যায়। এক জাত সমস্যামূলক, অপর জাত দার্শনিক ভাবনামূলক। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, যুক্তিবাদ ও বাস্তববাদের ভিত্তিতে মানুষের হৃদয়-ধর্মকে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচারের একটিই মাপকাঠি আছে—কোনো নীতি বা সংস্কার বা অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতিজ শুভ হৃদয়ধর্মের বিকাশকে সাহায্য করছে, না ব্যাহত করছে। কাজেই 'বৌঠাকুরানীর হাট' থেকে শুরু করে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত

উপন্যাসের মধ্যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একটি সুসমঞ্জস ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করা শক্ত নয়। কিন্তু এগুলি ছাড়া তিনি আর এক জাতের উপন্যাস লিখেছেন। হৃদয়ধর্মের অনন্ত বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা কবির মনে যে রস সঞ্চার করেছে তারই ফলে এ-সম্পর্কে কিছু কিছু বিচিত্র দার্শনিক ভাবনা তাঁর মনে স্থান পেয়েছে। কবি এখানে জীবনের সমালোচক নন, জীবন-বৈচিত্র্যের সহৃদয় উপভোক্তা। জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ে অনেক লেখকই কাহিনী রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা করেননি। তাঁর যুক্তিবাদী সত্তা জীবনের অভিজ্ঞতাকে কতকগুলি দার্শনিক ভাবনায় রূপান্তরিত করেছে, এবং সেগুলিকে তিনি সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। কাজেই বাস্তববাদী ঢঙে লেখা হলেও এগুলি যে ঠিক বাস্তববাদী উপন্যাস নয়, একটি আদর্শায়িত (idealised) বাস্তবের রূপকের মধ্যে কবি তাঁর দার্শনিক ভাবনা (philosophic contemplation)-কে রূপ দিচ্ছেন, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বেলিনস্কি সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—thinking in images. এই সংজ্ঞার সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাস-গুলির পুরোপুরি মিল আছে। নৌকাডুবি, শেষের কবিতা, দুই বোন, মালঞ্চ এই জাতের উপন্যাস।

রচনারীতির দিক থেকে 'নৌকাডুবি' পুরোপুরিভাবে 'চোখের বালি'র মতো বাস্তববাদী উপন্যাস; এবং দুখানি উপন্যাসই প্রায় কাছাকাছি সময়ের রচনা। কিন্তু 'চোখের বালি' সমস্যামূলক, 'নৌকাডুবি' তা নয়। কিছুদিন আগেও হিন্দু নারীর মধ্যে যে স্বামী-সংস্কার ছিল, এবং যার কিছুটা এখনও বর্তমান আছে, কবি একটি রূপক কল্পনার মধ্যে তার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করেছেন। হিন্দু নারীর বিশ্বাস যে স্বামীর সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। একটি নারী আর একটি পুরুষের সম্পর্ক আকস্মিক নির্বাচনের ব্যাপার মাত্র নয়। স্বামী তার কাছে নিছক একটি রক্ত-মাংসের মানুষ নয়; এবং মানুষ হিসাবে সে কতখানি ভালো বা মন্দ, গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় তা তার বিবেচ্য নয়। স্বামী তার কাছে স্বামী নামক অন্তরস্থ একটি আইডিয়া বা বিগ্রহের কায়ারূপ। মানুষ হিসাবে সে যাই হোক, সে তার মন্ত্রপূত স্বামী এই প্রত্যয়ই যথেষ্ট; সে তার মনের মতো হোক বা না হোক সে তাকে ভালবাসবে এবং পুজা করবে। বলা বাহুল্য গণতান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা অনুযায়ী এই স্বামী-সংস্কার অচল। এবং আমি আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্য বুদ্ধি এবং রোমান্টিক তন্ত্র প্রামাণ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে অস্বীকার করে না। স্বভাবতই

স্বামী-সংস্কারের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী নন। কিন্তু হিন্দু নারীর এই দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে জীবন্ত সেখানে এর মধ্যে যে একটি অপরূপ মাধুর্য আছে তা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। এই আদর্শকে অবলম্বন করে হিন্দু নারীর হৃদয়-ধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। কাজেই কবির কাছে এটি কোনো অবশ্য পরিত্যাজ্য আদর্শ নয়। একটি আদর্শ যা কবির নিজের নয়, অথচ দার্শনিক নির্লিপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করে যার মধ্যে তিনি কিছু মাধুর্য প্রত্যক্ষ করতে পারছেন, তাই এ বইতে কবির উপজীব্য। কাজেই বইখানি philosophic contemplation-এর একটি উদাহরণ।

কবি একটি বিচিত্র কাহিনী উদ্ভাবন করে স্বামী-সংস্কারের প্রকৃত বিশেষত্বকে অনাবৃত করেছেন। দুই নৌকায় দুই নব-দম্পতি যাচ্ছিল। পথিমধ্যে নৌকা-ডুবি হওয়ায় এক নৌকার স্বামী বিমল আত্মরক্ষা করে আর এক নৌকার স্ত্রী কমলাকে আবিষ্কার করল। বিমল কমলাকে নিজের স্ত্রী বলে গণ্য করল, কমলাও বিমলকে স্বামী জ্ঞান করে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষকে অনায়াসে স্ত্রীত্বের নিবিড় সান্নিধ্য দান করল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কমলার মুখের একটি কথায় বিমল জানতে পারল সে তার স্ত্রী নয়। সে তখন কমলাকে কিছু না জানিয়ে তাকে একটু দূরে দূরে রাখল। কমলা বিমলকে স্বামী হিসাবে ভালবাসল এবং তার ব্যবহারের জন্য মনে মনে ব্যথা অনুভব করল। দৈবাৎ বিমলের প্রণয়িনীর কাছে লিখিত একটি চিঠিতে কমলা জানতে পারল বিমল তার স্বামী নয়। মুহূর্তের মধ্যে বিমলের প্রতি তার সমস্ত ভালবাসা উবে গেল। বিমল যে তার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, সুযোগ পেয়েও তার প্রতি কোনো অসঙ্গত আচরণ করেনি,—এ সব কথা ভুলে গিয়ে সে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ভাগ্যক্রমে সে তার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষের সন্ধান পেয়ে তার বাড়িতে দাসীরূপে স্থান পেয়েই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করল। যখন নলিনাক্ষ তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন তখন তার আনন্দের সীমা রইল না। কী করে নলিনাক্ষকে ঘিরে কমলার সমস্ত হৃদয়ের ঐশ্বর্য উৎসারিত হল কবি উজ্জ্বল ভাষায় তার চিত্র দিয়েছেন।

এই পর্যায়ের বইগুলির মধ্যে কবির পরিণত বয়সের রচনা 'শেষের কবিতা' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অনেক পাঠকের কাছেই বইখানি একটি উৎকৃষ্ট কাব্য বলে অনুভূত হয়েছে। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার পিছনে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর দার্শনিকসুলভ মননের পরিচয় রয়েছে অনেকে তার সন্ধান নেননি। বইখানিতে

কবির রোমান্টিক কল্পনাধর্মিতার সঙ্গে বাস্তব-চেতনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। দৈনন্দিন নাগরিক জীবনের গদ্যময়তা থেকে অনেক দূরে শিলং পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তার পরিবেশে কবি কাহিনীটির প্রধান অংশকে গড়ে তুলেছেন। অতি-আধুনিক অভিজাত-বংশীয় ধনী-সন্তান অমিতের সঙ্গে একটি ছাত্রীর গবর্নেশ লাবণ্যের প্রেম একটি নিখুঁত রোমান্টিক সৌন্দর্যের আদর্শ পরিমণ্ডল রচনা করেছে। তিনটি মাস তারা জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে একটি স্বপ্নজগতের মধ্যে কাটিয়ে দিল। লাবণ্যের মাসীর মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু অমিত যখন প্রস্তাব দিল যে তারা বিয়ের পর এক বাড়িতে থাকবে না— একজন বাস করবে গঙ্গার এপারে, আর একজন ওপারে, তখনই বোধ করি লাবণ্য তাদের বিবাহ-প্রস্তাবের অবাস্তবতা অনুভব করতে পেরেছিল। তারপর যথাসময়ে অমিতের বোন লিসি-সিসি আর তাদের বন্ধু কেটি মিত্তির শিলং পাহাড়ে এল অমিতের খোঁজে। তারা সঙ্গে নিয়ে এল শহুরে কৃত্রিমতা আর শ্রেণীগত অভিজাত্যের গর্ব। এক মুহূর্তে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে অমিত যে-সমাজের ছেলে সে-সমাজ লাবণ্যের নাগালের বাইরে। অমিতদের সমাজে লাবণ্য হবে অপাংক্তেয়, অবজ্ঞাত, বেমানান। অমিত-লাবণ্যের বিয়ে গেল ভেঙে; অমিত কেটি বা কেতকীর পাণিগ্রহণ করল। আর লাবণ্য তার পূর্ব-প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী শোভনলালকে জীবন-সঙ্গী রূপে গ্রহণ করল।

স্পষ্টতই এ-কাহিনীতে কবি প্রেমের মধ্যে দু-রকমের শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং তা কবি-কল্পিত নিবারণ চক্রবর্তী আর রবি ঠাকুরের মধ্যে চরিত্রগত যে পার্থক্য রয়েছে তারই অনুরূপ। কবি নিবারণ চক্রবর্তী আধুনিক বাস্তববাদী কবি; সে স্পষ্টতার পূজারী, সবকিছুকে সে নিঃশেষে জানতে চায়, অচেনাকে না চেনা পর্যন্ত তাকে সে রেহাই দেবে না; সব কিছু সে নিঃশেষে ভোগ করবে। সে মনে করে না যে তাজমহলকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে তাজমহলের স্রষ্টা তাকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে, আর তাজমহল শুধু শূন্য মন্দির রূপে সেই স্মৃতি ধরে রয়েছে। বরং তাজমহল যুগে যুগে যে নরনারী ধরায় এসে জীবন উপভোগ করছে তার প্রতীক; সে শূন্য নয়, পূর্ণ। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন অনির্দেশ্যতার, অনিশ্চয়তার কবি; জানা থেকে অজানার দিকে তার যাত্রা; ভূমি থেকে ভূমার দিকে। অবশ্য, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিবারণ চক্রবর্তী অনুস্যূত; যেমন নিবারণ চক্রবর্তী-রূপী অমিতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। এই দুই

কবির মধ্যে যে পার্থক্য, দু-জাতের প্রেমের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। এক জাতীয় প্রেম হল ঘরোয়া প্রেম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যা দরকার হয়; যে-প্রেম বন্ধন স্বীকার করে, হিসাব-নিকাশ করে; যে-প্রেমের সঙ্গে সমাজ শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতি সব-কিছুর প্রশ্ন জড়িত। আর এক জাতের প্রেম হল মুক্তি; সংসারের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে তা এক মানসলোক রচনা করে; তা বন্ধন মানে না। হিসাবের ধার ধারে না। সমাজ সংসারকে হেলায় অস্বীকার করে। অমিত-লাবণ্যের প্রেম এই দ্বিতীয় জাতের রাবীন্দ্রিক প্রেম, যদিও অমিতই স্বয়ং নিবারণ চক্রবর্তী। পক্ষান্তরে লাবণ্য-শোভনলালের প্রেম ও অমিত-কেতকীর প্রেম প্রথম জাতের যা নিবারণ চক্রবর্তীর কাব্যের বিষয়। কাজেই 'শেষের কবিতা'র আরম্ভ রোমান্টিক, সমাপ্তি বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ দুয়ের মধ্যে কোনো সত্যিকারের বিরোধ নেই; এ দুই মিলে জীবনের পূর্ণতা।

'শেষের কবিতা'য় যেমন দু-জাতের প্রেম রূপ লাভ করেছে; 'দুই বোনে' তেমনি দু-জাতের নারীর চিত্রায়ণ রয়েছে। শশাঙ্কর স্ত্রী শর্মিলা হল মায়ের জাত। তার প্রতিভা সাংগঠনিক। সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে আন্তরিক পরিচর্যা দিয়ে সে শশাঙ্কের জীবনকে সুন্দর ও ঐশ্বর্যবান করে তুলতে সচেষ্ট। তার পরিচর্যার গুণে শশাঙ্ক সামান্য চাকুরে থেকে এক বিরাট ব্যবসায়ীরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। শর্মিলার ছোট বোন উর্মিমালা হল প্রেয়সীর জাত। ডাক্তার নীরদের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর নীরদ গেল বিলেতে; উর্মিমালার উপর ভার পড়ল বিজ্ঞাননিষ্ঠ ডাক্তারের যোগ্য সহচরী রূপে নিজেকে গড়ে তোলার। সে তাই পিতৃগৃহে পঠন-পাঠনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। কিন্তু এই কর্মনিষ্ঠার মধ্যে উর্মিমালার সত্যিকারের পরিচয় নেই। এখানে সে বাইরের চাপে নিজেকে অপরের মনের মতো করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে মাত্র। তার সত্যিকারের প্রকৃতিগত প্রতিভা ধরা পড়ল যখন সে দিদির অসুখের সময়ে জামাইবাবুর সংসার দেখা শোনা করার জন্য জামাইবাবুর বাড়িতে এল। শশাঙ্কের কাছে তার মায়াবিনী মোহিনী প্রকৃতি ধরা পড়ল। শশাঙ্ককে সে প্রীতি দিল না, দিল উত্তেজনা; তাকে পূর্ণতা না দিয়ে দিল উন্মাদনা। শর্মিলা নিজেকে আড়ালে রেখে স্বামীর কর্মজীবনকে অবাধ সুযোগ দিয়েছিল। উর্মিমালা নিজের আকর্ষণী শক্তিকে সামনে তুলে ধরে তাকে টেনে আনল অবাধ মোহগ্রস্ততার মধ্যে। ফলে শশাঙ্কের ব্যবসা ফেল পড়ল।

এই দুই জাতের নারীর চিত্রায়নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনো নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করছেন না। কে ভালো কে মন্দ—এ প্রশ্ন অবান্তর ; কারণ উভয় নারীই তাদের প্রকৃতজ হৃদয়ধর্ম অনুযায়ী কাজ করেছে। দুজনে পুরুষকে দু-রকমভাবে ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন হৃদয়ধর্মের চরিতার্থতা অনুভব করেছে।

'মালঞ্চ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে নারীর হৃদয়ধর্ম অন্য নারীর উপস্থিতির ফলে বাধাগ্রস্ত হলে তা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে নিজেকেও অসুখী করে, আশে-পাশের আর সবাইকে অসুখী করে। নীরজা অসুস্থা, কিন্তু তাই বলে সে অসুস্থা হওয়ার ফলে স্বামীর জীবনের যে অংশটা শূন্য পড়ে রয়েছে, সে-অংশটা আর কোনো নারী এসে পূর্ণ করুক এ-কথা সে ভাবতে পারে না। পরাজিত প্রতিহত নারীধর্ম ক্ষমা করতে জানে না।

(রবীন্দ্র সাহিত্যে ট্রাজেডি নেই এ আপ্তবাক্যের উপর আমার খুব আস্থা নেই। 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র পরিসমাপ্তিকে ট্রাজেডি বলব না তো কী বলব। অনুরূপ 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে'র সমাপ্তিকেও প্রায় ট্রাজেডি না বলে উপায় নেই। সাধারণত আধুনিক ট্রাজেডিতে মৃত্যু বা হত্যা আবশ্যিক নয়। যে-সংকটের পরিণামে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেও সামঞ্জস্য সম্ভব নয়, বেদনা এবং বিচ্ছেদ যে-সংকটের অপরিহার্য পরিণতি, এক কথায় যার অনিবার্য পরিণতি অপ্রীতিকর, তাকেই আমরা ট্রাজেডি বলে গণ্য করি।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণত সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের কবি এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বিশ্বাস করেন যে শুভবুদ্ধি, কল্যাণবোধ ও যুক্তিবাদ নিয়ে অগ্রসর হলে অধিকাংশ সংকট বা সমস্যার ক্ষেত্রেই সুসমঞ্জস সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে কোনো না কোনো ধরনের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু 'যোগাযোগে'র সমাপ্তিতে সামঞ্জস্যের দেখা মেলে না, সেখানে আছে আত্মসমর্পণ যা ট্রাজেডিরই নামান্তর। কিন্তু আরও পরিণত বয়সে কবি 'চার অধ্যায়ে' কোনো সহজ সামঞ্জস্যের পরিসমাপ্তি টানেননি। তিনি জানেন, মানুষের কর্মের একটা নিজস্ব লজিক বা গতি পারম্পর্য আছে, এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। অনেকে মিলে যখন কোনো ভয়ানক কর্মে লিপ্ত হয়, তার লজিক আরও দুরারোহ। এলা এবং অতীন প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছে তাদের ভ্রান্ত আদর্শের দরুন তারা বিড়ম্বিত হচ্ছে, তবু নিজেদের কর্মচক্র থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। তথাপি 'চার অধ্যায়ে'র সংকট সমাধানাতীত নয় ; আদর্শ ভ্রান্ত

হলেও এবং সে ভ্রান্তি বুঝতে পারলেও তার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়, তবে অসম্ভবও নয়।

কিন্তু এমন সংকটও আছে যার কোনো সমাধান নেই। মানুষের শুভ হৃদয়ধর্মের স্বাভাবিক বিকাশকেই কবি জীবনধর্ম বলে মনে করেন। কিন্তু এই হৃদয়ধর্ম আপন পথে চলতে গিয়ে অনেক সময় এমন অন্তর্দ্বন্দ্বের জট সৃষ্টি করে যে জট খোলা যায় না। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ একবার এমনি জটিল জট রচনা করেছিলেন। কাহিনীটি এইরূপ : মহেন্দ্র এবং আশার বিবাহিত জীবনের একটানা প্রেমচর্চায় ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল। সেই সময় এল দূর সম্পর্কের বিধবা বিনোদিনী। সে তার বিড়ম্বিত জীবনের ঈর্ষা বশত এবং সমাজের প্রতি এক ধরনের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব বশত আপন ছলা-কলা বিস্তার করে মহেন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। হৃদয়ধর্মের এই বিকৃত প্রকাশের জন্য অবশ্য অযৌক্তিক সমাজনীতি দায়ী। কিন্তু বিনোদিনীর প্রকৃত আকর্ষণ ধাবিত হল বিহারীর প্রতি; এবং বিহারী আপন অজ্ঞাতসারে সরলহৃদয়া আশার প্রতি আকৃষ্ট হল। এইভাবে দস্তুরমতো আলজেব্রার সাইক্লিক অর্ডারের অঙ্কের মতো একটি চক্রাকার প্রেমের জট সৃষ্টি হল যার আকৃতিটা এই রকম : আশা মহেন্দ্রেব দিকে, মহেন্দ্র বিনোদিনীর দিকে, বিনোদিনী বিহারীর দিকে এবং বিহারী আশার দিকে। এই চক্রাকার জটের সবটুকুর জন্যই সমাজনীতি দায়ী নয়, তা অনেকাংশে হৃদয়ধর্মের স্বাধীন গতিবিধির ফলে জাত। ক্রম-ঘনায়মান জটিলতার ফলে আমরা এক সময় দেখতে পাই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে এনে তুলেছে। কিন্তু এখানে এসে বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিঃসংশয়ে প্রত্যাখ্যান করল এবং বিহারীর কাছে হৃদয় নিবেদন করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হল। কিন্তু লেখকের যদি সদিচ্ছা থাকে তা হলে অবাধ্য বিপথগামী চরিত্রদেরও শুভ পথে আসতে দেরি হয় না। কাশীতে এসে সহসা বঞ্চিতা বিনোদিনীর ভোগতৃষ্ণা স্বর্গীয় প্রেমের অমলিন প্রভায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সে এক ত্যাগব্রতী মহীয়সী মহিলায় পরিণত হল। বিহারী তার একনিষ্ঠার কথা জানতে পেরে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করল। শেষ পর্যন্ত এই বিবাহটি না ঘটিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তবু খানিকটা নিরাসক্তি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। সামঞ্জস্যের নামে কাহিনীর উপর এতখানি বলাৎকার সহ্য হত না। বিহারী বিনোদিনীকে ভালবাসেনি; তার বিবাহ-প্রস্তাব নিতান্তই হঠাৎ-জাগা সহানুভূতির

ফল। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী প্রেমের মর্যাদাবোধকে বজায় রেখেছে।

কাজেই 'চোখের বালি'তে সুসমঞ্জস পরিসমাপ্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছু কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাস্তববাদী সত্তা পরিণত বয়সে স্থিতধী দার্শনিক মননের অধিকারী হয়ে এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছে।। 'দুই বোনে' মায়ের জাত শর্মিলা বোন উর্মিমালাকে সপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু উর্মি রিক্ত নিঃশেষিত শশাঙ্ককে দারুণ অবজ্ঞায় পরিত্যাগ করে সরে পড়ল। শর্মিলা শশাঙ্ককে ফিরে পেল বটে, কিন্তু এ আগের শশাঙ্ক নয়; এ শুধু অর্থের দিক থেকেই দেউলে নয়, মনের দিক থেকেও। দার্শনিক নির্মমতার সঙ্গে কবি দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত পরিবেশে নারী মাতৃরূপে বা প্রেয়সীরূপে জীবনকে ঐশ্বর্যশালিনী করতে পারে; কিন্তু আবার এমন পরিবেশ দেখা দিতে পারে যেখানে এই দুই কাঙ্ক্ষিত নারী-প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্ব দারুণ বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। শুভ বুদ্ধি এবং যুক্তিবাদের সাহায্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু হৃদয়ধর্মের স্বাধীন বিকাশের ফলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা দেখা দেয় তার কোনো সমাধান রবীন্দ্রনাথ জানেন না।

২। রচনা-রীতি

রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি উপন্যাস রচনা করলেও সেগুলি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রচিত এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের রচনারীতির আশ্রয় নিয়েছেন। রচনারীতির বিচারে তাঁর উপন্যাসগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে 'বৌঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'; দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'চোখের বালি' এবং 'নৌকাডুবি'; তৃতীয় শ্রেণীতে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'যোগাযোগ', তবে 'গোরা' বইটিকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের অন্তর্বর্তিকালীন উপন্যাস বলে গণ্য করা সঙ্গত; চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়'।

প্রথম দুখানি বই বঙ্কিমী রীতিতে রচিত। উপন্যাস রচনার সময়ে বঙ্কিম লেখক হিসাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করতেন তা হল সর্বজ্ঞ, বিশ্লেষক, ব্যাখ্যাকার এবং বিচারকের ভূমিকা। তিনি এক নিরপেক্ষ এবং উচ্চতর ভূমি থেকে বর্ণিত চরিত্রদের পর্যালোচনা করতেন।

বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসই ক্ষীণকায়। কিন্তু সেগুলির গঠন-নৈপুণ্য অসাধারণ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটিতে দেশের এক সংকটকালের জটিল রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলার এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন নর-নারীর জীবনের গতি ও পরিণতির চিত্র স্থান পেয়েছে। ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে এরকম একখানি এপিক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট উপন্যাসের আয়তন হাল আমলের একখানি দশফর্মা উপন্যাসের চেয়ে বেশি নয়। নিপুণ শিল্পী যেমন মাত্র কয়েকটি রেখায় একটি রক্ত মাংসের মানুষের ত্রিমাত্রিক অবয়বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন, বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সেই জাতের। বঙ্কিমের এই দুর্লভ ক্ষমতার মূলে ছিল নির্বাচনের দক্ষতা। তিনি এমন প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র, ঘটনা ও দৃশ্যের পরিকল্পনা করতেন যে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী-উক্ত কালের সামাজিক (ও সময়ে রাজনৈতিক) পরিমণ্ডল গড়ে উঠত।

বঙ্কিমের আর একটি দুর্লভ ক্ষমতা ছিল চরম সংকট মুহূর্ত সৃষ্টিতে। এই ব্যাপারে সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা চলে। একটি ঘটনা স্বাভাবিক লজিক অনুসারে ঘটনার পর ঘটনার জন্ম দিচ্ছে, তার সঙ্গে ভিন্ন আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগ ঘটে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অপরিহার্য গতি সৃষ্টি হচ্ছে। এই গতি সম্পূর্ণভাবে বাস্তব জীবনের গতির যুক্তি-পারম্পর্যের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অথচ তবু মনে হয় তা পূর্ব-পরিকল্পিত। এইখানেই বঙ্কিমের নিয়তিবাদ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের রীতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে স্বভাবতই এতখানি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তার একটি কারণ রবীন্দ্রনাথ fatalist নন। 'বৌঠাকুরানীর হাটে' রবীন্দ্রনাথও একের পর এক চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন— যেমন, বসন্ত রায়কে হত্যা, প্রতাপ-কর্তৃক জামাতা নবদ্বীপ-রাজকে হত্যার সংকল্প এবং তার পলায়ন, উদয়াদিত্যের বন্দীদশা ও পলায়ন। কিন্তু সবগুলি ঘটনাই একান্তভাবে মনুষ্য-সৃষ্ট; তার মধ্যে জীবন-রহস্যের অতলান্ত ব্যঞ্জনা নেই। দ্বিতীয়ত, চরিত্র, ঘটনা এবং দৃশ্যগুলি কবির রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্ভাবিত; ঐতিহাসিক কালের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সেগুলির উপযোগিতা সামান্য।

উপন্যাস হিসাবে 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র আর একটি বড় ত্রুটি এই যে তার কোনো পরিণতি নেই। বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একটি ভ্রান্ত আদর্শের অহমিকা বশত প্রতাপ হৃদয়ধর্মের উপর একের পর এক

আঘাত দিতে ব্যস্ত, আর হৃদয়ধর্ম-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বৃথাই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। চরিত্রগুলি সরলরেখাত্মক : প্রতাপ রক্তমাংসের নিষ্ঠুরতা, বসন্ত রায় প্রীতি, সহৃদয়তা ও ক্ষমাশীলতার প্রতিমূর্তি।

বঙ্কিম বিচারক হলেও নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি নিয়তিবাদী বলে এক কথায় বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কুন্দ, শৈবলিনী, এমন-কি রোহিণী পর্যন্ত তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। কারণ তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের অপরিহার্য লজিক অনুসারে অগ্রসর হয়েছে। নৈতিক বিচারে তারা শাস্তি পেয়েছে ; কিন্তু তারা নিয়তির হাতের অসহায় ক্রীড়নক। তারা তাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুসারে যে পথে গিয়েছে, সে-পথে ছাড়া অন্য পথে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচার অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। প্রতাপের মধ্যে তিনি একটুও ভালো দেখতে পাচ্ছেন না ; তার কর্মের মধ্যে কোনো অপরিহার্য লজিক নেই ; সে ইচ্ছে করলেই ভিন্ন উদারতর নীতি গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু নেয়নি। বঙ্কিম কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজীবের মধ্যেও নির্মলকুমারীর সঙ্গে সম্পর্কে কিছু মানবীয় হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

'রাজর্ষি'তে কিছুটা সাংগঠনিক উন্নতি দেখা যায়। বইখানিতে একটি পরিণতি আছে, যদিও তা দুর্বল। চরিত্র-চিত্রণ এ-বইতেও সরলরেখাত্মক। গোবিন্দ মাণিক্যকে একটি সাত্ত্বিক বুদ্ধির যন্ত্র বলে মনে হয়।

আসল কথা বঙ্কিমী রীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব ছিল না। তিনি হৃদয়ধর্ম-সর্বস্ব মানুষ ; যে-রীতির ভিত্তি হল—man in action—সে-রীতি তাঁর পক্ষে অনুপযোগী। তাই প্রথম দুটি বইয়ের পরে 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিদ্যুৎ-দীপ্ত চমক দেখে আমরা বিস্মিত হই। এ-বইয়ের প্রধান ভিত্তি হল মানুষের আবেগ। লেখক এখানে কোনো উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়ে দূর থেকে চরিত্রদের নিরীক্ষণ করছেন না। তিনি যখন যে চরিত্রটিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করছেন, তখন সেই চরিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সমান হিসাবে তাঁর দৃষ্টি-কোণটি বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করছেন। বিচারকের ভূমিকা তিনি ত্যাগ করেছেন। তিনি সবজান্তা, বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাকার। খুব সম্ভব জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ ও টলস্টয় প্রভৃতির উপন্যাস পাঠ করে তিনি এই রীতির আভাস পান। তবে 'চোখের বালি' রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা এসেছে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে। বইখানি বঙ্কিমের জবাব।

('চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথের সুপরিণত রচনা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে ; এবং ঘটনাটি বিস্ময়কর এইজন্য যে ঠিক এ জাতের বই বাংলায় এই প্রথম প্রকাশিত হল। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার ভিতরে সংশ্লিষ্ট চরিত্রসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তাদের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রবণতার বিশদ এবং রস-ঘন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটি চরিত্র যে কী ভাবে নিজের নিজের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন : কাজেই তারা ভালো না মন্দ এ প্রশ্ন প্রায় ওঠে না। মহেন্দ্র সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। একটু বেশি আদরে মানুষ হয়েছে বলে সে স্বার্থপর, একগুঁয়ে, অপরের মনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ পায় না। আশা সংসারানভিজ্ঞা এবং আনাড়ী ; স্বামী তার উপর একচেটিয়া দখল স্থাপন করতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়ার মতো দূরদর্শিতা তার নেই। বিনোদিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী ; সে সমাজে তার অবস্থা সম্পর্কে খুব সচেতন বলে প্রথমে মহেন্দ্রকে এড়িয়ে চলেছে ; কিন্তু যখন যোগাযোগ হল তখন তার মধ্যে বঞ্চিতা নারীর প্রতিহত হৃদয়ধর্ম আশার বিরুদ্ধে ঈর্ষারূপে আত্মপ্রকাশ করল। কাজেই চরিত্র বিশ্লেষণ সব সময়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথ ধরে চলেছে।)

('চোখের বালি'র সামগ্রিক পরিকল্পনায় ত্রুটি আছে বলে মনে হয়। প্রত্যেক চরিত্রের নিজস্ব সমস্যা ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে লেখক এত বিস্তৃত আয়োজন করেছেন, যে বইটিকে একটি পারিবারিক এপিক বলে প্রথমে অনুমান করার কারণ ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি বিনোদিনীই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। বিধবা বিনোদিনীর হৃদয়-সমস্যাই আসল ব্যাপার, সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রই শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর পরিণতিতে সাহায্য করেছে। এইভাবে যদিও প্রতিভাধর লেখক খুব সচেতনভাবে কাহিনীর ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তথাপি চারটি চরিত্রের মধ্যে পূর্ববর্ণিত চক্রাকার প্রেমের জটিল বিস্তার কাহিনীর ভারসাম্যকে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বইখানি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমাদের মনে এই সংশয় জাগে যে কাহিনীর থীম জটিল হৃদয় দ্বন্দ্ব, না বিনোদিনী নামক সামাজিক সমস্যা। কাহিনীতে বিনোদিনী অবশ্য ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করেছে ; কিন্তু হৃদয়-দ্বন্দ্বের চিত্রের আধিক্য সামাজিক সমস্যার গুরুত্বকে হ্রাস করে দিয়েছে।

'চোখের বালি'র সঙ্গে আমরা যদি 'বিষবৃক্ষে'র তুলনা করি, তবে দেখতে পাব অনেক প্রাচীনতর রচনারীতি সত্ত্বেও 'বিষবৃক্ষে' কাহিনী নিমেষের জন্যও

লক্ষ্যচ্যুত হয়। সহজ অপরিহার্য ঘটনা-পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে 'বিষবৃক্ষে'র কাহিনী দুর্বার গতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তার ফলে এই কাহিনী অত্যন্ত জমাট ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা বুঝতে পারি বঙ্কিমের সংহতিবোধ এবং নাট্যচেতনা রবীন্দ্রনাথ এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি।)

'নৌকাডুবি'র কাহিনী আরও ত্রুটিপূর্ণ। উপন্যাসটির থীম হল ভারতীয় নারীর স্বামী সংস্কারের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন। কাজেই এই কাহিনীতে কমলার সঙ্গে তার ভুল-স্বামী বিমলের জীবনযাত্রা, এবং কমলার সঙ্গে তার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষের মিলন—এই দুটিই প্রধান ঘটনা। কিন্তু বিমল হেমনলিনীর প্রেম নিয়ে এবং খুড়োমশাই ও শ্যামের উপকাহিনী নিয়ে লেখক যে সুবিস্তৃত জাল বিস্তার করেছেন তা থীমের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কমলার সঙ্গে নলিনাক্ষের সাক্ষাৎ ও মিলনকে সহজ ও প্রত্যয়গ্রাহ্য করার জন্য খুড়োমশাইয়ের পারিবারিক কাহিনীটি রচনা করে কোনো লাভ হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য তাতে ঢাকা পড়েনি। লেখকের থীমের জন্য কমলা-নলিনাক্ষের দেখা হওয়া এবং পরস্পরকে আসল ব্যক্তি বলে চিনতে পারা অত্যাবশ্যক; কাজেই সেটিকে আকস্মিকতা মুক্ত করে দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা না করে আকস্মিক ঘটনা হিসাবে দেখানোই উচিত ছিল। এরকম ঘটনা সাধারণত হয় না। কিন্তু হলে তার ফল কী রকম হতে পারে বইটিতে তো তা-ই উপজীব্য বিষয়।)

'গোরা' উপন্যাস থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত উপন্যাসের উপর একটি দার্শনিক ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প প্রক্রিয়া অধিকাংশ লেখকের শিল্প-প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র পথ ধরে চলেছে। সাধারণত লেখক বাস্তব জগতে যে কার্যকারণ পরিণাম প্রত্যক্ষ করেন একটি কাল্পনিক কাহিনীর হ্রস্ব পরিসরের মধ্যে তাকেই বিধৃত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়া ঠিক তা নয়,—ছবি থেকে ছবিতে যাওয়া নয়। বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে মননের সাহায্যে তিনি কতকগুলি সাধারণ সূত্রে উপনীত হন, এবং সেই সূত্রগুলিকে ছবিতে রূপান্তরিত করে তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করেন। 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঠিক বাস্তব থেকে গৃহীত চরিত্র নয়; বাস্তবের চিন্তা-সংকটে যে-সব আইডিয়াগুলি ক্রিয়াশীল 'গোরা'র চরিত্রগুলি তাদেরই কায়ারূপ মাত্র। তথাপি 'গোরা' উপন্যাসে পুরোপুরিভাবে প্রচলিত বাস্তববাদী রীতি অনুসৃত হয়েছে বলে এটিকে অন্তর্বর্তিকালীন উপন্যাস বলে গণ্য করা চলে।

'গোরা' উপন্যাসে লেখক একটি অসাধ্য সাধন করেছেন। তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে কাহিনীর গতি-পরিণতির গাঁটছড়া এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যে একের সঙ্গে অপরটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। কাহিনীর নায়ক যদিও গোরা, কিন্তু বিনয়ই মুখ্য চরিত্র। গোরা একটি অনমনীয় ভাবের প্রাচীরে আবদ্ধ স্থিতিশীল চরিত্র; কাজেই গোরাকে কেন্দ্রে রাখলে কাহিনীর অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। বিনয় গোরার সমর্থক এবং ব্যাখ্যাকার; অথচ গোরার অনমনীয় প্রাচীরকে অতিক্রম করার মতো মানসিক নমনীয়তা তারই আছে। স্বভাবত বিনয়-ললিতা প্রেমোপাখ্যানই কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। ললিতা গোরার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। গোরা সমাজবাদী, ললিতা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী; গোরা তত্ত্বপ্রিয়, তত্ত্বের জোরে সে হৃদয়ধর্মকে আঘাত করে, ললিতা মূর্তিমতী নারী-প্রকৃতি, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হৃদয়ধর্মের স্বাভাবিক দাবি। কাজেই বিনয়-ললিতার বিবাহ মানেই জীবনের কাছে, হৃদয়ধর্মের কাছে, জীবনবিরোধী তত্ত্বের পরাজয়। এই বিবাহের ফলে শুধু যে গোরাই পরাজিত হল তা নয়, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে কূপমণ্ডুক নিয়মের শাসন রয়েছে তারও পরাজয় ঘটল।

আর এক দিক থেকে সুচরিতার মা হরিমোহিনী গোরার বিপরীত চরিত্র। হরিমোহিনী সংস্কারবশত সনাতনপন্থী; সংস্কারের নাগপাশে তার মন ও হৃদয়ধর্ম কুঞ্চিত। কিন্তু গোরা অত্যন্ত হৃদয়বান পুরুষ, তার মন বিরাট ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন; তার সনাতনত্বে বিশ্বাস ভ্রান্তনীতি জাত। যেদিন সে জানতে পারল নিছক জন্মের দুর্ঘটনার জন্য সে হিন্দু হতে পারবে না, সেদিনই সে সনাতননীতির সংকীর্ণতা অনুভব করতে পারল। তার যে হৃদয়ের ঐশ্বর্য এতকাল বন্দী হয়ে ছিল তা মুক্তিলাভ করল সুচরিতার সঙ্গে মিলনে।

বিনয়-ললিতা কাহিনী আর গোরা-সুচরিতা কাহিনী পরস্পরের অনুপূরক, পুনরাবৃত্তি নয়। এই বইটি সম্পর্কে সাধারণ আপত্তি এই যে এতে তর্ক-বিতর্ক অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি এইজন্য যে তর্কের বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের আবেগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গোরার তর্ককে বাদ দিয়ে গোরা চরিত্রকে ভাবা যায় না। চরিত্র, কাহিনী এবং বিতর্কিত বিষয়ের সর্বাঙ্গীণ সাযুজ্যের জন্যই উপন্যাসখানি সার্থক।

'গোরা' উপন্যাসে বিনয়-ললিতা কাহিনীটিই প্রধান নাটকীয় ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক, তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব চরমভাবে

আত্মপ্রকাশ করেছে। ধাপে ধাপে ঘটনার পর ঘটনা সংযোজিত হয়ে যে নাটক জমে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব নাট্যকুশলতার সঙ্গে সংগঠিত করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরেশবাবুকে মাঝখানে স্থাপন করে তিনি সংঘর্ষের তীব্রতাকে হ্রাস করে এনেছেন। ফলে এত বড় তীব্র সংঘাতের পরিণামে সামান্য কিছু মন ভাঙাভাঙি ছাড়া আর কোনো বড় রকমের ক্ষতি হল না। এর মধ্যে আমরা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের একটি চরিত্রগত বিশেষত্বের সন্ধান পাই। জীবনের অকরুণ নিষ্ঠুর পরিণামের চিন্তা তাঁর শিল্পবোধকে পীড়িত করে বলে তিনি প্রায় সর্বত্র তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। বঙ্কিমের সঙ্গে এইখানে তঁরে পার্থক্য। বঙ্কিম জানেন যে সামান্য ভুল বা ক্ষতির জন্য মানুষকে যে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তার সঙ্গে তার অপরাধের কোনো পরিমাপ হয় না। বঙ্কিমের উপন্যাসের নাটকীয় দ্বন্দ্ব তাই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। তা এমন কিছু ক্ষতি সাধন করে যা কিছুতেই পূরণ হবার নয়, রবীন্দ্রনাথ এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে অনেক সময়েই গররাজী।
গোরার শেষ আকস্মিক পরিবর্তনকে যতখানি আকস্মিক বলে মনে হয় আসলে তা নয়। এ জন্য লেখক পূর্বেই এমন ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন যে গোরার পালক পিতা গোরার ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকে সুনজরে দেখেন না এবং যে-কোনো মুহূর্তে একটি পারিবারিক ঝড় দেখা দিতে পারে। গোরার গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং সুচরিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হরিমোহিনীর কাছে আঘাত-প্রাপ্তিতে তার সংস্কার-প্রীতির উপর আঘাত পড়েছে। তবে গোরার মতো চরিত্র আস্তে আস্তে বদলায় না, হঠাৎ বদলায়।
'গোরা' উপন্যাসের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতিতে আর একটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। লেখকের ভূমিকাকে তিনি এখন আরও সঙ্কুচিত করে এনেছেন। তিনি এখন প্রধানত রিপোর্টার—ঘটনার ও সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের মানস-গতির। কখনও কখনও তিনি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু চরিত্রদের উদ্দেশ্য কর্মপরিকল্পনা বা কোনো বিশেষ অবস্থায় তাদের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার দায় লেখক ত্যাগ করেছেন। তার ফলে কাহিনীর গতি এখন অনেক সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠেছে: পদে পদে বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যার বাহুল্যে তার গতি ব্যাহত হয় না। অবশ্য চরিত্রদের বিচিত্র কার্যকলাপের কার্যকারণ ব্যাখ্যার ভার এখন পাঠকদের। চরিত্র ঘটনা এবং পাঠকের মাঝখানে এখন একজন ব্যাখ্যাকার উপস্থিত না থাকায়

কাহিনীর সঙ্গে এখন পাঠক প্রত্যক্ষতর সম্পর্ক অনুভব করেন; কাহিনী-সৃষ্ট আবেগ তাঁর মধ্যে আরও সহজে সঞ্চারিত হয়।

কবি এখন অনেক বেশি থীম-সচেতন। তিনি আর ঢিলেঢালাভাবে বাস্তবের কোনো দৃশ্য বা ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে চান না। যেমন আমরা 'চোখের বালি' বা 'গোরা'তে দেখেছি। যে-ভাবদ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে থীমটি পরিকল্পিত, কবি এখন সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে সেই দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করতে তৎপর। এই দ্বন্দ্বের গভীরতা এবং স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য যে পূর্ব-ইতিহাস এবং চরিত্র সম্পর্কে যে পূর্ব-পরিচয় জানা প্রয়োজন কবি তা সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উপস্থিত করেছেন। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্র আশা বা রাজলক্ষ্মী ও বিহারীকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, কবি দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোজন করে তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। 'যোগাযোগে' মধুসূদন এবং কুমুদিনীর বিবাহের ইতিহাস, দুটি পরিবারের মধ্যে বংশ পরম্পরা-গত বিবাদের ইতিহাস লেখক কয়েক পাতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সেরে দিয়েছেন। কাহিনীর যেটা আসল অংশ অর্থাৎ যেখানে থীম অনুযায়ী ভাব-দ্বন্দ্বটি রূপায়িত হয়েছে, সেখানে লেখক একের পর এক নাটকের দৃশ্যের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোজিত করে পাঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই পর্যায়েও থীমের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় এমন কোনো দৃশ্য বা ঘটনা বা চরিত্রের অনুপ্রবেশকে লেখক খুব সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। ভাষায় কিছু বক্রোক্তির সাহায্যে ও দু-একটি কৌতুককর দৃশ্য অবতারণা করে লেখক পাঠকের আগ্রহ বজায় রেখেছেন।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে এখন কাহিনীর গ্রন্থন ও সংহতি বঙ্কিমী উপন্যাসের মতো পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই সময়ে উপমা, ধ্বনি-মাধুর্য, ও প্রয়োজনমতো একটু পরিহাসপ্রিয়তার সহযোগে অপরূপ হয়ে উঠেছে। কাজেই এই সময়ে তিনি এমন এক উপযোগী রীতি ও ভাষার অধিকারী হয়েছিলেন যে তা সত্ত্বেও তিনি কেন যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভের উপযোগী কোনো উপন্যাস রেখে যেতে পারলেন না তা বিস্ময়কর। তার কারণ সম্ভবত এই যে একমাত্র 'গোরা' উপন্যাসে ছাড়া তিনি আর কোথাও এমন কোনো থীম গ্রহণ করেননি যা সমগ্র মানব জাতি অথবা মানব সভ্যতাকে স্পর্শ করে। শেষ জীবনের উপন্যাসগুলির থীম জীবনের এক খণ্ডাংশকে মাত্র স্পর্শ করেছে। অবশ্য যে কোনো থীমকে অবলম্বন করেই মানব অস্তিত্বের গভীরতম সমস্যা ও

পরিণামে পৌঁছনো যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতো শৈল্পিক নির্মমতাকে গ্রহণ করেননি বলে তিনি নাট্য-দ্বন্দ্বের সমুদয় আয়োজন করেও চরম নাটকীয় মুহূর্তের ভয়াবহতার সামনে পাঠককে দাঁড় করাননি।

'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ যে কৌশল গ্রহণ করেছেন, তা ইতিপূর্বে বঙ্কিম 'রজনী'তে পরীক্ষা করেছিলেন। খুব সম্ভব রিচার্ডসনের নায়ক-নায়িকার পত্রাবলীর সাহায্যে উপন্যাস রচনার রীতি এই পদ্ধতির অগ্রদূত। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে লেখক সম্পূর্ণভাবে নিজেকে অন্তরালে গোপন রাখতে পারেন। উপন্যাসের বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও অনুভূতির দিক থেকে কাহিনীর খানিকটা করে অংশের বর্ণনা দিচ্ছে। উপন্যাসেও বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের যেন সরাসরি সাক্ষাৎকার ঘটছে; তাতে নাটকীয়তা-গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদ্ধতিটির একটু অসুবিধাও আছে। কাহিনীর গতির ধারাবাহিক বিবরণের অভাবে পাঠকের মনে কাহিনীর কালানুক্রমিক গতির একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় না।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মানসলোকে। বাইরে শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে যে বিমলা-নিখিলের বাড়ির বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে বন্ধু সন্দীপ এসে তর্কের ঝড় তুলছে। স্বদেশী আন্দোলনের কিছু কিছু সংবাদ, কাহিনীর অংশ হিসাবে নয়, শুধু সংবাদ হিসাবেই বইতে স্থান পেয়েছে। কাহিনীতে একমাত্র নাটকীয় ঘটনা হল বিমলা কর্তৃক স্বামীর তহবিল থেকে টাকা চুরি। লেখকের অসাধারণ কৃতিত্ব এইখানে যে অন্তরের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্বের খুব সামান্য আভাসই বাইরের ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অন্তর আর বাইরের এই বৈপরীত্য একটি চমৎকার নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে।

বইখানির দুর্বলতা এই যে চরম মানস দ্বন্দ্ব কোনো সংকট সৃষ্টি না করেই মিলিয়ে গেল বর্ষণবিমুখ বৈশাখী মেঘের মতো। অবশ্য একে দুর্বলতা বলব কিনা ঠিক জানি না; কারণ এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। শুভা-শুভের দ্বন্দ্বের পরিণামে এমন কিছু ক্ষতি হয় যে জীবন কিছুতেই আর ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না, এই নির্মম জীবন সত্যের স্বীকৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যে খুব কম জায়গায় মেলে।

চরম নাটকীয় পরিণাম রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে এড়িয়ে গেছেন; কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের উপন্যাসে নাট্যধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে। 'যোগাযোগে' মধুসূদন-

কুমুদিনীর দ্বন্দ্ব যেখানে চিত্রিত হয়েছে সেখানে কবি পর পর কতগুলি নাটকোচিত দৃশ্যের ভিতর দিয়ে এই দ্বন্দ্বের নাটকীয়তাকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'শেষের কবিতা'য় অমিত-লাবণ্যের প্রেমের বিকাশও কতকগুলি সংলাপপ্রধান দৃশ্যের ভিতর দিয়ে সাধিত হয়েছে। 'চার অধ্যায়'কে তো প্রায় চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি নাটক বলেই উল্লেখ করা চলে। অবশ্য বলা বাহুল্য এই নাট্যধর্মী উপন্যাস আর পুরোপুরি নাটকের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। নাটকের দৃশ্য দর্শকের neutral বা নির্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পিত। উপন্যাসের প্রতিটি দৃশ্যই কোনো না কোনো চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়। 'যোগাযোগে' কখনও কুমুর চোখ দিয়ে একটি দৃশ্যকে দেখি, কখনও বা মধুসূদনের চোখ দিয়ে। 'শেষের কবিতা'য় কখনো আমরা অমিতের চশমা দিয়ে দেখছি, কখনও বা লাবণ্যের। তবে 'চার অধ্যায়' আর 'মালঞ্চে'র নাট্য-দৃশ্য পাঠকের নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পিত।

আবার 'দুই বোনে'র নাটকীয়তা ভিন্ন কৌশলে উদ্ভাবিত। এখানে সংলাপ খুব কম ; লেখক প্রায় সময়ই নিজের উক্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। কখনও তিনি নিজেই বর্ণনাকারী ; কখনও বা শর্মিলা বা ঊর্মিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রধানত বর্ণনামূলক হলেও, শর্মিলা-কেন্দ্রিক শশাঙ্ক আর ঊর্মিমালা-কেন্দ্রিক শশাঙ্কের জীবনের বিবরণে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে তাই প্রচণ্ড নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে।

পরিশেষে একটি কথা বলা দরকার। 'গোরা' পর্যন্ত উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তববাদী রচনারীতি অনুসরণ করেছেন তা আমাদের কাছে খুব পরিচিত। অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসই কমবেশি এই রীতিতে লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে ঠিক প্রচলিত বাস্তববাদের রীতি অনুসৃত হয়নি। কবি অবশ্য চরিত্র এবং ঘটনাসমূহকে বাস্তবসম্মত করেই পরিবেশন করেছেন এবং কাহিনীর ধারাবাহিক কালানুক্রমিকতাও মোটামুটি বজায় রেখেছেন। তথাপি একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে কাহিনীর বাস্তব প্রকৃত বাস্তব থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র, তা প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি আদর্শীকৃত (idealized)। আমরা আরও দেখতে পাব কাহিনীর মধ্যে একটি নিটোল ছক রয়েছে যা আসলে দার্শনিক মননের ছবিতে রূপান্তরিত রূপ। সাধারণ কাহিনী অপেক্ষা এই কাহিনীর চরিত্র ও ঘটনা অনেক বেশি প্রতীকধর্মী বা রূপকাশ্রয়ী। যদি কোনো পাঠকের এরূপ মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের

উপন্যাস পড়ে ঠিক পুরোপুরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্বাদ বা প্রচণ্ড শরীরী আবেগ অনুভব করা যায় না তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তীব্র আবেগ সঞ্চারের জন্য এই উপন্যাসগুলি রচিত হয়নি। লেখক এই বইগুলিতে ছবির সাহায্যে জীবন সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। সেদিক থেকে এ বইগুলির সঙ্গে টমাস মান বা আঁদ্রে জিদের উপন্যাসের তুলনা করা চলে। এঁদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার এমনিতে অবশ্য খুব বেশি মিল নেই। একমাত্র মিল এই যে এঁরা সবাই দার্শনিক মননকে রসে রূপান্তরিত করেছেন; অথবা বলা চলে এঁদের মধ্যে দার্শনিক মনন শিল্পসম্মত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার প্রকৃত স্বকীয় এবং মৌলিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শেষের উপন্যাসগুলিতে। যদিও, একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় এ পর্যায়ের কোনো একটি উপন্যাসকেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠতমদের সারিতে স্থাপন করা যায় না। সে দাবি করতে পারে একমাত্র অন্তর্বর্তীকালের রচনা 'গোরা' উপন্যাসটি। কারণ এ উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুতে না আছে তেমন ব্যাপ্তি, না বা জীবনের বা মনের কোনো গভীরতম সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস।

নবম পরিচ্ছেদ | শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও বয়সে অনেক ছোট। রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, তখন বঙ্কিম-যুগের ভরা মরসুম। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে শিক্ষিত সমাজে দার্শনিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কের ঝড় বইত। সনাতন পন্থা বনাম প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ও হিতবাদ (Utilitarianism), ধর্মচিন্তা বনাম বিজ্ঞান-চিন্তা, হিন্দুধর্ম বনাম ব্রাহ্মধর্ম,—প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের বিরাম ছিল না। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এই সব বিতর্কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় ঘটেছিল। এই অনুমান আরও সঙ্গত এই জন্য যে তিনি এমন এক পরিবারের সন্তান ছিলেন যে-পরিবার তখনকার কলকাতার সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ছিল। এই পরিবেশের ফলে যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভরতার একটা গভীর প্রভাব তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনের উপর অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

ষোড়শ শতকের ইংরেজ লেখক ফ্রান্সিস বেকন তাঁর Advancement of Learning-এ একটা কথা বলেছিলেন যার মর্মার্থ হল: ঐহিক ও জাগতিক ব্যাপারে যুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা আছে, যদিও পারত্রিক ও অতি-জাগতিক ব্যাপারে বাইবেলের তত্ত্ব ও অনুশাসনের উপর নির্ভর করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ ও উপন্যাস জগৎ-কে পাশাপাশি স্থাপন করলে মনে হবে তিনিও মোটামুটিভাবে এই রেনেশাঁসসঙ্গত মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। কল্পনা-বিস্তারে এবং অধ্যাত্ম চিন্তায় তিনি ভাববাদী, কিন্তু সমাজ-চিন্তায় তিনি যুক্তি ও বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার ছাড়তে রাজী নন। তারই ফলে তাঁর উপন্যাসে কুসংস্কার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ধর্মভিত্তিক স্বদেশ-চিন্তা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, নারীর সমানাধিকার প্রভৃতির সপক্ষে পরিচ্ছন্ন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে, শিক্ষাকাল অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে এবং কর্মজীবনের অনেকটা অংশ কাটে সুদূর ব্রহ্মদেশে। স্বভাবতই তাঁর মানস-গঠনের সময়ে তিনি নব্যবাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন। উনিশ শতকের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ তা বইপত্রের মারফৎ। অপরপক্ষে জমিদারপ্রধান বাংলা, পল্লী বাংলা ও বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তা অভিজাত রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তের বাইরে ছিল। মধ্যবিত্ত মানসের উপর যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষা সংস্কার ও আবেগের শাসন বেশি। শরৎ-সাহিত্যে এই সংস্কার ও আবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ধর্ম ও স্বদেশ-চিন্তায় বিপুল ভাব-বন্যা দেখা দিয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক প্রকৃতির হলেও, হৃদয়ধর্মের সহজ অনুশীলনের পক্ষপাতী হলেও, সযত্নে নিজেকে অন্ধ ভাবাবেগ বা ভাবালুতা থেকে দূরে রেখেছেন। বরং অনেক উপন্যাসে তিনি অন্ধ স্বাদেশিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে কঠোর সমালোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই শরৎ-মানসের উপর এই ভাবাবেগের গভীর প্রভাব অনুভব করা যায়। দেশের মানুষ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা যুক্তি বিচারের দ্বারা সংশোধিত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভালবাসা গভীর ভাবালুতা আশ্রিত। তেমনি যেখানে এই ভালবাসার অভাব আছে, সেখানে ভাবালুতার যুক্তিই এই অভাবের কারণ।

সুতরাং শরৎ-সাহিত্যের সম্যক্ অনুধাবনের জন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাবাবেগের প্রকাশ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা দরকার। ভাবাবেগ বা sentiment জিনিসটা এমনিতে খারাপ কিছু নয়, যদিও তা যুক্তিনির্ভর নয়। মানুষ যখন কোনো নীতি বা আদর্শ বা ভাবকে জীবনের প্রধান উপজীব্য করে তাকে একটা স্থায়ী আবেগে পরিণত করে, তারই নাম ভাবাবেগ। প্রত্যেক মানুষ বা সময়ে সমগ্র সমাজ-মানসের মধ্যে কিছু না কিছু ভাবাবেগ উপস্থিত থাকে এবং কর্মে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে (এবং অনেক সময় জীবনের ক্ষেত্রেও) এই ভাবাবেগ খুব সহজেই বিকৃতি ও আতিশয্যযুক্ত হয়ে কৃত্রিম এবং অবাস্তব আবেগবাহুল্য সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে প্রচুর ভাবাবেগসমৃদ্ধ নাটক এবং উপন্যাস রচিত হয়েছিল। ভাবাবেগের কৃত্রিমতা এবং আতিশয্যকে অনেক সময় ইংরেজিতে sentimentality বলে উল্লেখ করা হয়।

জীবনের ক্ষেত্রে যে ভাবাতিশয্য আছে তাকে অনায়াসেই বিষয়নির্লিপ্তভাবে বা objectively প্রকাশ করা যায়। যেমন, বার্নার্ড শ তাঁর Arms and the Man নামক নাটকে বীরত্ব এবং প্রেমের ভাবালুতাকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতখানি বিষয়নির্লিপ্ত লেখক, শরৎচন্দ্র তা নন। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে পড়তে আমাদের কখনই মনে হয় না যে কোনো বিশেষ পরিবেশে তাঁর নায়ক-নায়িকা যেভাবে কাজ করছে, তিনি নিজেও সেই পরিবেশে সেই ভাবে কাজ করতেন। বোধ করি নিখিলেশ চরিত্রটি একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় তা মনে হয়। কাজেই শরৎচন্দ্র নির্লিপ্তভাবে ভাবালুতাকে চিত্রিত করেননি। বরং এক ধরনের রোমান্টিক ভাবালুতা তাঁর শিল্পী প্রকৃতির বিশেষত্ব। বাস্তবকে তিনি একটি বিশেষ রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে দেখেছেন বলে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবের এক অতিরঞ্জিত ও চিত্তগ্রাহী প্রকাশ ঘটেছে।

কতকগুলি লক্ষণ দেখে আমরা এই রোমান্টিক ভাবাতিশয্যকে চিনতে পারি, যেমন পরিবেশ অনুযায়ী যতখানি আবেগ সঙ্গত তার চেয়ে বেশি আবেগ প্রকাশ করা; চরিত্রের উপর কৃত্রিম অবাস্তব ভাবাদর্শ আরোপ করা; খামখেয়ালী ভাবে অযৌক্তিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা; এমন চারিত্রিক আদর্শ সৃষ্টি করা যা ঠিক বাস্তবও নয়, বাস্তবের পক্ষে উপযোগীও নয়। মোটের উপর ভাবাতিশয্যের বিশেষত্ব হল জীবনের উপর এমন কিছু জিনিস আরোপ করা যা অগভীর ও কৃত্রিম, অর্থাৎ লেখকের মনঃকল্পিত, যা লেখকের এক ধরনের ভাববিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রোমান্টিসিজমের সাধারণ ধর্মের সঙ্গে অনেক সময়েই এই ভাবালুতা যুক্ত থাকে কিন্তু এ দুটি জিনিস এক নয়। রোমান্টিসিজমের কয়েকটি সাধারণ বিশেষত্ব হচ্ছে—কল্পনাবাহুল্য, বিদ্রোহপ্রবণতা, বাস্তবের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, রূপ-রস-গন্ধে ভরা জগৎ সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা, এক আদর্শ মানবসমাজের সম্ভাব্যতায় আস্থা প্রভৃতি। সুতরাং এই সব গুণের সঙ্গে উপরোক্ত ভাবালুতার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। আমরা কাব্যে-সাহিত্যে যে জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রেম ও প্রেমের জন্য অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগের চিত্র দেখতে পাই তা এক ধরনের রোমান্টিক ভাবাবেগ। ইওরোপীয় সাহিত্যে যে বায়রণসুলভ চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে, যে চরিত্র সমাজের প্রতি অভিমান বশত যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে একের পর এক প্রেমের ব্যাপারে লিপ্ত হয় তাও ভাবালুতা-প্রসূত। মায়াবিনী নারীর

কল্পনা, [illegible]নারী তার সম্মোহজালে পুরুষকে আকৃষ্ট করে এবং তাকে সর্ববিধ শ্রেয়োবোধ বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করে, তাও ভাবালুতা-প্রসূত কল্পনা। Mario Praz তাঁর Romantic Agony নামক বইতে এই রোমান্টিক ভাবালুতা যে ক্ষয়িষ্ণু আবেগ ও চিত্রকল্পের জন্ম দেয় তার বিশদ আলোচনা করেছেন।

ভাবালুতা সবসময়েই যে রোমান্টিকধর্মী তা নয়। প্রেম-প্রীতি প্রভৃতির উপর অতিরিক্ত মূল্যারোপ ও বিদ্রোহপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তা অনায়াসে কর্তব্য-বুদ্ধি ও নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, যেমন আমরা অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে দেখতে পাই।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা যে রোমান্টিক ভাবালুতার পরিচয় পাই তা বিভিন্ন বিদেশী লেখকের থেকে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়াতে তা এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাধারণত শরৎচন্দ্রের প্রেমমূলক কাহিনীতে, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং আদর্শবাদী প্রবণতার মধ্যে এই ভাবালুতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

শরৎচন্দ্র যে-সব প্রেমমূলক কাহিনীর অবতারণা করেছেন তার অন্যতম বিশেষত্ব এই যে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অন্তত এক পক্ষ অবশ্যই খুব ধনী এবং অর্থব্যয়ে অকুণ্ঠ হবে। 'পরিণীতা' উপন্যাসে নায়িকা ললিতা অল্প বয়স থেকেই নায়ক শেখরের আলমারি থেকে প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ টাকা পয়সা নিত এবং তার কোনো হিসাবপত্র কেউ রাখত না। আবার, ব্রাহ্ম যুবক গিরীণ ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহের কোনো রকম কথাবার্তা হওয়ার আগেই ললিতার কয়েক হাজার টাকা পিতৃঋণ শোধ করে দিল। 'দত্তা' উপন্যাসের নায়িকা বিজয়া ধনী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর অর্থের কোনো পরিমাপ পাওয়া যায় না; তার অনেক দাস দাসী; চাকর রতনকে সে যখন তখন একটা পুটুলি দেয় এবং তার মধ্যে অন্তত পাঁচশো টাকা থাকে; শ্রীকান্তের সাময়িক অবস্থানের জন্য সে কলকাতায় একটা বাড়িই করে ফেলল এবং তা নতুন আসবাব-পত্র পরিধেয় দিয়ে সুসজ্জিত করল। এমনি আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। 'দেনাপাওনা'র নায়ক জীবানন্দ জমিদার, 'দেবদাসে'র দেবদাসও জমিদার তনয়; পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল আর এক জমিদারের সঙ্গে, এবং সেখানে তার যথেচ্ছ দান-ধ্যান করার ব্যাপারে কেউ বাধা দিত না। এক কথায় প্রাচুর্য-বিলাসিতা এবং দান-ধ্যানের একটি পশ্চাৎপট ছাড়া শরৎচন্দ্রের

প্রেম-কাহিনী জমে না। বিষয়টি আরও বিস্ময়কর এইজন্য যে মোটের উপর শরৎচন্দ্র গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং দরিদ্র ও অত্যাচারীদের উপর তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না।

শরৎ-সাহিত্যে প্রেমের ব্যাপারে প্রায় সর্বত্রই নারীই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। সেটা আমাদের সমাজে অভাবিত হলেও এ-দেশের সংস্কৃতিতে মাতৃ-প্রাধান্যের ঐতিহ্য আছে বলে একেবারে নিরর্থক নয়। নারীর প্রেমের বিশেষত্ব হল পুরুষের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা। সেটাও কিছুদিন আগেও, এবং কিছুটা পরিমাণে এখনও স্বামী-প্রেমের যে আদর্শ ছিল বা আছে তার সঙ্গে অসঙ্গত নয়। কিন্তু এককালের বাঈজী রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সেবাধর্মের আতিশয্যকে সত্যিই আতিশয্য বলে মনে হয় না কি? শ্রীকান্তকে সে নিজে বিয়ে করতে পারে না সামাজিক কারণে; কিন্তু অপর কাউকে শ্রীকান্ত বিয়ে করলে তা-ও তার সহ্য হবে না; কারণ শ্রীকান্তের অসুখ হলে বাইরে থেকে তাকে খবর সংগ্রহ করতে হবে এ সে ভাবতে পারে না। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বন্দনা উচ্চ-শিক্ষিতা এবং পাশ্চাত্য ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। কিন্তু বিপ্রদাসকে খুশি করার জন্য দেশীয় প্রথায় রান্না করতে তার একটুও অসুবিধা হয় না। বস্তুত প্রেমিকা নারীর মধ্যে অবধারিতভাবে সেবাপরায়ণতা এবং সেবায় আশ্চর্য দক্ষতা আবিষ্কারের পিছনে এক ধরনের ভাবালুতা কাজ করছে। 'চরিত্রহীনে' সতীশ যখনই অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছে, তখনই আশ্চর্যজনকভাবে সাবিত্রী খবর পেয়ে এসে তাকে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছে।

প্রেমের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের নায়ক বা নায়িকা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় বা অবহেলিত হয় তবে তার ফল বড় বিষময় হয়। 'বড়দিদি'তে ছাত্রীকে না পড়ানোর জন্য বড়দিদি অনুযোগ করলে অভিমান-ক্ষুব্ধ সুরেন্দ্রনাথ বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেল। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় গাড়ি-চাপা পড়ে হাসপাতালে স্থান লাভ করল। 'দেবদাসে'র মধ্যে পার্বতী পিতার আদেশে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেলে দারুণ মর্মজ্বালায় পীড়িত হয়ে দেবদাস মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির পথ ধরে জীবনটাকেই ছাই করে দিলে। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী উপীনদার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দারুণ অপমানের জ্বালা ভোলার জন্য অনুজ-তুল্য দিবাকরকে নিয়ে দেশান্তরী হল। প্রতিহত প্রেমের সাংঘাতিক পরিণাম কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মধ্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু

শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব হল নায়ক-নায়িকারা যখন যুক্তি-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে হৃদয়াবেগের জোয়ারে ভেসে চলেছে তখনও তারা লেখকের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করছে।) প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ প্রেমিক যদি সুস্থ জীবনযাত্রার পন্থাকে বিসর্জন দেয়, তবে তাকে ভাবাতিশয্য ছাড়া আর কিছু বলার অবকাশ কোথায় ?

(প্রেমের কাহিনী রচনায় শরৎচন্দ্র যেমন ভাবালুতাপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি চরিত্র সৃষ্টিতেও। এক ধরনের আপনভোলা নির্বিরোধী ভালমানুষ-গোছের চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে বিপুল সমাদর লাভ করেছে। এই মানুষগুলির মধ্যে অবশ্য দোষের কিছু নেই ; কিন্তু এদের দ্বারা এদের নিজেদের বা সমাজের কোনো উপকার হয় না। এরা অসহায় বলে অবশ্য কিছু সহানুভূতি দাবি করতে পারে, কিন্তু শরৎবাবুর কাছে যে মর্যাদা এরা লাভ করেছে তা ভাবালুতা জাত। 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়, 'দত্তা'র নরেন, 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ, 'শ্রীকান্তে'র গহর মিঞা,'নিষ্কৃতি'র গিরিশ প্রভৃতি এই জাতের চরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রটির মধ্যেই এই জাতীয় চরিত্রের বাস্তব অনুপযোগিতা লেখক নিজেই পরিস্ফুট করেছেন। সে নিজে নির্লোভ এবং স্নেহশীল ; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে অনায়াসে বাগানবাড়িতে ফূর্তি করে, আর তার নায়েব অনায়াসে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন করে। গিরিশ চরিত্রটির মধ্যে অদ্ভুত অসঙ্গতি রয়েছে : নাম-করা উকিল হিসাবে সে মাসে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জন করে, অথচ সে নাকি নিখুঁত ভালমানুষ !

(দেবদাস, সতীশ, শ্রীকান্ত, মহিম, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের একগাদা নায়ক চরিত্র ঠিক উপরোক্তদের মতো গোবেচারা না হলেও অলস, নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ। একমাত্র হৃদয়াবেগের চর্চা করা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টির ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র চরিত্র-মূল্য নির্ধারণের এক নতুন মাপকাঠি হাজির করেছেন। বঙ্কিম মূল্য দিয়েছেন কর্মী পুরুষকে, রবীন্দ্রনাথ মূল্য দিয়েছেন সুস্থ হৃদয়াবেগ-বিশিষ্ট মননধর্মী মানুষকে আর শরৎচন্দ্র মূল্য দিয়েছেন ভবঘুরে, অভিমানী এবং সামাজিক অর্থে অকর্মণ্য চরিত্রকে, যে প্রধানত আপন মনের সৃষ্ট কুজ্ঝটিকার মধ্যে বাস করে।)

শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে দু-একটি ভৃত্য জাতীয় চরিত্র চোখে পড়ে। এরা প্রভুদের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান। আগেকার সমাজে এ-রকম ভৃত্যের সাক্ষাৎ মিলত, সুতরাং সেটা খুব বড় কথা নয়। কিন্তু শরৎবাবুর

ভৃত্যরা অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং বাক্‌পটু। প্রভুদের চরিত্রের মূল্য এবং মর্যাদা তাদের মতো করে আর কেউ বোঝে না, এবং তাদের মতো সুন্দর করে কথা বলতেও পারে না। বস্তুত, রামচন্দ্রের হনুমানের মতো, প্রভু-মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যই তাদের উপন্যাসে উপস্থিতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; এবং তা করতে গিয়ে তারা নিজেরাও মহৎ হয়ে গিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর রতন, গহরের নবীন, বিপ্রদাসের অন্নদাদিদি প্রভৃতি এই জাতের চরিত্র।

স্বভাব-লেখক শরৎচন্দ্র নিজেও হয়তো জানতেন না যে তিনি নানাদিক দিয়েই বিদ্রোহী লেখক। তিনি যেমন নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নতুন ধরনের মূল্যবোধেরও সূচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রও হৃদয়ধর্মকে, অর্থাৎ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার মানবিক প্রবণতাগুলিকেই মানব-সংসারে সর্বাধিক মূল্যবান বলে মনে করেন। কিন্তু ভাবালুতা বশত তাঁর এই পক্ষপাতের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের কাছে ভালবাসা এক রকমের সর্বদোষহর কবচ। 'রামের সুমতি'র রাম অত্যন্ত ডানপিটে, গোঁয়ার-গোবিন্দ এবং পরের অনিষ্টকারী ছেলে; তবু সে লেখকের সম্পূর্ণ সহানুভূতির অধিকারী, কারণ বৌদিকে সে মায়ের মতো ভালবাসে। আমি আগেই বলেছি শরৎ-সাহিত্যে যত রাজ্যের আপন-ভোলা ও নিষ্কর্মা লোকের ভিড় জমেছে। লেখক তাদের সর্ববিধ ত্রুটিকে নির্দ্বিধায় প্রশ্রয় দিয়েছেন, কারণ তারা ভালবাসতে পারে।

ভালবাসার সংসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অভিমানবোধ ও মর্যাদাবোধ। কাজেই এই দুটি মনোভাবকে সংযত করার প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের মধ্যে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই দুটি হৃদয়বৃত্তিকেও শরৎচন্দ্র উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। বস্তুত অভিমান ও মর্যাদাবোধ ব্যতীত শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রের মহত্ত্ব ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হয় না। 'বিন্দুর ছেলে'তে বিন্দু আত্মমর্যাদাবোধ বশতই জায়ের সঙ্গে বিবাদ করে সংসারে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করল; আবার জায়ের উপর অভিমান করে সে মরতে বসল। 'পণ্ডিত মশাই'তে কুসুম বিধবা হলেও তাদের সমাজের নিয়ম অনুসারে অনায়াসে বৃন্দাবনকে বিবাহ করতে পারত; কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ বশত সে উচ্চবর্ণীয় মেয়েদের মতো বিধবার পুনর্বিবাহে আপত্তি জানিয়ে বসল। বন্দনা বিপ্রদাসের বাড়িতে জলগ্রহণ না করেই চলে গেল আহত মর্যাদা বজায় রাখতে। দেবদাস ও কিরণ্ময়ীর জীবনের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তীব্র অভিমানবোধ। বস্তুত, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেরই

নাটকীয় সংঘাতের মূলে রয়েছে অভিমানের সঙ্গে অভিমানের এবং মর্যাদার সঙ্গে মর্যাদার লড়াই।

'একাদশী বৈরাগী' নামে একটি ছোট্ট কাহিনী খুব তাৎপর্যপূর্ণ। একাদশী একজন সুদখোর মহাজন। সে খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেয় এবং শত অনুরোধেও সুদ-আসল থেকে কানাকড়িও রেহাই দেয় না। কাজেই সমাজে সে ঘৃণিত লোক বলে পরিগণিত। কিন্তু একটি ঘটনা দেখে লেখক তাকে একটি দুর্লভ চরিত্র বলে গণ্য করলেন। এক ব্যক্তির কাছ থেকে একাদশীর পিতা কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। সে টাকাটা দাবি করতেই একাদশীর কর্মচারীরা তাকে ধমকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একাদশী যখন বুঝতে পারল সে প্রকৃতই ঋণ দিয়েছিল, তখন কড়ায় ক্রান্তিতে চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ হিসাব করে সে ঋণশোধ করে দিল। কাহিনীর শেষে আমরা দেখতে পাই একাদশী হীন-জাতীয় হলেও এবং হীন কাজে নিযুক্ত হলেও লেখক তাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু উক্ত ঘটনায় একাদশীর নিরঙ্কুশ সততার হয়তো প্রমাণ পাওয়া গেল; তবু তার মহাজনীবৃত্তি যে বহু মানুষের উপর নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়, সে অপরাধ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যায় কী করে?

আমার মনে হয় লেখক চরিত্রের যে জিনিসটিকে উচ্চ মূল্য দিতে চেয়েছেন তা হল integrity—মানুষ যে-কোনো পেশায় নিযুক্ত থাক না, সামাজিক বিচারে তা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে যদি একটি নীতিতে অবিচলিত থাকে; যেমন অপরের উপর তেমনি নির্দ্বিধায় নিজের উপরও সে যদি সেই নীতিকে প্রয়োগ করে, তবে সে মহৎ।

ঠিক একই কারণে লেখক আচারনিষ্ঠ ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকসম্পন্ন মানুষকে কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। রাজলক্ষ্মী একটি বিদ্রোহাত্মক চরিত্র; সমাজের সহজ সড়ক থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। তবু সে ব্রাহ্মণ পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী, ব্রত-উপবাসাদি পালনে অত্যন্ত তৎপর। এরকম অসঙ্গতি জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যায়; কোনো মানুষ খুব বড় একটা জায়গায় নিয়মভঙ্গ করে থাকলেও ছোটখাটো ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলে। অনুরূপভাবে গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বিপ্রদাস এবং তার মাকে শরৎচন্দ্র অত্যধিক মূল্য দিয়েছেন। আবার 'শেষ প্রশ্নে'র কমল চরিত্রের মধ্যেও লেখক এই সংযম ও আচার-নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি দেখিয়েছেন। যৌন-নীতির ক্ষেত্রে

কমল অতি আধুনিক মতবাদের সমর্থক; অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তার মধ্যে বৈধব্যাচরণের এই রক্ষণশীলতা কেন? 'চন্দ্রনাথ', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখক যে সামাজিক সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে সচেতন এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় লেখক এখানেও যে-জিনিসটিকে মূল্য দিচ্ছেন তা হল integrity, মানবিক দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেম প্রীতির বৃত্তিগুলিকে আঘাত না করে, কোনো স্বার্থপর অভিলাষ পূরণের কুটিল ইচ্ছা না রেখে, কেউ যদি ব্যক্তিগত সংযম ও শুচিতার জন্য কতকগুলি নিয়ম মানে, তবে তা এক ধরনের চারিত্রিক integrity-র নিদর্শন।

শরৎচন্দ্রের কাছে শ্রেষ্ঠ গুণ হল পরোপকার, দুঃস্থ অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতিবোধ। আর নিকৃষ্ট অপরাধ হল স্বার্থপরতা। মানুষ যে স্বার্থপরতা-শূন্য হয়েও নিছক অন্ধ সংস্কারবশত কোনো মানুষের উপর অন্যায় সামাজিক বিধি প্রয়োগ করতে পারে এমন দৃষ্টান্ত শরৎ-সাহিত্যে বিরল। মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা প্রভৃতি যত হীন প্রবণতা দেখা যায়, সব কিছুর মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা। শরৎচন্দ্রের মতে স্বার্থপর জমিদার আছে, আবার পরোপকারী জমিদারও আছে। জমিদার স্বার্থপর হোক বা পরোপকারী হোক, জমিদারী প্রথাটা অকল্যাণকর বলেই যে তার জমিদারীতে অশুভ ঘটনা ঘটে এ চেতনা শরৎচন্দ্রের মধ্যে নেই। কাজেই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যে লেখকের মনোভাব তার পিছনেও কোনো যুক্তি নেই, আছে ভাবালুতা। প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেই কমবেশি স্বার্থপর; স্বার্থপরতার বাড়াবাড়িটা খারাপ বটে, কিন্তু কিছুটা স্বার্থপরতা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

কাজেই শরৎ-সাহিত্য খানিকটা বিশ্লেষণ করলেই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এর পিছনে একটি যুক্তিবিরোধী ভাবালুতাপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। কিন্তু এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে উপরোক্ত মন্তব্য শরৎচন্দ্রের শিল্পী-প্রকৃতি সম্পর্কে। শরৎ-সাহিত্যের শিল্পমূল্য নির্ধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কৃত্রিম যুক্তিবিরোধী ভাবালুতাকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছে। ফীল্ডিং, ডিকেন্স, ভিক্টর হুগো, পুশ্‌কিন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের মধ্যে আমরা কতকগুলি যুক্তিহীন পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই। এবং এই সরল বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পাই যে শেষ পর্যন্ত ন্যায়-পক্ষ জয়লাভ করে এবং অন্যায়-পক্ষ পরাজিত হয়। কাজেই শরৎচন্দ্র ভাবালুতাপ্রধান লেখক—এ-কথা তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিচয়জ্ঞাপক, সমালোচনা নয়।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার যে সাহিত্যে কখনোই বাস্তবের যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব নয়, তার সহজ কারণ এই যে বাস্তবের সবটুকু আমরা কোনোদিন জানাতে পারি না বা পারব না। লেখক এই সীমারেখাহীন আদি-অন্তহীন অনির্দেশ্য অনিশ্চিত বাস্তবের উপর একটি প্যাটার্ন আরোপ করেন যার সীমারেখা আছে, আদি-অন্ত আছে, যা নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত। বঙ্কিম মধ্যযুগীয় রোমান্সমূলক উপাখ্যান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে—আকস্মিকতা, অভাবনীয় যোগাযোগ, বীরোচিত একনিষ্ঠ প্রেম ও ন্যায়-নীতির আদর্শের সহযোগে—জীবনের একটি প্যাটার্ন তৈরি করেছিলেন। কাহিনীর গতি পরিণতিতে তিনি এই ভিত্তিভূমির উপর নিজের যুক্তিবাদী ও দার্শনিক চিন্তা ভাবনাকে প্রয়োগ করেছিলেন।

বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে জীবনের আর একটি প্যাটার্ন রচনা করলেন, যা অভিনব এবং মৌলিক। ঘরোয়া জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী, মানুষের কর্মের উদ্দেশ্যের ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত হৃদয়ধর্মের প্রাধান্য প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে এই প্যাটার্নটি তৈরি।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে জীবনের এমন একটি প্যাটার্ন অঙ্কিত করলেন যা অন্তত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অভিনব এবং মৌলিক। ভাবালুতা ইতিপূর্বেও কিছু কিছু দেখা গিয়েছিল বটে ; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বিষয়বস্তুতে তার এমন সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ এই প্রথম। এবং এই নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টির মধ্যেই শরৎ প্রতিভার অনস্বীকার্য প্রমাণ রয়েছে। প্রচলিত ধারণা এই যে শরৎ-সাহিত্য মূলত রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়ায় পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ শরৎচন্দ্রেও পাওয়া যায়। বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় যদি উপন্যাসের থীমের বিচার করা যায় তবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের মধ্যেও কতকগুলি গণতান্ত্রিক দাবি এবং সমাজের কূপমণ্ডুকতার সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু থীমের বিচারই সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। শরৎচন্দ্র জীবনের একটি নতুন প্যাটার্ন উপস্থিত করেছেন যা রবীন্দ্রনাথের প্যাটার্ন থেকে স্বতন্ত্র। শরৎ-প্রতিভার অনন্যতা আরও বেশি করে স্বীকার্য এই জন্য যে তিনি স্বভাব-লেখক। সচেতনভাবে কোনো বিদেশী সাহিত্য থেকে তিনি তাঁর প্যাটার্ন ধার করেননি। বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী ঐতিহ্য এবং ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর প্যাটার্নটির সন্ধান পেয়েছিলেন।)

ভাবাবেগ-শাসিত জগৎ বলে শরৎচন্দ্রের জগতের একটি নিটোল পরিচ্ছন্নতা আছে। এই জগতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মানুষের ইতিকর্তব্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে এমন সুনিশ্চিত প্রত্যয় আছে যা আমাদের বিপুল আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করে। এই জগতে যে অপ্রীতিকর ঘটনা নেই তা নয়, আছে ট্র্যাজেডি এবং বিচ্ছেদ, সংঘাত এবং পরাজয়। কিন্তু তা কখনও আমাদের হতাশ করে না, সান্ত্বনাহীন বেদনায় অভিভূত করে না। 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্যা, 'পল্লী-সমাজে'র রমেশ, 'দেনা-পাওনা'র ভৈরবী হয়তো কুটিল পল্লী-সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়লাভ করতে পারেনি, কিন্তু তাদের পরাজয়ের মধ্যেই তাদের নৈতিক জয় সুনিশ্চিত। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে এই বিশ্বাস ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে যে মানুষের কর্ম ও ভাবনা যদি সত্য হয় তো কোনো না কোনো ভাবে তা স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করবেই। 'পল্লীসমাজে'র রমেশ সমাজপতিদের কুটিল স্বার্থপরতা ও হীনতাকে যেমন ভাবে দেখতে পেয়েছিল রমা তা পায়নি, কারণ অন্তঃপুরচারিণী রমার পক্ষে পরিবেশের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ দৃশ্যে জীবন-যুদ্ধে হতমান প্রায় পরাজিত রমেশকে অকুণ্ঠ সেবা-দান করে রমা শুধু রমেশের প্রতি তার অনুচ্চারিত প্রেমকেই প্রকাশ করল না, সেই সঙ্গে রমেশের সমস্ত সংগ্রামকে নিঃশব্দে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দান করল। বস্তুত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের শেষ দৃশ্যগুলি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কার্যকারণের সূত্রের সঙ্গে মেলে না ; এগুলি কৃত্রিম এবং ভাবাবেগ-পরিকল্পিত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টি অনুযায়ী এগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে এগুলির শিল্প-মূল্য অনস্বীকার্য। দেবদাস পার্বতীকে বলেছিল তাদের আবার সাক্ষাৎ হবে ; বাস্তবিকই মৃত্যুকালে দেবদাসের সঙ্গে পার্বতীর সাক্ষাৎকার ঘটল ; এই সাক্ষাৎকার প্রমাণ করল যে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক ভালবাসা সত্য, কাজেই তার চিরকালীন মূল্য আছে। 'চরিত্রহীনে'র শেষ দৃশ্যে রক্ষণশীল উপীনদা চরিত্রহীনদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করলেন, সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, সাবিত্রীকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করলেন এবং উন্মাদ কিরণময়ীর জন্য দুঃখ বোধ করলেন। উপীনদা এই ভাবে যে অবৈধ প্রেমের সত্যতাকে স্বীকৃতি দিলেন তা শুধু ব্যক্তিবিশেষের স্বীকৃতি নয় ; শরৎবাবুর কল্পনায় উপীনদার মারফৎ সমগ্র মানবজাতি সত্য ভালবাসাকে স্বীকার করল।

শরৎচন্দ্রের জগৎ এমন সুন্দর আর নিটোল বলে তা মানুষকে অফুরন্ত

আশা-ভরসা আর আশ্বাস দেয় বলে মধ্যবিত্ত মানসের কাছে তার আবেদন অপ্রতিরোধ্য। সেইজন্যই এক কালে শরৎচন্দ্র অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন এবং সাম্প্রতিক কালেও তাঁর জনপ্রিয়তা কম নয়। ভাবালুতা-প্রধান জীবনদৃষ্টি অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে কিছু সংখ্যক সার্থক উপন্যাস রচনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা যথেষ্ট বিপত্তি সৃষ্টি করেছেন। ভাবালুতার বিপদ এই যে একবার তা জীবন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছলে আর তা কখনও পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোতে পরিবর্তিত হয় না। অচিন্ত্যকুমার শরৎবাবুর প্রভাবকে কোনোদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি; যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্র পেরেছিলেন। সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার হল সাম্প্রতিক কালের অনেক জনপ্রিয় লেখকের মধ্যেই শরৎচন্দ্রসুলভ ভাবালুতাই প্রধান stock-in-trade, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিমল মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কিছু কিছু লেখক শরৎবাবুকে মূলধন হিসাবে গ্রহণ করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্যের স্বাভাবিক অগ্রগমন ব্যাহত হচ্ছে।

দুই

শরৎবাবুর জগৎ নিটোল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই তা জীবনের গভীরতম সমস্যার মুখোমুখী হতে অসমর্থ। বঙ্কিমবাবুর মতো ব্যক্তি-মানুষের মৌল প্রশ্ন নিয়ে শরৎবাবু কোনোদিন ব্যস্ত হননি; বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাত্যহিক জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যও তাঁকে পথ হাতড়িয়ে বেড়াতে হয়নি। তেমনি মানব-মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি-সীমার বাইরে। এই ভাবে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা উভয় দিক দিয়ে সীমিত হলেও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির ব্যাপ্তি অসাধারণ। গভীর প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে তিনি বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে নিপুণভাবে ও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে কারখানার জীবন এবং গোষ্ঠীভুক্ত জাতিদের জীবনকথা বাদ দিলে প্রায় সমগ্র প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাঙালী সমাজ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। সমাজের এমন ব্যাপক পরিচিতি তার কোনো

বাঙালী লেখকের কলমে ধরা পড়েনি। জমিদার, মহাজন, সমাজপতি, কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের ও শহরের নিম্নবিত্ত পরিবার, ব্যবসায়ী, ভৃত্য, চাষী, বৈরাগী, আশ্রমবাসী, ভৈরবী, অন্ত্যজ, বিধবা, কুলত্যাগিনী, প্রভৃতি পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলাদেশের বহু বিচিত্র চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মুসলমান সমাজও শরৎ-সাহিত্যে একেবারে অবহেলিত হয়নি। একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, বিধবা সমস্যা, কুমারী মেয়েদের বিবাহ সমস্যা, পতিতা নারীর সমস্যা, বিধি-বহির্ভূত প্রেমের সমস্যা, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পল্লীর সমাজপতিদের দুর্নীতি, প্রভৃতি সেকালের বাঙালী সমাজের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ফরাসী লেখক ব্যালজাক আশিখানি উপন্যাসের মধ্যে তৎকালীন প্যারিসীয় সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের সংকীর্ণতর পরিসরের মধ্যে শরৎচন্দ্রও অনুরূপ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ব্যালজাক সম্পর্কে বলা হয় যে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর এক একখানি উপন্যাসের যা মূল্য, সমস্তগুলি উপন্যাসকে একসঙ্গে বিবেচনা করলে সে-মূল্য আরও অনেক বেড়ে যায়। বোধকরি শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যায়। তাঁর শেষ বয়সের তিন-চারখানি বিতর্কমূলক উপন্যাসকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত ছোট ছোট উপন্যাস (এবং 'শ্রীকান্ত')-কে যদি এক সঙ্গে বিবেচনা করা যায় তবে কি এ-কথা মনে হয় না যে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে ভিত্তি করে একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন? অবশ্য, বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক হিসাবে আমি ব্যালজাকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করার কথা ভাবছি না। ব্যালজাক প্রাকৃতবাদী লেখকদের জনক, শরৎচন্দ্র ভাবালুতাপ্রধান লেখক। ব্যালজাকের রচনা-নৈপুণ্য অনেক বেশি।

আলাদা আলাদাভাবে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা' প্রভৃতি ছোট উপন্যাসগুলি এক একটি বড আকারের ছোট গল্পের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয় না। বইগুলি সুখপাঠ্য, এবং সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র অংশের নিটোল পরিচয় বহন করে। কিন্তু এই পরিচয় এত সামান্য, এর মধ্যে রঙ ও তুলির ব্যবহার এত স্বল্প, যে কোনোক্রমেই এদের কোনো একটিকেও আমরা মহৎ উপন্যাসের মর্যাদা দিতে পারি না। 'গোরা' বা 'পথের পাঁচালি' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র মতো একখানি বইও শরৎচন্দ্র রচনা করেননি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছোট উপন্যাসগুলিকে একসঙ্গে ধরলে এই ধারণা

পরিবর্তিত হবে। তখন মনে হবে শরৎচন্দ্র একখানি মাত্র মহাকাব্য রচনা করেছেন যার থীম হল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের খাঁটি এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার হিসাবে শরৎচন্দ্র অমর হয়ে থাকবেন। যে ভাবালুতায় শরৎ-সাহিত্য আচ্ছাদিত তার জন্ম বাংলাদেশের জল-হাওয়াতে।

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের মতো খাঁটি বাঙালী লেখক বাংলাদেশে আর কেউ জন্মাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ঘটনা ও পরিবেশে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে সেগুলিকে যে-কোনো দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তাঁর মনে মানুষের মৌল প্রশ্নগুলি প্রাধান্য পেয়েছে বলেই তাঁর উপন্যাসের এত সর্বজনীন আবেদন আছে। এমন কি 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো বইতেও বাংলাদেশের বিধবা বিবাহের সমস্যাকে ছাপিয়ে গিয়ে মানুষের কামনা-প্রবৃত্তির মৌল সমস্যা বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কিছু কিছু বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রূপ পেয়েছে বটে; কিন্তু দার্শনিক উচ্চভূমি থেকে পরিকল্পিত বলে তাঁর চরিত্রগুলিতে কোনো জাতীয়তার ছাপ খুঁজে পাওয়া শক্ত। গোরা বা নিখিলেশ বা মধুসূদনকে যে-কোনো সমাজেই কল্পনা করা চলে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের কোনো পরিবেশ বা সমস্যা বা চরিত্রকেই বাংলাদেশের বাইরে স্থাপন করা যায় না। তিনি যে কোনো পরিবেশের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন তা নয়। তবু অল্প কথার মধ্যেই পরিবেশটির খাঁটি বাঙালিয়ানা ধরা পড়েছে। দেশের নাড়ির সঙ্গে খুব নিবিড় আত্মিক অন্তরঙ্গতা থাকলেই এমন চিত্র দেওয়া সম্ভবপর; এবং শরৎচন্দ্র ছাড়া এ-দেশের আর কোনো লেখকের তা এত বেশি মাত্রায় ছিল না। 'বড়দিদি'তে বড়দিদির সংসারের কতটুকু বিবরণ লেখক দিয়েছেন; কিন্তু তার মধ্যেই একটি স্নেহ-সজল মধুর-করুণ পারিবারিক জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। তেমনি সুরেন্দ্রনাথের জমিদারীর চিত্রটিও সংক্ষিপ্ত অথচ সত্য। বাংলাদেশে নিজেদের বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত যত জমিদার দেখা গিয়েছে এমন বোধকরি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। সুরেন্দ্রনাথ তাদের প্রতিনিধি।

পৃথিবীব্যাপী মানব জাতির মধ্যে বাঙালী চরিত্রের কিছু অনন্যতা আছে। আদর্শ বাঙালী চরিত্র হিসাবে যদি কারও নাম করা যায় তো তিনি বোধ করি শ্রীচৈতন্য। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড ভাবাবেগ ও প্রখর বুদ্ধির আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু মানব মনের এই প্রধান দুটি বৃত্তির চরমোৎকর্ষের মধ্যে সমন্বয় পৃথিবীতে

খুব দুর্লভ ঘটনা। সাধারণত, বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই দুইয়ের একটির অধিক বিকাশ ঘটে, এবং অপরটি তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু দুটি বৃত্তিই যদি অধিক পরিমাণে অথচ অসমানভাবে বিকাশ লাভ করে, তবে উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাবে মানসিক ভারসাম্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী। মাইকেল, বঙ্কিম, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি অনেক বাঙালীর মধ্যেই আমরা বুদ্ধি আর আবেগের মধ্যে একটা ভারসাম্যের অভাব অনুভব করি। শরৎচন্দ্রের চরিত্রলিপির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই খাঁটি বাঙালীসুলভ ভারসাম্যের অভাবের ভাবরূপ ধরা পড়েছে। দেবদাস, নরেন, জীবানন্দ, সতীশ, প্রভৃতি চরিত্র যে খাঁটি বাঙালী চরিত্র এ বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ জাগে না।

তেমনি বাংলা দেশের নারীসমাজ শরৎ-সাহিত্যে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালী নারীকে প্রকৃত পক্ষে অবরোধের জীবন যাপন করতে হত। পুরুষপ্রধান সমাজের পক্ষপাতমূলক আইনের কল্যাণে তার পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষালাভের সুযোগও একরকম ছিল না বললেই ভালো হয়। তথাপি এ-কথা বলা চলে যে বাঙালী নারী নিপীড়িতা হলেও এতখানি নিপীড়িতা হয়নি যাতে তার মানসিক বৃত্তি সকল পিষ্ট হয়ে যায়। মোটামুটিভাবে গৃহের অভ্যন্তরে তার স্বাধীনতা এবং আধিপত্যকে মেনে নেওয়া হত। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সে বাধ্য হয়েই পারিবারিক ডিপ্লোম্যাসিতে সেয়ানা হয়ে উঠত বলে বুদ্ধিবৃত্তিও তার যথেষ্ট বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেত। তার এই সজীব জাগ্রত মন আর জাগ্রত বুদ্ধির উদ্বৃত্ত অংশটুকু সহজ আত্মপ্রকাশের আর কোনো রাস্তা না পেয়ে স্নেহ-রূপে অজস্র ধারায় প্রিয়জনদের উপর বর্ষিত হয়েছে। এই স্নেহ চাহিদার অপেক্ষা রাখেনি বলে তা প্রায়, সময়েই অত্যন্ত সক্রিয় উদ্যোগী এবং এমন-কি, আক্রমণাত্মক। অনেক সময় পুরুষ অসহায় মেষ-শাবকের মতোই নারীর হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে তৈরি এই সুদৃঢ় বিরাট নিরেট স্নেহ আর সেবার জালের মধ্যে ধরা দিয়েছে, এবং নিজের স্বাধীন অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়েছে। আবার, কোনো আইনসঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা ছিল না বলেই এই নারীর হৃদয় আপন অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এক কথায় গৃহ বাঙালী নারীর বন্দীশালা ছিল না। গৃহ ছিল তার সাম্রাজ্য।

এই বাঙালী নারীর চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে অপরূপভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অধিকারের সীমার বাইরে শরৎবাবুর নারী ভীরু, লজ্জাবতী ; কিন্তু অধিকারের সীমার মধ্যে সে তেজস্বী, গর্বিত, ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রিয়জনের প্রতি তার অকৃপণ সেবা ও নিষ্ঠার তুলনা নেই, কিন্তু বিনিময়ে প্রিয়জনকেও তার সেবার কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হয়। প্রিয়জন যদি এই সেবায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যদি সে বিদ্রোহের চেষ্টা করে, তবে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। নারীর অভিমানবোধ বা মর্যাদাবোধকে আঘাত করলে তাকে আবার প্রকৃতিস্থ করা সহজ নয়। এইটুকুই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির মূল কাঠামো ; এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটিয়ে বা খুঁটিনাটি উপাদান যোগ করে শরৎবাবু তাঁর প্রধান-প্রধান নায়িকাদের অঙ্কিত করেছেন। বলা বাহুল্য বাঙালী নারীর এই একটিই চরিত্র নয়, আরও অনেক চরিত্র আছে। কিন্তু ভাবালুতাপ্রধান শরৎচন্দ্রের মুগ্ধ বিস্মিত চোখে তার এই রূপটিই অপরূপ হয়ে ধরা পড়েছে, এবং নানা বর্ণে তাকে তিনি চিত্রিত করেছেন। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে এই নারীটির আদর্শ প্রকাশ ঘটেছে। বিপ্রদাসের মা তাঁর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পার্বতী, ভৈরবী, বিরাজ বৌ, ললিতা, বড়দিদি, রমা, শৈলজা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে একই দেবতা নানা পরিবেশে নানা বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য অন্যরকমের নারীও যে শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিছু কিছু নেই তা নয়,—যেমন 'অরক্ষণীয়া'র জ্ঞানদা, 'চন্দ্রনাথে'র সরযূ, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী। এদের মধ্যে দীনতার চেতনা একটু বেশি বলে এরা ম্রিয়মাণ, এরা গর্বে মাথা উঁচু করে না দাঁড়িয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায়। বিজয়াও কিছুটা ব্যতিক্রম, তার মধ্যে সঙ্গত অহংকার খুব সংযতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিরন্ময়ী আর কমল অবশ্য একেবারেই ভিন্ন জাতের, তারা লেখকের বক্তব্যের বাহক বলে ভিন্নভাবে পরিকল্পিত। কিরন্ময়ী আধুনিক বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতার প্রতিনিধি ; বুদ্ধির কষ্টিপাথরে বিচার করে সমস্ত সরল বিশ্বাস ও যুক্তিহীন সংস্কারকে সে ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু তারই ফলে তার জীবন কেন্দ্রচ্যুত অবলম্বনহীন। অথচ নারী হিসাবে সে নারী-মনস্তত্ত্বের অধীন, এমন একজন সাথী তার দরকার যাকে সে ভালবাসবে এবং যার থেকে সে ভালবাসা লাভ করবে। স্বামী-সংস্কার নেই বলে স্বামীকে সে ভালবাসতে পারেনি ; নিষ্ঠা নেই বলে সে সাময়িক মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন হয়ে অনঙ্গ ডাক্তার, উপীনদা আর দিবাকরের কাছে পাক খেয়ে খেয়ে বেড়িয়েছে, এবং পরিণামে পাগল হয়ে গিয়েছে। কিরন্ময়ী একমাত্র হাঁ-ধর্মী চরিত্র যার প্রতি লেখক পুরো সহানু-

ভূতি প্রকাশ করতে পারেননি। সাহিত্যতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে কিরন্ময়ীর মতামত বহুলাংশে পরিণত বয়সের শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি ; কিন্তু তার কোনো নিষ্ঠা এবং স্থির বিশ্বাসভূমি না থাকায় লেখক তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। কিরন্ময়ী সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত বিংশ শতকীয় চরিত্র। কমল একটু ভিন্ন জাতের চরিত্র। প্রেমচিন্তায় সে কিরন্ময়ীর চেয়েও অগ্রসর। সে সতীত্ব মানে না, প্রেমহীন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মিথ্যাচার বলে মনে করে, প্রয়োজন হলে সাথী বদল করা তার যৌবনধর্মের পক্ষে স্বাভাবিক। তথাপি তার প্রবল চিত্ত-সংযম আছে বলে তার আশে-পাশে অনেকে যখন সাময়িক উচ্ছ্বাসে বিপথগামিনী হয়েছে, তখন সে অবিচলিত। তার বৈধব্যের রীতি পালনের মধ্যে তার আত্মসংযমের প্রকাশ রয়েছে। সতীত্ব এবং ব্রহ্মচর্য মিথ্যাচার হতে পারে, বৈধব্য-প্রথা হয়তো নিছক সামাজিক উৎপীড়ন, কিন্তু আত্মশাসনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বৈধব্যের নীতি পালন কমলের integrity-এ প্রমাণ, সে যে উচ্ছৃঙ্খলতায় বিশ্বাসী নয় তার প্রমাণ।

তিন

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহপ্রবণতার কথা আলোচনা না করলে শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। এই বিদ্রোহ রোমান্টিক—স্বতঃস্ফূর্ত এবং শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিজাত। কিন্তু মনে রাখা দরকার শেলী, কীটস বা নজরুলের বিদ্রোহ থেকে এ বিদ্রোহ স্বতন্ত্র জাতের। অপ্রীতিকর বাস্তবের নিষ্ঠুরতা আর ঔদাসীন্য দেখে উপরোক্ত কবিরা দারুণ ঘৃণায় আর অসহিষ্ণুতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র, প্রবাসী শরৎচন্দ্র, তাঁর বাংলাদেশের ফেলে-আসা সমাজকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ভালবেসেছেন। বাংলাদেশের মানুষকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মাটিকে ভালবাসার দার্শনিক উন্নাসিকতা তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথের গোরার একটা চিন্তা ছিল যে দেশকে বাইরে থেকে সংস্কার করা যায় না; দেশকে সংস্কার করতে হলে আগে দেশের একজন হতে হবে, দেশের ভালো-মন্দ কুসংস্কার সুসংস্কার সব কিছু মেনে নিতে হবে। তারপর ভিতর থেকে সংস্কার করা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। শরৎচন্দ্র ঠিক এই মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশের সমাজকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিয়ে এবং ভালবেসে তিনি তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাজেই শরৎচন্দ্রের মধ্যে যদি কেউ কোনো

পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজচিন্তা প্রত্যাশা করেন তবে তিনি নিরাশ হবেন। সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশকেই তিনি ভালবেসেছেন, যৌথ পরিবার প্রথাকে তিনি পছন্দ করেছেন। পূজা অর্চনার প্রতি তাঁর কোনো বিরাগ নেই। এমন কি বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট উক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এমন কি ছোঁয়াছুঁয়ির আচার নিয়ম যদি হৃদয়ধর্মকে আঘাত না করে তবে তা-ও তিনি স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। এই ভাবে সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশকে নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়ে শরৎবাবু আক্রমণ করেছেন সেই সব সামাজিক প্রথা বা ব্যবস্থাকে যা নিষ্ঠুরতার নামান্তর, যা হৃদয়ধর্মের প্রতিকূল। 'মহেশ' গল্পে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর জমিদারী প্রথাকে আক্রমণ করেননি। আক্রমণ করেছেন খারাপ ব্রাহ্মণ আর খারাপ জমিদারকে। তা যদি না হত তবে তিনি পরে বিপ্রদাসের কাহিনী লিখতেন না,—বিপ্রদাস ব্রাহ্মণ এবং জমিদার।

শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে আক্রমণ করেছেন কয়েকটি জিনিসকে: গ্রামের দলাদলি, অর্থাৎ সমাজপতিদের সমাজ রক্ষার নামে স্বার্থ-শিকারের লড়াইকে (পল্লীসমাজ, দেনা পাওনা), অনূঢ়া নারীর বিবাহ ব্যবস্থাকে (অরক্ষণীয়া), কৌলীন্য প্রথাকে এবং পূর্ব পুরুষের অপরাধের জন্য সন্তানকে অপরাধী করার প্রবণতাকে (বামুনের মেয়ে), কুলত্যাগিনী নারী এবং তার সন্তানদের প্রতি সমাজের মনোভাবকে (চন্দ্রনাথ, শুভদা, শ্রীকান্ত), প্রাক্ বিবাহ প্রেমের প্রতি সমাজের অসহিষ্ণুতাকে (দেবদাস), স্বার্থপর জমিদার এবং ব্রাহ্মণকে (মহেশ)। বিধবাদের দুঃখ এবং সমস্যা যে তাঁকে বিচলিত করেছে অনেক কাহিনীতে তার প্রমাণ আছে। যেমন বড়দিদিতে, শ্রীকান্তে, চরিত্রহীনে ; কিন্তু বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করে কোনো কাহিনী তিনি রচনা করেননি। মোটের উপর সমাজের বিরুদ্ধে শরৎবাবুর অভিযোগের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়, এবং এ নিয়ে রচিত সাহিত্য তাঁর সমগ্র সাহিত্যের ভগ্নাংশ মাত্র। তালিকাটি দেখলেই এ-কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ মূলত সংস্কারাত্মক প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। *সেদিক দিয়ে তিনি বঙ্কিম যুগ ও উনিশ শতকের নিকটবর্তী।* রবীন্দ্রনাথের পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে পারেনি।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের বিদ্রোহপ্রবণতাকে যদি এরকম গাণিতিকভাবে বিচার করা যায় তবে বোধ করি অবিচার হবে। আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র ভিতর থেকে সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন ; এবং এক কথায় তার যথেষ্ট মূল্য আছে।

যে-পরিবর্তনের জন্য সমাজ প্রস্তুত নয়, কোনো চিন্তানায়ক সে পরিবর্তনের কথা বললে খুব লাভ হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রসর চিন্তার অধিকারী, শরৎচন্দ্র জনতার সঙ্গে পা ফেলার পক্ষপাতী। বোধ করি এ ভাবে বলাও ভুল। দুজন দুই ভিন্ন শিল্পী-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন; তাঁরা যার যার প্রকৃতি অনুযায়ী দান করে গিয়েছেন। তার মধ্যে তুলনা চলে না। তবে ফলের দিক থেকে যদি বিচার করি, তো দেখতে পাব বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মানসে গত পঞ্চাশ বছরে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাবের একটি চমৎকার উদাহরণ। এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা শরৎ-সাহিত্য। আজ যে প্রাক্-বিবাহ প্রেমের প্রতি অসহিষ্ণুতা নেই, গ্রাম্য দলাদলি ও জাতিভেদের কুশ্রী সংকীর্ণতা যে প্রায় অনুপস্থিত, লোকের মন যে অনেক উদার ও নিষ্ঠুরতা-বিমুখ হয়ে উঠেছে, তার জন্য অনেকখানি দায়ী শরৎ-সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের এই অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

(শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহাত্মক চিন্তার এক আশ্চর্য পরিণতি দেখা যায় শেষ জীবনের কয়েকখানি বইতে—'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' এবং 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে।) অবশ্য 'চরিত্রহীন' বইখানি এককালে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকলেও আসলে এতে যে বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে—বিধবার প্রেম—বাংলা সাহিত্যে তা নতুন নয়। তবে কিরন্ময়ী চরিত্রটি একটি দুঃসাহসিক সৃষ্টি। লেখক এ বইতে এ কথাই প্রতিপন্ন করেছেন যে যৌবন-অনুত্তীর্ণা বিধবার প্রেম করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে যদি তার প্রেমে স্বার্থহীন সেবার মনোভাব ও নিষ্ঠা থাকে। সাবিত্রী চরিত্রটির মধ্যে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কিরণ্ময়ীর মতো যে-নারীর নিষ্ঠা অনিশ্চিত লেখক তাকে সমর্থন করেননি। লেখক কিন্তু সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পারেননি; তা যাতে না দিতে হয় সেই জন্যই সরোজিনী চরিত্রটিকে উপস্থিত করেছেন। কিরণ্ময়ীর মতো 'গৃহদাহে'র অচলাও লেখকের পূর্ণ সমর্থন পায়নি। প্রেমে একনিষ্ঠা সাধারণত কাম্য হলেও সেটাকে একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলে গ্রহণ করা যায় কিনা গ্রন্থে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। অচলার সামনে দুই পুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছিল। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের মতো মহিম শান্ত ধীর কর্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ, এবং সন্দীপের মতো সুরেশ অশান্ত উদ্বেল জীবনীশক্তিতে ভরপুর। মহিমকে অচলা ভক্তি করে তার চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্য; কিন্তু সুরেশের প্রাণচাঞ্চল্য তাকে

দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে। এবং যেহেতু ভক্তি এবং জৈব আকর্ষণ এই উভয় পথেই নারীর প্রেম জাগ্রত হয়, অচলা পর্যায়ক্রমে উভয়কেই ভালবাসে এবং একজনের উপর চূড়ান্তভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না। লেখক সযত্নে এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছেন; মহিমকে বিয়ের পর অচলা যে মহিমের বাড়ি ছেড়ে সুরেশের সঙ্গে চলে গেল তারও সঙ্গত পরিবেশ রচনা করেছেন। মহিমের শীতলতা, একঘেয়ে গ্রাম্য পরিবেশ যে অচলার মতো নারীর কাছে কারাগারের মতো লেখক তা দেখিয়েছেন। তথাপি সুখী মৃণালের স্বামীপরায়ণতার চিত্রটি অসুখী অচলার চিত্রের পাশাপাশি স্থাপন করে লেখক তাঁর প্রকৃত পক্ষপাতিত্ব কোন্ দিকে তার স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন।)

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেম বিবাহাতিরিক্ত প্রেমের একটি নিদর্শন। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আপন স্বামী হিসাবেই গণ্য করে। তার একটি প্রমাণ পুঁটিকে শ্রীকান্ত বিবাহ করার অনুমতি চাইলে তাতে সে তীব্র-ভাবে আপত্তি জানায়। অপর প্রমাণ কমললতার সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রেমের সমান্তরাল ঘটনা। কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসলেও তাকে সে কোনো মতেই কোনোরকম বন্ধনে আবদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। কাজেই বিবাহের মামুলী অনুষ্ঠান বাদ গেলেও প্রেম যেখানে সত্য সেখানে তা স্বীকার্য কিনা 'শ্রীকান্তে' সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক চিন্তা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শরৎবাবু নিঃসন্দেহে পরিণত বয়সে কিছু বিদেশী সমাজ ও যৌনতত্ত্বের বই পাঠ করেছিলেন—এবং তারই ফল এই বইখানির রচনা। ইতিপূর্বে 'নারীর মূল্য' নামে একখানি বইতে বিভিন্ন সমাজের নারী-জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য আলোচনা করে শরৎবাবু দেখিয়েছিলেন যে যে-সব সমাজে ঋজু যৌন-নীতি বিদ্যমান সে-সব সমাজের মেয়েরা নীচ ও স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়; পক্ষান্তরে যে সব সমাজে শিথিল যৌন-নীতি বিদ্যমান সেখানে মেয়েরা অতিথি-বৎসল ও উদার ভাবাপন্ন। এ-বইতেই স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে সতীত্বের মূল্য সম্পর্কে লেখক সন্দিহান। 'শেষপ্রশ্নে' কমল সতীত্বের মূল্যকে এবং বিবাহের অচ্ছেদ্য পবিত্রতাকে অস্বীকার করেছে। প্রেম যখন অস্তমিত বা পাত্রান্তরিত, তখন সাথী পরিবর্তন যৌবনধর্মের পরিপোষক। কমলের এই বক্তব্য কিন্তু উপন্যাসে বিতর্ক হিসাবেই স্থান পেয়েছে। কমলের চরিত্রে ও কাহিনীতে আমরা এই তত্ত্বের রূপায়ণ দেখতে পাই না। যে ভদ্রলোক কমলকে গাড়িতে করে নিয়ে

যাওয়ার সময় তাকে নিয়ে উধাও হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, সে কমলের মুখের কিছু অম্লমধুর বাণী শুনে নিজের প্রস্তাব নিজেই গলাধঃকরণ করার পথ খুঁজেছে। বইখানি পড়ে একথাই মনে হয় যে যৌন-নীতি সম্পর্কে যে এ-ভাবেও চিন্তা করা যায় শরৎচন্দ্র তাই আমাদের দেখাতে চেয়েছেন এবং সেজন্যই উপন্যাস হিসাবে বইখানি ব্যর্থ।

এই ক-খানি বইয়ের মধ্যে যে দুঃসাহসী বক্তব্য স্থান পেয়েছে, বোধ হয় শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী বইগুলির মধ্যে তার প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। যে-সব মেয়েরা নিজেদের বা মায়েদের ভুলে বা সমাজের কারসাজিতে সমাজের বাঁধা-ধরা ছকের বাইরে পা ফেলতে বাধ্য হয়, সমাজ তাদের অন্ত্যজ বলে ত্যাগ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাদের এমন করে ত্যাগ করতে পারেননি; অপরের অপরাধের শাস্তি তারা বহন করবে এ তিনি ভাবতে পারেননি। এদের কথা ভাবতে-ভাবতেই সম্ভবত সতীত্ব এবং বিবাহের চরম মূল্য সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল।

চার

মোটামুটিভাবে বলা চলে থীমের বিচারে শরৎচন্দ্র দু-জাতের উপন্যাস লিখেছেন: সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস এবং মননধর্মী উপন্যাস। ভাষান্তরে বলা চলে—ছোট উপন্যাস এবং বড উপন্যাস। ছোট উপন্যাসগুলিতে একমুখী একটি কাহিনী নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন করেছে; লেখকের যা কিছু বক্তব্য তা সম্পূর্ণভাবে কাহিনীকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীতে অংশ-গ্রহণকারী চরিত্রসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত গতি-পরিণতির মধ্যেই সামাজিক রীতি-নীতির বিশেষত্ব ও সময়ে তার সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে; স্বতন্ত্রভাবে কোনো তর্ক-বিতর্ক সংযোজন করে লেখক কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেননি। যেমন 'অরক্ষণীয়া' বইতে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ-সমস্যা ও পণপ্রথা সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যে আবশ্যিক কর্তব্য এবং মেয়ের একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই বিবাহকার্য সমাধা হওয়া উচিত, বাইরে থেকে এই নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য লেখক কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করেননি। প্রধানত, মেয়ে আর মেয়ের মায়ের আচার-আচরণ অন্তর্জ্বালার চিত্রায়নের মধ্যেই লেখক দেখিয়েছেন সামাজিক অনুশাসন কী ভাবে ধর্মীয় সংস্কার হিসাবে

তাদের মনের মধ্যেই আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করছে। তেমনি 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে সমাজ থেকে স্খলিতা মেয়েকে বিবাহ করা যে কী ভয়াবহ সামাজিক অনাচার বাইরের কোনো শক্তি তা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে না। চন্দ্রনাথ ও সরযূর পারিবারিক জীবনযাত্রার চিত্রেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই ভাবে একটি অত্যন্ত সহজ সরল মিষ্টি কাহিনীর মধ্যে সমাজের একটি জটিল জটকে উন্মোচন করার আশ্চর্য দক্ষতাই শরৎ-প্রতিভার বিশেষত্ব। 'দেবদাস' উপন্যাসেও প্রাক্-বিবাহ প্রেম যে সমাজে ঠিক অনুমোদিত নয় তা সমাজপতিরা এসে কাউকে বলে দিয়ে যাচ্ছে না।

অবশ্য এই রীতির ব্যতিক্রমও আছে। 'পল্লীসমাজে' সামাজিক দলাদলির উভয় পক্ষকে লেখকই দেখিয়েছেন। বেণী ঘোষাল সামাজিক রীতি নীতির আক্ষরিক প্রয়োগের নাম করে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত। তার প্রতিপক্ষ রমেশ স্বার্থহীনভাবে গ্রামবাসীদের কল্যাণ কামনা করে। এই ভাবে দুই প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বকে উপস্থিত করার ফলে কাহিনী ছাড়িয়ে সামাজিক সমস্যার গুরুত্ব নিঃসংশয় প্রাধান্য লাভ করেছে এবং উপন্যাসের শিল্পমূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য 'বামুনের মেয়ে'তে গোলক চাটুজ্যে সন্ধ্যার প্রতিপক্ষ হলেও সে ঠিক সমাজ-পালক হিসাবে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থহানির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই সন্ধ্যার জীবনের সমাজবিগর্হিত পূর্ব-ইতিহাস টেনে বার করেছে। সুতরাং এখানেও সমস্যা কাহিনীকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি।

রোমান্টিক প্রেমমূলক কাহিনী এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কমূলক কাহিনীতেও লেখক এমনি সন্তর্পণে পাঠকের প্রায় অগোচরে সামাজিক পরিস্থিতির প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। বড়দিদিতে বিধবা নায়িকা মাধবীর জীবনে প্রেম দেখা দিয়েছে অতি চুপি চুপি অলক্ষিত পদসঞ্চারে এবং তার নিঃশব্দ উপস্থিতি কাহিনীতে কোথাও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। এই নিঃশব্দতার মধ্যেই বিধবার কাছে যে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ অবরুদ্ধ তার করুণ চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে অন্যত্রও প্রেম ভীরু, সলজ্জ, দ্বিধাগ্রস্ত, নিঃশব্দ পদসঞ্চারী এমন কি ভাগ্যের উপরে নির্ভরশীল। এমন-কি খুব শিক্ষিত অগ্রসর সমাজের মধ্যে পরিকল্পিত 'দত্তা'তে বিজয়ার প্রেমও ভীরু এবং দুর্বল। সময় মতো নলিনী উপস্থিত না হলে এবং পিতার লিখিত চিঠিটির সন্ধান না পেলে বিলাসের সঙ্গে তার বিবাহ প্রায় অবধারিত ছিল। এই চিত্রায়নের বিশেষত্বের মধ্যেই সামাজিক অবস্থা সুপরিস্ফুট।

তেমনি 'বিরাজ বৌ'-তে নিছক এক স্বামী আর স্ত্রীর সংসারযাত্রার কাহিনীর মধ্যে কী চমৎকারভাবেই না বাংলাদেশের গার্হস্থ্য জীবনের একটি মডেল-চিত্র উত্থাপিত হয়েছে। বাঙালী স্ত্রী স্বামীকে সুখী করার জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে রাজী আছে; এদেশের ঐতিহাসিক দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে অনায়াসে স্বামীর কাছে গোপন করে অর্থ রোজগার করে স্বামীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাই বলে তার অন্তর দীন নয়; নিজের মর্যাদার যথোচিত স্বীকৃতি সে আশা করে। অভাব-পীড়িত অসহায় ত্যক্ত-বিরক্ত স্বামী যখন স্ত্রীর ঋণের কথা বিস্মৃত হয়ে তার প্রতি মিথ্যা সন্দেহের কথা প্রকাশ করে তখন সে তা সহ্য করতে পারে না। বিরাজ-বৌ এমনি এক পরিস্থিতিতে ঝড়ের রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এমনি করে নিছক একটি করুণ-মধুর-নিষ্ঠুর পারিবারিক চিত্রের মধ্যে তৎকালের বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার একটি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়।

পারিবারিক উপন্যাস বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। কিন্তু যদি থেকে থাকে তবে শরৎবাবুর অনেকগুলি ছোট উপন্যাস তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ: বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, বিরাজ বৌ, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি কি নিছক পারিবারিক চিত্র? পরিবারের মধ্যেই যে সমাজ অস্তিত্ববান, এ সেই সামাজিক জীবনের চিত্র। এখন প্রশ্ন এই—বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন নির্দ্বন্দ্ব পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে কী করে শরৎচন্দ্র এতগুলি চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করতে পেরেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর নিতে হলে শরৎচন্দ্রের রচনা-কৌশল নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রচনারীতির উল্লেখযোগ্য বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনারীতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। এমন কি তাঁর শেষ বয়সের লেখা দীর্ঘ উপন্যাসগুলির মধ্যেও কোনো মৌল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। রচনারীতির দিক থেকে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বরং বঙ্কিমকে বেশি অনুসরণ করেছেন। সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ আমি আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিভা।

বঙ্কিম তাঁর কাহিনীতে কিছু দীর্ঘ বর্ণনা সংযোজিত করেছেন; বিভিন্ন চরিত্রের দীর্ঘ পূর্ব-ইতিহাস এবং বিভিন্ন দৃশ্যের অন্তর্বর্তীকালীন ইতিহাসকে তিনি সংক্ষিপ্তসারের ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন; তা ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে পাঠককে সম্বোধন করে কিছু কিছু নীতি-উপদেশ দিতেও ছাড়েননি। অর্থাৎ, লেখক

সর্বজ্ঞ হিসাবে কাহিনীর আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রও এই সর্বজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি প্রকৃতি বা রূপ বা দৃশ্য বর্ণনাকে অনেক সংক্ষেপ করে এনেছেন। পূর্ব-ইতিহাস বা অন্তর্বর্তীকালীন ইতিহাসও তিনি খুব অল্পের মধ্যে সেরে ফেলেন, এবং সাধারণত এক নাগাড়ে সবটা পূর্ব-কথা না বলে ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে দু-চার কথায় তা ব্যক্ত করেন। আর, বিচারক ও জ্ঞানদাতার ভূমিকাকে তিনি একেবারেই বর্জন করেছেন। অর্থাৎ, শরৎচন্দ্র মূলত বঙ্কিমকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু কাহিনীর সাবলীলতার দিকে নজর রেখে।

বঙ্কিম কদাচিৎ চরিত্রের উদ্দেশ্য (motive) এবং মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ দিয়েছেন; কিন্তু উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মতো তার বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেননি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। বঙ্কিম জানতেন বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা কাহিনীর নাটকীয়তাকে খর্ব করে, এবং নাট্যরসই উপন্যাসকে উপভোগ্য করে তোলে। এখানেও শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের অনুসারী। বঙ্কিমের মতো শরৎচন্দ্রেরও নাট্য-সচেতনতা খুব বেশি এবং তা-ই তাঁর সার্থকতার মূল কারণ।

বঙ্কিম সাধারণত পর পর কতকগুলিকে যুক্তি ও পারম্পর্য দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে অপরিহার্যভাবে একটি চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যান। দৃশ্যের বিবরণ দেওয়ার সময় তিনি যথাসাধ্য নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন, যাতে পাঠক সরাসরিভাবে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের মুখোমুখী হতে পারে, যেমন করে শ্রোতা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যের মুখোমুখী হন। ঠিক একই পদ্ধতিতে নাটকীয় গতি ও চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করেন। নাটকীয় পরিস্থিতি এবং চরম মুহূর্ত সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র যদি সব সময় বঙ্কিমের মতো কৃতিত্ব না দেখাতে পেরে থাকেন তো আমাদের মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্র যে বাস্তব নিয়ে কারবার করেছেন তার সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমের বাস্তবে অনেক বেশি নাটকীয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব শরৎচন্দ্রের মধ্যে মানস বিশ্লেষণের অবকাশ প্রায় নেই। তাঁর লক্ষ্য নাট্যরস। এবং এ-কথা স্বীকার করাই ভালো যে নাট্যরস সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও যে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেননি এমন নয়। কিন্তু কমেডিমূলক কাহিনীতে তা প্রায় অপরিহার্য।

নাট্যরসের জন্য প্রধানত দরকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। তখনকার কালের বাংলাদেশে অ্যাড্‌ভেঞ্চার, যুদ্ধ বিগ্রহ, ভাগ্যের প্রচণ্ড উত্থান-পতন, বিশেষ

করে রমণীকুলের সক্রিয় ভূমিকা—এ-সব কিছুই ছিল না। সমালোচকদের তো এই মত এখনও রয়েছে যে বাঙালী সমাজদেহের নির্দ্বন্দ্ব বিবর্ণতার জন্যই এ-দেশে ভালো নাটক হল না। শরৎচন্দ্র এ-কথা প্রমাণ করলেন যে-কোনো সমাজেই নাটকীয় সম্ভাবনা আছে যদি দেখার চোখ থাকে। নাট্যরসের জন্য দ্বন্দ্ব ছাড়া আরও দরকার উৎকণ্ঠা, বিস্ময়, চরম মুহূর্ত, এবং অবস্থার পট-পরিবর্তন। এই সমস্তগুলি উপাদানের দিকেই শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ নজর আছে। শরৎচন্দ্র দু-রকম দ্বন্দ্বের চিত্র দিয়েছেন : ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব এবং ভালোর সঙ্গে ভালোর দ্বন্দ্ব। এই শেষোক্ত দ্বন্দ্বের চিত্রায়নেই শরৎ প্রতিভা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, এবং তার ভিত্তি হল অভিমান এবং মর্যাদাবোধ। 'বিরাজ-বৌ'তে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, 'পণ্ডিতমশাই'য়ে কুসুম-বৃন্দাবনের দ্বন্দ্ব, 'বিন্দুর ছেলে'তে বিন্দু আর তার জায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, 'পল্লীসমাজে' রমা-রমেশের দ্বন্দ্ব ভালোর সঙ্গে ভালোর দ্বন্দ্বের উদাহরণ।

'পরিণীতা' একটি পারিবারিক নাটক। এ বইতে ললিতা ও শেখর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু তাদের সম্পর্কের প্রতি গভীর অবজ্ঞা দেখিয়ে ললিতার বাবা গুরুচরণ তার জন্য পাত্র সন্ধান করছেন, এবং শেখরের বাপ অনেক টাকা পণ ছাড়া ছেলের বিয়ে দেবেন না বলে হুমকি দিচ্ছেন। এখানে ললিতা-শেখরের সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত হয়েছে। ললিতাদের বন্ধু হিসাবে ব্রাহ্ম যুবক গিরীণের আবির্ভাব দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তুলেছে। ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে তার পিতৃ ঋণ শোধ করে দিয়েছে ; তাদের মধ্যে বিবাহ এখন প্রায় নিশ্চয়তার স্তরে গিয়েছে। এরই মধ্যে শেখর-ললিতার মালা-বদল করার ছেলেমানুষী ঘটনাটি বিস্ময় এবং কৌতুক হিসাবে পাঠকের মনে থেকে যাচ্ছে, কারণ, বাইরের ঘটনা এর দ্বারা একটুও প্রভাবিত হচ্ছে না। অসুস্থ গুরুচরণকে নিয়ে গিরীণ ললিতা এবং তার বোনেরা শেখরের থেকে শেষ বিদায় নিয়ে বিদেশে চলে গেল—সেইটেই কাহিনীর চরম সংকট-মুহূর্ত। কাহিনীর শেষে যখন গিরীণ-ললিতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেই নিশ্চিত অনুমান হচ্ছে তখন প্রকাশ পেল ললিতা নিজেকে বিবাহিত বলে ঘোষণা করায় গিরীণের সঙ্গে ছোট বোন কালীর বিবাহ হয়েছে। তারপর পট-পরিবর্তন, অর্থাৎ শেখর-ললিতার বিয়ে হতে দেরি হল না। কিন্তু এই নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি বইতে আর একটি দ্বন্দ্বের প্রচ্ছন্ন চিত্র আছে এবং তাই বইখানিকে উপাদেয় করেছে। তা হল ললিতা-শেখরের মধ্যে অভিমানের

দ্বন্দ্ব। পরস্পরের প্রতি অভিমান ও মিথ্যা সন্দেহ বশতই মালা-বদলের গোপন ঘটনাটি কেউ বাইরে প্রকাশ করতে পারছে না।

আর এক ধরনের উপন্যাস হিসাবে 'দেনা-পাওনা'র উল্লেখ করা চলে। কারণ এটি পারিবারিক নয়, সামাজিক উপন্যাস। একটি চরম নাটকীয় মুহূর্ত নিয়ে বইখানির শুরু। অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ কর্তৃক ভৈরবী অপহৃতা হয়েছে, তার লাঞ্ছনা ও কলঙ্কের শেষ নেই; অথচ তা সত্ত্বেও সে দারোগাকে জানালো যে সে স্বেচ্ছায় জমিদারের কাছে এসেছে। এইভাবে চরম উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীর ভিতরে অগ্রসর হয়েছেন। অনেকগুলি দ্বন্দ্ব এই নাটকে স্থান পেয়েছে: প্রথমত জীবানন্দ-ষোড়শীর দ্বন্দ্ব, তাদের মাঝখানে অভিমান ও মর্যাদাবোধ ছাড়াও রয়েছে দুস্তর সামাজিক বাধা। দ্বিতীয়ত, ষোড়শীর সঙ্গে সমাজের বিরোধ; যে ভৈরবী গোপনে পাপাচারে লিপ্ত হতে আপত্তি করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে পাপাচারের অভিযোগ আনার সুযোগ সমাজপতিরা ছাড়বে কেন? ভৈরবী সামাজিক কর্মে লিপ্ত বলে সে একটি সামাজিক চরিত্র; কাজেই পরিবেশের চিত্র বাদ দিয়ে ভৈরবীর জীবনের গতি-প্রকৃতি দেখানো চলে না। এই গ্রাম্য পরিবেশ একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তা হলে তার অন্যায় কর্মের মধ্যেও শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু লেখক এই সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার চিত্র দেওয়ার জন্য তৃতীয় দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন গ্রামবাসীদের মধ্যে মতভেদ। ভৈরবীকে শাসন করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বাগ্‌দী প্রজারা, নির্মল এবং ফকির ঠাকুর। গ্রাম্য সমাজের একটি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্রের জন্য এই অন্তর্দ্বন্দ্বের উল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। লেখক হৈম-নির্মলের উপাখ্যানটিকে প্রলম্বিত করেছেন আরও একটি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। ভৈরবী যে তার বিবাহের রাত্রে পরিত্যক্ত স্বামী জীবানন্দের কাছে ফিরে যাবে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার। জীবানন্দকে দেখে এবং চিনতে পেরে তার নারী-হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল এইটুকুই ভৈরবীগিরি ত্যাগের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। প্রথম প্রয়োজন তার মোহভঙ্গের, কারণ ভৈরবীগিরি একটি সম্মানজনক আসন। সমাজপতিদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে বুঝল কত অসার ভিত্তির উপর তার ভৈরবীগিরির গৌরব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সংসার-জীবন লাভ করলেই নারীজীবন সার্থক এরকম একটা সস্তা মোহ নিয়ে কি ভৈরবীর মতো শক্ত মেয়ের সংসার জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব? তার আরও মোহভঙ্গ দরকার। হৈম-

নির্মলের সংসারযাত্রার আপাত সুন্দর চিত্রের তলায় যে ছলনা আর প্রতারণা রয়েছে লেখক তাও ভৈরবীকে দেখিয়ে দিলেন। ভৈরবী জানুক যে বিবাহিত জীবনেও সত্য-ভিত্তি না থাকতে পারে। এইভাবে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়ে কেবল আপন নিষ্ঠা ও শক্তির উপর আস্থা রেখে ভৈরবী স্বামীর ঘর করতে গেল। শরৎচন্দ্র জীবানন্দ চরিত্রেও অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তার ছকটি আমাদের মহাদেবের পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যায়। সতী বিহনে মহাদেব ভীষণ, প্রলয়ের দেবতা ; সতী সান্নিধ্যে তিনি অসীম কল্যাণের দেবতা। জীবানন্দ চরিত্রটি mythical, psychological নয়।

পাঁচ

শরৎচন্দ্রের বড় উপন্যাসগুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। আমি আগেই বলেছি শরৎ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে তাঁর ছোট উপন্যাস-গুলিতে। এই বইগুলিতে থীম, চরিত্র-লিপি ও কাহিনীর সুদৃঢ় ঐক্য, অনাবশ্যকতা পরিহার করে সর্বদা থীমের দিকে দৃষ্টি রেখে দৃশ্য-সন্নিবেশ করা, অনাড়ম্বর, সংযত ব্যঞ্জনাধর্মী, অথচ প্রয়োজনীয় আবেগ বহনে সক্ষম ভাষা, প্রভৃতি দেখে শরৎচন্দ্রকে বঙ্কিমের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে চিনতে পারি। তাঁর বড উপন্যাসগুলিতে কাহিনীর জট অনেক জটিল, তবু মোটের উপর তিনি একই রচনারীতিকে অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখি পরিণত বয়সের শরৎচন্দ্রের ভাষা আরও সমৃদ্ধ এবং অধিকতর আবেগ বহনে সমর্থ, তাঁর ভাবালুতা আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, তাঁর দৃশ্যগুলি আরও বিস্তারিত এবং নাটকীয় সংলাপে সমৃদ্ধ হয়েছে। তথাপি আমার বিশ্বাস শরৎচন্দ্রের শৈল্পিক শক্তিগুলির অতি-বিকাশই তাঁর বৃহৎ উপন্যাসগুলির ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে 'চরিত্রহীন' বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ ; এমন কি শ্রেষ্ঠ দশখানি বাংলা উপন্যাসের মধ্যে 'চরিত্রহীন' স্থান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তার কারণ প্রধানত এই যে এ-বইতে সর্বপ্রথম গতানুগতিক সমাজনীতি সম্পর্কে যত গুরুত্বের সঙ্গে স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এমন আর পূর্বতন কোনো বইতে তোলা হয়নি। তথাপি একমাত্র কিরন্ময়ী ছাড়া এ-বইয়ের আর সমস্ত চরিত্রই আমাদের পূর্বপরিচিত। এ বইয়ে গুরুতর সাংগঠনিক ত্রুটিও লক্ষণীয়। বড উপন্যাসগুলির ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল শরৎ প্রতিভা মূলত স্থির

অপরিবর্তনীয় (static) চরিত্র এবং পরিবেশ সৃষ্টিতেই পারদর্শী ; চরিত্রের যে নতুন উপলব্ধি তার চোখে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে দেয় তা শরৎচন্দ্রের কলমে ধরা পড়ে না, স্থিরধর্মী চরিত্র ও পরিবেশ ছোট উপন্যাসগুলিকে ছোট বলেই খুব ক্ষতিগ্রস্ত করে না। কিন্তু বড উপন্যাসগুলিতে, যেখানে আমরা লক্ষণীয় পরিণতি ও রূপান্তর প্রত্যাশা করি, এই স্থিরধর্মিতা মারাত্মক ত্রুটি হিসাবে চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্রের নাট্য-চেতনা খুব তীক্ষ্ণ, তার কারণ তিনি পরিবেশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে খুব ভালভাবে দেখতে পান ; কিন্তু তাঁর নাট্য চেতনায় কোনো synthesis নেই, দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব হিসাবেই থেকে যায়, কোনো উচ্চতর উপলব্ধিতে বা সমন্বয়ে পরিণতি লাভ করে না। ছোট উপন্যাসগুলিতেও দুর্বলতা চোখে পড়ে ; তাঁর কাহিনীতে আমরা যে সুডৌল পরিসমাপ্তি দেখতে পাই তার মধ্যে একটি সুচতুর কৃত্রিমতা আছে। 'দত্তা'র বিজয়ার মধ্যে শেষ পর্যন্ত দ্বৈত-মনোভাব কার্যকরী ; নলিনীর উপস্থিতি ব্যতীত কাহিনীর নিটোল পরিসমাপ্তি সম্ভবপর ছিল না। চন্দ্রনাথ যে সরযূকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনল, তার পিছনে কোনো নতুন উপলব্ধিকে লেখক চিত্রিত করতে পারেননি ; ফিরিয়ে আনাটা তাই আদৌ প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়নি। তবু ছোট উপন্যাসগুলিতে এই ধরনের ত্রুটি মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যখন আমরা দেখি 'চরিত্রহীনে'র বৃহৎ কলেবরের মধ্যেও সতীশ, সাবিত্রী, উপীনদা, সুরবালা—সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং নিছক কাহিনী শেষ করার জন্যই উপীনদা মৃত্যুশয্যায় যেন দৈব প্রত্যাদেশ লাভ করে চরিত্রহীনদের জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার ঘোষণা করছেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বৎসরান্তিক পুরস্কার ঘোষণার মতো, তখন আমরা হতাশ বোধ না করে পারি না। তেমনি 'গৃহদাহ' উপন্যাসে প্লেগের আক্রমণে সুরেশের মৃত্যু না ঘটাতে পারলে লেখক কাহিনী শেষ করতেই পারতেন না। 'শেষপ্রশ্নে' থীমের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত আশুবাবুর কন্যার সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষের সঙ্গে পলায়ন, বস্তিতে শুশ্রূষা করতে গিয়ে রাজেনের মৃত্যু প্রভৃতি এক রাশ আকস্মিক ঘটনার ভিড।

ছোট উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবালুতা থাকলেও তা ভাষাকে স্পর্শ করেনি। ভাষা প্রায় সর্বত্রই সংযত, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। কিন্তু বড উপন্যাসগুলিতে অতি-সমৃদ্ধ ভাষা শরৎচন্দ্রের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছে। তার ফলে ভাষা আড়ম্বর ও ভাবাতিশয্যের বাহন হয়ে উঠেছে ; পরিবেশকে অতিক্রম করে ভাষা আপন শক্তি প্রকাশে ব্যস্ত। লেখক আর

এখন ঘটনার সাহায্যে চরিত্র সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত নন। 'বিপ্রদাস' বইতে দ্বিজদাস-বন্দনা ও অন্নদাদিদি-বন্দনার দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্রদাস ও তার মা মহামায়ার চরিত্র-মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত। লেখক ভুলে গিয়েছেন যে বিপ্রদাস বা মহামায়া কাল্পনিক চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র নয়; থীমের প্রয়োজনেই তারা মূল্যবান। কিন্তু কাল্পনিক চরিত্রের গুণকীর্তন করতে করতে লেখক এতই মগ্ন হয়ে গেছেন যে থীমের প্রয়োজন এবং কাহিনীর প্রয়োজনের কথাও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। 'বিপ্রদাস' বইটিতে কাহিনী খুবই দুর্বল; শব্দাড়ম্বরের চাপে কাহিনী প্রায় পিষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিপ্রদাসের সঙ্গে মহামায়ার বিচ্ছেদের দৃশ্যটি নিতান্তই আকস্মিক, প্রস্তুতিবিহীন, কৃত্রিম, এবং থীমের পক্ষে বা কাহিনীর পরিণতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। লেখক যেন ধরে নিয়েছেন যে কাল্পনিক মহৎ চরিত্রের গুণকীর্তন করাতেই উপন্যাসের একমাত্র সার্থকতা। এমন-কি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কিছু কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও ইন্দ্রনাথ, অভয়া, গহর মিঞা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের গুণকীর্তনে লেখক এত বেশি মেতে উঠেছেন যে তার বাইরে আর কিছু চোখে পড়ে না। জীবনের সঙ্গে, এমন-কি কাহিনীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন, ভাবাতিশয্য-দুষ্ট আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির এই যে ঐতিহ্য শরৎবাবু সৃষ্টি করে গিয়েছেন, পরবর্তী কালের সাহিত্যে তা বিষময় প্রভাব বিস্তার করেছে। এখনও অনেক জনপ্রিয় লেখক মনে করেন যে কৃত্রিম আদর্শপুষ্ট ভাবাবেগ কল্পিত মহৎ চরিত্র সৃষ্টিই বুঝি উপন্যাসের কাজ। বাংলাদেশের কোমলমতী পাঠক-পাঠিকারাও এই ধরনের কল্পনাবিলাসকে খুব পছন্দ করেন, যদিও তাঁরা জানেন এর সঙ্গে জীবনের ও প্রকৃত শিল্পরসের কোনো সম্পর্ক নেই।

দশম পরিচ্ছেদ | প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী ঔপন্যাসিক না হলেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। রবীন্দ্র-শরৎ এবং পরবর্তী কল্লোলকালীন লেখকদের মাঝখানে তিনি সংযোগ-সেতু। চলিত ভাষাকে তিনিই সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করেন এবং কল্লোলের লেখকদের শিল্পকৈবল্যবাদের তত্ত্ব তিনিই উপহার দেন। বঙ্কিম থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সদর দরজায় আছে রোমান্টিকতা, আর খিড়কির দরজায় আত্মগোপন করে বসে আছে বাস্তববাদ। এমন-কি পরের কল্লোল যুগেরও প্রধান স্থরে রোমান্টিকতার প্রাধান্য। এই রোমান্টিকতার সর্বময় কর্তৃত্বের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী একমাত্র লেখক যাঁর মধ্যে এ-জিনিসের বাষ্পগন্ধও নেই। রোমান্টিকতার উল্টোপিঠে আছে বাস্তববাদ, যুক্তিপ্রিয়তা এবং ব্যঙ্গ। তিনি যুক্তিপ্রিয়তা এবং ব্যঙ্গের রাস্তা ধরেছেন। দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে এই একমাত্র ব্যতিক্রমের ঘটনাটি এমনি অভাবনীয় যে তা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

প্রমথ চৌধুরী শুধু যে রোমান্টিকতাকে পরিহার করে চলেছেন তাই নয়, তাঁর মনোভাবটাও রোমান্টিকতা-বিরোধী ছিল। বোমান্টিক প্রেমকে বিদ্রূপ করে তিনি 'চার-ইয়ারী-কথা' লেখেন। এই রচনাটির মধ্যে প্রেম-ঘটিত অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দুটি গল্প হচ্ছে প্রথম দর্শনেই প্রেমের নমুনা-চিত্র। একটিতে দেখা গেল নায়িকা পাগল এবং অন্যটিতে নায়িকা চোর। তৃতীয় গল্পটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের চিত্র—কিন্তু নায়িকার আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রেমের অভিনয়ের ভিতর দিয়ে তার পূর্ব-নির্বাচিত অর্থনৈতিক-কারণে যোগ্য পাত্রের মনে ঈর্ষা জাগ্রত করা, যাতে সে তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করে। 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' এটি রোমান্টিক লেখকদের একটি প্রিয় বিষয়বস্তু। চতুর্থ গল্পটিতে প্রমথবাবু দেখাচ্ছেন এমন নির্বাক প্রেমিকা আছে কি নেই, যতক্ষণ

পর্যন্ত না প্রণয়ী পরলোক-প্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কারণ প্রেততত্ত্ববিশারদগণের মতানুসারে, মৃত্যুর পরে প্রেত্-যোনি লাভ করার পরই কেবল মানুষের পক্ষে অপরের অন্তর্লোকে প্রবেশাধিকার ঘটে। সুতরাং নির্বাক প্রণয়িনীর প্রণয়ীর পক্ষে মন জানা-জানির জন্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মৃত্যুর পর পরলোক থেকে সে হয়তো টেলিফোন-যোগে প্রণয়িনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হতে পারে। এই ধরণের একটি অসম্ভব কাহিনী রচনা করে প্রথমবাবু বহু-অভিনন্দিত তথাকথিত নির্বাক প্রেমের অসারতা ও অসঙ্গতিকে পরিস্ফুট করেছেন।

বাস্তব জগতে প্রেম নামক কোন বস্তুব অস্তিত্ব নেই এ-কথা প্রতিপন্ন করা গল্পগুলির উদ্দেশ্য নয়। প্রেমকে একটি ভাবাদর্শে পরিণত করে যে সব আতিশয্য পূর্ণ রোমান্টিক চিত্র সাহিত্যে রচিত হয়েছে, তাই চৌধুরী মশাইয়ের আক্রমণের লক্ষ্য। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রেম-মূলক ঘটনার যে চারটি বৈচিত্র্যকে তিনি চিত্রিত করেছেন, রোমান্টিক সাহিত্যের পাতায় পাতায় সেগুলিরই প্রাধান্য বেশী। সুতরাং বিদ্রূপের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট এবং সুচিন্তিত। বাস্তব জীবনে প্রেম নামক এক ধরণের ঘটনা ঘটে; এবং এতকাল পর্যন্ত ঔপন্যাসিকরা সেগুলিকে একভাবে ব্যাখ্যা করে এসেছেন; এবং আমরা নির্বিবাদে সেই ব্যাখ্যাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে এসেছি। 'চার ইয়ারী কথা'-তে প্রমথবাবু দেখিয়েছেন যে প্রেমমূলক ঘটনাগুলিকে এক ভিন্ন বিপরীত দৃষ্টিকোন্ থেকেও দেখা সম্ভব। তা যদি করি, তবে প্রেমের ভাবাদর্শতে আমরা এতকাল যে কৃত্রিম মূল্য আরোপ করে এসেছি তার ফাঁকটা হয়তো আমাদের কাছে ধরা পড়বে।

আমাদের প্রচলিত স্বীকৃত মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ-গুলিকে বিপরীত দিক থেকেও অবলোকন করা যায়। সমগ্র প্রমথ-সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হয়তো এই সত্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করা। কোন সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ না করে তার বিপরীত সম্ভাবনাটিকেও মনের মধ্যে স্থান দাও—প্রমথবাবু আমাদের যেন এই উপদেশই দিয়েছেন। এক হিসাবে বলা চলে যে বার্ণার্ড শ'এর নাট্যরচনার পিছনেও এই ধরণের অভিসন্ধি ছিল, এবং তিনিও প্রমথবাবুর মত প্যারাডক্স বা বিরোধাভাসকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বার্ণার্ড শ'-এর চেষ্টা ছিল প্রচলিত মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলে তাদের জায়গায় নিজের গড়া আর এক প্রস্থ মূর্তি বসিয়ে দেবেন। প্রমথবাবুর কিন্তু এক তত্ত্বের

স্থানে অন্য কোন তত্ত্ব চিন্তা প্রতিপন্ন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ; সাহিত্যিক হয়েও সমাজ সংস্কারকের উচ্চ আসনকে তিনি পরিহার করে চলেছেন।

বস্তুতঃ প্রমথবাবুর একটি প্রিয় বিষয়বস্তু হল—সাহিত্যকে অতখানি গুরুতর কর্ম বলে চিন্তা না করাই সঙ্গত। আমাদের দেশের বঙ্কিম থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় সব লেখকই নিজেদের এক একজন প্রফেট বলে গণ্য করেছেন। সাহিত্যের মারফৎ তাঁরা যে মূল্যবান বাণী বা নির্দেশ পরিবেশন করবেন তার দিকে সমগ্র দেশ নির্ণিমেষে তাকিয়ে রয়েছে, সুতরাং কোনরূপ লঘুতা বা চাপল্যের তাঁদের অবকাশ নেই—প্রত্যেকের মধ্যে এই ধরণের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজের উপর সাহিত্যের এতখানি প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বলে প্রথমবাবু বিশ্বাস করতেন না ; এবং সমাজের উপর কর্তব্য পালনের যে পবিত্র দায়িত্ব সাহিত্যিকের স্কন্ধে কেউ চাপিয়ে দেয়নি সেই কল্পিত দায়িত্বের চাপে আনন্দ উপভোগের ক্ষমতাকে নষ্ট না করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। আলোচনামূলক নিবন্ধে ছাড়া ছোট গল্পেও তাঁর এই মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশলাভ করেছে। 'ফরমায়েসী গল্পে' (১৩২৪) সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ পাঠকের হাতে দুর্গেশ নন্দিনীর লেখকের কিরূপ নিগ্রহ হতে পারত তার একটি কাল্পনিক চিত্র দিয়েছেন। একটি কৌতুকজনক কাহিনীর ভিতর দিয়ে প্রমথবাবু দেখিয়েছেন বিখ্যাত উপন্যাসের অন্তর্গত বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ বীরত্বের আদর্শ প্রভৃতির কতটুকু মূল্য আছে সাধারণ পাঠকের কাছে।

গল্প হল সম্ভাব্যতার সূত্রে গাঁথা এক কৃত্রিম ফসল যার কাজ মানুষকে এমন এক আনন্দ দান করা যা বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বটি লেখক চমৎকারভাবে প্রতিপন্ন করেছেন নীল লোহিত-কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে। নীল লোহিত, নীল লোহিতের আদি প্রেম, নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা, এবং নীল লোহিতের স্বয়ংবর,—এই চারটি গল্পের মধ্যে আশ্চর্য নায়ক নীল লোহিত প্রতিপন্ন করেছে যে যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তি থাকলে যে-কোন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সম্ভাব্য বলে বর্ণিত করা যায়। প্রতি পদে পদে নীল অসম্ভবের রাজ্যে তার বর্ণিত কাহিনীকে নিয়ে গিয়েছে, এবং ঘটনার জটিল জাল বুনে বুনে সে শেষ পর্যন্ত কাহিনীকে সম্ভাব্য করে তুলেছে। এই গল্প কয়েকটির পরিকল্পনা যেমন অভিনব, তেমনি এ গুলির মধ্যে চৌধুরী মশাইয়ের গল্প সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তা নিহিত রয়েছে। গল্প বাস্তবের উর্ধ্বের একটি স্বতন্ত্র জগৎ। গল্পের মূল ভিত্তি বাস্তবতা নয়, সম্ভাব্যতা। গল্পগুলির দুর্লভ সার্থকতা

এইখানে যে পাঠক কৌতুকজনক ঘটনা-স্রোতকে উপভোগ করার সময়ে ঘুনাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না যে এদের মধ্যে কোন সুচিন্তিত তত্ত্ব চিন্তা আছে। 'ঘোষালের গল্প' ও অনুরূপ কারণে উল্লেখযোগ্য।

গল্প সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর তত্ত্বচিন্তার যাই মূল্য থাক, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম এই তত্ত্ব চিন্তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। এরকম ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ যাঁর সমগ্র জীবন একটি বিশুদ্ধ শিল্প-বোধের দ্বারা পরিচালিত। তিনি কখনো তাঁর সাহিত্যকে 'বাস্তবের ভ্রান্তি' (Illusion of reality)-তে পরিণত করতে চাননি। অবশ্য এ কথা ঠিক হাস্যরসাত্মক বা কৌতুক প্রধান কাহিনী প্রায় সবত্রই কৃত্রিম আজগুবি-কল্পনার উপর নির্ভরশীল। কারণ আতিশয্য ও অতিরঞ্জনই হাস্যরসের জনক। কিন্তু প্রমথবাবুর হাস্যরসে অসঙ্গতি সৃষ্টি অপেক্ষা wit বা ভাষাগত কৌতুক-সৃষ্টির উপর জোর বেশী। তথাপি তিনি তাঁর সমস্ত কাহিনী ও চরিত্রকে যথাসম্ভব কল্পনা রাজ্যের সহচর হিসাবে উপস্থিত করেছেন। নীল লোহিতের চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সর্বাধিক প্রকাশিত। কিন্তু অন্যত্রও এমন কি দু'একটি গভীর রসাত্মক গল্পেও তিনি কাহিনীতে ও চরিত্রে বাস্তবের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। তাঁর রচিত গল্পে আমরা যে বাস্তব সম্পর্কে উপদেশ পাইনা, বা বাস্তবের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে পারি না, তা নয়; কিন্তু এসবগুলি তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয়।

তাঁব গল্পগুলির মধ্যে বোধ করি 'রাম ও শ্যাম' গল্পটি বাস্তবতার সবচেয়ে কাছাকাছি। রাজনৈতিক আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্বের আসন দখল করেন তাঁদের বিদ্রূপ করাই এই গল্পটির উদ্দেশ্য। কাহিনীটি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি রেখার সমষ্টিমাত্র; বোধ করি বাস্তব-ঘেঁষা কাহিনী বলেই কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায়কে বিস্তার করবার কোন আবশ্যকতা লেখক অনুভব করেননি। রাম ও শ্যাম দুই ভাই-এর বাল্য-লীলা থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের লীলা পর্যন্ত অনেকগুলো অধ্যায়ের বিবরণ মাত্র কয়েক পাতার মধ্যে লেখক শেষ করে ফেলেছেন। অবশেষে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক প্রচণ্ডরকমের নেতৃত্বের সংঘাতের চিত্র দিয়ে লেখক কাহিনী শেষ করেছেন। লক্ষনীয় এই যে অপরের অর্থ আত্মসাৎ বা জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গল্প রচনার যে-সব সহজলভ্য উপাদান আছে, প্রমথবাবু সেগুলোর সুযোগ গ্রহণ করেন নি। তিনি যে উপাদানগুলি নিয়েছেন সেই একই উপাদানের সাহায্যে রাম ও শ্যামকে

দুই প্রকৃত দেশপ্রেমিক আদর্শনিষ্ঠ নেতা বলে চিত্রিত করা যেত। শুধু বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে দু' জনের অগ্রগমন নিছক ব্যক্তিগত উচ্চাশার চরিতার্থতার ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। দু'ভাই এর দ্বন্দ্বে আদর্শগত বিরোধটা ছদ্মবেশ মাত্র, আসলে নেতৃত্বলাভের দ্বন্দ্বটাই প্রধান। এই গল্পে লেখক আর একবার করে দেখিয়েছের যে যে-কোন ঘটনাকে প্রচলিত দৃষ্টিকোন্ থেকে না দেখে ভিন্ন দৃষ্টিকোন্ থেকেও দেখা যায়। আর বাস্তবিক, যে-কোন আদর্শগত রাজনৈতিক সংঘাতের পিছনে যে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে না একথা হলফ্ করে বলা খুব শক্ত। বাস্তবের কাছাকাছি কাহিনী বলেই রাম ও শ্যামের চরিত্রকে লেখক এক একটি পূর্ণাবয়ব চরিত্ররূপে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেননি। তারা নিছক একটি attitude বা মনোভঙ্গী মাত্র, এবং সেই হিসাবে নিছক মানস সহচর।

ভালবাসার আতিশয্য ও আতিশয্য-জাত ঈর্ষা ও সন্দেহ প্রচণ্ড ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু, আবার তা কমেডির বিষয়বস্তু হতেও বাধা নেই। 'বড়দিনের বড়বাবু' গল্পে প্রমথবাবু শেষোক্ত দৃষ্টিতে ভালবাসা ও সন্দেহের ঘটনাকে চিত্রিত করেছেন। স্ত্রীকে বড়বাবু একটু বেশীমাত্রায়ই ভালবাসেন, এবং ভালবাসেন বলেই স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর সন্দেহ। এই মিথ্যা সন্দেহের বশীভূত হয়ে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ কবেন তাই একটি কৌতুকজনক কাহিনীতে লেখক পরিবেশন করেছেন। লেখকের কাছে ভালবাসা এবং সন্দেহ দুই-ই একরকমের মানসিক বিলাস; অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার জন্য মাঝে মাঝে খেসারত দিতে হয় বৈকি!

'আহুতি' একটি দীর্ঘ গল্প, এবং গভীর রসাত্মক। এক উত্তরাধিকারীহীন ধনী ব্যক্তি সারা জীবন ধরে অনন্যনিষ্ঠ হয়ে শুধু অর্থ সঞ্চয় করেছে। বৃদ্ধবয়সে এই সঞ্চিত অর্থকে পাহারা দেওয়ার জন্য সে এক শিশুকে চুরি করে এনে যখ্ দেয়। পরে শিশুর মা খবর জানতে পেরে লোকজন নিয়ে এসে দারুণ প্রতিশোধ নেয়। সমস্ত বাড়িঘরে সে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমস্ত লোকজন সংঘর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনো সে জায়গাটা এক পোড়ামাটির জনশূন্য দগ্ধ প্রান্তর হয়ে ভূতের বাসস্থান বলে লোকের মনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। লেখক কিছু অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার চিত্রও সংযোজিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে এক অনুরূপ কাহিনী আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল এক অমানুষিক ঘটনা-জনিত কারুণ্যকে রূপ দেওয়া। তাঁর গল্পে মানবিক

আবেদনই প্রধান। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি জীবনের এক গভীর প্যারাডক্সকে এই কাহিনীর মধ্যে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। মানুষ তার ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য হয়তো একটিমাত্র নিষ্ঠুরতার কাজ করে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় এমন বিপুল পরিমাণ নিষ্ঠুরতা এসে দেখা দিতে পারে যে তা আগে জানতে পারলে মানুষ কখনোই প্রথম নিষ্ঠুরতার কাজটিতে অগ্রসর হত না। লোকটি চেয়েছিল একটি মাত্র প্রেত সেখানে যখ্ হয়ে পাহারা দেবে; কিন্তু যায়গাটা হাজার হাজার প্রেতের লীলা-ভূমি হয়ে উঠল। সুতরাং গল্পটি গভীর রসাত্মক হলেও লেখকের মূল লক্ষ্য ব্যঙ্গাত্মক; এবং তাঁর অন্যান্য গল্পের মধ্যে এ গল্পটিকে একটি ব্যতিক্রম বলে গণ্য করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। হুতোমী ভাষা, আলালী ভাষার মত বীরবলী ভাষাও বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই বীরবলী ভাষার বিশেষত্ব হল প্যারাডক্স বা বিরোধাভাসের প্রাধান্য। সত্যি বলতে কি, শুধু ভাষার মধ্যেই এই প্যারাডক্স সীমাবদ্ধ নয়। বীরবলের প্রায় প্রতিটি গল্পই প্যারাডক্স। প্যারাডক্সের মূল কথা হল অভ্যস্ত চিন্তার বাইরেও যে কোন সত্য থাকতে পারে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। বীরবলের গল্পগুলো এ কাজই করে। এ কথা হয়তো ঠিক, কোথাও কোথাও মনে হয় বীরবলের প্যারাডক্স একটা মুদ্রাদোষের সামিল; তা অনেক কষ্টকল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। প্যারাডক্সের মোহে তিনি 'ছোট গল্প' 'ভাববার কথা' প্রভৃতি কিছু কিছু স্কেচ্ রচনা করেছেন যার মধ্যে আলোচনামূলক সংলাপ প্রাধান্য লাভ করেছে প্যারাডক্স-যুক্ত বাক্য ব্যবহারের সুবিধার জন্য, আবার সামান্য একটু কাহিনীরও সংস্পর্শ আছে। তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বীরবলের গল্পগুলি মৌলিক এবং অননুকরণীয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ঠিক এ ধরণের গল্পের মত গল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। অবশ্য বীরবলী গল্পগুলি অনুকরণ করা শক্ত হলেও, আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু লেখকের উপর তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রভাব অনুভব করা যায়। বহু আধুনিক লেখকের মধ্যে প্যারাডক্স-প্রিয়তা সংক্রামিত হয়েছে। আকস্মিকভাবে একটি হেঁয়ালী-পূর্ণ-বাক্য ব্যবহার করে ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি ঘটানো, যাকে চলতি আলোচনায় 'স্টাণ্ট্' বলে অভিহিত করা হয়, তার পিছনেও বীরবলী প্রভাব দুর্নিরীক্ষ নয়।

একটি প্যারাডক্সের সাহায্যে প্রমথবাবু ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে ছোট গল্প ছোট হওয়া চাই, এবং গল্প হওয়া

চাই। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে সহজ-বোধ্য কারণেই যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছে। আমার মনে হয় ছোট কথাটির অর্থ শুধু পরিসরের হ্রস্বতা নয়; 'ছোট' কথাটির তাৎপর্য এই যে ছোটগল্পের একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে (উপন্যাসে কয়েকটি লক্ষ্যের সমন্বয় ঘটে)। ছোট গল্পের পাঠক ঘটনা-স্রোতের মধ্যে নিজেকে সামিল করেন না। কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একত্বীভূত করেন (identify) না। তিনি ঘটনা-স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে সজাগ বুদ্ধি ও কৌতূহল নিয়ে ঘটনা-স্রোতকে পর্য-বেক্ষণ করেন কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য। সেই-জন্যই প্রমথবাবু কাহিনী-বিস্তার পছন্দ করেন না; বুদ্ধিবৃত্তি সর্বদা অনাবশ্যককে পরিহার করে চলতে চায়। গল্প বলতে প্রমথবাবু ঠিক আদ্য-মধ্য-অন্ত বা সূচনা-সংঘাত-পরিণতি সমৃদ্ধ একটি সুডৌল কাহিনী বোঝেন না। প্রমথবাবুর গল্প একটি ঘটনা স্রোতের তাৎপর্য-পূর্ণ খণ্ডাংশ হতে পারে; আবার দীর্ঘকালস্থায়ী অনেক ঘটনার সমষ্টি একটি কাহিনী হতে পারে। কিন্তু বৈঠকী গল্পের বক্তা দীর্ঘ কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা করে শ্রোতাদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন না। তিনি শুধু কাহিনীর প্রধান গ্রন্থিগুলিকে উন্মোচন করেন শ্রোতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্য। কাহিনীর গ্রন্থিগুলি দীর্ঘকালের ব্যাপার হলেও তা যেন একই কালেব ব্যাপাব হিসাবে শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে, যাতে কাহিনীব লজিক বা যুক্তি-সূত্রটা তাদের বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে। সুতরাং সমস্ত কাহিনীটা মিলে একটি সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। প্রমথবাবুর সংজ্ঞার এই ব্যাখ্যা অন্ততঃ তাঁর রচিত গল্পগুলির ক্ষেত্রে সত্য। লক্ষণীয় এই যে প্রমথবাবু অনেক গল্পেই কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে আসল কাহিনীটি শুনিয়েছেন। তাতে সুবিধা হয়েছে এই যে কাহিনীটি সম্পর্কে বক্তা ও শ্রোতা চরিত্রদের কিছু কিছু মন্তব্য আমরা উপহার পাই। বলা বাহুল্য, বক্তা ও শ্রোতাদের উক্তির মধ্যেও কাহিনী সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিহিত থাকে না;—প্রমথবাবু কোথাও তাঁর কাহিনীর কোন তৈরি সিদ্ধান্ত পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পাঠকের উপব। কাহিনী যেখানে বর্ণিত সেখানে স্বভাবতঃই তা স্মৃতি-চারণা বা অতীতের রোমন্থন; তার মধ্যে পাঠকের অংশ গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বলা বাহুল্য, প্রমথবাবুর এই রচনা-কৌশল ব্যঙ্গাত্মক বা কৌতুকজনক কাহিনীর পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু প্রমথবাবু গভীর রসাত্মক গল্পের ক্ষেত্রেও এই কৌশল অবলম্বন করেছেন; যেমন 'আহুতি'তে। এই গল্পেও আসল

কাহিনীটি অতীতের ঘটনা, বর্ণিত কাহিনী; কাজেই কাহিনীর ভয়াবহতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পাঠককে উপহার দেওয়ার কোন অভিপ্রায় তাঁর নেই। পাঠকের মনে 'রস'-সঞ্চার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর আবেদন পাঠকের বুদ্ধির কাছে।

কাহিনীগুলির মধ্যে প্রমথবাবু প্রচলিত স্বীকৃত মত পথ সিদ্ধান্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি সর্বক্ষেত্রেই যা প্রচলিত এবং স্বীকৃত তা অস্বীকার করছেন। আমি যতদূর বুঝেছি তাতে প্রমথবাবুর উদ্দেশ্য হল চিন্তার বিকল্প পন্থা দেখিয়ে দেওয়া। প্রমথবাবুর কাহিনী আমাদের পন্থা নির্দেশ করে না, কর্মে প্ররোচিত করে না। তাঁর উদ্দেশ্য শুধু বুদ্ধি-সঞ্জাত আনন্দ দান করা। যদি অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য আমরা অনুসন্ধান করি তো তা হল আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে শাণিত করা, আমাদের যুক্তি-প্রবণতাকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রমথবাবু হলেন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকদের শেষ প্রতিনিধি।

প্রথম চৌধুরীর শিল্পী ব্যক্তিত্ব একটি নিটোল গীতিকবিতার মত বা একটি বীরবলী ছোট গল্পের মত। তার মধ্যে কোথাও কোন খাদ বা ভেজাল নেই; কোথাও ছন্দপতন নেই। সারাজীবন বাণীর অকুণ্ঠ সেবক থেকেও খুব সামান্য সারস্বত-সঞ্চয় তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তার কারণ, নিজের সীমার বাইরে পদক্ষেপে তাঁর গভীর অনীহা ছিল; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা বাহুল্যকে তাঁর পরিশীলিত পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন সর্বদা পরিহার করে চলেছে।

'নানাকথা' ও 'রায়তের কথা'র মধ্যে সংগ্রথিত প্রবন্ধগুলিও মূল্যবান; সেগুলির মধ্যেও তাঁর বিষয় নির্লিপ্ত যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আপাতত এগুলি আমাদের আলোচ্য-সূচীর অন্তর্গত নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বীরবলের দৃষ্টিভঙ্গীর খানিকটা আভাস পেতে পারি। প্রথমতঃ, বীরবল বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ছিলেন। সমাজের এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তিনি যুক্তি-প্রয়োগের সার্থকতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এক ধরনের অর্ধ-বিকশিত রোমান্টিকতার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল যা জনসাধারণের রেনেশাঁসসুলভ আবেগ-প্রবণতার সুযোগ নিয়ে জন-চিত্তে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে ও বিভ্রান্তিকর বা পুরাতনের সঙ্গে আপোষমূলক চিন্তার জন্ম দিচ্ছিল। এই ক্ষতিকর রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বীরবল দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁর

বাহন হয়েছিল পরিহাস চটুল ব্যঙ্গ। তৃতীয়তঃ, যদিও তিনি বাংলা দেশে শিল্প-কৈবল্যবাদের তত্ত্বের জন্মদাতা, এবং সাহিত্যকর্মকে বাস্তবের উর্ধ্বে তুলে মানুষের কল্পনা-রাজ্যে স্থাপন করেছেন, তথাপি তাঁর বিভিন্ন রচনায় তখনকার দেশেব কষ্ট-কল্পনা ও কল্পনা-বিলাসিতাকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করেছেন। চতুর্থতঃ, প্রমথ চৌধুরী প্রথম পূর্ণাবয়ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক। বঙ্কিমের সময় থেকেই যদিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের দেশে ভিত গেড়ে বসেছে। কিন্তু প্রমথর পূর্ববর্তী সমস্ত লেখক ও বাজনৈতিক নেতার পেছনে কম-বেশী গণ বা দল সমর্থন ছিল। বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে দেশের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লেখনী-ধারণ করার সৎসাহস প্রমথ চৌধুরীব মধ্যেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীর অবিশ্যি অভাব ছিল না, কিন্তু তার বিশিষ্ট চিন্তাধারার কোন সহগামী বা অনুগামী ছিল না। তাঁর বিচ্ছিন্নতাই তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত উচ্চারিত ও স্পষ্ট কবে তুলেছে।

মোটের উপর পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার জন্য, বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিকতাব জন্য, এবং ভাবালুতা-অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে অনমনীয় সমালোচকের ভূমিকার জন্য প্রমথ চৌধুবী বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর কালেব ব্যতিক্রম—এবং কী করে এটা সম্ভব হল আমরা অতঃপর তারই অনুসন্ধানে অগ্রসব হব।

উনিশ শতকের শেষ দিকে আমাদের দেশে কিছু পরিমাণে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময়টাতেই রবীন্দ্রনাথের মন গঠিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ছোট; এবং তাঁর মানস-গঠনের সময়ে উগ্র সনাতনপন্থী জাতীয়তার জোয়ার উদার-নৈতিকতার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, শিক্ষায়-দীক্ষায় বংশ-কৌলীন্যে, আত্মীয় গৌরবে, প্রমথ চৌধুবী বাঙালী সমাজের উচ্চতম স্তরে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেখানে তখনও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বেঁচে ছিল। স্বভাবতই সনাতনপন্থীদের পিছনে ব্যাপক গণ-সমাবেশ ঘটলেও তাঁদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি চৌধুরী মশাই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সনাতনপন্থী চিন্তার সঙ্গে সংঘাতই তাঁর মনের গণতন্ত্র-প্রিয়তাকে আরও ধারালো, তীক্ষ্ণ, যুক্তিবাদী এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে রোমান্টিক হওয়া সম্ভব ছিল না; এবং

তখনকার ক্ষতিকর রোমাণ্টিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। খুব সম্ভব এই ভাবেই প্রমথ চৌধুরীর মত বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যুক্তিবাদীর অস্তিত্ব আমাদের দেশে সেইযুগে সম্ভব হয়েছিল। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথও এই উগ্র জাতীয়তাব বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি অনুভূতিপ্রধান মানুষ ছিলেন বলে তাঁর গণতান্ত্রিক মানবতন্ত্রী চিন্তাধারাকে রোমাণ্টিক আবেগের স্তবে উন্নীত করে গণ-মানসের হৃদয় দুয়ারে আঘাত করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিবাদী মানুষ ছিলেন; গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখাব জন্য দেশেব প্রধান চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তিনি নিজের জন্য একটি ছোট্ট স্বাতন্ত্র্যবাদেব দুর্গ নির্মাণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরবর্তী সাহিত্যে বীরবলের খুব প্রত্যক্ষ প্রভাব টের পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রে, বা এমন কি ব্যঙ্গ-বচনাতেও তিনি কোন ধারাবাহিকতার জন্ম দেননি। তবে তাঁর প্রভাব টের পাওয়া যায়' সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। সাহিত্যগুণ-যুক্ত সাংবাদিক প্রবন্ধ রচনাব পথ তিনিই দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর পরোক্ষ সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভব করা যায় পরবর্তী লেখকদের মানস-ক্ষেত্রে। এতকাল পর্যন্ত একমাত্র প্রতিভাধরগণ ছাড়া সাধারণ লেখকের পক্ষে পূর্বানুস্মৃতি বা প্রচলিত চিন্তাধারার অনুসরণ না করা খুব শক্ত কাজ ছিল। প্রমথ চৌধুরী লেখকের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে এমন সুরক্ষিত করেছিলেন যে পরবর্তীকালে নিতান্ত ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষেও নিজের কলানৈপুণ্যের বা চিন্তাধারার নিজস্বতাকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ কবা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশেব মত সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা এবং গুরুবাদের দেশে লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন চিন্তার শক্তিশালী ঐতিহ্য সৃষ্টি করার জন্যই প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মবণীয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ | রবীন্দ্র শরৎ যুগ

বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের পরিচয়

রবীন্দ্র-শরৎ যুগের বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত মূল্য বুঝতে হলে সেই সময়কার একটি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকেরও প্রথম পাদে বিপুল সংখ্যক উদ্বৃত্ত নারী বাংলা দেশের ছোট বড় শহরগুলিতে এক বিষম সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। তখনকার দিনে এই উদ্বৃত্ত নারী-সমাজের সামনে একটিমাত্র উপজীবিকার রাস্তা উন্মুক্ত ছিল, এবং তার ফলে পল্লীগুলি ক্রমশঃ স্ফীতকায় হতে হতে অনেক সময় ভদ্র-পল্লীগুলির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। সমাজ জীবনে সরবরাহ এবং চাহিদার মধ্যে একটা রহস্যময় সম্পর্ক আছে; যার ফলে কোন পণ্যের সরবরাহ অসম্ভব রকমের বৃদ্ধি পেলে সেই অনুপাতে সেই পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। [অর্থ-নীতিতে যে বলে, সরবরাহ বাড়লে চাহিদা কমে এবং ফলে জিনিসের দাম কমে, এ-কথা কেবল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজ-বিদ্ জানেন যে যে দেশে প্রচুর নারকেল জন্মে, সে দেশের লোক নারকেল বেশী খায়। আমের ঋতুতে আম কেনার জন্য প্রচুর ক্রেতা সমাগম হয়; কিন্তু অকালের আম কেনার জন্য তেমন ক্রেতার ভীড় দেখা যায় না।] সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই সেকালে সমাজের নৈতিক মান খুব নিম্নগামী ছিল। তখনকার দিনের একজন ভদ্রলোকের পক্ষে বারবনিতা গৃহে গমন অথবা দু' একজন রক্ষিতাকে পালন করা খুব লজ্জাকর বিষয় বলে গণ্য হত না। সন্ধ্যার পর পিতার সন্ধানে কোন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলে পুত্র কোন বারবনিতার গৃহে পিতাকে পাওয়া যাবে তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত বোধ করত না। একদিকে মনু-শাসিত সমাজে ব্রহ্মচর্য এবং সতীত্বের গুণ-কীর্তনের বিরাম ছিল না; অপরদিকে একাধিক নারীর সঙ্গ-লাভ পুরুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে গণ্য হত।

নানা কারণে সেকালে এই বিপুল উদ্বৃত্ত নারী-সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। বাল্য-বিবাহ এবং পুরুষের বহু বিবাহ, এবং তার ফলে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহে সামাজিক বাধা ; স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার ; অর্থনৈতিক উপযোগিতার অভাবের দরুণ নারীর প্রতি সমাজের স্বাভাবিক অবজ্ঞা ; দারিদ্র্য এবং অভিভাবক-শূন্য নারীর অসহায়তা,—প্রভৃতি ঘটনাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ যাই হোক, তখনকার শিক্ষিত সমাজ-মানসের কাছে সমাজের এই কুশ্রীতা নিঃসন্দেহে প্রীতিকর বলে বোধ হয় নি। বিশেষ যাঁবা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ডের সুচিতা বোধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের সমাজের এই চিত্রকে অত্যন্ত কলঙ্কজনক বলে গণ্য করতেন।

বঙ্কিম যুগে এই সমস্যা আরও প্রবলতর আকারে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেকালের লেখক এই কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সামান্য উল্লেখকেও অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মনে করতেন। সাহিত্যে পতিতা-চরিত্রের স্থান হতে পারে এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি। বিধবা সমস্যা নিয়ে তাঁরা কাহিনী রচনা করেছেন ; কিন্তু সেখানে বিধবার অন্তর্জ্বালাই তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়েছে ; সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্য যে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রয়োজন—এ ধবণের যুক্তি কোন কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়নি। বস্তুতঃ বঙ্কিম যুগের সাহিত্যে যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের নৈতিক সুচিবায়ুর মনোভাব বিদ্যমান ছিল তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তাব কারণ অনুমান করাও শক্ত নয়। ভরতচন্দ্রের কাল থেকে সুরু করে বাংলা কাব্যে এবং কবিগান তরজা প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠানেব মধ্যে অশ্লীলতা অশালীনতা এবং নিম্নরুচির পরিচায়ক ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছিল ; বঙ্কিম যুগের সাহিত্য এই গড্ডালিকা-স্রোতের প্রতিক্রিয়া। তা ছাড়া এ-কালের সাহিত্যের উপর রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংলণ্ডের পিউরিটানিক মনোভাবের ছায়াপাত ঘটেছিল এরুপ অনুমান করারও সঙ্গত কারণ আছে। এই সব কারণেই বঙ্কিমযুগে বাস্তববাদী সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটলেও তার মধ্যে উদ্বৃত্ত নারী-সমাজের সমস্যা স্থান-লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু মানুষের নিয়ম এই যে কোন কিছু আরম্ভ করলে মাঝ পথে থামতে জানে না। বঙ্কিম-যুগে যে বাস্তববাদী চিন্তার জন্ম হয়েছিল, এক যুগ পরে

তা নির্ধারিত গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজ-দেহের গভীরতর ক্ষত আবিষ্কারের চেষ্টায় পতিতা সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আরও এক যুগ পরে আমরা দেখতে পাব বাস্তববাদ সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ কৃষক মজুর, এমন কি চোর ডাকাত ভিখিরি প্রভৃতির সমস্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সে যাই হোক, রবীন্দ্র-শরৎ যুগের সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী আলোচিত সমস্যা হিসাবে যদি কোন সমস্যার উল্লেখ করা যায় তবে তা উদ্বৃত্ত নারী সমাজের সমস্যা। যেখানেই আমরা কোন উপন্যাসে সমাজনীতির পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে দেখতে পাই, সেখানেই বুঝতে পারি এই গুরুত্বদানের পিছনে লেখকের মনে উদ্বৃত্ত নারী সমাজের চিন্তা কাজ করছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ যুগের প্রধান দু'জন লেখক—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে পতিত নারীর চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মসমাজের শুচিতা বোধের প্রভাব সহজেই অনুভব করা যায়, তার ফলে তাঁর 'বৈষ্ণবী' প্রমুখ এক আধটি ছোট গল্পে মাত্র গৃহচ্যুত নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। শরৎ-সাহিত্যে দুঃসাহসিকতার অনেক নিদর্শন সত্ত্বেও তাঁর উপর যে ব্রাহ্মণ পরিবার সুলভ নৈতিক রক্ষণশীলতার প্রভাব ছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। খুব সাবধানে দু' একটি কাহিনীতে তিনি উদ্বৃত্ত নারী চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন, যেমন চন্দ্রনাথে। শেষ পর্যায়ের কিরণময়ীকে একজন অভিজাত পতিতা বলে গণ্য করা চলে।

কিন্তু এ যুগের উপন্যাসিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরেই যাঁদের নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, জলধর সেন,—তাঁদের রচনায় উদ্বৃত্ত নারী সমাজের সমস্যা অনেক বেশী স্পষ্টতর ও তীব্রতরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁরা অবশ্য সরাসরি-ভাবে বারবণিতাকে কদাচিৎ-ই কাহিনীর উপজীব্য করে তুলেছেন; কিন্তু সমাজ-জীবনের যে-সব গলদ বারবণিতা সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ তা তাঁদের কাহিনীতে রূপ-লাভ করেছে। এ যুগে বটতলার উপন্যাস বলে অবজ্ঞাত একজাতের সুলভ মূল্যের উপন্যাস স্বল্প-শিক্ষিত নারী-সমাজের অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এসব উপন্যাসের শিল্প মূল্য যৎসামান্য, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই উপন্যাসের সীমা হল সতীত্বের জয়-গান করা। তথাপি এ-সব বইতে যে তৎকালীন সমাজ বাস্তবের ছায়াপাত ঘটেনি তা নয়। বটতলার অনেক কাহিনীতেই জমিদার

কর্তৃক অসহায় সুন্দরী গ্রাম্য-বধূকে অপহরণ, ধনী দুর্বৃত্ত কর্তৃক গরীবের ঘরের অনাহার-পীড়িত বধূকে ফুসলিয়ে বার করে নেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। এ-সব চিত্র যে বাস্তব ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য কাহিনীতে যখন নারী সমস্যা ক্রমবর্ধমান গুরুত্বলাভ করেছে, বাস্তব সমাজে তখন এ সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বিংশ শতাব্দী যত এগিয়ে গিয়েছে, ততই নাগরিক জীবনে কিছুটা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির ফলে এবং শিক্ষা-বিস্তাব ও নৈতিক মানের উন্নয়নের ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনের সংহতি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীকে নিছক পণ্য ও ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে দেখার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে গৃহচ্যুত সমাজ চ্যুত নারীর সংখ্যাও হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সমস্যাটা যখন তীব্রতম আকারে উপস্থিত ছিল, তখন লেখকদেব দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি; সমস্যাটা যখন আপনা-আপনি আংশিক সমাধানের পথে অগ্রসর হয়েছে, তখনই লেখকেরা তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছেন। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমাজে সংকটজনক অবস্থা থাকলেই তা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেজন্য লেখকের প্রয়োজনানুরূপ মানস প্রস্তুতি দরকার।

রবীন্দ্র-শরৎ যুগের উপন্যাসের প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। ইংরাজ রাজত্বের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে শহরগুলি বিস্তার লাভ কবেছে, আর তার ফলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রামগুলিকে কানা করে দিয়ে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজই শহরে আশ্রয় নিয়েছে। এদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে খানিকটা নিরাপত্তার ভাবও দেখা দিয়েছে এবং জীবিকার জন্য পরিশ্রম করার পরও খানিক উদ্বৃত্ত সময়ও এরা লাভ করতে পেরেছে। কিন্তু অবসর যাপনের জন্য যাত্রা কবিগান প্রভৃতি মুমূর্ষু-প্রায়, শহুরে রুচির সঙ্গে এ-সব লৌকিক সংস্কৃতির সুর মিলছে না। তার ফলে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছে উপন্যাস অবসর যাপনের একটি অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিম থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব লেখকই পাঠকের অবসর যাপনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই সাহিত্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা এমন এক সামাজিক পরিবর্তনের মোহনায় দাঁড়িয়েছিলেন যে উদ্দেশ্য-বিহীন হয়ে কর্তব্য-বুদ্ধি বিস্মৃত হয়ে তাঁদের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিশ শতকে এসে আমরা দেখতে পাই

নিছক অবসর যাপনের জন্য প্রচুর উপন্যাস লেখা হচ্ছে যার পিছনে কোন উদ্দেশ্য বা কর্তব্য বুদ্ধির ভেজাল নেই। এই অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্য রচনার প্রবণতা থেকেই হয়তো এ-কালে শিল্প কৈবল্যবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল, এবং আর কয়েক বছর পরে কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ কালে তা আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য অবসর-বিনোদনের সাহিত্য আর শিল্প কৈবল্যবাদের মধ্যে তফাৎ অনেক। শিল্প কৈবল্যবাদ উপন্যাসকে বিশুদ্ধ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছে, আর অবসর-বিনোদনের সাহিত্য যে-কোন উপায়ে পাঠককে খুশী করতে ব্যস্ত। শরৎ সাহিত্যে আমরা যে রোমান্টিক ভাবালুতার সাক্ষাৎ পেয়েছি ; অবসর-বিনোদনের সাহিত্যে ক্রমশঃ তাই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার আমরা এ যুগের কয়েকজন লেখক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নরেশচন্দ্র অনেক কাল ধরে লেখার কাজ ছেড়ে দিলেও এখনও তিনি জীবিত ; কিন্তু ইতিমধ্যেই বাঙালী পাঠক সমাজ তাঁকে প্রায় ভুলতে বসেছে। বাঙালী পাঠকের স্মৃতিশক্তির এতখানি অভাব প্রশংসাযোগ্য নয়। কারণ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী গৌরবময় আসন নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে। সমস্যা-সঙ্কুল বাস্তবের এমন নির্ভীক ও আন্তরিকতা-পূর্ণ রূপকার বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা দেননি। এতকাল পর্যন্ত যে-সব সমস্যাকে সংস্কারের নাগপাশ ভেঙে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে বাঙালী লেখকগণ সাহসী হন, নরেশচন্দ্র অকুতোভয়ে সেই নিষিদ্ধ সমস্যার উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। কাজেই অগ্র পথিকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলে গৃহ-চ্যুত নারী ও সেই নারীকে ঘিরে যত রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয় ও অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নরেশচন্দ্র তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাস্তব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই এবং সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়েছিলেন বলেই নরেশচন্দ্র অসাধারণরকমের সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ। তাঁর কাহিনীতে কোথাও মিথ্যা অসার ও অবাস্তব কল্পনা স্থানলাভ করেনি। বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার সাহায্যে তিনি অনুভব করেছিলেন যে গৃহচ্যুত নারীর সমস্যা নিছক অল্প কয়েকজন নারীর বিশেষ সমস্যা নয়, তা বৃহত্তর নারী সমাজের ব্যাপকতর সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ব্যাপক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি

গৃহচ্যুতাদের সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং তাকেই তিনি তাঁর উপন্যাস সমূহের প্রধান উপজীব্য বিষয় বলে গ্রহণ করেছিলেন।

নরেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে আদর্শবাদী ও সংস্কারপন্থী ছিলেন। অর্থাৎ এদেশে একটি সুখী সুন্দর উন্নতিশীল সমাজ গড়ে উঠুক এ কামনা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই বলে কতকগুলি সহজ ফরমুলার দ্বারা সমাজের গভীরে প্রবৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা যায় এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। সমস্যা যে গভীরে প্রোথিত, এবং তাঁর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমাজের ভিত্তিস্থানীয় মূল নীতির পরিবর্তন দরকার এ-বোধ তাঁর ছিল। এ প্রয়াস যে কত দুরূহ তা তিনি জানতেন। তিনি এও জানতেন যে মানব-চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি জটিলগ্রন্থি আছে যেগুলি সংস্কার-প্রয়াসের পথে বিষম বাধা। একদিকে রক্ষণশীলতা এবং অপরদিকে মানুষের চরিত্রগত জটিলতা এই দুই মিলে সংস্কারকের যাত্রাপথকে দুর্গম করে তুলেছে।

নরেশচন্দ্র সুশিক্ষিত লেখক। বিদেশীর সাহিত্যের অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেই চিন্তাকে দেশীয় সমাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছেন যে সমস্যার সমাধান দুর্নিরীক্ষ নয়, কিন্তু তার পথ দুর্গম। উন্নততর সমাজ যুক্তির দিক থেকে আয়াস লভ্য, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে। তাই একধরণের ব্যর্থতা-বোধ ও হতাশার মনোভাব নরেশচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের উপর একটা গাঢ় বেদনা-বোধের ছায়াপাত ঘটিয়েছে। এই বেদনা-বোধের অনুভূতিই নরেশচন্দ্রের সমস্যা প্রধান উপন্যাসকে মানবিক আবেগ সম্পন্ন করে তুলেছে।

কোন কোন সমালোচকের মতে উদ্দেশ্যমূলকতার আতিশয্য নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের ব্যর্থতার কারণ। কিন্তু ফীল্ডিং-এর 'টম্ জোনস্' ভিক্টর হুগোর 'লা মিজায়েবল', লিও টলস্টয়ের 'ওআর এণ্ড পীস্' প্রভৃতি বিশ্ব বিখ্যাত বইগুলি উদ্দেশ্যমূলক। বস্তুত সঙ্গীত বা নৃত্যশিল্প যে অর্থে বিশুদ্ধ শিল্প, সে অর্থে উপন্যাস বিশুদ্ধ শিল্প নয়। উপন্যাসে ব্যক্তি-জীবন সমাজ-জীবন জীবন-দর্শন সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি কাহিনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি উক্ত উপন্যাস গুলিতে বহু তত্ত্বালোচনা এবং নীতি উপদেশও স্থান-লাভ করেছে। লক্ষণীয় এই যে বইতে লেখক যে-সব তত্ত্বালোচনার অবতারণা করেন তার জন্য বইয়ের মূল্য বাড়ে না বা কমে না। কাহিনীর মধ্যে বা ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে যদি লেখকের বক্তব্য বা

চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ্ করে তবেই উপন্যাসের সার্থকতা। কাহিনী যদি নিজস্ব গতিতে না চলে, যদি অনুভব করা যায় যে লেখক কাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাহিনীর উপর বলপ্রয়োগ কবছেন, তবে সে-কাহিনী ব্যর্থ। লেখকের বক্তব্য সেখানে নিতান্তই বুদ্ধির আশ্রয় পুষ্ট, তা একটি পরিপূর্ণ শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়নি। সুখের বিষয় কাহিনী রচনায় নরেশচন্দ্রের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও, তার অনেক কাহিনীই তাঁর চিন্তাধারাব ভার বহনে সক্ষম।

আদর্শমূলকতার অভিযোগ সম্পর্কে নবেশচন্দ্র নিজে তাঁর 'পাপের ছাপ' নামক বইয়ের ভূমিকায় যে-কথাগুলি লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

'আমি আদর্শ লইয়া একেবার কাববার করি নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি এক একটি বিশিষ্ট বাস্তব জীবনে এক একটি আদর্শের ক্রিয়া। আমি আদর্শ মানুষ গড়িতে চেষ্টা করি নাই। যাঁবা আমাব গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা তাবা নিতান্তই মানুষ, তাই তাদের যেমন একদিকে আদর্শ আছে, অপব দিকে তাদের রক্ত মাংসের শরীরটাও আছে। তাই তারা কোন পূর্ণাদর্শেব অভ্রান্ত কল্পনাও কবে নাই, তার অনুশীলনেও পায়ে পায়ে ঠেকিয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন আদর্শ যে ঠিক এমন কথা আমি হলপ করিয়া বলি নাই।'

নিজের রচনা সম্পর্কে নরেশচন্দ্রেব এই উক্তিকে আমি অভ্রান্ত বলে মনে করি। কর্মব্যস্ত মানুষ নবেশচন্দ্র নানা কাজের ফাঁকে যে সব উপন্যাস রচনা করেছিলেন তাব সংখ্যাটা বিস্ময়কর রকমের বড়। স্বভাবতঃই কোন উপন্যাসে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে পারেন নি। তাঁর কাহিনী রচনার মধ্যে তাই অস্বাভাবিক দ্রুততা এবং অমনোযোগিতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাহিনীব বিভিন্ন দৃশ্য ভবাট, স্বচ্ছন্দগতি, এক কথায় জীবনানুগ সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। দ্রুত চিন্তায় অভ্যস্ত বলে পাঠকের কথা না ভেবে তিনি যেন উর্ধ্বশ্বাসে কাহিনীর পবিসমাপ্তির দিকে ছুটে চলেছেন। এই দ্রুততার দরুণই তার রচনার ভাষা সাবলিল হলেও, তার মধ্যে ব্যঞ্জনাধর্মিতা, অলঙ্কবণ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ইমেজেব অভাব থেকে গেছে। তবে তাঁর কাহিনীর জটিলতার কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জটিল। তার কাছে সমস্যাগুলি খুব সরল নয়, সমাধানও সুলভ নয়।

বাঙালী পাঠকের কাছে নরেশচন্দ্র যে তাঁর প্রাপ্য সম্মান লাভ করেননি

তার কারণ বাঙালী পাঠক পাঁচমিশেলি রসের পক্ষপাতী। কিছু রোমান্স, কিছু হাস্যরস, কিছু কৌতুকজনক বা মিষ্টি ঘটনার ফোরন না থাকলে বাঙালী পাঠক খুশি হয় না। স্বভাবতঃই ঐতিহাসিক এই বিশিষ্ট রুচির নিরিখে সাহিত্যের মূল্যবিচার করতে পারেন না। নরেশচন্দ্র গুরুগম্ভীর লেখক, সমস্যান্তবর্তী ;—তিনি অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভালই করেছেন।

নরেশচন্দ্রের 'শুভা' (১৯২০) বাঙলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে মননধর্মী রচনার একটি অভিনব প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে বা কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে নায়ক বা নায়িকার মনে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হল: তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সেই প্রশ্নটির উপর নানাভাবে আলোক নিক্ষেপ করল, এবং তারই ফলে প্রশ্নটি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল। ইতিপূর্বে 'গোরা' উপন্যাসে এই প্যাটার্নের প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু গোরার জীবনের একেবারে শেষ অভিজ্ঞতাটি ছাড়া আর সব অভিজ্ঞতাই তার জীবন-বৃত্তের বাইরের ঘটনা ; সুতরাং এই প্যাটার্নের উদাহরণ হিসাবে 'গোরা' খুব সার্থক সৃষ্টি নয়। যতদূর মনে হয় 'শুভা'ই এই প্যাটার্নের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ, এবং নরেশচন্দ্র পথিকৃতের দাবী করতে পারেন। অবশ্য বিদেশে এই প্যাটার্ন অনুযায়ী রচিত বইয়ের অভাব নেই।

পৃথিবীর কয়েকখানি খুব নাম করা বই-এ এই প্যাটার্ন অনুসৃত হয়েছে। তথাপি শৈল্পিক সার্থকতার বিচারে এই প্যাটার্নের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ, এই রীতিতে নায়ক বা নায়িকা কম-বেশী লেখকের প্রতিনিধিত্বের গৌরব লাভ করে। সে খানিকটা আদর্শায়িত হয়, এবং পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনায় তার চরিত্রের বিপুল পার্থক্য বিসদৃশ বলে মনে হয়। কাহিনীর প্রতি পর্যায়ে নায়ক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে, এবং সেই সঙ্গে আত্ম-বিশ্লেষণও করে, এই বিশ্লেষণের বাড়াবাড়ি কাহিনীর গতিকে শুধু যে বাধাগ্রস্ত করে তাই নয়, লেখক স্বয়ং প্রতি পদে পদে কাহিনীর ব্যাখ্যা করেন বলে পাঠক তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান না। সুতরাং মনে হয় 'কপালকুণ্ডলা', 'সীতারাম' প্রভৃতি বইতে বঙ্কিম অনুসৃত প্যাটার্নটি রস-বোধের দিক থেকে অধিকতর উপযোগী।

অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল স্বামী নিবারণের সঙ্গে সংসার-ধর্ম পালন করা অসম্ভব বলে বোধ হওয়ায় শুভা একদিন পালিয়ে এসেছিল কলকাতা। কলকাতায়

এসে সে চাঁপা নামক একটি সন্দেহজনক চরিত্রের স্ত্রীলোকের কাছে আশ্রয়-লাভ করে। দৈবক্রমে তার অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীনা নারী হিসাবে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে সে জীবন কাটাবে এ-স্বপ্ন তার শীঘ্রই ভেঙ্গে গেল। নারীকে হয় স্বামীর ঘরে পত্নী হয়ে থাকতে হবে, আর নয়তো অন্য কোন পুরুষের উপপত্নী হয়ে কাল কাটাতে হবে—এই নাকি নারীব বিধিলিপি। এই বিধিলিপিকে এড়ানোর জন্য শুভা চাঁপার আশ্রয় ত্যাগ করল এবং ভিন্ন একটি থিয়েটারে যোগ দিল। তথাপি এ-দেশেব নাবীর বিধিলিপিকে সে এড়াতে পারল না, এবং নতুন থিয়েটাবের ম্যানেজাব নগেনেব উপপত্নী হয়ে সে একদিন আবিষ্কার করল আব একজন নাবীব জীবনে—যে নারী নগেনের ধর্ম-পত্নী—সে দারুণ অভিশাপ ডেকে এনেছে। এই অবস্থাটাকে বিবেকের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পেরে সে নগেনের সংশ্রব ত্যাগ করল। কিন্তু দেখল, নারী হিসাবে তার জীবনেও পুরুষের জন্য কিছু কামনা রয়েছে; নিঃসঙ্গ জীবন তার পক্ষেও কাম্য নয়। এমন সময় সুরেশের সঙ্গে তাব পরিচয় হল। সুরেশের প্রতি তার হৃদয়ের অপবিতৃপ্ত প্রেম ধাবিত হ'ল এবং সুরেশও তাকে বিবাহ করতে সম্মত হল। কিন্তু নারীর পুনর্বিবাহ সঙ্গত কিনা, এবং সুরেশ শেষ পর্যন্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পাববে কিনা, এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধের অভাবে শুভা দ্বিধান্বিত হয়ে রইল। এই সময়ে ক্রীশ্চিয়ান মিশনারীদের সঙ্গে তার পরিচয় হল, এবং খ্রীষ্টীয় সমাজে তার প্রশ্নের জবাব পেল। দেখল, মণ্টি নামক এক খ্রীষ্টীয় মহিলা স্বামীর ঘব ত্যাগ করে অপর এক পুরুষের সঙ্গে সুখে ঘর করছে। জানতে পারল সে পুরুষ তার আইনানুগ স্বামী। নিবারণ ভিন্ন পবিবেশে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। শুভাকে সে চিনতে পারল না, কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হল। শুভা কিন্তু নিবারণের আকর্ষণে সাড়া দিয়ে অপর একজন নাবীর জীবনে বিফলতা ডেকে আনতে চাইল না। সে সরে গিয়ে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে স্বামীকে ডাইভোর্স করে মণ্টির সঙ্গে স্বামীর মিলনের পথ সুগম করে দিল। তারপর নিজের ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থতার কোন পথ উন্মুক্ত নেই বুঝতে পেরে শুভা একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেবা-ব্রতে নিজেকে নিয়োগ করল।

লক্ষণীয় এই যে সেবাব্রত শুভার জীবনের সমস্যার সমাধান নয়। তাব জীবনের ব্যর্থতার সান্ত্বনা মাত্র। শুভার জীবনে অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু সমাজানুমোদিত পথ যে ত্যাগ করে তার জীবন স্রোতের মুখে শ্যাওলার মত অনেক ঘাট স্পর্শ করেই চলে। শুভার জীবনের কোন আকস্মিক ঘটনাই নিছক কাহিনীর উপর ভারবৃদ্ধি নয়। প্রত্যেকটা ঘটনা শুভার জীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করছে। প্রধান প্রশ্ন হল—নারীর জীবনে স্বাধিকার অর্জন সম্ভব কিনা। লেখক দেখিয়েছেন, শুধু সামাজিক বাধাই এ-পথের প্রধান অন্তরায় নয়, নারী-মনস্তত্ত্বের বাধাও এক দুস্তর বাধা। আবার নারী স্বাধীন থেকে তার প্রকৃতিজ কামনা পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তাও সহজ নয়। কারণ তার ফলে অপর কোন নারীর প্রতি হয়তো দারুণ অবিচার করা হবে।

এ বইতে নরেশচন্দ্রের দুঃসাহসিক এবং সংস্কার-মুক্ত মনই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন শস্তা সমাধান তিনি উপহার দেন নি; সমস্যা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাই তাঁর কাজ। সমস্যার এত গভীরে তিনি পদার্পণ করেছেন,—সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং মানব অস্তিত্বের এমন সব মৌলিক প্রশ্নের তিনি সম্মুখীন হয়েছেন, যে সেখানে কোন সহজ সমাধান কল্পনা করাও শক্ত। জীবন সম্পর্কে এত গভীর অনুভাবনা এবং বিশ্লেষণ সত্ত্বেও দ্রুততা এবং অমনোযোগিতার জন্য বইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস-শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

'পাপের ছাপ' উপন্যাসে নরেশচন্দ্র বাস্তবতার আর একটা দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন। শুভা সৎ, সুস্থ, বিবেক-সম্পন্না নারী, সামাজিক অব্যবস্থার দরুণ জীবনের সহজ বৃত্ত-পথ থেকে স্খলিত হয়েছিল। কিন্তু 'পাপের ছাপে'র মনোরমা, স্বভাব-দুর্বৃত্ত। মেঘনাদের সঙ্গে মনোরমার এক সময়ে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু মেঘনাদ তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। পরে যখন সে জানতে পারে যে মনোরমা স্খলিত, তখন এজন্য নিজেকে দায়ী মনে করে সে অনুতাপ বশতঃ নানা চেষ্টায় মনোরমাকে খুনের অপরাধ থেকে মুক্ত প্রমাণিত করে তাকে বিবাহ করে। কিন্তু মনোরমা সুস্থ সামাজিক জীবন গ্রহণ করতে না পেরে মনি মিঞার সঙ্গে পলায়ন করে; মেঘনাদকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। শেষে হত্যার দায়ে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডাদেশ লাভ করে। গৃহচ্যুতা নারীর পুনর্বাসনের সহজ সামাজিক ব্যবস্থা থাকলেও যে সমস্যার সর্বাঙ্গীণ সমাধান সম্ভব নয় নরেশচন্দ্র এ বইতে সেই অপ্রিয় সত্যটিই উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিছু নারী (বা পুরুষ) আছে যাদের কাম প্রবণতা এবং স্বার্থবুদ্ধি এত প্রবল যে সুস্থ জীবনের

সীমাবদ্ধতায় কথনোই তারা সন্তুষ্ট হয় না। এ বইতে নায়ক মেঘনাদের আদর্শবাদী প্রচেষ্টার ব্যর্থতাজনিত হতাশা-বোধ একটি বিষন্নতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

সম্পূর্ণভাবে ভাবালুতা-বর্জিত মন নিয়ে কঠোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করাই নরেশচন্দ্রের বিশেষত্ব। নারী সমস্যার বিভিন্ন দিককে উন্মোচনের জন্য তিনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'লুপ্তশিখা' উপন্যাসে তিনি পতিতা নারী মালতীর চিত্র উপস্থিত করেছেন। নীতিবাদীর দৃষ্টি নিয়ে যেমন তিনি মালতীর এক কুৎসিত জীবন অঙ্কিত করেন নি, তেমনি শরৎচন্দ্রের মত ভাবালুতা দ্বারা চালিত হয়ে তিনি মালতীকে পাকের মধ্যে পদ্মফুল রূপেও চিত্রিত করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন মালতী অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হলেও তার মধ্যে নারী-সুলভ গুণের অভাব নেই। অনাথ বালক বটুর প্রতি তার অপরিতৃপ্ত স্নেহ ক্ষুধা ধাবিত হয়েছে। হীন-বৃত্তি অবলম্বনের জন্য তার মধ্যে একটা সলজ্জ সংকোচ রয়েছে। কিন্তু মানুষ পরিবেশের দাস। অসুন্দর পরিবেশের দুর্বার চাপে মালতীর মনের সুকুমার অনুভূতিগুলি কী করে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে, এবং অন্তর্হিত হওয়ার জন্য একটি আপশোষ বোধ কী করে তার মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ কবছে, নবেশচন্দ্র তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন।

নাবী সমস্যাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হলে নারী মনস্তত্ত্বের সন্ধান নেওয়া দরকার। নারী মনস্তত্ত্বেব বিভিন্ন দিকের প্রতি নরেশচন্দ্রের আগ্রহ কম; প্রধানতঃ নারীব কামনা-বৃত্তির বিচিত্র গতি-প্রকৃতিই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'অভয়ের বিয়ে' এবং 'তারপর' (১৯৩১) নামক যুগ্ম উপন্যাসে বিদ্বান আত্মভোলা পুরুষ অভয়কে ঘিবে দুই বোন মায়া ও সরমার বিচিত্র প্রেম-দ্বন্দ্বের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। সরমা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব নিয়ে মায়া এবং অভয়ের বিবাহানুষ্ঠানের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও তার অন্তরের নিরুদ্ধ অপরিতৃপ্ত কামনার জ্বালা দূর হয় না; সাময়িক ত্যাগ স্বীকারের শুভবুদ্ধি এক স্থায়ী জীবন ব্যাপী অনুশোচনায় পরিণত হয়। অবশেষে মায়ার পূর্বপ্রণয়ী অজয়কে পতিরূপে লাভ করে তার মন কিছুটা শান্ত হয়। রোমান্টিক প্রেমের মাধুর্যময় চিত্র অঙ্কনে নরেশচন্দ্র এখানে বা আর কোথাও খুব সক্ষম হননি; কারণ প্রেমের পিছনে যে স্বার্থপর কামনার লৌহ-আইন মানুষের শুভবুদ্ধিকে

ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই অপ্রিয় সত্যই তাঁর বাস্তববাদী চেতনায় অধিকতর মাত্রায় প্রতিভাত হয়।

নারীর মধ্যে অপরিতৃপ্ত কামনা থাকলে তার মধ্যে যে ত্যাগের আদর্শ, ধর্মের আদর্শ ব্যর্থ তা 'বিপর্যয়' নামক উপন্যাসেও বিবৃত হয়েছে। বিধবা মনোরমা তার অন্তরের কামনাকে নিরুদ্ধ করার জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর আচার নিয়ম পালনের পথে অগ্রসর হয়েছে। তথাপি তার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়নি। একটু সুযোগ পেয়েই তার অন্তরের কামনার আগুন নবজীবন লাভ করেছে; এবং অবশেষে বিবাহ করে সে শান্তি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে এই বইয়েরই আর একটি বিপরীত চিত্রে অনীতা ভোগ বিলাসিতার মধ্যে কাল কাটিয়ে যাবতীয় কামনায় পরিতৃপ্তি লাভ করেছে; কাজেই সে অনায়াসে বৈষ্ণবীয় আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। 'বিপর্যয়' বইখানি নরেশচন্দ্রের অন্যতম সার্থক উপন্যাস। 'অগ্নিসংস্কারে' নারীর লঘুচিত্ততার সঙ্গে পুরুষের আদর্শপ্রিয়তার দ্বন্দ্বের একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নরেশচন্দ্র অনেক উপন্যাস লিখেছেন। স্বভাবতঃই নারী-সমস্যা ছাড়া অন্যান্য বাস্তব সমস্যাও তাঁর কিছু কিছু উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। 'রবীন মাষ্টারে' এক আদর্শবাদী শিক্ষকের শিক্ষা-সংস্কার প্রয়াসের সঙ্গে পরিবেশের অসম দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। 'শেষপথে' দুটি গ্রাম্য মেয়ে পুরুষের রোমান্টিক প্রেম কী করে জমিদারী তন্ত্রের অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে অভিশাপে পরিণত হয়েছে তার চিত্রে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়।

মোটের উপর বাস্তববাদী উপন্যাসের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্রকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁর পূর্বে এবং পরে খুব কম বাঙালী লেখকই বাস্তবকে এতখানি গভীরভাবে দেখেছেন। সুন্দর সমাজ গঠনের অন্তরায় হিসাবে তিনি শুধু পরিবেশকেই দায়ী করেন নি; মানব মনস্তত্ত্বের ভূমিকাকেও তিনি তুলে ধরেছেন। রোমান্টিক-সুলভ একটি আদর্শ সমাজের কল্পনা তাঁর মনে রয়েছে; অথচ বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে সেই আদর্শ রূপায়ণের অসম্ভাব্যতাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেইজন্য 'তৃপ্তি' প্রভৃতি দু'একখানা উপন্যাসে ধর্মচিন্তার মধ্যে তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন। নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণতিতে এক ধরণের বেদনা-বোধ ও হতাশা-বোধ তাঁর অনেক কাহিনীতে প্রধান হয়ে উঠেছে; এবং তাঁর অন্তরে যে একটি রোমান্টিক মানস গোপনে বাস করে তাকে ইঙ্গিতে আভাসিত করেছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও নরেশচন্দ্রের মত জটিল দ্রুত-পরিবর্তনশীল ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনী রচনা করতে ভালবাসেন। তাঁর উপন্যাসেও বাস্তব সমস্যার কিছু কিছু প্রতিফলন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও আছে। কিন্তু তাঁর কাহিনীর জটিলতার উদ্দেশ্য বাস্তব-সমস্যার বিভিন্ন দিকের পরিচয় দান নয়; বরং নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করা। এক কথায় চারুবাবু নাটকীয় অভিনবত্ব সৃষ্টি করে পাঠক-চিত্তকে অভিভূত ও চমৎকৃত করতে চান। তাঁর উদ্দেশ্যের দিক থেকে চারুবাবু নিঃসন্দেহে সার্থক। তাঁর ভাষা আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম; তাঁর কাহিনীব অভাবনীয় পট পরিবর্তন আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

নরেশচন্দ্রের মত সততার সঙ্গে জীবন সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবকে অবলম্বন করে তিনি অভাবনীয় নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল আর্ট সৃষ্টি; জীবন-নাট্যের সত্য উদ্‌ঘাটন নয়। দুঃখের বিষয় যাঁরা সচেতনভাবে আর্ট সৃষ্টি করতে চান, তাঁদের রচনায় এক ধরণের অগভীরতা ও কৃত্রিমতাকে অনুভব না করে পারা যায় না।

চারুবাবু দুঃসাহসিক এবং সংস্কর-বর্জিত লেখক। সেইজন্যই হঠাৎ মনে হয় আমাদের গতানুগতিক সমাজ-নীতিতে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বুঝি উপন্যাস লিখছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর দুঃসাহসিকতা কিন্তু শুধু চমক সৃষ্টিতেই পর্যবসিত হয়েছে। সমাজ সম্পর্কে কোন উন্নততর আদর্শ যে তাঁর মনে কাজ করছে তা নয়; কিন্তু তিনি সমাজের বাঁধা-ধরা রাস্তার বাইরে যে অভিনব অভিজ্ঞতা লাভেব সুযোগ রয়েছে তার প্রতি অনুরক্ত। সেইজন্য তাঁর কাহিনীতে গৃহ-চ্যুত নারী, জোচ্চোর, সাধু, ভবঘুরে প্রভৃতি অদ্ভুত ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। এই সব চরিত্র সম্পর্কে চারুবাবুর চিন্তাধারা গতানুগতিক নয়। এদের মধ্যে যে প্রত্যাশা-বহির্ভূত দোষ বা গুণের সাক্ষাৎ মিলতে পারে তিনি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। সেইজন্যই স্বীকার না করে উপায় নেই যে চারুবাবু স্বাধীন মন ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাঁর কল্পনাকে ঠিক ঠিক বাস্তবানুগ বলা যায় না। কিন্তু তাঁর কল্পনায় অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় আছে। বিখ্যাত সমালোচক শ্রীশ্রীকুমার তাঁর মধ্যে বৈদেশিক গন্ধ আছে বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু এ ধরণের অস্পষ্ট অভিযোগের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। আসল কথা, বৈদেশিক

প্রভাব তাঁর কল্পনাকে হয়তো প্রখরতর করেছে ; কিন্তু তাঁর কাহিনীতে আমরা যে কল্পনার অভিনবত্ব দেখতে পাই, তার কারণ সম্ভাব্যতার সামান্য সূত্র বজায় রেখে অভিনবত্ব সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য। বাংলাদেশের তৎকালীন বাস্তবের অনেক উপাদান চারুবাবুর উপন্যাসে আছে, কিন্তু নাট্যরস সৃষ্টির জন্য তিনি তাকে কৃত্রিমভাবে পুনর্বিন্যাস করেছেন বলে এই ভ্রান্তি জন্মে যে তিনি বুঝি এ-দেশের বাস্তবের সীমাকে অতিক্রম করে গেছেন।

'দোটানা', 'যমুনা পুলিনে,' 'ভিখারিণী', 'হেরফের' প্রভৃতি চারুবাবুর উল্লেখযোগ্য বই। 'দোটানা' বইটি গৃহচ্যুত নারীর সমস্যা নিয়ে শুরু হয়েছে ; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত এক অভিনব ত্রিভুজ দ্বন্দ্বের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। বিধবা হৈমবতী তরল নামক এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হয়ে সন্তান-সম্ভবা হয়েছিল। দুর্গাপূজাব পটচিত্রণকারী গোবর্ধন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে হৈমবতীকে নিয়ে পলায়নের জন্য তরল যখন উপস্থিত হল না, তখন গোবর্ধন প্রস্তাব দিল যে সে তাকে বিবাহ করে ভাবী পুত্রকে পিতৃহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে, কিন্তু হৈমর উপর স্বামী হিসাবে কোনরূপ দাবী উত্থাপন করবে না। তারা কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করার পর আকস্মিকভাবে তরল তাদের জীবনাকাশে আবির্ভূত হ'ল। হৈমর মধ্যে এখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল : যে তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, অথচ যথাযথ সত্য-পালনে দ্বিধা করেনি, তাকেই সে গ্রহণ করবে ; না, তার পূর্ব প্রণয়ীকে সে জীবনসঙ্গী করে নেবে। তখন গোবর্ধন তরলকে বলল যে, এক কন্যার দুই প্রণয়ী থাকতে পারে না, দু'জনের একজনকে পথ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে ; এবং সে নিজেই সরে দাঁড়াবে একমাস পরে আত্মহত্যা করে। একমাস যেদিন শেষ হ'ল সেদিন দেখা গেল গোবর্ধন নয়, হৈমবতীই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

এ কাহিনীতে যে প্রক্রিয়ায় নারী গৃহচ্যুত হয় তার সঠিক বিবরণ আছে। গৃহচ্যুত নারীকে নিয়ে যে প্রণয়দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাও বাস্তব-সম্মত। কিন্তু প্রণয়দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে লেখক যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র উপস্থিত করেছেন তা সমস্যার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত এক সম্ভাব্য পরিস্থিতি, তার উদ্দেশ্য কৃত্রিম উপায়ে নাট্যরস সৃষ্টি তবু যে অপরাধের মধ্যে অনেকেই লিপ্ত সে অপরাধের জন্য শেষ পর্যন্ত সমস্ত শাস্তি নারীকেই ভোগ করতে হয় এই নিদারুণ বাস্তব সত্যটুকু কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'দোটানা' বইখানা হয়তো চারুবাবুর

শ্রেষ্ঠ রচনা। ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান হিসাবে চারুবাবুর মুন্সীয়ানা অসাধারণ পরিণতির বিস্ময়কর অভাবনীয়তাই চারুবাবুর রচনা-রীতির উৎকর্ষের কারণ।

'মুক্তিস্নান' উপন্যাসটিতে কী করে চঞ্চল নামক এক জুয়াচোর দলের সভ্য কিছুকাল সাধুর পোষাক পরে সাধুর ভান করতে করতে শেষে সত্যি সত্যি সাধুর মত চরিত্র মাহাত্ম্য লাভ করল তার এক বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'চোর-কাঁটা' উপন্যাসটিতে কলকাতার গাঁটকাটা দলের নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাত্রাব এক আশ্চর্য চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ সমাজের বাঁধা-ধরা ছকের বাইরে যে-সব মানুষের জীবনে নাটকীয়তা এবং এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সম্ভাবনা প্রচুর তাদের প্রতি চারুবাবুর আগ্রহ খুব বেশী। তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্য নিছক বাস্তবতা নয়। বাস্তবতাকে ভিত্তি করে তিনি এক ধরণের আধুনিক বোমান্স সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য যে-কোন অবস্থাতেই থাক, মানুষ যে আসলে মানুষই—এই রোমান্টিক বক্তব্যটি তাঁর কাহিনীতে উপস্থিত বলে তাব সমস্ত কাহিনীরই একটি সহজ মানবিক আবেদন আছে। 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী' বইটিতে রোমান্স প্রবণতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়। ক্ষণিক-দৃষ্ট সুন্দরীকে লাভ করার জন্য অভিজাত মেজাজ সম্পন্ন ফণী দেশে দেশে ঘুবে বেড়াচ্ছে—এ-কাহিনী একেবারে খাঁটি বোমান্স থেকে নেওয়া। তবে স্ত্রীর প্রতি ফণীর লাঞ্ছনার বিবরণ আমাদের সমাজের এককালের পাবিবারিক চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলকাতার শিক্ষিত সমাজ নিয়ে চারুবাবু 'হেরফের' উপন্যাসটি রচনা করেন। কাহিনীটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গভীবতা আছে, তবে নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছ ধার করা। রজত এবং শিশির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রজত সাহিত্যিক হিসাবে কিছু সুনাম অর্জন করেছে; কিন্তু শিশির গোপনে সাহিত্য চর্চা করে। যেদিন সম্পাদকগণ শিশিরকে একজন দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন লেখক বলে গণ্য করল, এবং রজতের প্রণয়িণী বিদ্যুত পর্যন্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হল, তখন ঈর্ষা ও অভিমান-ক্ষুব্ধ রজত শিশিরের বন্ধুত্বেব কক্ষ থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। রজত একটু গর্বিত প্রকৃতির যুবক; সেই গর্বে যখন আঘাত লাগল তখন তার প্রতিক্রিয়া হল মর্মান্তিক। আহত গর্ব ও সামান্য ঈর্ষা মানুষকে যে কত গভীব অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়, রজতের মধ্যে লেখক তাই দেখিয়েছেন। এই চিত্রটি মনস্তত্ত্ব-সম্পন্ন এবং লেখকের গভীব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় দেয়। তবে শ্রেষ্ঠের গলায় বরমাল্য অর্পণ করব—বিদ্যুতের এই মনোভাবের মধ্যে

মধ্যযুগীয় রোমান্সের অনুরণন শোনা যায়। বিদ্যুতের কলঙ্কজনক জন্ম ইতিহাসের মধ্যে আমাদের দেশে গৃহচ্যুত নারী-সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। যে কলঙ্ক নারীকে সমাজে অপাংক্তেয় করে, সে কলঙ্ক সত্বেও যে নারীর চরিত্র মহৎ হতে পারে,—এ উপকাহিনীতে তাই দেখানো হয়েছে। কাহিনীতে এ উপকাহিনীর কিছু তাৎপর্য আছে। রজতের মধ্যে বংশ মর্যাদার অহঙ্কার খুব প্রচুর; কিন্তু মানুষের প্রকৃত মূল্য যে বংশ মর্যাদার উপর নির্ভর করে না লেখক তাই দেখাতে চেয়েছেন।

মোটের উপর চারুবাবুর উৎকেন্দ্রিক কল্পনা বিলাস এবং নাট্যরস প্রীতির মধ্যে খানিকটা রোমান্টিক অবক্ষয়ের পূর্বাভাস থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক, সংস্কার বর্জিত এবং বিজ্ঞানাশ্রয়ী। বিশেষ করে ছোট গল্পগুলিতে তিনি অনেক সামাজিক কুপ্রথা এবং কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছেন। তিনি কুশলী; ঘটনা সংস্থাপনে এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সার্থকভাবে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করতে পারেন। তথাপি তিনি কোন নিজস্ব নিটোল শিল্প-জগৎ গড়ে তুলতে পারেন নি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় এবং জগদীশ গুপ্তের, লেখা সাধারণতঃ ১৯২০ সালের পরে প্রকাশিত হয়েছে। চারুবাবু এবং নরেশচন্দ্রেরও অনেক লেখা ১৯২০-র পরে রচিত হয়। এই সময় 'কল্লোল' 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক নবীন লেখক-গোষ্ঠী সাহিত্যে নতুন চিন্তাধারা ও নব্য রীতি প্রবর্তনের প্রয়াস শুরু করেছেন। এই দুই শ্রেণীর লেখকদের রচনা-ধারা প্রায় একই সময়ের ব্যাপার হলেও এবং উভয়শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ থাকলেও পূর্বোক্ত লেখকদের রবীন্দ্র-শরৎ যুগের সঙ্গে সংযুক্ত করে এই যুগের সঙ্গে 'কল্লোল-কালিকলম' যুগের পার্থক্য নিরুপণ করা দরকার। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-রীতির বিচারে এঁরা দুই ভিন্ন যুগের বাসিন্দা।

চারুবাবুর মত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও জটিল কাহিনী রচনা করতে ভালবাসেন। বস্তুত এ যুগের অধিকাংশ লেখকই জটিল কাহিনীর পক্ষপাতী; কোন নায়ক বা নায়িকাকে অনুসরণ করে তাঁরা তার জীবনের অনেকগুলি অধ্যায়ের বিবরণ দিতে চান, অবশ্য তার একটি কেন্দ্রীয় আবেগকে মূল উপজীব্য বিষয় করে। তার ফলে অনেক সময়েই কাহিনীর ভারসাম্য এবং ঐক্য ব্যাহত হয়, অবান্তর প্রসঙ্গ প্রশ্রয় পায়, কাহিনী অনেক সময় বর্ণনা-ধর্মী হয়, এবং সার সঙ্খেপের

আকার গ্রহণ করে। নরেশচন্দ্রের মধ্যে এ-দোষ থাকলেও তিনি কোন সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন দিকের প্রতি কড়া নজর রাখেন বলে তাঁর কাহিনীতে এক ধরণের ঐক্য বজায় থাকে। পক্ষান্তরে চারুবাবু নাটকীয় সংকটকে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করেন বলে তাঁর কাহিনী জমাট ও চিত্তাকর্ষক হয়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর উপন্যাস সমস্যা-কেন্দ্রিক নয়; নাট্যরস সৃষ্টিতেও তাঁর তেমন নজর নেই। নায়ক বা নায়িকার প্রতি গভীর সহানুভূতিই কাহিনীকে ধরে রাখে। আর তাঁর সব উপন্যাসেই বাস্তবের এক বিস্তৃত চিত্র থাকে। সমকালীন সমাজ-জীবনে ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতার চিত্রই তাঁর কাহিনীতে সাধারণতঃ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

তাঁর 'চাষার মেয়ে' (১৩৩১) উপন্যাসখানি বিষয়বস্তুর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাষী জীবনের কাহিনী হলেও বিশেষভাবে চাষীর সমস্যা এখানে প্রাধান্য পায়নি, বরং প্রধান হয়ে উঠেছে নারী সমস্যা। চাষীর মেয়ে সৌরভ কী করে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত স্বামীকে বাঁচানোর জন্য বেশ্যাবৃত্তি পর্যন্ত অবলম্বন করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম হয়েছিল তারই এক মর্মান্তিক কাহিনী বইটিতে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই দারিদ্র্য যে নারীকে পতিতা বৃত্তির দিকে টেনে নিয়েছে এ সামাজিক সত্যটি কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায় সারসংক্ষেপের আকারে উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে বলে বইখানি খুব সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বইখানিতে আন্তরিকতার ছাপ আছে; এবং এটি একটি গ্রাম্য মেয়ের অকৃত্রিম আত্মকথন বলে অনুভব করা যায়। এমন একটি অনাড়ম্বর, অথচ মানবিক আবেগ-সমৃদ্ধ বাস্তব-চিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। বোধ করি এটি আমাদের প্রথম কৃষি-কেন্দ্রিক উপন্যাস।

প্রেমাঙ্কুরের 'আতসী' মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক উপন্যাস, এবং এ-বইতে একটি জটিল কাহিনী রচনার প্রয়াস আছে। শোভনা, রমেশ, অজয় এবং ইন্দিরাকে ঘিরে রোমাণ্টিক প্রেম-দ্বন্দ্বের একটি চিত্রে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে এ যুগের কৃত্রিমতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকৃত প্রেমজ সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম। শোভনার প্রথম জীবনের প্রণয়ী রমেশ বিলাত থেকে ফিরে এসে নিছক ভোগ-তৃষ্ণা চরিতার্থতাকেই জীবন-যাপন বলে গণ্য করছে। শোভনা এবং সংস্কৃতের পণ্ডিত অজয়ের মধ্যে একটি রোমাণ্টিক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; কারণ অজয়ের স্ত্রী ইন্দিরা যদিও গভীর প্রেমের আবেগ কামনা করে, কিন্তু সংসার-জীবন ও সেবা-ধর্মের মধ্যে সে নিজের উচ্ছৃঙ্খল মনকে নিবিষ্ট করতে পারে না। ইন্দিরার

আত্মহত্যায় কাহিনীটির সমাপ্তি ঘটেছে। ইন্দিরা চরিত্রটির মধ্যে সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

বোধ করি প্রেমাঙ্কুরের যাবতীয় রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 'মহাস্থবির জাতক'। কয়েকখণ্ডে লেখা এই বইখানি লেখকের পরিণত বয়সের রচনা। আধুনিক লেখকদের ভাষার ও সংলাপের শহুরে ভাবটিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে লেখক বইটিকে আধুনিক পাঠকদের রুচি-সম্মত করে তুলেছেন। বইখানির জনপ্রিয়তার এটি একটি বড় কারণ। কিন্তু বইখানির প্রকৃত মূল্য এর বিষয়বস্তুতে। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও মানুষের বাল্য ও শিক্ষাজীবন কী ভাবে কাটত তার নিখুঁত বাস্তব চিত্রকে অনাবৃত করেছেন লেখক। গৃহজীবনে পিতার নিরঙ্কুশ শাসনের অত্যাচার যে কী ভয়াবহ ছিল, এবং সাধারণ ইস্কুলের আবহাওয়া ছাত্রদের কাছে যে কীরূপ ত্রাসের রাজ্য ছিল, বিভিন্ন চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তা উপস্থাপিত করেছেন। এ ধরণের চিত্র-ধর্মী কাহিনী অনায়াসে উচ্ছ্বাস প্রবণ (Sentimental) এবং একঘেঁয়ে হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু লেখক ঈষৎ কৌতুক ও শ্লেষের ভঙ্গীতে বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি বিবৃত করেছেন বলে বইখানি অদ্ভুত রকমের কৌতূহল ও আগ্রহ জাগ্রত করে। বইখানি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আমি অবশ্য শুধু প্রথম খণ্ডের কথাই বলছি। সত্যভাষণে, পরিমিতি ও সংযম বোধে, শিশু-মানসে অতি-শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে,—বইখানিতে লেখক যেন তাঁর স্বাভাবিক রচনা-শক্তিকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু বইখানির পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এই উচ্চ শৈল্পিক মান রক্ষিত হয়নি। অভ্যস্ত কৌতুকের ভঙ্গীতে ভবঘুরে নায়কের জীবনের একের পর এক এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে ; তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তবের খণ্ডচিত্র আছে ; কিন্তু পরিণতিতে সমগ্রভাবে কাহিনীর ক্রমিক অগ্রগতি না হওয়ায় আমাদের মনে কোনরূপ দাগ কাটে না।

প্রেমাঙ্কুরের উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার পাশাপাশি কৌতুকপ্রিয়তা এবং রোমান্টিক ভাবাবেগের একটি ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত। যেমন, 'চাষার মেয়ে' বইটির সমাপ্তিতে রয়েছে স্বামীর মৃত্যুর পর সৌরভ তার মাতৃহীন মায়ের বাড়িতে ফিরে এল ; আর সেই সময়ে তার বাল্যপ্রণয়ীর পত্নীবিয়োগ ঘটল আর সে তার একমাত্র সন্তানকে অবলম্বনহীন সৌরভের হাতে সমর্পণ করে বিবাগী হয়ে গেল। কাহিনীর এই কৃত্রিমতাটুকুর মধ্যে ভাবাবেগের প্রকাশ রয়েছে। পরবর্তী বইগুলোতে এই প্রবণতা আরও স্পষ্টতর।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অসমঞ্জের রচনাবলীর মধ্যে বাস্তবতা এবং কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে এই ভাবাবেগের প্রকাশ আরও প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর 'পথের স্মৃতি' উপন্যাসে বিনুদা একটি ডানপিটে চরিত্র; সে পাঠশালার মাষ্টার মশাইকে জব্দ করে; ফিরিওলাকে ঠকিয়ে মিঠাই নিয়ে পালায়; আবার বিপদ্‌গ্রস্ত মেয়ে সীতার উদ্ধারেরর জন্য জীবন বিপন্ন করে। এই কৌতুককর ঘটনাগুলির পাশাপাশি একটি বৌয়ের উপর শাশুড়ীর নির্মম উৎপীড়ন ও তার আত্মহত্যার উপকাহিনীটি বাস্তব-ভিত্তিক হলেও ভাবালুতার আতিশয্যে দুষ্ট। আবার আশার সঙ্গে বিনুদার বিয়ের পর আশার প্রতি তার গভীর ভালবাসা এবং উভয়ের শোচনীয় মৃত্যুর অধ্যায়টি কাহিনীর প্রথম অংশের সুরের সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

'মাটির স্বর্গ' কাহিনীটির মধ্যে বিদায়ী রোমান্সের শেষ পদধ্বনি শোনা যায়। অর্চনার বিয়ে হয়েছিল অতি শৈশবে এবং তারপর সে হারিয়ে যায়। কালক্রমে সে তার অপুত্রক পালক পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। সেই সময়ে সে ম্যানেজার নেপালের প্রতি এক ধরণের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। নেপালের মৃত্যুকালে জানা গেল সে-ই অর্চনার বাল্যকালে বিবাহিত স্বামী। অর্চনা স্বামীর ভিটাকেই স্থায়ী বাসস্থানরূপে গ্রহণ করল; সে শাঁখা সিঁন্দুর ত্যাগ করল না, কারণ নিজের চারপাশে সে অনুপস্থিত স্বামীর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। এ-কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় নারীর 'স্বামী-সংস্কার'-ই গভীব ভাবাতিশয্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের মত জগদীশ গুপ্তও বয়সে একটু প্রবীন হলেও লেখক হিসাবে অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর সমসাময়িক। তিনি যে বাস্তবকে নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন, সে বাস্তব তাঁর কালে প্রায় বিলীয়মান; সেই বিলীয়মান বাস্তবের রেখা অনুসরণ করে তিনি অল্প পূর্ববর্তী বাংলাদেশের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা পাপ ও দুর্নীতির এক নিরন্ধ্র জগৎ। মন্ত্র শাসন আর সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্যের অহঙ্কারের অন্তরালে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যযুগের যত আবর্জনা আর ঔপনিবেশিক শাসনের যত অব্যবস্থা মিলিত হয়ে যে ক্লেদ আর পঙ্কিলতা সৃষ্টি করেছিল, নির্মম সততার সঙ্গে জগদীশ গুপ্ত তা অনাবৃত করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি কদাচিৎ-ই উপন্যাসোচিত সম্পূর্ণতা লাভ করেছে; সেগুলি রেখাচিত্র মাত্র। কিন্তু এই রেখাচিত্রগুলি অতিশয় শক্তিশালী

তুলির আঁকা। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র জগদীশ গুপ্তের বাস্তবতার সঙ্গেই মোপাসাঁ এবং জোলার বাস্তবতার তুলনা চলে, যদিও শেষোক্তদের শৈল্পিক সম্পূর্ণতা তিনি অর্জন করতে চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশে জগদীশ গুপ্ত স্বাভাবিক কারণেই কোনদিনই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি; বাঙালী পাঠক নির্ভেজাল নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্রকে সহ্য করতে পারে না, যদি না তা একটু ভাবালুতার বাষ্পে আচ্ছাদিত হয়।

জগদীশবাবুর মধ্যে বাস্তববাদী সুলভ নিরাসক্তির প্রয়াস যে নেই তা নয়; কিন্তু তাতে তিনি সক্ষম হননি। তাঁর অন্তরের গভীর জ্বালা তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সৃষ্ট দু' একটি চরিত্র এই ক্লেদকে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে চেষ্টা করছে। আলোর এই ক্ষীণ আভাসটুকু ছাড়া জগদীশবাবুর বাস্তব আলোবাতাসহীন ভ্যাপশা গন্ধে ভরা এক নিরন্ধ্র প্রকোষ্ঠ মাত্র।

'দুলালের দোলা' উপন্যাসে লেখক ভরার মেয়ে বলে পরিচিত সেকালের একশ্রেণীর মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালে কন্যাপণ লাগত, এবং তা জোটাতে না পারার ফলে অনেক পুরুষের বিবাহ হত না। এইসব পুরুষ অপরিতৃপ্ত কামনার চরিতার্থতার জন্য অনেক সময় দল বেঁধে নদীর ঘাট থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে যেত। কখনো তাদের উপভোগ করে ছেড়ে দিত বা মেরে ফেলত; কখনো একটা লোক দেখানো বিয়ে করে ঘরে নিয়ে তুলত। এমনি করে শ্রীদাম চক্রবর্তী এক ধোবার মেয়েকে বিবাহ করেছিল। যে কনের বাপ সেজে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিল, সে মাঝে মাঝে এসে টাকা নিয়ে যেত। শ্রীদামের মৃত্যুর পর সে একদিন এসেছিল; এবং দুপুর রাতে তার ঘরে মাকে দেখতে গেল শ্রীদামের ছেলেরা। শ্রীদামের বিধবা বৌ আত্মহত্যা করল; এবং তার সাজানো বাপকে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দিল ছেলেরা। এই কাহিনীতেই অসতী মাতামহীর বংশজ সতীশ অন্যের কৃত অপরাধের চেতনায় পাগলাটে হয়ে গিয়েছে; এবং মেয়েও অসতী হতে পারে এই আশঙ্কা বশতঃ তাকে মেরে ফেলে। ভারতের অন্যাসক্তির পরিচয় পেয়ে তার পোয়াতী বৌ আগুনে পুড়ে মরে।

'নন্দ আর কৃষ্ণ' উপন্যাসে নন্দ যে-বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করত, সে বাড়ির গৃহকর্তা মণীন্দ্রের স্ত্রী আসলে স্ত্রী নয়, তার খুড়তুতো বোন কৃষ্ণা। সেই খুড়তুতো বোনেরও জন্ম হয়েছিল তার মায়ের বিবাহ-পূর্ব প্রণয়ের ফলে। নন্দ কৃষ্ণার মাকেও আবিষ্কার করেছিল বেশ্যালয়ে।

যে-সব সামাজিক প্রক্রিয়ায় সেকালের বহু মেয়ে গৃহবঞ্চিতা ও পতিতা হত তার একটি মর্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে।

'যথাক্রমে' একটু ভিন্ন ধরণের, কিন্তু এমনি কলুষিত এক গ্রামীন বাস্তবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গ্রামে ডাক্তার ওষুধের বদলে জল দিয়ে পয়সা নেয়। দোকানদার ওজোনে কম দিয়ে ঠকায়; ক্রেতা দোকানের ধার শোধ দেয় না; শাশুড়ী পুত্রবধূর উপর অকথ্য অত্যাচার করে; এবং পুত্রবধূ শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে তাব আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় শাশুড়ীর গলার উপরে নিজের গলা তোলা।

মোটামুটিভাবে বলা চলে, জগদীশবাবুর প্রায় সব উপন্যাসই রেখা-চিত্র; বাস্তবকে অনাবৃত করাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই কর্তব্য-কর্মে কোন সংকোচ বা সংস্কাবের বাধাকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি। অবশ্য তিনি কোথাও সহজ সংযমের সীমা লঙ্ঘন করেন নি; এবং আবেগাতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন নি।

বোধকরি একমাত্র তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' বইখানিতেই কতকটা উপন্যাসের আমেজ এসেছে। জারজ সন্তান বলে জন্মলগ্নেই নটবরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে তাকে চোর জুয়াচোরদের সঙ্গে অসামাজিক জীবনযাপন করতে হবে। কিন্তু সে কিছু শিক্ষালাভ করেছিল এবং ভদ্রমনের অধিকারী হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে এক ভদ্রকন্যার প্রেম আকর্ষণ করতেও সে সক্ষম হয়, এবং আশা করেছিল তাকে বিবাহ করে সে তার জন্ম-বিধানকে অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা গেল সে সিদ্ধার্থ নয়, সে ছদ্মবেশী নটবর। লেখক এখানে ছদ্মবেশধারী নটবরকে ধিক্কার দেননি, ধিক্কার দিয়েছেন কূপমণ্ডুক সমাজকে।

রবীন্দ্র-শরৎ-যুগে নরেশচন্দ্র এবং জগদীশ গুপ্তের রচনার মধ্যেই বাস্তবচিন্তা সর্বাধিক গভীরতা স্পর্শ করেছে। নরেশচন্দ্রের কাছে বাস্তব সমস্যার রূপ ধরে দেখা দিয়েছে, কিন্তু জগদীশ গুপ্তের কাছে বাস্তব চিত্রই প্রধান। দ্রুততা এবং ব্যস্ততার দরুণ নরেশচন্দ্রেব বাস্তব সমস্যা সর্বাঙ্গ সুন্দর শৈল্পিক রূপমূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে নি। জগদীশবাবু যে পরিমাণে বাস্তবের বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছেন; সে পরিমাণে তাকে মানস-কল্পনার সামগ্রীতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন নি। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে নরেশচন্দ্র রোমাণ্টিক

এবং বৈজ্ঞানিক ; অর্থাৎ, মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং মানবিক বোধ সম্মতভাবে সমাজ-সংস্কারের এবং সমাজনীতি পরিবর্তনের আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন। সেদিক থেকে তাঁর চিন্তা সংগঠনমূলক। অবশ্য তিনি এও জানেন যে মানুষের প্রকৃতি এমন যে তার কোন সুষ্ঠু সমাধান নেই। পক্ষান্তরে জগদীশ গুপ্ত বাস্তবের তথ্য চয়নে এবং বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারী। কিন্তু তিনি মনে করেন যে সমস্ত সামাজিক দুর্নীতির মূল কারণ অসংযত কামনা ও স্বার্থবুদ্ধি। সংযম ও শাসনের দ্বারা মানুষের কামনা ও স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই সমাজ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং নৈতিক চিন্তার দিক থেকে জগদীশ গুপ্ত ক্লাসিক পন্থী। জগদীশ গুপ্ত মনে করেন নৈতিক দুর্নীতি এক দারুণ পাপ-চক্র রচনা করে। অপরাধ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, এবং পিতা-মাতার অপরাধের বোঝার ভারে সন্তানকে সমাজে পতিত হয়ে থাকতে হয়। সমাজের মধ্যে এমন এক ধরণের আত্মরক্ষার প্রবণতা আছে যার ফলে সে অনেক সময় নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। 'লঘু গুরু'তে লেখক দেখিয়েছেন যে বেশ্যার কাছে পালিত বলে টুকীর বিবাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে ; অবশেষে পরিতোষ তাকে বিবাহ করল বটে, কিন্তু যেখানে তাকে এনে তুলল সেখানে টুকী দেখল তাকে বেশ্যায় পরিণত করার পূর্ণোদ্যমে আয়োজন চলছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা দেখেছি এ-কালের উপন্যাসে অনেক লেখকের মধ্যেই বাস্তবতার সঙ্গে কিছুটা রোমান্টিক ভাবালুতা ও ভাবাদর্শের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই রোমান্টিসিজম্ বিদ্রোহাত্মক নয়, বা জীবনকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখতে চায় না। মোটামুটিভাবে এই রোমান্টিসিজম মানুষের সুখকর কল্পনা ও ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং দেখা গেছে বাস্তবতা ও রোমান্টিক মনোভাবের এই ধরণের সংমিশ্রণ সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। আমি আগেই বলেছি নাগরিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবসর বিনোদনের সাথী হিসাবে উপন্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ; এবং উপরোক্ত হাল্কা ধরণের উপন্যাসই অবসর বিনোদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সংক্ষেপে এই জাতীয় উপন্যাসকে কমেডি-মূলক বা চিত্ত-বিনোদনকারী উপন্যাস বলে অভিহিত করা চলে।

উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম লেখক যাঁর মধ্যে চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যটি

সচেতনভাবে কাজ করেছে। সমাজ চিন্তা বা আদর্শ চিন্তা তাঁর মধ্যে যে ছিল না এমন নয়; কিন্তু এ-সব তাঁর চিত্তকে বিচলিত বা ভারাক্রান্ত করেনি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তাঁর কাজ পাঠককে আনন্দ দেওয়া, যার অপর নাম পাঠকের রুচি অনুযায়ী রস সৃষ্টি করা।

এতকাল পর্যন্ত সাহিত্যিকরা কমবেশী মনে করেছেন যে উপন্যাস হল সমাজ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তার ও নৈতিক আদর্শপ্রচারের লোকোপযোগী বাহন। কাজেই এতকাল উপন্যাসের বহিরঙ্গের দিকে নজর কম ছিল। কিন্তু উপেনবাবু উপন্যাসের বহিরঙ্গের দিকে অনেক বেশী নজর দিলেন। যে মানুষকে সহজে খুশী করতে চায় সে সাজ-সজ্জার দিকে নজর দেবেই। সুতরাং উপেনবাবুর ভাষা অধিকতর সাবলিল হয়ে উঠল, এবং তাঁর সংলাপে নাগরিক সৌকুমার্য প্রকাশ পেল।

চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যের মধ্যে নিন্দার কিছু নেই; তবে তা অবশ্যই জীবন সম্পর্কে লেখকের সত্য-অভিজ্ঞতার প্রকাশ অপেক্ষা নিম্নমানের। উপেনবাবু পাঠককে আনন্দ দিতে চাইলেও তিনি এ যুগের ব্যবসাদার লেখকদের মত চাঞ্চল্যকর ও রোমাঞ্চকর জিনিস সরবরাহ করে পাঠককে মুগ্ধ করতে চাননি কখনো। তিনি শুধু একটি সহজ মনোহর মিষ্টি তৃপ্তিকর কাহিনী পরিবেশন করতে চেয়েছেন। পরিচ্ছন্ন এবং সংযত আবেগ, লঘু নাটকীয় সংঘাত, মিলন-মধুর সমাপ্তি,—এই হল মোটামুটিভাবে তাঁর কমেডি মূলক কাহিনীর পরিসীমা। লেখক যে নিছক পাঠককে পরিতৃপ্তি দেওয়ার জন্যই এই পরিসীমাকে বেছে নিয়েছেন তা নয়! এইটুকু বৃত্তের মধ্যে জীবনকে দেখতে ও উপভোগ করতে তিনিও ভালবাসেন। নৈতিক এবং আদর্শ-চিন্তা যে তাঁর মধ্যে নেই তা নয়; কিন্তু তা-ও এই নিরাপদ বৃত্তের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। চিন্তা বা আদর্শের খাতিরে তিনি জীবনের অপ্রীতিকর বা সংকটজনক সীমায় পদার্পণ করতে নারাজ। সুন্দর অসুন্দর, ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর মনে এক পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে, এবং পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁর ধারণা-কে কখনো অতিক্রম করে যান না। সুতরাং তৃপ্তিকর কাহিনী পরিবেশন করার তাগিদে উপেনবাবু তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের ভূমিকে ত্যাগ করেন না। তিনি যে সহজে জনচিত্তকে জয় করতে পারেন, তার কারণ পাঠকের মনের মাপ আর তাঁর নিজের মনের মাপ প্রায় সমান। পাঠক তার

মনকে শিল্পসঙ্গতভাবে সুবিন্যস্ত করতে পারে না, তিনি তা পারেন,—উভয়ের মধ্যে তফাৎ এইটুকু।

উপেনবাবুর অল্প পরে আরও কয়েকজন লেখক বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছেন যাঁদের মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা চলে, যেমন—বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু। এঁদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও বলা চলে যে জীবনের এক সঙ্কীর্ণ মনোরম বৃত্তকে অবলম্বন করে এঁরা পাঠক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে চান; কিন্তু তাই বলে তাঁরা নিজেদের ভারতীয় ঐতিহ্য সম্মত নৈতিক মান ও মূল্য বোধকে বিসর্জন দেন না। জীবনের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা এঁদের কলমে ধরা না পড়লেও, এঁদের রচনায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। জীবনের অফুরন্ত কৌতুকের ভাণ্ডার তাঁদেব কাছে উন্মুক্ত। প্রীতি-মধুর হাঁ-ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁরা জীবনকে দেখেন বলে এঁদের জীবন-চিত্র সহজেই সরস এবং উপভোগ্য হয়ে ওঠে এবং মনে একটি স্থায়ী প্রসন্নতার ভাব সৃষ্টি করে।

উপেনবাবুব প্রায় সব উপন্যাসই বোমাণ্টিক প্রেম-কেন্দ্রিক। প্রেমের অঙ্কুরোদ্‌গম, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের জটিল পথে তার ক্রমবিকাশের ধারাটি তিনি বেশ নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেন। তাঁর 'শশিনাথ' উপন্যাসে দুই জোড়া প্রেমিক প্রেমিকার ভীড় বেশ জমে উঠেছে। প্রেমের জটিল দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য তিনের বদলে চারটি চরিত্র নেওয়ার মধ্যেই লেখকের অভিসন্ধি বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়; কাহিনীর শেষে একটি ব্যর্থ চরিত্রের বোঝা চাপিয়ে তিনি পাঠকের মনকে ক্ষুব্ধ করতে চান না। কমেডি-মূলক কাহিনীতে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে—চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন সংকটজনক সীমায় পৌছানোর আগেই আকস্মিক ঘটনার সহায়তায় জটিলতার নিরসন ঘটেছে এবং মিলনান্তক পরিণতি সহজ হয়ে উঠেছে।

কমেডি চিত্র হিসাবে 'অমূল তরু' অধিকতর সার্থক। সরল-হৃদয় সুবোধের সঙ্গে প্রেমিকার অভিনয় করতে করতে কী করে সুনীতির ছদ্ম-অনুরাগ প্রকৃত অনুরাগে পরিণত হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে মিলন সাধিত হয়েছে কাহিনাতে তাই বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির সার্থকতার কারণ পরিস্থিতি-গুলি কৌতুককর, অথচ স্বাভাবিক এবং মনস্তত্ত্ব সম্মত। উভয় চরিত্রেরই মার্জিত স্বভাব এবং সূক্ষ্ম রুচি ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান তাদের রোমাণ্টিক কাহিনীর পক্ষে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীতে পরিণত করেছে।

উপেনবাবু অনেক উপন্যাস লিখেছেন; তার মধ্যে মাত্র দু'একবার তিনি সামাজিক সমস্যা ও আদর্শের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছেন। 'অমলা' উপন্যাসে আমরা একটি জটিল নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারতাম; কিন্তু কাহিনীটি ঠিক সে-ভাবে গড়ে ওঠেনি। শশুড়বাড়িতে অমলা উৎ-পীড়িতা; স্বামী বিজয়নাথ তার প্রতি সহানুভূতিশূন্য ও উদাসীন। এই সুযোগ নিয়ে প্রমথ ছোটখাটো সাহায্যের আড়ালে এক ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে অমলাকে হাত করতে চায়। যদি অমলার প্রতি প্রমথর গভীর অনুরাগ কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং তা অমলার হৃদয়কে স্পর্শ করত, তবে অমলার সামনে একটি প্রকৃত নৈতিক সমস্যা দেখা দিত: একদিকে উদাসীন স্বামী, অপরদিকে প্রকৃত অনুরাগী পুরুষ—অমলার সামনে এ দু'য়েব মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার প্রশ্ন দেখা দিত। স্বামী সংস্কার এবং প্রেমের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি প্রকৃত সংকট সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু প্রমথর হীন ও প্রতারণা পূর্ণ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কাজেই অমলা কর্তৃক প্রমথর প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোন জটিল নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

'রাজপথ' উপন্যাসটিতে একটি প্রেম-দ্বন্দ্বের পরিণতিতে দেশপ্রেমের আদর্শের জয়-লাভ সূচিত হয়েছে। একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিজাত ঘরের মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুরেশ্বরের পরিচয় হয়। সুমিত্রা যে পরিবারে ও যে সমাজে মানুষ, সেখানে স্বদেশীয়ানা ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না। সুমিত্রার প্রণয়প্রার্থী হল বিমান, যে তার সমান ঘরের ছেলে। তথাপি কাহিনীর প্রথম সূত্রপাতেই আমরা অনুমান করতে পারি যে স্বদেশীয়ানার প্রতি সুমিত্রার বিরূপতা থাকবে না এবং সুরেশ্বরের প্রতি সে আকৃষ্ট হবে। কাহিনী এমন অনায়াসে এই প্রত্যাশিত পথে এগিয়ে গেছে যে কমেডি ধরণের কাহিনীর মূল রস—উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি—তা এ বইতে মোটেই দানা বাঁধতে পারেনি। তার ফলে এ বইতে লেখক স্বাদেশিকতার প্রতি নিজের অনুরাগকে প্রকাশ করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু সার্থক কাহিনী সৃষ্টি করতে পারেন নি। প্রতি পদে পদেই আমরা বুঝতে পারি লেখক তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ীই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করছেন।

যেখানে একটি মিষ্টি কাহিনী রচনা করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, সেখানেই উপেনবাবু সার্থক।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় (১৮৭৪-১৯৩২)

বোধকরি উপরে আলোচিত প্রায় সব ক'জন লেখক অপেক্ষাই প্রভাতকুমার পূর্ববর্তী। তথাপি উপেন গাঙ্গুলীর পাশাপাশি তাঁর নামোল্লেখের তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে তিনিও শহুরে জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্য রচনাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রভাতকুমার যে-সময়ে তাঁর উপন্যাস ও বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন, সে-সময়ে সমাজ-সংস্কারের অথবা চরিত্রাদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাস লেখাই নিয়ম ছিল। সেই সময়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে শুধু কৌতুক-রস সৃষ্টির জন্য সাহিত্য-রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় ছিল। তাঁর কালে রোমান্টিক প্রেম নিয়ে সবসকমেডি-ধর্মী সামাজিক উপন্যাস লেখার পথে যথেষ্ট বাধা ছিল; কারণ বাঙালী সমাজে নারী তখনো স্বাধীন-সত্তা লাভ করেনি এবং পূর্বরাগের প্রচলন হয়নি। তথাপি ক্বচিৎ কোথাও পূর্বরাগের একটু আধটু ছিঁটে ফোঁটা যোগ করে নিছক সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবের উপর নির্ভর করে প্রভাতকুমার অজস্র সংখ্যক আশ্চর্য কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে ছোটখাটো অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতির ঘটনা আবিষ্কার করে যে এত কৌতুক পরিবেশন করা যায় তা তাঁর পূর্বে কেউ জানত না। সুতরাং তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই প্রভাতকুমাব অধিকতর দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন; এবং সেইজন্য একসময় তাঁকে বাংলার মোপাসাঁ বলে অভিহিত করা হত। এই নামকরণের মধ্যে যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে প্রসঙ্গত তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কৌতুককব এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রভাতকুমার মোপাসাঁর অনুগামী। কিন্তু উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। মোপাসাঁ ছিলেন ব্যক্তি ও সমাজের কঠোর সমালোচক; তাঁর আপাত হাসির অন্তরালে একটি উত্তোলিত সম্মার্জনীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ব্যক্তি চরিত্র এবং মনস্তত্ত্বের গভীরতম উৎসমুখ পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল; এবং মানুষকে গভীরভাবে জেনে তিনি তাকে সম্মান, করুণা, এমন-কি ক্ষমারও অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। মোপাসাঁর দু'টি খুব বিখ্যাত গল্পকে স্মরণ করলেই তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। তাঁর 'ইভেট্' নামক একটি গল্পে আছে যে সরাইখানায় আগত একদল যাত্রীর সঙ্গে স্খলিত চরিত্রের নারী ইভেটও ছিল। অঞ্চলটি তখন জার্মানীর অধীন ছিল; এবং

উক্ত সরাইখানায় অবস্থানকারী বিজয়ী দেশের এক সেনাপতি ইভেটকে উপভোগ করতে চায় এবং জানায় ইভেট আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তার কোন সহযাত্রী সরাইখানা ত্যাগ করতে পারবে না। ইভেটের কাছে শুচিতার কোন মূল্য না থাকলেও নিছক পশু-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে গররাজী হয়। তখন তার সহযাত্রীরা নানারূপে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে, এবং সকলের স্বার্থের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্ররোচিত করে। অবশেষে সহযাত্রীদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য সে সেনাপতির বর্বর কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারপর মুক্তিপ্রাপ্ত সহযাত্রীরা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন তারা সবাই ইভেটকে দারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছে। এই কাহিনীর মধ্যে সমগ্র বারবণিতা প্রথার পিছনে সমাজের যে নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতা রয়েছে তাকে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। পুরুষ-সমাজের উদ্বৃত্ত কামনা যাতে বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে সেইজন্য নানা কৌশলে কিছু নারীকে বারবণিতায় পরিণত করা হয়। সমাজের বিষ আকণ্ঠ পান করে তারা সমাজেব স্বাস্থ্য রক্ষা করে। কিন্তু প্রতিদানে কী ঘৃণা এবং অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই না সমাজ তাদের দেখে এবং অন্ত্যজ করে রাখে! এই নীচ স্বার্থপর এবং অধঃপতিত মানব সমাজে সব কিছুই মেকী এবং কৃত্রিম; এর মধ্যে কেউ যদি আন্তরিকভাবে কোন সমাজাদর্শকে অনুসরণ করে তবে তা অর্থহীন ও হাস্যকর বলে প্রতিভাত হয়। 'দি নেকলেস' নামক গল্পে মোপার্সাঁ দেখিয়েছেন নায়িকা তার বান্ধবীর কাছ থেকে একটি নেক্‌লেস ধার করে এবং সেটি খোয়া যায়। তখন সে বহু টাকা ধার করে অনুরূপ একটি নেকলেস কিনে বান্ধবীকে ফেরৎ দেয়, এবং কুড়ি বছর যাবৎ কৃচ্ছ্রসাধন করে সেই দেনা শোধ দেয়। পরে সে জানতে পারে নেকলেসটি ছিল মেকী এবং তার দাম সামান্য।

সুতরাং মোপার্সাঁ হচ্ছেন জীবনের কঠোর সমালোচক। পক্ষান্তরে প্রভাতকুমার জীবনের মুগ্ধ ভক্ত। জীবনকে তিনি ভালবাসেন এব, বিশ্বাস করেন যে হাসি বৈচিত্র্য এবং কৌতুকের ভেতর দিয়ে জীবনের ছন্দ সঠিক পথেই আবর্তিত হচ্ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি প্রতারণাপূর্ণ কুটকৌশল যে-সব বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে তা জীবনের একঘেয়েমীকে দূর করে বলে মূল্যবান। প্রভাতকুমার এই বৈচিত্র্য দেখে প্রাণ খুলে হাসেন, এবং হাসতে হাসতে নির্বোধদের এবং প্রতারকদের ক্ষমা করেন।

প্রভাতকুমারের বাস্তব-বোধ স্বচ্ছ এবং নির্মল। কোন রকম দার্শনিকতার বা ভাবালুতার চশমা না পরে তিনি প্রাত্যহিক বাস্তবকে নিখুঁত ও যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাস্তবকে কোনভাবে আদর্শায়িত ও অতিরঞ্জিত না করেই তিনি তাকে উপভোগ করতে পারেন। জীবনের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা আছে তাই বাংলা সাহিত্যে চিরকাল প্রভাতকুমারকে আদরণীয় করে রাখবে।

প্রভাতকুমার প্রকৃত শিল্পী। তাঁর কাহিনী ফটোগ্রাফ নয়, তা কষ্টকল্পনা নয় (ত্রৈলোক্যনাথের মত)। জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পী মানসে রূপান্তরিত হয়ে অনায়াসে কতকগুলো কৌতুককর ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে; এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এই ছবিগুলিকে তিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর গল্প পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে; কিন্তু একালের লেখকদের মত পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যই তিনি লেখেন নি।

'রমাসুন্দরী' (১৯৩৭) প্রভাতবাবুর প্রথম উপন্যাস। একটি অখণ্ড রসবস্তু হিসাবে উপন্যাস রচনা করা প্রভাতকুমারের সাধ্যাতীত। তাঁর উপন্যাসগুলি আসলে কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি, এবং এইভাবে দেখলেই উপন্যাসগুলির রস উপভোগ করা যায়। তাঁর চরিত্রগুলি কোন মানুষকে একনজরে দেখা অনুভূতি মাত্র। অজস্র ঘটনার ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলি একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। যখন তিনি কোন চরিত্রে পরিবর্তনশীলতা আঁকতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি কার্যতঃ একটি ভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেন। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসের নায়িকা রমাসুন্দরী বাল্যে দুর্দান্ত স্বভাবের পুরুষালী প্রকৃতির মেয়ে; বিবাহের পর সে স্নেহশীলা গৃহকর্ত্রী হিসাবে আর একটি ভিন্ন চরিত্র হয়ে গিয়েছে। এই বইতেই চক্রান্তকারী চরিত্র সৃষ্টিতে প্রভাতকুমারের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় সীতানাথ ও তার মাতার চরিত্রে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটি আরও বেশী উপভোগ্য। প্রতারণায়, কূটকৌশল বিস্তারে, ধর্ম ও ধার্মিকতার ভান করে আত্মস্বার্থ অনুসন্ধানে নায়েব গদাই লালের জুরি নেই। এই চরিত্রটির কার্যকলাপই বইখানির আকর্ষণীয় অংশ। লেখক নায়েবের কর্মের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে বসেন নি; তার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রাণপ্রাচুর্যই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, এবং তাই তিনি চিত্রিত করেছেন। কাহিনীর নায়ক মোহিত লেখাপড়া শিখে আদর্শবাদের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে। তারপর অনেক কৌতুককর অভিজ্ঞতার

সাক্ষী হয়ে সন্ন্যাসী জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পেরে সে গৃহে ফিরে আসে; এবং চিনি নামক যে মেয়েটি এক সময়ে তার মনে সামান্য একটু রঙ ধরাতে পেরেছিল তাকে বিয়ে করে। সুতরাং কাহিনীর এ অংশটিও বেশ উপভোগ্য।

'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে স্বামী পরিত্যক্তা ফুলীর প্রতি কী করে নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে বিপত্নীক বিজয়ার প্রণয়সঞ্চার হল তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যথারীতি উভয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হল; এবং বলা বাহুল্য এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নায়ক-নায়িকাকে কোনরূপ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়নি। বস্তুত প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কাহিনী সংযোগ-সূত্র মাত্র, কৌতুককর পরিস্থিতিগুলিই আসল। ফুলী কী করে টাকা ডবল করার কৌশল দেখিয়ে লোককে ঠকাত তার চিত্রগুলি কৌতুককর।

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হিন্দু নারীর স্বামী-সংস্কারের যে চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে তারই একটি ভিন্ন চিত্র 'রত্নদীপ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। রাখাল বৌরাণীর স্বামী এই ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার ফলে বৌরাণীর সমগ্র হৃদয়াবেগ তার প্রতি ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে এই ভ্রান্তি ধরা পড়ল, অমনি বৌরাণী নির্দ্বিধায় তাঁর হৃদয়কে গুটিয়ে আনলেন এবং রিক্ততার পথকে বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারেব পার্থক্য এইখানটায় যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুনারীর মনের উপর সামাজিক সংস্কারের প্রভাব যে কত তীব্র বিষয়-নির্লিপ্ত ভাবে তার চিত্র দিয়েছেন, কিন্তু তার উপর মূল্য আরোপ করেননি; পক্ষান্তরে প্রভাতকুমার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগের উপর সামাজিক সংস্কাবকে স্থান দেওয়াব উপর মূল্য আরোপ করেছেন। প্রভাতকুমার তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনে বোধ কবি মাত্র দু'একবারই এইরূপ স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-প্রিয়তাব পথ ত্যাগ করে গভীর ভাবাবেগের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। বইখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি এইজন্য যে লেখক হৃদয়াবেগ ও মনস্তত্ত্বের উপর নৈতিক চিন্তাকে স্থান দিয়েছেন, এবং তাঁর নৈতিক চিন্তা সমাজের প্রচলিত নৈতিক চিন্তার অনুগামী বলে তা কোন নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি। স্বাভাবিক হৃদয়াবেগের সঙ্গে নৈতিক আদর্শের কোন সংঘাত তিনি দেখান নি; নায়ক এবং নায়িকা উভয়েই অতি অনায়াসে চিত্ত সংযম করে ত্যাগের আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছে। তার ফলে কাহিনীটিতে প্রকৃত নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হতে পারে নি। 'মনের মানুষ' উপন্যাসটিতে যোগেন্দ্র ও ইন্দুবালার মধ্যে একটি ভাবাবেগ-পূর্ণ প্রেম ও মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রত্যাশিত গতানুগতিক পথে কাহিনীর

এই অংশটি অগ্রসর হয়েছে বলে তা আমাদের মনে দাগ কাটে না। পক্ষান্তরে কাহিনীর অপর অংশে ইন্দুবালার প্রতি কুঞ্জর অসঙ্গত প্রেমাকাঙ্ক্ষা, তার বড় বড় আদর্শবাদী কল্পনা, এবং পরিণামে কিরণকে বিবাহ করিয়া একটি ঘরোয়া সংসার জীবনে নির্বাসন লাভ,—প্রভৃতি ঘটনাগুলি চমৎকার কৌতুক-রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

মোটের উপর উপন্যাসগুলিতে প্রভাতকুমারের প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। উপন্যাসের প্রত্যেক কাহিনীতেই দৃঢ়-বদ্ধ ঐক্যের অভাব পাঠকের মনকে বার বার কেন্দ্র-চ্যুত করে। কাহিনীর গভীর রসাত্মক অংশগুলি সমাজাদর্শ অনুমোদিত পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছে বলে সেখানে কোন প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টি হয়নি। পাশাপাশি একটি বা একাধিক কৌতুককর উপকাহিনীই পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই উপকাহিনীগুলি মূলতঃ কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টিমাত্র ; এবং এখানে লেখক ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষের জীবনের ছোট খাটো অসঙ্গতি, ছোট খাটো লোভ শঠতা ও নির্বুদ্ধিতার চিত্র দিয়েছেন। এখানে লেখকের মন সমাজ নীতির ঋজু বেড়াজাল থেকে বহুলাংশে মুক্তিলাভ করেছে।

কাজেই প্রভাতকুমার যেখানে বৃহৎ কাহিনী রচনার উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে ছোট ছোট কাহিনী রচনা করেছেন সেখানেই তাঁর প্রতিভা সম্যক বিকাশ লাভ করেছে। প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে তাতে বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র সার্থক শিল্প-রূপ লাভ করে দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের বাঙালী চিত্র মূলতঃ সমস্যা-কেন্দ্রিক ; তাই দৈনন্দিনতার পরিচয় তার মধ্যে তত পরিস্ফুট নয়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ মননশীলতার এমন গভীরে অবতরণ করেছেন যে বাঙালিয়ানাকে অতিক্রম করে তাঁরা সর্বজনীনতার পর্যায়ে চলে গিয়েছেন। একমাত্র প্রভাত-কুমারের মধ্যেই ঘরোয়া বাঙালী সমাজের খুঁটিনাটি চিত্র, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, লোভ শঠতা নির্বুদ্ধিতার খাঁটি আঞ্চলিক বিশেষত্ব বাধা-বন্ধহীন সূর্যকিরণের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে একমাত্র বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নাম করা চলে। ছোট গল্পে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, স্নেহপ্রবণ, ক্ষমাশীল, এবং শ্লেষবিহীন। সেইজন্য তাঁর গল্পগুলি কৌতুক হাসির ভিতর দিয়ে নির্মল আনন্দ দান করে, গল্প-পাঠের পরে পাঠকের মনে কোন অপ্রীতিকর চিন্তার কাঁটা ক্ষত সৃষ্টি করে না।

আমার যতদূর জানা আছে, প্রভাতকুমার এবং রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোট গল্প রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে ছোট কাহিনী রচিত হয়েছে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়', কিন্তু ছোটগল্প বলতে আমাদের মনে যে প্রত্যাশা জাগে এই কাহিনীগুলি তা পূরণ করে না। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু বড় আকারের গল্প, যেমন 'নষ্টনীড়', 'মেঘ ও রৌদ্র', প্রকৃত অর্থে ছোট গল্পের শ্রেণীভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আয়তনটাই অবশ্য ছোট গল্পের বড় কথা নয়; শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর কথা যে, ছোট গল্পকে অবশ্যই ছোট হতে হবে, এ-কথা সব সময় স্বীকার করা মুস্কিল। কিন্তু ছোট গল্পের আয়তন যাই হোক তাতে একটি মাত্র সংকট মুহূর্ত থাকবে, এবং তারপরে কোন চরিত্র বা পাঠকের মনে কিছু নতুন আলোক-সম্পাত (enlightenment) ঘটবে। উপন্যাসেও সময়ে একটিমাত্র সংকট মুহূর্ত থাকতে পারে; কিন্তু উপন্যাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ মর্যাদা আছে। সমগ্র উপন্যাসটি না পড়ে তার দু'একটি অধ্যায় পড়লেও আমরা কিছু পরিপূর্ণ রস পাই, যদিও আমাদের সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হয় না। ছোট গল্পেও কিছু কিছু ধারাবাহিক ঘটনা থাকতে পারে, তাতে বেশ খানিকটা সময় ক্ষেপের অনুভূতিও জাগতে পারে; কিন্তু ঘটনাগুলি নিতান্তই সংকট মুহূর্তের প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে উদ্‌ভাবিত। সেই ঘটনাগুলির মধ্যে কোন রকম স্বয়ং সম্পূর্ণতা নেই। সেগুলো যেন ভবিষ্যতের একটি লক্ষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনার ছাঁটাই বাছাই করা অংশ-মাত্র। সেইজন্য সম্পূর্ণ ছোটগল্প না পড়ে তার অংশমাত্র পড়ে তেমন কোন আনন্দ পাওয়া যায় না।

ছোটগল্প যেন জীবনের একটা স্ন্যাপ্‌শট—একনজরে দেখা জীবনের একটা ফালি; তাতে গভীরতা থাকতে পারে কিন্তু তা মূলতঃ ইতিহাস এবং পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা জীবনের একটি খণ্ডাংশ মাত্র।

ছোটগল্পের এই প্রকৃতিটিকে প্রভাতকুমার হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর ছোট গল্পগুলিতে কিছু কিছু ধারাবাহিক দৃশ্য থাকলেও একটি মাত্র সংকট মুহূর্তের উপর তিনি প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই সংকট মুহূর্ত এবং সংকটমুহূর্তের ফলে আমরা যে আলোক লাভ করি তা-ই পূর্ববর্তী বিবরণগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

প্রভাতকুমারের বিখ্যাত গল্প 'বলবান জামাতা'তে বিবাহের সময়ের দুর্বল জামাতা প্রচুর শারীরিক শক্তি অর্জন করে শ্বশুড় বাড়ি এসে বিতাড়িত

হল। এইটি কাহিনীর সংকট মুহূর্ত। বিতাড়িত করার পর শ্বশুরবাড়ির লোকদের মনে এই চেতনা দেখা দিল যে মানুষের চেহারা অনেক সময় পরিবর্তিতও হয়। চরিত্রগুলির মনে যে শুধু এইটুকু আলোক প্রাপ্তি ঘটল তাই নয়। জামাতাকে ফিরিয়ে আনা হল, কিন্তু যতক্ষণ সে থাকল তার চেহারা সম্পর্কে কেউ কোন মন্তব্য করল না। দুর্বল বলে যে অবজ্ঞা লাভ করেছিল, সবল হয়ে সে কোন প্রশংসা লাভ করল না।

জীবনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের যে সহজ পথ নেই এই একটি অসঙ্গতি দেখিয়ে লেখক তাই প্রতিপন্ন করেছেন।

হাস্যরসিকের বিশেষত্ব এই যে তিনি সব সময় জীবন-পটের বিপরীত দিকটা অনায়াসে দেখতে পান। তাই তাঁর কাছে কোন আদর্শেরই চূড়ান্ত মূল্য স্বীকার্য নয়। ইতি-পূর্বে আমরা প্রভাতকুমারের উপন্যাসে দেখেছি তিনি মোটামুটি-ভাবে গতানুগতিক নৈতিক ও আদর্শ-চিন্তার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোন আদর্শ ও নীতিবোধের মধ্যে বেশ ফাঁক এবং ফাঁকি আছে, এবং তার প্রয়োগ বা প্রকাশের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা আছে, সে সম্পর্কে সচেতন। এবং এই উদার দৃষ্টি রয়েছে বলেই আজও প্রভাত-কুমারের ছোটগল্প পড়তে গেলে তাঁকে খুব অনাধুনিক বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের লেখকদের রোমান্টিক প্রেমের প্রতি অচলা ভক্তি বঙ্কিম-যুগ থেকেই আমরা দেখে এসেছি। রোমান্টিক প্রেমের এই ভাবাতিশয্য-দুষ্ট আদর্শ প্রভাতকুমারের কয়েকটি গল্পে পরিহাস-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'পোষ্ট মাষ্টার' গল্পের পোষ্ট মাষ্টার ডাক যোগে আনীত প্রেম-পত্র-গুলি পাঠ করে; ফলে তার মধ্যে যে রোমান্টিক প্রেমের আকাঙ্খা জেগে ওঠে তা তাকে এক কৌতুককর, এবং স্বভাবতঃই ব্যর্থ প্রেমাভিযানে প্ররোচিত করে। শেস পর্যন্ত অবশ্য তার লাভই হয়; ডাকের চিঠি ও সরকারী টাকা অপহরণ করেও সে স্বদেশী ডাকাতির মিথ্যা গল্প বলে অব্যাহতি পায় ও পদোন্নতি লাভ করে। ভাবালুতা তাকে বিপদে ফেলেছিল, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি তাকে রক্ষা করল। লক্ষণীয় এই যে লেখক নৈতিক অপরাধের জন্য তার দণ্ডবিধান করেন নি। বাস্তব জগৎ যে নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা চলে না; এমন কি সরকারী দপ্তরও যে নৈতিক ভিত্তির বদলে সুবিধাবাদী চিন্তা দ্বারা পরিচালিত, গল্পে লেখক সেই বক্র-

ইঙ্গিতই উপস্থিত করেছেন। অবশ্য এই ইঙ্গিতের মধ্যে কোন জ্বালা নেই; বাস্তবকে বাস্তব হিসাবেই লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন।

রোমান্টিক শরৎচন্দ্র পতিতা-মেয়ের সঙ্গে দেবদাসের একনিষ্ঠ প্রেমের কাহিনী উপস্থিত করেছেন। কিন্তু বাস্তববাদী প্রভাতকুমার তার বিপরীত চিত্র দিয়েছেন। 'সচ্চরিত্র' গল্পটিতে সুরেন কলকাতা এসে এক পতিতার মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু তার অনুরাগের গভীরতার প্রমাণ দেওয়ার আগেই কলকাতায় বসন্ত মহামারী শুরু হয়, এবং সেই সুযোগে সে দেশে ফিরে এসে প্রেম-জ্বর থেকে অব্যাহতি পায়। প্রভাতকুমার এখানে পতিতার সঙ্গে প্রেমের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিন্তু কিছু বলছেন না; তিনি কেবল দেখিয়েছেন, অধিকাংশ মানুষই ভীরু, এবং ভাবালুতার উপর ভীরুতার শক্তি বেশী। সচ্চরিত্র নামটির মধ্যেও শ্লেষ আছে; অধিকাংশ মানুষই নৈতিক দৃঢ়তার দরুণ নয়, সাহসের অভাবে সচ্চরিত্র থেকে যায়।

প্রভাতকুমার অনেক গল্প লিখেছেন। এবং তার মধ্যে বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য অসাধারণ। 'রসময়ীর রসিকতা', 'আই ডোণ্ট্ নো', 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' প্রভৃতি অজস্র গল্প পাঠককে প্রচুর আনন্দ দান করে।

তিনি 'আদরিণী', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি কয়েকটি গম্ভীর রসাত্মক গল্পও লিখেছেন। 'আদরিণী' গল্প হাতীর প্রতি মানুষের ভালবাসার একটি সার্থক মানবিক চিত্র। গল্পটি খুব প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার ধারণা প্রভাত-কুমারের কৌতুক-রসাত্মক গল্পগুলি অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, উপভোগ্য, এবং ঐতিহাসিকের কাছে অধিকতর মূল্যবান।

অনুরূপা দেবী

এই অধ্যায়ে অন্ততঃ দু'জন মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম উল্লেখ না করলে অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একজন অনুরূপা দেবী এবং অপরজন নিরূপমা দেবী। নামের মধ্যে মিল থাকলেও উভয়ের উপন্যাসেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মহিলা ঔপন্যাসিকদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের কথা বাদ দিলে এ দেশের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণ খুব কদাচিৎ চোখে পড়ে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রটি ব্যতিক্রম। উনিশ শতকেও আমরা স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি

দু'একজন লেখিকার নাম পেয়েছি। বিশ শতকে লেখিকার সংখ্যা অনেক। লেখিকারা সহজেই সহজ, সাবলীল অথচ আবেগবান ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন, স্বাভাবিক কারণেই গার্হস্থ জীবনের বাস্তব-সম্মত খুঁটিনাটি নিখুঁত চিত্র তাঁরা দিতে পারেন; পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে-সব দ্বন্দ্ব-সমস্যা দেখা দেয় সে সবের অত্যন্ত সত্য ও অন্তরঙ্গ চিত্রাঙ্কনে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দেন। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে বিশ শতকের প্রতিটি পর্যায়েই কিছু কিছু লেখিকা প্রায় পুরুষ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র-শরৎ-যুগে উপন্যাসের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের পরেই অনুরূপা ও নিরূপমা দেবীর স্থান ছিল। এঁরা ব্যতীত এ যুগে প্রভাবতী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রভৃতি আরও কয়েকজন লেখিকা সেকালের দিনে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকলেও তাঁরা এমন কিছু মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ রচনা রেখে যেতে পারেন নি যার জন্য বর্তমান আলোচনায় তাদের জন্য স্থান-শঙ্কুলান করা যায়। আমরা যতই বর্তমান কালের দিকে এগিয়ে আসব, ততই লেখক লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কাজেই ইতিহাসকারকে নির্বাচনের পথ ধরতেই হবে।

আমার মনে হয় যে ক'খানি উপন্যাসে অনুরূপা দেবী বিশেষভাবে সার্থকতা অর্জন করেছেন, সে ক'খানিকে Novel of Sentiment আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভয়ে ভয়ে আমি এই নামকরণের প্রস্তাব করছি, কারণ ইতিপূর্বে আর কোন সমালোচক অনুরূপা দেবীর প্রসঙ্গে এ কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইংরেজী সাহিত্যের আঠার শতকের লেখক রিচার্ডসনের মধ্যে Sentiment-এর যে ধরণের সুষ্ঠু চিত্রায়ণ আছে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হলেও অনুরূপার উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যায়।

Sentiment কথাটির সমার্থজ্ঞাপক বাংলা প্রতি শব্দ ভাবাবেগ (=আবেগ-মিশ্রিত ভাব বা idea)। প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু কিছু আদর্শমূলক চিন্তা থাকে; সে মনে করে এই আদর্শের অনুবর্তনেই জীবনের সার্থকতা বা শ্রেষ্ঠত্ব। যেমন, দেশপ্রেম, মানবতাবাদ, সতীত্ব ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি যে কোন জীবনে-উপজীব্য আদর্শই যখন আবেগ-যুক্ত হয় তখন তাকে আমরা ভাবাবেগ বলতে পারি। উপরে যে চারটি আদর্শের উল্লেখ করেছি

তার মধ্যে প্রথম দু'টি বিশেষভাবে আধুনিক যুগের সৃষ্টি, এবং শেষের দু'টি মধ্যযুগে বিশেষভাবে গুরুত্বলাভ করেছিল। সুতরাং ভাবাদর্শগুলি অনড়-অচল বা চিরকালীন কিছু নয়, যুগের প্রয়োজন অনুসারে ভাবাদর্শের উদ্ভব হয় বা কোন একটি ভাবাদর্শ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। শিল্প সাহিত্য কাব্য প্রভৃতি এই ভাবাদর্শগুলিকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে মানুষের সামনে উপস্থিত করে। সুতরাং এই আদর্শ ভাবনাগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বতস্ফূর্ত নয় বা মানুষের মনে আপনা-আপনি জন্মায় না। কোন না কোন ভাবে বাইরে থেকে এই ভাবনার বীজ মানুষের মনে উপ্ত হয়, এবং আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে। অবশ্য এ যুগে এমন ঘটনা বিরল নয় যে কোন মানুষ আপন মনন-শক্তির বলে একটি নিজস্ব আদর্শ তৈরী করে নেন এবং তাকে জীবনে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হন। এ-যুগে বহু পরস্পর বিরোধী আদর্শ বা আইডিয়া আমাদের সামনে উপস্থিত থাকার ফলে এই ধরণের ব্যক্তিগত সিন্থেসিস্ কম-বেশী অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদর্শ বাইরে থেকে উপ্তই হোক, বা অন্তরেই জন্ম-লাভ করুক, তা যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের নিজস্ব ঐশ্বর্যে পরিণত হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ব্যক্তির আশা-আকাঙ্খা চিন্তা-ভাবনার অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ভাবাবেগ আখ্যা দেওয়া যায় না।

সাধারণতঃ মানুষের মন এক সঙ্গে অনেকগুলো পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত বা সম্পর্ক-হীন ভাবাবেগকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়, কোন বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ ভাবাবেগ অনন্য নিরপেক্ষ গুরুত্ব অর্জন করে; একটি প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে সমস্ত সত্তাকে তা প্লাবিত করে এবং মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরাধীন দেশে যখন স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস শুরু হয় তখন কিছু মানুষের মনে দেশপ্রেম এই ধরণের অনন্য গুরুত্ব লাভ করে, দেশপ্রেমের কাছে পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ প্রভৃতি কাঙ্খিত ভাবাবেগগুলিও দ্বিতীয় বা তৃতীয় অগ্রাধিকার লাভ করে। এই ধরণের একটি ভাবাবেগের জন্ম-লাভ এবং সমগ্র সত্তার উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জনের চিত্রই অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের বিশেষত্ব।

ভাবাবেগ জিনিসটা মূলতঃ যুক্তি ভিত্তিক নয়—Irrational. যুক্তির আঁচ বেশী পরিমাণে গায়ে লাগলে কোন ভাবাবেগকেই টিঁকিয়ে রাখা মুস্কিল। সেইজন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি-মার্গের লোকদের পক্ষে কোন ভাবাবেগের কাছে

নিঃশেষে আত্মসমর্পন করা শক্ত। ভাবাবেগ মূলতঃ এক ধরণের ফেইথ—ধর্ম বা ধর্মের বিকল্প। কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান মানুষও একথা ভাবতে পারেন যে ভাবাবেগ ব্যক্তি মনের পক্ষে স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়, ব্যক্তি মনে কতকগুলি শুভ ভাবাবেগের উপস্থিতি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর এবং সমাজের অগ্রগতির সহায়ক। এই ধরণের মনোভাব-পুষ্ট যে ভাবাবেগ তাকে আমরা যুক্তি নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ বলে আখ্যাত করতে পারি। বঙ্কিম-যুগের উপন্যাসে আমরা যে ধরণের ভাবাবেগের চিত্র দেখতে পাই তা এই শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত। অষ্টাদশ শতকীয় ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বশতঃ বঙ্কিমযুগে Reason বা যুক্তিবাদ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ যুগের সাহিত্যে আমরা যে সব ভাবাবেগের প্রকাশ দেখতে পাই তা যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত; সমাজ বা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে সেগুলোকে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত কবা হয়েছিল। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন বঙ্কিমের নৈতিক চিন্তা কি যুক্তি-সিদ্ধ? কিন্তু এই ধবণের প্রশ্ন অসমীচীন; আমি আগেই বলেছি ধাপে ধাপে যদি যুক্তি প্রয়োগ কবা যায়, তবে যে কোন নৈতিক চিন্তা বা আদর্শ চিন্তার কতটুকু যে শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে বলা মুস্কিল। বঙ্কিম যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন অন্যভাবে; তিনি বোধ করেছিলেন সমাজের সুস্থতা শৃঙ্খলা এবং অগ্রগতির জন্য কতকগুলি নৈতিক ও আদর্শগত ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। কাজেই তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যে-সব ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেগুলো এই অর্থে যুক্তি-শাসিত।

আবর কতকগুলি ভাবাবেগ আছে যা যুক্তি-শাসিত নয়। সেগুলোকে নিছক কতকগুলি মানস-পক্ষপাত বা mental preference ছাড়া আর কিছু বলে ব্যাখ্যা করা মুস্কিল। রোমান্টিক মনোভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে তা প্রতি পদে পদে যুক্তি ও বিচারের দ্বারা মনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় না। স্বতস্ফূর্তভাবে মনের অভ্যন্তরে যে প্রবণতা জন্ম-লাভ করে সেই প্রবণতার পথ ধরে নির্বিচারে অগ্রসর হতেই রোমান্টিক মানস ভালবাসে। গভীর মনোজাত কোন ভাবাবেগের যুক্তিসঙ্গত বাস্তব উপযোগিতা আছে কিনা তা বিচার না করে, তা মনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভবের বা ভাবানুষঙ্গের জাল বোনে রোমান্টিক মন তার মধ্যে অবগাহন করতে চায়। শরৎচন্দ্র যখন মানব চরিত্রের কতকগুলি বিশেষত্বের

উপর এবং নারীর অভিমানের মনস্তত্ত্বের উপর অতিরিক্ত মূল্যারোপ করেন, তখন তার পিছনে কোন যুক্তি বা কারণ অনুসন্ধান করা নিরর্থক, তা এক-ধরণের মানস পক্ষপাত-মাত্র [অবশ্য শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতকে ভাবাবেগ না বলে ভাবালুতা বলা ভাল, কারণ এর পিছনে কোন সুস্পষ্ট আইডিয়া নেই]। আবার, অনুরূপার উপন্যাসে যখন পিতৃস্নেহের আকাঙ্খা বা স্বামীর প্রতি আনুগত্য কোন চরিত্রর উপর নির্বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করছে, তখন তা-ও মানস-পক্ষপাত-মূলক, যুক্তি শাসিত নয়। অবশ্য অনুরূপা দেবীর ক্ষেত্রে মানস পক্ষপাত সর্বত্রই সনাতনপন্থী চিন্তাব অনুসারী; সুতরাং সেদিক থেকে তিনি রোমান্টিক নন। বিদ্রোহ প্রবণতা রোমান্টিসিজমের চরিত্রগত বিশেষত্ব, এবং অনুরূপার মধ্যে তার প্রকাশ অনুপস্থিত। বস্তুত সাহিত্যে যুক্তি-বর্জিত ভাবালুতার প্রাবল্য রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত, রোমান্টিসিজম্ নয়।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা দরকাব। Sentimentality বা ভাবাতিশয্য বা ভাবাতিরেক আবার একটি স্বতন্ত্র জিনিস। ভাবাতিশয্য মূলতঃ ভাব প্রকাশের ভাষাগত ত্রুটি। পরিবেশ বা প্রসঙ্গ বা কার্য-কারণের সূত্র অনুযায়ী ভাষার যতখানি আবেগ সঞ্চার করা দরকার, তার চেয়ে অতিরিক্ত আবেগ সঞ্চারই ভাবাতিশয্য। বলা বাহুল্য ভাবাবেগ অনেক সময়েই ভাবাতিশয্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, এবং হয়ে থাকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবাবেগ বা ভাবালুতা সব সময় দোষের নয়, কিন্তু ভাবাতিশয্য সব সময়ই সাহিত্য কর্মের দুর্বলতা সূচিত করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ভাবালুতা আছে, কিন্তু ভাবাতিশয্য কদাচিৎ চোখে পড়ে।

ভাবাবেগ (সাহিত্যের আলোচনায় ভাবাবেগ কথাটি যখন উল্লিখিত হয়, তখন সাধারণতঃ তা যুক্তি-বর্জিত ভাবাবেগ) দোষের না হলেও তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। লেখক যদি বিষয় নির্লিপ্তভাবে ভাবাবেগের চিত্রায়ণ করেন তবে অবশ্য চিন্তাব কিছু নেই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যিনি ভাবাবেগের চিত্রায়ণ কবেন, তিনি নিজেই ভাবাবেগের শিকার। যে লেখক ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হন, সে-লেখকের মন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করে, গণ্ডী অতিক্রম করার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেন। একদিকে যেমন তিনি যুক্তি ও বাস্তবের শাসনকে অবজ্ঞা করেন, অপরদিকে তেমনি হৃদয়জ আবেগ-অনুভূতির গভীরে অবতরণের শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেন। তার ফলে তিনি এমন এক ধরণের মানসিকতার অধিকারী হন

যা সাম্প্রতিক কালের রম্যরচনা ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বাংলা উপন্যাসের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে ভাবাবেগ ভাবালুতা এবং ভাবাতিশয্য এদেশের উপন্যাসের অগ্রগতির পথে বিসম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে-জন্যই প্রসঙ্গটি নিয়ে এখানে এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম।

অনুরূপা যে কালে সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হন, সে-কালে স্ত্রী শিক্ষা এদেশে তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। যেটুকু ব্যাপকতা-লাভ করেছিল, তা-ও মেয়েদের মর্মমূলে বাসা বাঁধতে পারেনি। গতানুগতিক ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তার বসবর্তী হয়ে তারা স্বামী আর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গৃহস্থ ধর্ম পালন করছিল। তাদের জীবনে যে-সব সমস্যা ছিল তা মূলতঃ অর্থ নৈতিক, বা হৃদয়জ আবেগের দ্বন্দ্ব-জাত; চিন্তা বা ভাবের সংঘাত বাংলাদেশের অন্তঃপুরকে তখনো উল্লেখযোগ্যভাবে আঘাত করেনি। অনুরূপা দেবী ঠিক এই গতানুগতিক নারী সমাজের অন্যতম ছিলেন না। তিনি সুশিক্ষিতা ছিলেন; এবং এদেশে যে জড়বাদ যুক্তিবাদ নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি গুচ্ছের গুচ্ছের পাশ্চাত্ত্য'বাদের' আক্রমণ ঘটেছে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পরিচিত পথ ছেড়ে নতুন পথে পা বাড়ানোর আগে মানুষের মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধার ভাব জাগে; কেউ সে দ্বিধাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হন, কেউ বা থমকে দাঁড়ান। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একজনও যুক্তি-বিচারের দ্বারা চালিত হয়েছেন এ-কথা ধরে নেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। উভয়ের ক্ষেত্রেই নতুনকে স্বীকার করা বা না করার মধ্যে একটা মানস পক্ষপাত কাজ করছে। এমন হতে পারে এই অযৌক্তিক মানস-পক্ষপাতের ফলেই অনুরূপা দেবী নতুনকে পরিহার করে পুরাতনকে ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছেন।

যারা গতানুগতিকতার পথ ধরে চলে তারা আপন অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়। আমাদের দেশের মেয়েরা এইভাবেই পোষাক পরিচ্ছদে, আচার-বিচার লঙ্ঘনে, অন্তঃপুরের অবরোধ মোচনে ধীরে ধীরে পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু অনুরূপা শক্ত চরিত্রের মানুষ; নতুনের আক্রমণ থেকে পুরাতনকে রক্ষা করতে হবে বলে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বিদ্রোহ প্রকাশের পিছনে যেমন একটা প্রচণ্ড জোর আছে, সচেতনভাবে বিদ্রোহকে প্রতিরোধ করার চেষ্টার মধ্যেও অনুরূপ শক্তির প্রকাশ ঘটে। এই প্রচণ্ড প্রতিরোধ-শক্তি ও দার্ঢ্য অনুরূপা দেবীর উপন্যাসকে

মহিমান্বিত করেছে। তাঁর উপন্যাস পড়তে গিয়ে অনুভব করা যায় যে এক অসাধারণ চারিত্র্য-শক্তি-সম্পন্ন লেখিকা এর পরিকল্পনা করেছেন।

আমাদের পরিচিত বাস্তবের মধ্যে নতুন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্বের চেয়ে নতুন এবং পুরাতনের মিশ্রণের চিত্র বেশী। সুতরাং এই বাস্তব অনুরূপার নিকট উপন্যাস রচনার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়নি। তিনি এমন বাস্তব চেয়েছেন যেখান নতুন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্ব ঋজু এবং স্পষ্ট; অথবা যেখানে নতুনের বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশ ঘটেনি—পুরাতন অভ্রভেদী পাষাণের মত দৃপ্ত গরিমায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সামাজিক উপন্যাস লিখতে গিয়েও অনুরূপা আমাদের পরিচিত বাস্তবকে গ্রহণ করেন নি, বাস্তবের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করে এক মনঃকল্পিত বাস্তবেব সম্ভাব্য চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

তার অতি পরিচিত 'মা' (১৯২০) উপন্যাসটিকে প্রায় ফ্যাণ্টাসী বলে গণ্য করা যায়। আধুনিক সমাজের বাসিন্দা হলেও এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা রামায়ণে বর্ণিত পরিবেশের অনুরূপ একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছে অনায়াসে। পিতার ইচ্ছা অনুসারে অরবিন্দ স্নেহাস্পদ স্ত্রী মনোরমাকে ত্যাগ করে পুনরায় ব্রজরাণীকে বিবাহ করেছে। মনোরমার ছেলে অজিত পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, অথচ পিতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা তার মনে অত্যন্ত তীব্র। এইভাবে রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতা লব-কুশের অনুরূপ একটি দ্বন্দ্বময় চিত্র লেখিকা আধুনিক সমাজের পরিবেশে উপস্থাপিত করেছেন। এই অসঙ্গতি সহজেই বিচারশীল পাঠকের মনকে একটু বিরূপ করে; কিন্তু এই বিরূপতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বইখানিকে ফ্যাণ্টাসী বা রূপক-ধর্মী কাহিনী বলে গণ্য করলে দেখা যায় এর মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে। লেখিকা প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ ভাবাবেগকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। অরবিন্দের কাছে পিতার আজ্ঞানুবর্তিতা চরম ধর্ম; সে জানে এজন্য মনোরমার প্রতি অবিচার ঘটছে, পুত্র অজিতকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করা হচ্ছে; তবু সে অবিচলিত। তেমনি মনোরমাও স্বামী পরিত্যক্তা ও লাঞ্ছিতা হয়েও স্বামীর প্রতি মুহূর্তের তরেও আস্থা বা নিষ্ঠাশূন্য নয়; তার জীবনের প্রধান ভাবাবেগ স্বামীপরায়নতা। উপন্যাসে এই দুটি ভাবাবেগের চিত্র কম বেশী static, গতিহীন; কারণ কাহিনীর সূত্রপাতেই এদের মানস অবস্থা একটা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করেছে। সুতরাং একমাত্র অজিতের মনের ভাবাবেগের চিত্রায়নই কাহিনীতে

বেগ ও গতি সঞ্চার করেছে। লেখিকা দেখিয়েছেন পিতার বিরুদ্ধে নানা-প্রকার অবিশ্বাস সন্দেহ বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে কী করে অজিতের মনে ধীরে ধীরে একটি ভাবাবেগ প্রচণ্ড গতি লাভ করে তার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করে ফেলছে—পিতৃমুখিনতা ও ভাবাবেগের সঞ্চার ও বিস্তার লাভের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিবর্তনকে পর্যন্ত লেখিকা অত্যন্ত নিখুঁত-ভাবে বর্ণিত করেছেন। সুতরাং উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীর এই অংশটুকু নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

অনুরূপা যেখানে ভাবাবেগের চিত্র দিতে গিয়েছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতার পরিচয় মেলে। যেখানে তিনি নতুন আর পুরাতনের দ্বন্দ্বের চিত্র উপস্থিত করতে গিয়েছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুতঃ ভাবাবেগ-প্রধান লেখক বা লেখিকার পক্ষে সমাজ-দ্বন্দ্বেব চিত্র উথাপন করতে যাওয়া অনধিকার প্রবেশের সামিল; দ্বন্দ্বের চিত্র উপস্থিত কবতে হলে মননশীলতার একটি ভিত্তিভূমি দরকার। এই কারণেই অনুরূপার 'জ্যোতিহারা,' 'পথের সাথী,' উপন্যাসগুলি সফল হয়ে উঠতে পারেনি! লেখিকার প্রচারমূলক অভিসন্ধি স্থূলভাবে ধরা পড়েছে, অথচ প্রচারেব বিষয় জোরালো যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন হয়নি। 'পথের সাথী' উপন্যাসে রুবীর প্রেম সম্পর্কে অতি-আধুনিক মতবাদ অনায়াসে গতানুগতিক স্বামী-নিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়েছে। এই পরিবর্তন মনস্তত্ত্ব-সিদ্ধ বা প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়নি।

'মহানিশা' অনুরূপার অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। অন্ধ চরিত্র ধীরার ভাবাবেগের চিত্রায়ণে লেখিকা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্ধত্বের অন্তরালে যে গভীর আবেগ-সম্পন্ন নারী সত্তা বিরাজমান, যে নারী সহজেই আপন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে স্বামীপ্রেমের মূল্যকে বুঝতে ও চিনতে পারে ধীরার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে নির্মলের সেবা-যত্নের মধ্যে প্রকৃত প্রেমানুভূতির যে অভাব রয়েছে তা সে অনায়াসে বুঝতে পারে। নিজের অন্তরে সে আবিষ্কার কবে যে নির্মল অন্যাসক্ত। এই আবিষ্কারের ফলে ধীরার স্বামীনিষ্ঠায় অবশ্য কোন ফাটল সৃষ্টি হল না। শুধু প্রতিদান-হীন প্রেম আপন অন্তরে গুমড়ে গুমড়ে একটা গভীর বেদনা-বোধের সঞ্চার করেছে। এই অতল-গহ্বর বেদনা-বোধের চিত্রায়ণে অনুরূপার দক্ষতা অসাধারণ। বিচিত্র নাট্যরস সৃষ্টি করে অনুরূপা এই বেদনা-বোধকে সজীব করে তোলেন। ধীরার মূল্য বুঝতে পেরে নির্মল এক সময় সত্যি

সত্যি ধীরার প্রতি প্রেমজ আকর্ষণ অনুভব করেছিল। কিন্তু ধীরা তখন নির্মলের প্রেম অপ্রাপ্য এই বিধিলিপিকে স্বীকার করে নিজের মনের চারদিকে এক দুর্ভেদ্য বর্ম রচনা করেছে। নির্মলের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেম সেই কর্মে আঘাত লেগে ফিরে এল। এই নাটকীয় পরিহাস করুণ রসকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

'মহানিশা' (১৯১৯) উপন্যাসে অবশ্য কাহিনীর ঐক্যের দিকে লেখিকা যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। বিহারী-অপর্ণার উপকাহিনীটির সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না।

'মহানিশা'র মত 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসেও নায়িকা নীলিমার জীবনের মর্ম-বেদনার চিত্র গভীরতা লাভ করেছে। পিতার কদর্য ব্যবহারে তার দুর্ভাগ্যের সূচনা, পিতার জন্যই সুশীলের সঙ্গে মিলনে বাধার সৃষ্টি, খ্রীষ্টীয় সমাজে তার লাঞ্ছনা—সমস্ত মিলিয়ে এক নিশ্ছিদ্র ভাগ্য বিড়ম্বনার চিত্র বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে লেখিকা চিত্রিত করেছেন। শেষে সুশীলের সঙ্গে অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ করে নীলিমা পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করল।

মন্ত্রশক্তি (১৯১৫) বোধকরি লেখিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। কাহিনীর ঐক্য, নির্বাধ গতিশীলতা, নাটকীয় পরিহাস প্রভৃতির যোগ্য সমন্বয়ে বইখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠেছে। 'মা' উপন্যাসে আমরা যেমন দেখেছি সমাজচিত্র দিতে গিয়েও লেখিকা আমাদের পরিচিত সমাজ থেকে একটি ব্যবধান রচনা করেছেন (বস্তুত অনুরূপার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই এই ব্যবধান অনুভব করা যায়); মন্ত্রশক্তি উপন্যাসে তেমনি লেখিকা কাহিনীকে এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে পরিকল্পিত করে এই ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। বাণী এই কাহিনীর নায়িকা; এবং প্রায় সমগ্র কাহিনীটি তার দৃষ্টি-কোন্ থেকে বিবৃত হয়েছে বলে কাহিনীর নাট্যরস বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপার বেশীর ভাগ নায়িকাই নিপীড়িতা; কিন্তু বাণী নিপীড়িতা নয়, বরং শুরুতে সে উৎপীড়ক। সামন্ততান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে অম্বরনাথ মন্দিরের পুরোহিত হয়েছে, এবং জমিদার কন্যা নিয়ম-নিষ্ঠার সজাগ প্রহরী বাণী তার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, প্রতি পদে পদে অম্বরনাথের কাজের ত্রুটি প্রদর্শন করতে সে ব্যস্ত—এইভাবে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। কালক্রমে বিবাহ-সম্বন্ধীয় পারিবারিক বিধান অনুযায়ী সেই অবজ্ঞাত অম্বর-নাথকেই বাণী বিবাহ করতে বাধ্য হল। বিবাহের পরও ভৃত্যস্থানীয়

অম্বরনাথের প্রতি প্রভুত্ব-গর্ব-সচেতন বাণীর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণার অবধি ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে ঘটনা-চক্রে অম্বরনাথের সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যপরায়নতার দৃষ্টান্ত দেখে দেখে কী করে বাণীর মনে স্বামীর প্রতি অনুরাগ দেখা দিল, কী করে সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে দীনহীনের মত স্বামীর কাছে আত্মসমর্পনের আকাঙ্ক্ষা তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল তার কাহিনী লেখিকা নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়ণের ভিতর দিয়ে উপস্থিত করেছেন। অবশেষে পতি-নিষ্ঠার শক্তিতে সে মৃত্যুপথ যাত্রী স্বামীর জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারল।

লক্ষণীয় এই যে অনুরূপা অনেক উপন্যাসেই উৎপীড়িতা ভাগ্যবঞ্চিতা অসহায় নারীর জীবনের অপরিসীম কারুণ্যের চিত্র উপস্থিত করেছেন। এত বঞ্চনা সত্ত্বেও নারী ধর্মপালনে ও স্বামী-নিষ্ঠায় অনন্যচিত্ত। এই ধর্ম ও নিষ্ঠা কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক শিক্ষা বা সংস্কার থেকে জাত বলে লেখিকা দেখাচ্ছেন না। বরং হিন্দু নারীর প্রকৃতির এমন বৈশিষ্ট্য যে এই বোধগুলি যেন স্বতস্ফূর্তভাবে তার অন্তরে জাগ্রত হয়। অনুরূপার নায়িকার ভাবাবেগ আপন অন্তরেই জন্মলাভ করে এবং বিকাশ লাভ করে, বাইরের পরিবেশের উপর তা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং অনুরূপার উপজীব্য ভাবাবেগ যদিও ধর্মীয় প্রবণতা-জাত ; কিন্তু উপস্থাপনায় তা প্রায় রোমান্টিক গুণ-বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। অনুরূপার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা প্রাচীন গ্রীস্ দেশের ষ্টয়েক (Stoic) দের মত। জীবন দুঃখময়, অথচ তবু ধর্ম ও নিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। ধর্মহীনতার পথ থেকে ধর্মের পথ অনেক বেশী কষ্টসাধ্য এবং দুঃখময়, তবু ধর্মের পথ ধরে চলতে হবে। পরকালের সুখের জন্য বা মোক্ষলাভের জন্য কি? কিন্তু এমন ইঙ্গিত অনুরূপার উপন্যাসের কোথাও মিলবে না। অনুরূপার নায়িকারা ধর্মের পথে চলে ; কারণ ধর্মই তাদের প্রকৃতি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য তাদের নেই।

অনুরূপার সার্থক উপন্যাসগুলিতে প্রচারের অভিসন্ধি নেই, লেখিকার সত্য অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই এ বইগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। লেখিকা একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব শিল্পজগৎ রচনা করেছেন, অথচ তার মধ্যে নারীর দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখা সেকালের বাস্তবের মৌল স্বরূপটি ধরা পড়েছে। ভাবাবেগের চিত্রায়ণে লেখিকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুষঙ্গের নিখুঁৎ বিবরণ দিয়েছেন।

নিরুপমা দেবী

অনুরূপার মত নিরুপমাও ভাবাবেগের চিত্রকর। কিন্তু তাঁর রচিত শিল্প-জগৎটি সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের এবং আমাদের পরিচিত বাস্তবের কাছাকাছি। অনুরূপার কাহিনী পড়তে যেমন একটু অপরিচয়ের দূরবর্তিতার অনুভূতি জাগে, নিরুপমার কাহিনী পড়তে গেলে তেমনি মনে হয় আমাদের প্রতিবেশী-দের ঘরোয়া জীবনের দিন-লিপি যেন পড়ছি। পুনরাবৃত্তিশীল জীবন যাত্রার একঘেঁয়েমীর মধ্যে কী করে অতি ধীরে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে নিরুপমা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে তা পরিস্ফুট করেন।

ভাবাবেগের চিত্রায়ণে নিরুপমা বিস্তারিত ইম্প্রেশনিষ্টিক মানস চিত্র বা ভাবানুষঙ্গের চিত্র উপস্থিত করেন না। তিনি একান্ত ধৈর্যের সঙ্গে একের দৈনন্দিন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তার মধ্যে নায়িকা চরিত্রের ভাবাবেগের সূক্ষ্ম প্রকাশকে লক্ষ্য করেন। অনুরূপা আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা, নাটকীয়তা ও তীব্র উচ্ছ্বাস-পূর্ণ ভাষার সাহায্যে সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নিরুপমা অনাড়ম্বর ঘটনা ও অনতি-উচ্ছ্বাস-পূর্ণ ভাষার সাহায্যে ব্যঞ্জনা ধর্মিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ গভীরতা তাঁর মধ্যে কম নয়; পারিবারিক জীবন বাস্তবের চিত্রায়ণে তিনি অত্যন্ত নিপুণ এবং বস্তুনিষ্ঠ।

নিরুপমা দেবীর শ্যামলী, দিদি এবং অন্নপূর্ণার মন্দির—এই তিনখানি উপন্যাসই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শ্যামলী' (১৯১৮) বই খানিতে অবশ্য অনিল ও রেবার যে আদর্শবাদী জীবন-চিত্র লেখিকা উপস্থিত করেছেন তা তাঁর প্রতিভা প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র নয়। রোমান্স-সম্মত আদর্শবাদের জগৎ অপেক্ষা বাস্তবের পরিচিত মাটিতেই নিরুপমা অধিকতর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। কিন্তু মূক নারী শ্যামলীর চিত্রায়ণে লেখিকার সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার্য। একটি শিক্ষা-বঞ্চিতা প্রায় জড়বুদ্ধি-সম্পন্না নারীর মধ্যে কী করে প্রেমের উৎপত্তি হল, কী করে প্রেমের এই ভাবাবেগ তার সমস্ত সুপ্ত সত্তাকে জাগরিত করে তুলল, মনের সমস্ত অচেতন দীপশিখা-গুলিকে জ্বালিয়ে দিল, তার দীর্ঘ ইতিহাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পর্যায়গুলি নিরুপমা অতি ধৈর্যের সঙ্গে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

'অন্নপূর্ণার মন্দিরের' উপজীব্য একটি অসহায় দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবার। অভাব-অভিযোগ দুঃখকষ্ট ও অপমানের মধ্যে নায়িকা সতীর অমলিন দৃঢ়তার সঙ্গে শুচিতা ও মর্যাদা-বোধকে অক্ষুণ্ণ রাখার সংগ্রাম কাহিনীটিকে মহত্ত্ব

দান করেছে। সতীত্ব রক্ষার সংকল্পের সঙ্গে দারিদ্র্যজাত আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের সমন্বয় হওয়ায় সতীর জীবনের ট্রাজেডি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। যে বিশ্বেশ্বরের প্রতি তার গোপন আকর্ষণ রয়েছে সেই বিশ্বেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার 'দৃশ্যের মধ্যে এই বিশিষ্ট ভাবাবেগ নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। ছোট বোন সাবিত্রী ব্যক্তিত্বশালিনী দিদির ছায়া-মাত্র। কিন্তু ছায়া বলেই তার সলজ্জ কুণ্ঠিত ভাবটি, বিবাহের পর বিশ্বেশ্বরের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা-মিশ্রত কুণ্ঠিত প্রেমটুকু বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে।

'দিদি' (১৯১৫) নিরূপমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; কারণ এই উপন্যাসে লেখিকা কোথাও সহজ পরিচিত বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করেননি। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরের' সতী চরিত্রেব মধ্যেও খানিকটা পোষাকী উপন্যাস-সুলভ আদর্শবাদ বইখানির বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু 'দিদি'তে লেখিকা কোথাও এই ধরণের অনধিকার চর্চা করেন নি। সুরমা আধুনিক মেয়ে; স্বামীর প্রতি তাঁর যেমন অনন্য-নিষ্ঠা, স্বামীর থেকেও সে তেমনি নিষ্ঠা দাবী করে। কিন্তু সুরমার ব্যক্তিত্বের চাপ থেকে হয়তো অব্যাহতি লাভের জন্যই স্বামী অমর চারুকে দ্বিতীয় পত্নী হিসাবে গ্রহণ করল। তারপর সুরমা এবং অমরের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল তাই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তেজস্বী মেয়ে সুরমা অনায়াসে অমরকে ত্যাগ করল, কিন্তু চারুকে সে বোন হিসাবে গ্রহণ করে সাংসারিক ব্যাপারে তাকে অকুণ্ঠিত সাহায্য দান করে। অমর নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে সুরমার ভালবাসা ফিরে পেতে চায়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরে সুরমা পরের বাড়িতে পরের জন্য সেবাধর্মে নিজেকে নিয়োগ করে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল স্বামী ভিন্ন তার রিক্ততা এবং নিঃস্বতা ঘুচবার নয়। তখন সমস্ত অভিমান ও অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে সে স্বামীর কাছে আত্ম-সমর্পন করল। সুরমার মানস পরিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি লেখিকা অত্যন্ত যত্নেব সঙ্গে ধীরে ধীরে অনাবৃত করেছেন। বাস্তব-নিষ্ঠা লেখিকার অসাধারণ। স্বামীর কাছে নিঃশেষে আত্মনিবেদনের ভাবাবেগটি অহঙ্কার অভিমান প্রত্যাখ্যান দ্বিধা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে কী ভাবে অবশেষে অমিলন উজ্জ্বলতায় আত্মপ্রকাশ করল তা আশ্চর্য সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছে।

অনুরূপা ও নিরূপমার উপন্যাস পড়ার সময় মনে রাখা দরকার এঁরা মূলতঃ

ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন লেখিকা। এঁদের সমস্ত রচনার পেছনে রয়েছে ধর্মানুভূতি—কোন বৃহত্তর শক্তির কাছে আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের উপন্যাসের মধ্যে সমাজের সমালোচনা-মূলক অনেক উপাদান পাওয়া যায়—পিতা বা স্বামীর অন্যায় উৎপীড়ন, নারীর অসহায়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের উপন্যাসের মূল সুরটি হল—সমালোচনা নয়, প্রতিবাদ নয়—আত্মসমর্পণ। সেই হিসাবে লেখিকাদ্বয়কে হয়তো অনেকে অনাধুনিক বলে গণ্য করবেন ; কিন্তু ধর্মীয় আবেগ একটি সত্য আবেগ, এযুগেও তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং তার সাহিত্যে উপস্থাপনা নিশ্চয়ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

রবীন্দ্র-শরৎ যুগের উপন্যাস আলোচনা করে আমরা দেখলাম বঙ্কিম যুগের যুক্তি-প্রাধান্যের বদলে এ-যুগে একটি নতুন বিশেষত্বের সূত্রপাত ঘটেছে—ভাবাবেগ বা ভাবালুতা। বঙ্কিম যুগের রোমান্স-প্রিয়তার বদলে এ-যুগে বাস্তবনিষ্ঠা দেখা দিয়েছে, বেশীর ভাগ উপন্যাসই বাস্তব ভিত্তিক ; কিন্তু নির্মম নিরাসক্ত যুক্তিবাদ বা সত্যনিষ্ঠা ত্যাগ করে আমরা রোমান্টিক ভাবাবেগ বা ভাবালুতার দৃষ্টি নিয়ে বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করছি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ব্যতিক্রম ; নরেশচন্দ্র ও জগদীশ গুপ্তের মধ্যেও ভাবালুতা প্রায় অনুল্লেখ-যোগ্য। কাজেই যুগের পরিবর্তন আমরা সহজেই অনুভব করি ; কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য করি একটি পরিপূর্ণ রোমান্টিক অভিব্যক্তির দিকে এই যুগের সাহিত্য অগ্রসর হতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। একটি বিদ্রোহাত্মক, জীবনেব আমূল পরিবর্তন ও পুনরুজ্জীবন-মূলক ভাবনা নিয়ে অনুভূতি-উপলব্ধির নতুন দিগন্তে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা যেন সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে চেয়েছে, কিন্তু অর্ধপথে সুর কেটে গিয়েছে। তার ফলে রোমান্টিসিজমের বদলে কতকগুলি রোমান্টিক লক্ষণ এ যুগের উপন্যাসকে চিহ্নিত করেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | পথ-ভোলা পাখি

পথ-ভোলা পাখি ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ অথবা রোমান্টিক ভাবনার ব্যাপ্তি, পরিণতি ও অবক্ষয়ের যুগ।

নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগের সাহিত্য-কর্মে এবং সাহিত্য ভাবনায় যে রূপান্তর দেখা দিয়েছিল তার বহু উপাদান ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে সেই সব উপাদান ডক্টরেট ডিগ্রি-লাভেচ্ছু গবেষকদের গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হবে। আপাততঃ বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিকতাকে বোঝার জন্য যে কয়েকটি কথা না বললে নয় তাই উল্লেখ করতে চেষ্টা করব।

এক হিসাবে বলা চলে ১৯২২ সাল, অর্থাৎ কল্লোল-পত্রিকা প্রকাশের বছর থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দী সুরু হ'ল। সেইজন্য অনেকে এই যুগটিকেই 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী; অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তো 'কল্লোল যুগ' নাম দিয়ে একটি বই-ই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। বস্তুতঃ এই নামকরণের ফলে এই যুগের পরিধি সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় বলেই তা আপত্তিকর। এই যুগের লেখকগণ যুগটিকে অতি-আধুনিক যুগ বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু অতি-আধুনিক কথাটির কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কিনা বলা শক্ত।

নামকরণের সমস্যাটি মুলতুবি রেখে আপাততঃ যুগের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক। ভুল বোঝা-বুঝির সুযোগ যাতে না ঘটে সে-জন্য আগেই বলে রাখি কোন যুগের গুরুত্ব সে-যুগের সাহিত্য-ফসলের মূল্যের উপর না-ও নির্ভরশীল হতে পারে। যে যুগের কথা বলছি (মোটামুটি হিসাবে, ১৯২২-১৯৩৮) সে-যুগের উপন্যাসের মূল্যায়নের চেষ্টা যথাস্থানে করা যাবে। তবে আপাপত এখনই একটা কথা বলা চলে যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার আলোচনায় এ যুগের গুরুত্ব এ যুগের সৃষ্ট উপন্যাস-সমূহের মূল্যমান অপেক্ষা

অনেক বেশী। আমরা সূত্রপাত থেকে আলোচনা আরম্ভ করে এই গুরুত্ব কেন তা তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই সৌন্দর্য-পূজার প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। চলনে-বলনে ব্যবহারে পোষাকে, বাসগৃহের রুচি সম্মত পারিপাট্যে, জীবনের সবকিছুর মধ্যেই একটা সুঠাম পরিমার্জিত মাত্রা ও পরিমিতি-বোধ আয়ত্ত করাকে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড মূল্য দিতেন। কিছু লোকের মধ্যে বিলাসিতা ও পোষাক-পারিপাট্য চিরকালই আছে এবং ছিল। রবীন্দ্রানেথর সৌন্দর্যানুবৃত্তি ঠিক সে-জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে সমস্ত জীবন-যাপনটাই মালিন্য ও কুশ্রীতা-মুক্ত হয়ে শ্রী ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠুক, কারণ আমাদের জাগতিক জগতে সৌন্দর্যের রূপায়নই চরমতম মূল্য। জাঁকজমক ও চাকচিক্য নয়, সুরুচি এবং সুষমাই তাঁর কাম্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-পূজার মধ্যে একটু মেয়েলীপনা ছিল। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে কিছু কিছু তরুণ সম্প্রদায় যে মেয়েলী ধরণে বাবরি চুল রাখত, লম্বা পাঞ্জাবী গায়ে দিত, মাটি পর্যন্ত লম্বিত কুঁচোন ধুতি পরত এবং কিন্নরকণ্ঠে কথা বলত তার একটি ব্যঙ্গ-রূপ রাজশেখর বসুর কচি-সংসদ নামক গল্পে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রবণতাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম দেখা গেল এ-কথা মনে করা ভুল। আমার তো মনে হয় বৈষ্ণব-কাব্যের যুগ থেকেই বাঙ্গালী চরিত্রের মধ্যে মেয়েলীপনার একটা সচেতন প্রয়াস বরাবর চলে এসেছে। বৈষ্ণব কবিগণের রাধা-ভাবে ঈশ্বর-সাধনার রীতির মধ্যেই এই প্রবণতার বীজ লুক্কায়িত ছিল। নারী-সুলভ কোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলির অনুশীলন, আলাপে ব্যবহারে নারী-সুলভ কমনীয় বাচন ও অঙ্গ-ভঙ্গী—অন্ততঃ বৈষ্ণব-সমাজের কাছে অপরিচিত নয়। অবশ্য বাংলাদেশে পাশাপাশি পৌরুষের সাধনা ছিল না এমন কোন ইঙ্গিত আমি করছি না।

সৌন্দর্যানুশীলনের সঙ্গে মেয়েলীপনার এই সংযুক্তিকে পাশ্চাত্যের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও শক্তিশালী করেছে। মানুষের কোমল বৃত্তিগুলি—স্নেহ প্রেম দয়া মায়া প্রভৃতি—নারী চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে গণ্য হয়ে এসেছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী এই বৃত্তিগুলিকে অধিকতর মূল্য দিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্র-নাথের সৌন্দর্যানুশীলন ও মেয়েলীপনা তাঁর ব্যাপক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অঙ্গীভূত হয়েছে। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেছে দেশ ও

গণ-জীবনের ব্যথা-ক্লান্ত সমস্যা-জীর্ণ পৃথিবীতে। কাজেই সৌন্দর্যপূজার নাম করে তিনি জীবন-বিচ্ছিন্ন একটি 'প্যালেস অব্ আর্ট' রচনা করতে পারেননি। তিনি পলাতক বালকের মত সারাদিন নদীর তীরে তীরে বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন; কিন্তু জগতের আর্তচিৎকার বার বার তাঁর ধ্যান-ভঙ্গ করেছে।

সুতরাং কাল্ট অব্ বিউটি রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর জগত বা উচ্চতর মানবিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি; কিন্তু তাঁরই সৃষ্ট শান্তিনিকেতনে যাঁরা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন বা বসবাস করেছেন, তাঁরাই ব্যবহারে পোষাকে ভাষায় কতকগুলি পরিশীলিত অভ্যাস আয়ত্ত করে এক ধরণের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা-ধর্মী আভিজাত্য সৃষ্টি করেছিলেন। 'কল্লোল' প্রকাশের কালে যে তরুণ লেখক ও কবি সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও এই কাল্ট অব্ বিউটিকে জীবনের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। একালে যে শিল্পকৈবল্যবাদ (art for art's sake)-এর তত্ত্ব প্রবল আলোচনা ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে এই কাল্ট অব্ বিউটি সম্পর্কিত।

তত্ত্ব হিসাবে দেখতে গেলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পকৈবল্যবাদের নীতি আর জীবনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য-পূজার কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। শিল্প-কৈবল্যবাদ এ-কথা বলে যে শিল্প-সাহিত্য যে 'ইস্থেটিক প্লেজার' বা নান্দনিক আনন্দ দান করে তা জীবন-যাপন থেকে উদ্ভূত পরিচিত আনন্দ থেকে স্বতন্ত্র। নান্দনিক আনন্দ মনের একটা স্বতন্ত্র বৃত্তিজাত, এবং তার সঙ্গে মনের অন্যান্য মানস-বৃত্তিগুলির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর করার অর্থ হল আমাদের দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-বিধান করা। যা দেখতে সুন্দর বা শুনতে সুন্দর তা আমাদের মনে যে আনন্দ উৎপন্ন করে তা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত আনন্দ থেকে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু শিল্পকৈবল্য-বাদের মত অনুসারে শিল্প-জাত আনন্দ জাগতিক আনন্দ থেকে স্বতন্ত্র জিনিস। কাজেই আমাদের দেশে যে শিল্পকৈবল্যবাদের তত্ত্বের সঙ্গে সৌন্দর্য-পূজা জড়িয়ে গিয়েছিল তাতে বোঝা যায় ঐ তত্ত্বটিকে (যার প্রধান প্রবক্তা হলেন ডক্টর ব্রাড্‌লি) আমরা দার্শনিক বিশুদ্ধির সঙ্গে গ্রহণ করিনি। বস্তুতঃ এই সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিল্প-কৈবল্যবাদের তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা চোখে পড়ে তার মধ্যে দার্শনিক গভীরতা অনুপস্থিত। ডঃ ব্রাড্‌লি বা ওআল্টার পেটারের উল্লেখ কদাচিৎ-ই চোখে পড়ে; তাঁদের বদলে অস্কার ওআইল্ডের নাম বেশী

উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু ওআইল্ডের চিন্তাধারা অনেক বেশী তরলীকৃত। ওআইল্ডের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের বেশীক্ষণ খুশী করতে পারে না, কারণ তা বড্ড একঘেঁয়ে, তুলনায় মানব-কল্পনায় সৃষ্ট সৌন্দর্য অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়, সুতরাং আমাদের আগ্রহ সঞ্চারে সক্ষম। এই মত অনুসারে সাহিত্য বাস্তবের অনুকরণ নয়, কল্পনার সাহায্যে বাস্তবে অনুপস্থিত এমন জিনিস সৃষ্টি করা।

এই সময়ে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শিল্প-কৈবল্যবাদের তত্ত্ব ছাড়াও আর একটি তত্ত্ব যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেটা হল আমাদের প্রাচীন ভারতের অভিনব-গুপ্ত- ব্যাখ্যাত রস-তত্ত্ব। শ্রীঅতুল গুপ্ত রচিত 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ এই তত্ত্বের ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ। এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, একটি মৌল ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। উভয় তত্ত্বই বলছে শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র রস বা আনন্দ দান করা, নীতি উপদেশ বা আদর্শ প্রচার নয়, সমাজ কল্যাণ বা বাস্তবের রূপায়ণ নয়, বা শিক্ষাদান নয়। আনন্দ সৃষ্টির যোগ্যতাই সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি। রসতত্ত্ব অবশ্য যে নয়টি রস বা আবেগ সৃষ্টিকে সাহিত্যের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছে—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর প্রভৃতি—সেগুলো ইন্দ্রিয়জাত। ইন্দ্রিয়জাত হলেও সেগুলো অপূর্বতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, চরম ক্ষেত্রে ব্রহ্মস্বাদ দান করে। এখন নান্দনিক আনন্দ আর ব্রহ্মস্বাদ এক জিনিস কিনা তার মীমাংসা করা সহজ নয়।

এ-কালের সাহিত্যলোচনায় যে কয়েকটি প্রসঙ্গ বিস্তর বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে একটি হল: কী লিখব তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কি ভাবে লিখব তাই আসল কথা। এ প্রশ্ন যে গুরুত্বলাভ করেছিল তাতে যুগ-মানসের উপর প্রাচীন ধ্বনি-তত্ত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়। লেখক কতখানি সামাজিক তথ্য বা সমস্যা তাঁর সাহিত্যে সংগ্রথিত করেছেন, বা তাঁর বক্তব্য কী, শিল্প-মূল্যের বিচারে এ সবের কোন গুরুত্ব নেই। বাগ্‌-ভঙ্গী ও কাহিনী বিন্যাসের সাহায্যে তিনি কতখানি আবেগ বা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারছেন, তাই গুরুত্বপূর্ণ। ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে যে ভাষায় ব্যঙ্গ্যার্থ আছে (অর্থাৎ আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থের দ্যোতনা আছে) তাই সাহিত্যের ভাষা। সুতরাং প্রাচীন তত্ত্বের মধ্যে যে দার্শনিক গভীরতা আছে সেটুকু বাদ দিলে এ-কালের চিন্তার সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে।

এ-কালের কিছু কিছু লেখকের আর একটি প্রিয় ধারণা ছিল যে সাহিত্য-কর্ম একান্তভাবে লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। লেখক লেখেন নিজের আনন্দের জন্য, সে লেখা পড়ে দৈবাৎ যদি কোন পাঠক আনন্দলাভ করেন তবে তা অতিরিক্ত প্রাপ্তি, অত্যাবশ্যক নয়। এই কথাগুলি ডি-এইচ-লরেন্সকৃত 'সাহিত্য আমার জন্য,' (Art for my sake) এই সূত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। লেখক যখন লেখেন, তখন তিনি এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম—এ দু'য়ের মাঝখানে আর কিছু নেই। তাঁর স্বাধীন কল্পনার পথে কোন প্রতি-বন্ধককে তিনি স্বীকার করবেন না।

মোটের উপর, কল্লোল প্রগতি বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে যে সব সাহিত্য মূলক আলোচনা ছড়িয়ে রয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সে-সব থেকে একটি সুপরিণত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-তত্ত্ব নির্মাণ করা যায় না। তখনকার বাংলাদেশে শিল্প কৈবল্যবাদ একটি ধ্বনি বা শ্লোগান-মাত্র, সাহিত্য ব্যাপারের সামগ্রিক আলোচনা-জাত কোন সুসম তত্ত্ব নয়। তরুণ লেখকগণ এই ধ্বনিটির মধ্য দিয়ে মনের নিরুদ্ধ আবেগকে ভাষা দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে গণতান্ত্রিক সমাজে বাণিজ্যিক অগ্রগতির যুগে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ফ্রি ট্রেড্ বা অবাধ বাণিজ্য নীতির দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, শিল্পকৈবল্যবাদ শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই দাবীরই সম্প্রসারণ-মাত্র। বাণিজ্যপতি বা শিল্পপতি যেমন নির্বাধে আপন খুশী মত পন্য উৎপাদন ও বিক্রয় ও মুনফা অর্জনের অধিকার দাবী করেছিলেন, লেখক তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমস্ত সামাজিক দায়িত্ব এবং বিধি-নিষেধ থেকে অব্যাহতি দাবী করেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে শিল্পকৈবল্যবাদী চিন্তা মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তার অগ্রগতির প্রতিফলন মাত্র। তাকে পাশ্চাত্য আর্ট ফর আর্টস্ সেকের তত্ত্বের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায় বলে আমার মনে হয় না। ও-দেশের এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ শিল্প-কর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, জীবনের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ হতে শিল্প প্রক্রিয়ার অনন্যতা দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করেছেন ও সবশেষে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন। বাঙ্গালী লেখক সেকালে ঠিক এ ধরণের সুশৃঙ্খল আলোচনায় অগ্রসর হন নি। তাঁদের কাছে শিল্পকৈবল্যবাদ একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-তত্ত্ব নয়, একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী (attitude)-মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তাঁরা সাহিত্যের উনিশ শতকীয় বিষয়-প্রাধান্য, আদর্শ-

মূলকতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। দেশ-জোড়া যখন বৈদেশিক শাসন-মুক্তির দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই মুক্তি দাবী করলেন।

শুধু মুক্তির দাবী নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু। সেই 'আরও কিছুটুকু' বুঝতে হলে আমাদের তখনকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা স্মরণ করা দরকার। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এ যুদ্ধের ফলে আমরা তেমন-কিছু লাভবান হইনি, তেমন-কিছু ক্ষতিও স্বীকার করিনি। আমরা ছিলাম দর্শক-মাত্র। সুতরাং এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপ যে-ধরণের নৈরাশ্যবাদ-পীড়িত হয়েছিল, মানব-ধর্মী চিন্তার অপমৃত্যুকে চোখের উপরে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশে ঠিক সে-ধরণের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকও ছিল না, দেখাও যায়নি। আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহের শক্তির বিপুলতা দেখে, তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির বিশালতা দেখে। ওরা যে হত্যাকাণ্ডে মত্ত হয়েছিল, তার নৈতিক ও মানবিক তাৎপর্য আমাদিগকে চিন্তিত করেনি; আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম কী প্রচণ্ড-ভাবে ওরা হত্যা-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ওদের জীবন-যাপনের প্রচণ্ডতার পাশে আমাদের নিজেদেরকে সেদিন অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বল, শক্তিহীন, উৎসাহ-হীন বলে অনুভব করেছিলাম। ওদের জীবনীশক্তির পাশে আমাদের বীর্য-হীনতা চিরদিনই আমাদের মনে হীনম্মন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে; প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্রে' খেদের সঙ্গে বলেছিলেন—ওরা যখন বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করে, আমরা তখন চুটকী লিখি, এবং তাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দৃশ্য এই হীনতা-বোধকে শতগুণে বর্ধিত করে দিল। রবীন্দ্র-নাথ এই হীনতা-বোধকে বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পেরে। কিন্তু এ-কালের নিরীশ্বরবাদী তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে এই ধর্মীয় ঐতিহ্য কোন সান্ত্বনা বহন করে আনেনি; অনুভবে এবং স্মৃতিতে তাঁরা প্রাচীনের সঙ্গে এমন কোন গভীর যোগসূত্রের পরিচয় পান নি যার ফলে অতীতের গৌরবকে তাঁরা নিজস্ব বলে গর্ব করতে পারেন। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের শক্তি-মদমত্ত রূপের পাশে আপন দীনতার গ্লানি এ যুগের তরুণদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

এই হীনতাবোধের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ ছিল অক্ষমতা-বোধ ও পরাজয়ের মনো-

বৃত্তি। যুদ্ধ-সমাপ্তির পর গান্ধীজী যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কোনদিনই গান্ধীজীর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের খুব ভক্ত ছিল না; তথাপি এই ব্যর্থতার গ্লানি তাদের অন্তরকে ব্যথিত করেছিল। আমরা দুর্বল, শক্তিহীন; গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সেই দুর্বলতার স্বীকৃতি-মাত্র। আধ্যাত্মিক প্রভাবের দ্বারা শত্রুর মানস-ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা অলসকল্পনা; এবং তা প্রত্যাশিত ব্যর্থতা অর্জন করেছে। বস্তুতঃ বিংশোত্তর বছরগুলিতে হীনবীর্য নিরস্ত্র ভারতীয় জাতি যে প্রবল ইংরেজের হাত থেকে কোনদিন স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে এ কথা বিশ্বাস করার মত সাহস এবং আশাবাদ কারও মধ্যে ছিল না। আর মাত্র বিশ পঁচিশ বছর পরে দেশ স্বাধীন হবে এরকম ভবিষ্য-দ্বাণী সেদিন যদি কেউ করত তবে সে নিঃসন্দেহে হাস্যাস্পদ হত।

এই হীনতাবোধ এবং হতাশাবোধেব পাশাপাশি অবশ্যই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক দারিদ্র এবং অনিশ্চয়তা। সেদিনকার শিক্ষিত সমাজেব কাছে দেশগতভাবে বা সমাজ-গত-ভাবে বড় হয়ে ওঠাব সঙ্কল্প কল্পনাবিলাস মাত্র বলে প্রতিভাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে জাতীয় আদর্শ লেখক সমাজকে সঞ্জীবিত রেখেছিল, .অকস্মাৎ তা নিতান্ত আত্ম-প্রতারণা বলে তরুণ লেখক-দের কাছে অনুভূত হয়েছিল। এদেশের সামনে বড় রকমের কোন সম্ভাব-নার দরজা উন্মুক্ত নেই। যদি কোন ব্যক্তির সুযোগ এবং শক্তি থাকে, তবে সে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো নিজেব জন্য একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে নিতে পারে। আমরা সেদিন হতাশার এমন একটা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছুতে পেরেছিলাম যখন ব্যক্তির চিন্তা তার নিজের পরিধির বাইরে অগ্রসর হওয়াব সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিনকার লেখক সমাজ আবিষ্কার করেছিলেন যে এই নিরক্ষরতার ,দেশে দৈবাৎ তাঁরা কিছু শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন, দৈবাৎ তাঁরা কিছু রচনা শক্তির অধিকারী হয়েছেন। এইটুকুকে অবলম্বন করে জীবনে তাঁদের একটি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করতে হবে। সকলের আগে দরকার জীবনের একটি অবলম্বন, এমন-কিছু যা তাঁদের সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। দেশমায়ের পূজা বা সমাজমায়ের সেবা নিরর্থক,—এ দেশের নিবীর্য মানুষদের দ্বারা কিছু হবে না; ব্রহ্মোপাসনা রবীন্দ্রনাথের জন্য সংরক্ষিত থাক; সুতরাং তাঁদের কাছে একটি পথই খোলা আছে,—সৌন্দর্যকে ধর্ম হিসাবে গণ্য করা। আর দৈবাৎ যখন তাঁরা রচনা-

শক্তির অধিকারী হয়েছেন, তখন তাঁরা লিখবেন—একমাত্র নিজের প্রতি ছাড়া আর কারও প্রতি কোন দায়িত্ব নেই বলে—শিল্পকৈবল্যবাদের নীতি অনুসারে। এইভাবে সৌন্দর্যপূজার সঙ্গে শিল্পকৈবল্যবাদের মিলন ঘটেছিল এই যুগে।

সুতরাং শিল্পকৈবল্যবাদী নীতির পিছনে শুধু ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই যে ছিল তা নয়। তার চেয়েও বৃহত্তর মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল পলায়নের ইচ্ছা,—হতাশা নীরাশা হীনতাবোধ থেকে, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে, যে দেশবাসীর জন্য অনেক কিছু করা দরকার অথচ কোন কিছুই করা সম্ভব নয়, তাদের থেকে। সে-জন্য একালের সাহিত্যে একদিকে দেখা যায় মুক্তির জন্য দুঃসাহস, আনন্দ, একগুঁয়েমী; সবোপরি উপন্যাসকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প-কর্ম হিসাবে গড়ে তোলার, একটি নিটোল আনন্দের বস্তুতে পরিণত করার ইচ্ছা। আবাব অপরদিকে দেখতে পাই ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হতাশা, গ্লানি, ব্যঙ্গ।

স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে যুদ্ধোত্তর লেখকদের মূল প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন নয় পূর্ব-যুগেই তা আভাসিত হয়েছিল। 'সবুজ পত্রের' পৃষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরীই প্রথম শিল্পকৈবল্যবাদের নীতির উল্লেখ করেন। পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ পাঠকের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যেই উপন্যাস রচনা করেছেন। একটি নিটোল সুবিন্যস্ত প্রীতিকর সমাপ্তি-যুক্ত কাহিনী রচনাতে তাঁরা নজর দিয়েছিলেন। অবশ্য উনিশ শতকীয় সাহিত্য-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা যুদ্ধোত্তব কালের বিশেষত্ব; তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রবণতা অনুপস্থিত।

আর্ট ফর আর্টস্ সেকের নীতি সহজেই লেখককে রোমান্টিকধর্মী করে তোলে। যে লেখক বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে বসেছে, তাকে স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্মের জন্য প্রধানতঃ আপন কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। এই কল্পনা কখনো গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারে না গভীর বিশ্বাসের অভাবে, প্রবল আশাবাদ অথবা প্রতিহত আশাবাদ-জনিত দুঃখবাদের অভাবে। এ কল্পনা নিরুদ্দেশ যাত্রার সওয়ার হতে অক্ষম, কামার্ত হয়েও অনন্ত কামনাকে বুকে পুষে রাখতে সাহস পায় না। সুতরাং এ যুগের লেখকরা বাস্তবকে অস্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবকে ছেড়ে বেশী দূর ওড়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। আর্ট ফর আর্টস সেকের নীতি সাহিত্য কর্মকে অতখানি গুরুত্ব দিতে চায় না; সুতরাং এক ধরণের লঘুচাপল্য, এক ধরণের গুরুত্বহীন গুরুত্বদান, (non-serious Seriousness) এ যুগের সাহিত্যের চরিত্রগত বিশেষত্ব। সেকসপীয়র শেলী

কীটস্ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিদের মধ্যে রোমান্টিসিজমের যে আদিগন্ত বিস্তার দেখা যায়, এ যুগের রচনায় তা প্রত্যাশা করা অনুচিত। বিশেষ করে শিল্প-মাধ্যম হিসাবে উপন্যাস উচ্চতুম কাব্যানুভূতিকে ধারণ করতে অক্ষম। অধিকন্তু এ-যুগের লেখকদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ধরণের রোমান্টিক উপাদান লক্ষ্য করা যায় যার অনুরণন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিকের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এই উপাদানগুলি এ যুগের রোমান্টিক ভাবনার স্বাভাবিক উপচার। আমরা নীচে কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ করছি :

যাযাবরী কল্পনা—সামাজিক সার্থকতার প্রচলিত মাপকাঠিগুলির প্রতি রোমান্টিক মানসের দারুণ অবজ্ঞা। জীবনের সরল রাস্তায় অগ্রসর হয়ে অর্থ বিত্ত প্রতি-পত্তির মালিক হওয়াকে সে জীবনের অপব্যয় বলে গণ্য করে। পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র কোনে ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র ঈর্ষার শিকার হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কী আছে! বরং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে, পৃথিবীর বহুবিচিত্র জীবন-ধারাকে অনুভবের সীমার মধ্যে ধরতে পারলে জীবনের এক ধরণের সার্থকতা মেলে। সারা জীবন ধরে নানা দেশ ঘুরে ঘুরে জীবন-বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের যাযাবরী কামনা এড্‌ভেঞ্চার্স অব্ কাসানোভা (Adventures of Cassa-nova) নামক একখানা জগৎ-বিখাত বইয়ের বিষয়-বস্তু। কাসানোভা এক বহু-প্রেমিক নায়ক; দেশে দেশে তার জন্য ঘর বাঁধা রয়েছে; ঘরে ঘরে শয্যা বিছানো রয়েছে; প্রত্যেক শয্যার পার্শ্বে অপেক্ষা করছে একজন করে সুন্দরী নায়িকা। এই ধরণের রোমান্টিক কল্পনা বহু-দেশের বহু-লেখককে প্রভাবিত করেছে। বিংশোত্তর বাংলা সাহিত্যে অচিন্ত্য কুমারের বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়, প্রবোধ সান্ন্যালের যাযাবর, প্রিয়বান্ধবী, অন্নদাশঙ্করের বাদল-চরিত্র, বুদ্ধদেব বসুর সানন্দা, এবং আরও অনেক বইতে নানা বেশে এই পরম সুখকর যাযাবরী চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই এই যাযাবরী কামনা কল্পনা-বিলাস মাত্র; তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এই মনোভাবের কোন প্রতিফলন নেই।

সমাজ-নীতি ও-শৃঙ্খলা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা—সমাজ-নীতির ক্ষেত্রে বার্ণার্ড শ এবং বার্ট্রাণ্ড রাশেল যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে, এবং হ্যাভলক এলিস যৌন-জীবনের গবেষণামূলক বিজ্ঞান চিন্তা প্রয়োগ করে যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, একালের লেখকদের স্বাভাবিক রোমান্টিক প্রবণতাকে তা আরও শক্তিশালী করেছিল। যাযাবরী কল্পনা নীতি-চিন্তা-বর্জিত অবাধ প্রেমের এমনিতেই উগ্র

সমর্থক ; উক্ত লেখকগণ ঐ কল্পনার পিছনে যুক্তিবাদের সমর্থন দান করলেন। তার ফলে শুধু অবাধ প্রেম নয়, শারীর-ধর্মী প্রেম এই যুগের উপন্যাসের প্রিয় বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হল। ব্রহ্মচর্য, সতীত্ব, এমন্-কি বিবাহ-প্রথা পর্যন্ত এ-কালের লেখকদের তীব্র আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ আদৌ যুক্তিবাদ ভিত্তিক নয়, রোমান্টিক অসহিষ্ণুতা-জাত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। বুদ্ধদেব অচিন্ত্য প্রভৃতি লেখকগণ ডি-এইচ্-লরেন্স এবং আলডুস হাক্সলীব খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁরা যে গল্পে উপন্যাসে অকুণ্ঠিতভাবে যৌন-চিত্র পবিবেশন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার পিছনে শেষোক্ত লেখকদের প্রভাবে অনস্বীকার্য। কিন্তু হাক্সলী আধুনিক যন্ত্র-নির্ভব সভ্যতা এবং তাব বিভিন্ন প্রবণতার কঠোর সমালোচক ; এবং লরেন্স তো এই কৃত্রিম কুশ্রী নগব-প্রধান সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আদিম জীবন-যাত্রায় ফিবে যাওয়াব পক্ষপাতী। 'কল্লোলের' প্রত্যেক লেখকই কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার ভক্ত, তাবা মনে প্রাণে শহুবে, এবং এ-দেশে যথেষ্ট যান্ত্রিকী-করণ হয়নি বলেই তাদের আক্রোশ। ক্লাইভ স্ট্রীটের চাঁদ এবং সকালবেলাকার কাবখানার ভেঁপু এঁদেব মধ্যে কাব্যানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। এঁরা যৌন-ক্ষুধার নগ্ন বর্ণনা দেন, কিন্তু তাই বলে লবেন্সের মত মানুষেব আবেগ-অনুভূতির আদিম বিশুদ্ধিতে ফিরে যেতে চান না। এর থেকে বোঝা যায় এঁদের রোমান্টিসিজম্ খুব স্বল্প জীবনীশক্তি-সম্পন্ন। ড্রয়িং রুমের সোফা কৌচ আর কাঁচের টবে রক্ষিত প্লাষ্টিকের ফুল, আর মাথার উপরে বিজলীর পাখা এঁদের কল্পনা-বিস্তারেব পক্ষে যথেষ্ট প্রেরণা। এঁরা কেউই প্রকৃতি প্রেমিক নন। রোমান্টিক মানস জীবনের মৌল সমস্যা এবং পরম আবেগ নিয়ে মাথা ঘামায় ; এঁরা অত দূরে যেতে রাজী নন।

সুতরাং এ-যুগের লেখকদের সমাজেব প্রতি অসহিষ্ণুতা যতখানি ভঙ্গী-মাত্র, ততখানি প্রকৃত নয়। এঁরা বাস্তবকে স্বীকার করতে না চাইলেও, বাস্তবের কাছাকাছি চলাফেরা করেন। কাহিনীতে সমাজ সম্পর্কিত যে বক্তব্য আভাসিত হয়েছে তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির প্রতি এঁদেব পক্ষপাত পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-নীতিকে এঁরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশী সুসঙ্গতভাবে বর্জন করতে পেরেছেন। সমাজ-নীতির প্রশ্নে শরৎচন্দ্রও দ্বিধাগ্রস্ত ; যেখানে প্রাচীন সমাজ-নীতি পীড়নমূলক, সেখানে তিনি অকুণ্ঠিত-

ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কিন্তু যেখানে প্রাচীন সমাজ-নীতি ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক সংযমের অবলম্বন, সেখানে তিনি তাকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তরুণ লেখকগণ যৌথ-পরিবার ভিত্তিক চিন্তা, স্বামী-সংস্কার, বিবাহ-সংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন।

ইতিপূর্বে আমি সমাজ ও ব্যক্তির প্রশ্নে ক্লাসিক্যাল মনোভাব ও রোমান্টিক মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ক্লাসিক্যাল মনোভাব অনুযায়ী সমাজ ব্যক্তি অপেক্ষা বড়; সমাজের অনুশাসন ব্যক্তির উপর অবশ্য প্রযোজ্য: প্রয়োজন হলে পীড়ন করেও। রোমান্টিক মনোভাবের কাছে ব্যক্তি সমাজ অপেক্ষা বড়; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষে সবসময় ব্যক্তি লেখকের সহানুভূতি লাভ করে। এই রোমান্টিক মনোভাব কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে খুব সুসমঞ্জসভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিম ছিলেন অন্ততঃ দৃশ্যতঃ ক্লাসিক্যাল মনোভাবাপন্ন।

উৎকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ—রোমান্টিক মানস সবসময়েই একটু বেশী মাত্রায় ইন্দ্রিয় সচেতন। সুতরাং কল্লোল-কালের লেখকগণ সহজেই নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে দেহজ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন সমাজের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশের অস্ত্র হিসাবে। তার ফলে যৌন প্রেম, ও যৌন মনস্তত্ত্ব তাঁদের গল্প-উপন্যাসের প্রায় সর্বপ্রধান বিষয়-বস্তু হিসাবে দেখা দেয়। তার পরবর্তী ধাপ হিসাবে যৌন-মনস্তত্ত্বের বিকৃতিগুলির দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং মাছি-যেমন আবর্জনা-কুণ্ড থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে না, তেমনি করে যৌন বিকৃতির বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে তাঁদের দৃষ্টি পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

যৌন অস্বাভাবিকতার প্রতি রোমান্টিক মানসের প্রকৃতিগত আকর্ষণ সম্পর্কে সজাগ না থাকলে তা লেখকের পক্ষে বিপত্তির কারণ হয়। স্যাডিজম্ (Sadism) বা অপরকে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা, ম্যাসকিজম্ (massochism) বা অপর-কর্তৃক আহত হওয়ার ইচ্ছা,—এই দুইটিই যৌনজীবনের প্রধান বিকৃতি। তার সহচর হিসাবে দেখা দেয় বায়রণ-সুলভ বহু-প্রেমিক, এবং সাকো-সুলভ বহু-প্রণয়িনী এই দু'টি চরিত্র। বলা বাহুল্য এ উভয় জাতের চরিত্রই সমাজ জীবনে বিস্তর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং বহু মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে। কিন্তু এই দু'টি বিকৃতি এবং এ দু'জাতের চরিত্রের প্রতি বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক বহু ক্ষেত্রে প্রচুর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। ইংরেজ কবি

রসেটি এবং সুইনবর্ণের মধ্যে আমরা এই বিকৃত পক্ষপাতিত্বের সাক্ষাৎ পাই। বুদ্ধ বসু এবং অচিন্ত্যকুমার রচিত মধ্যবর্তি পর্যায়ের উপন্যাস-গুলিতে এই বিকৃত পক্ষপাতিত্বের সাক্ষাৎ পাই।

পীড়নের ইচ্ছা এবং নিপীড়িত হইবার ইচ্ছার মানস্তত্ব যদি বিষয় নির্লিপ্তভাবে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় তবে তা জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে বলে দোষের নয়। কিন্তু এই বিকৃতিব প্রতি যদি লেখকের আসক্তি প্রকাশ পায়, তবে খুব বেশী সাহিত্যে ঔচিত্যবাদের সমর্থক না হয়েও স্বীকার করতে হবে যে অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যে মানসিকতা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকব, যা জীবন-বিরোধী, সেই মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক সাহিত্যকে অববক্ষয়ের সাহিত্য বলা চলে। এই মানসিকতার বিপদ এই যে আক্রান্ত ব্যক্তি এর নিগড থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। বিংশোত্তর যুগের কিছু কিছু সাহিত্যিক এই অবক্ষয়ের মনস্তত্ত্বের বশীভূত হয়েছিলেন বলে তাঁদের মন আর স্বাভাবিক বিবর্তন-ধর্ম অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারেনি। পঁচিশ বছব বয়সে তাঁরা যে চমক সৃষ্টি করে বাঙ্গালী পাঠককে হতভম্ব করে দিয়েছিলেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তাঁরা সেই প্রথম যৌবনের উৎকর্ষকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

বুদ্ধি-চর্চা ও বুদ্ধির বড়াই—শিল্পকৈবল্যবাদ এবং সৌন্দর্য-পূজা যেমন এ-যুগের লেখকদের কাছে তত্ত্ব নয়, প্রবণতা মাত্র; তেমনি রোমাণ্টিসিজম্‌ও ছিল একটি সহযোগী প্রবণতা মাত্র। ওআর্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরিজের মত তাঁরা কোন রোমাণ্টিক দর্শনে উপনীত হননি; অথবা বঙ্কিমের মত তাঁরা কোন প্রবল জীবনীশক্তি-সম্পন্ন রোমাণ্টিসিজমের অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের দুর্বল কল্পনা ও অনুভূতি-প্রবণতার সহায়ক হিসাবে দেখা দিয়েছিল বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন। এ-যুগের অনেক লেখকই নাম-করা ভাল ছাত্র ছিলেন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট পরিচয়ও ছিল। তাঁদের রচিত সাহিত্যে বিভিন্ন বিদেশী লেখক ও গ্রন্থের যে প্রভাব দেখা যায়, তাই তাঁদের বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের নিদর্শন।

রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততাকে তাঁরা খুব বেশী প্রশ্রয় দেননি। ভাষাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, শানিত ও উজ্জ্বল করে তোলার জন্য তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াস স্বীকার করেছেন। শব্দ-চয়নে ও স্টাইলে সচেতন বৈদেশিক অনুকরণ লক্ষণীয়। তির্যক ভাষা, বৈদেশিক উল্লেখ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ, শ্লেষ ও বিরোধাভাসের প্রচুর ব্যবহার

প্রভৃতি এ যুগের বুদ্ধি-প্রাধান্যের পরিচায়ক। বস্তুতপক্ষে বুদ্ধির বড়াই এ যুগের সাহিত্যের একটি প্রকৃতিগত বিশেষত্ব।

বোধ করি এই সময় থেকেই ইণ্টেলেকচুয়েল কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। বিদেশের সর্বশেষ নাম-করা লেখক বা বই বা সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে, এবং সাহিত্য দর্শন পলিটিক্স, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি জনপ্রিয় বিষয় সমূহ সম্পর্কে কিছু পল্লবগ্রাহী জ্ঞান অর্জনের নামই এদেশে ইণ্টেলেকচুয়েল হওয়া। বোধ করি বিংশোত্তর লেখকেরাই আমাদের দেশের প্রথম ইণ্টেলেকচুয়েল। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য-পূজার মত বুদ্ধির অনুশীলনও এ যুগের লেখকদের জীবন ও সাহিত্যের বহিঃ-শৌকর্য্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই গভীরতাকে স্পর্শ করার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি।

বাস্তববাদ ও প্রাকৃতবাদ

এ যুগের উপন্যাসে শিল্পকৈবল্যবাদী রীতির পাশাপাশি বাস্তববাদেরও বিকাশ ঘটেছে। এই দুটি ভিন্নধর্মী সাহিত্য-ধারা স্বাভাবিক কারণে ভিন্ন পথগামী হয়ে থাকলেও কতকগুলি সাধারণ যুগ-লক্ষণ উভয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। যে মনস্তাত্ত্বিক হীনতা-বোধ হতাশা ও নিরাশা শিল্পকৈবল্যবাদী প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল, তারই এক ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাস্তববাদের জন্ম হয়েছিল। মানুষ অত্যন্ত জটিল মানসিকতার অধিকারী বলেই এরকম হয়। উদ্দীপক এক হলেও বিভিন্ন মানুষ তাতে বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়। সাহিত্য যখন যথেষ্ট প্রসার লাভ করে, তখন একই কালের সাহিত্যে বিভিন্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটলে দর্শকদের মধ্যে তিনরকমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। একজন শিউরে উঠে চোখ বুজে ছুটে গিয়ে ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকবেন। এবং বাইরের কোন শব্দ যাতে কানে না আসে সেজন্য ঘরের মধ্যে হয়তো রেডিও চালিয়ে দেবেন। তিনি বলবেন, আমার মন বড় নরম, এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। দ্বিতীয় ব্যক্তি অসহায়ভাবে অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখবেন, এবং বলবেন, হায়! এ দৃশ্য-দেখে আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। তৃতীয় ব্যক্তি হয়তো প্রতিবিধানের চেষ্টায় ঘটনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তিনজনেই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল; কিন্তু সহানুভূতির প্রকাশ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন। এ.দের মধ্যে প্রথম জন হলেন শিল্পকৈবল্যবাদী,

দ্বিতীয় জন নেতিমূলক বাস্তববাদী, তৃতীয় জন হয়তো সংস্কারপন্থী বা আদর্শবাদী। বলা বাহুল্য আমরা যখন সাহিত্য আলোচনা করতে বসেছি, তখন এ তিনের মধ্যে কোন গুণগত তারতম্য করা অনুচিত।

এ-যুগের শিল্পকৈবল্যবাদী এবং বাস্তববাদী উভয়েই বাস্তবকে অসহিষ্ণুতা, বিতৃষ্ণা এবং অসহায়তার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। একজন বাস্তবকে অস্বীকার করে এক আপাত সুখকর জীবন-চিত্র নির্মান করতে গিয়ে তার মধ্যে নিজের মনের জ্বালা ও অপরিতৃপ্তকে প্রকাশ না করে পারেননি। আর একজন বাস্তবের কদর্যতার সবটুকু চিত্র উপস্থিত কবে মনেব ক্ষোভ মেটাতে চেয়েছেন।

পূর্ববর্তী যুগের বাস্তবাদের সঙ্গে তুলনায় এ-যুগের বাস্তবাদের বিশেষত্ব হল যে নৈতিকতা শোভনতা বা সাহিত্যের পূবসংস্কারের খাতিরে তা বাস্তবের রাখা-ঢাকা চিত্র উপস্থিত কবতে রাজী নয়। নগ্ন বাস্তবের বর্বরতা ও বীভৎসতাকে অনাবৃত করতে এ-যুগেব বাস্তববাদী সঙ্কল্প-বদ্ধ। তাঁর আদর্শ হচ্ছে জোলা এবং মোপাসাঁর প্রাকৃতবাদ (Naturalism)। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন; পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের চরিত্র, নৈতিক চিন্তা প্রভৃতি গডে ওঠে। সুতরাং শরৎচন্দ্রেব মত সমাজের নিম্নতম স্তরেও উচ্চতম মানবিক আদর্শ আবিষ্কার করতে তাঁবা অভ্যস্ত নন। অশিক্ষা-দারিদ্র্য, কুসংস্কাবের মধ্যে হীরকের অস্তিত্ব—বৈজ্ঞানিক চিন্তা অনুযায়ী সম্ভব নয়। সুতরাং এযুগের লেখক মুখোশ-খোলা চোখ নিয়ে বাস্তবকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তথাকথিত মানবিক আদর্শ একটি ফিকসন মাত্র, বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই।

শরৎচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাস্তববাদীবা সামাজিক উৎপীড়নের জন্য মূলতঃ ব্যক্তিকেই দায়ী করেছেন। কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা তাঁদের আক্রমনের বিষয় হলেও, সেই প্রথাগুলোর স্থায়িত্ব বা উচ্ছেদ প্রধানতঃ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। কল্লোল-কালের বাস্তব চিন্তায় এই সিদ্ধান্ত উঁকি-ঝুঁকি মারছে যে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ-ব্যবস্থা অনেক বেশী শক্তিশালী, ব্যক্তি সমাজ ব্যবস্থার দাস-মাত্র—যে উৎপীড়ক, সে-ও! যে উৎপীড়িত সে-ও। সুতরাং তাঁরা ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাজ-ব্যবস্থাকে নয়তো মানব-নিয়তিকে দায়ী করলেন মানুষের মন্দ ভাগ্যের জন্য। অথবা, মানুষ তার মনস্তত্ত্বের দাস; ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যা মানব মনের তিন চতুর্থাংশ, কিংবা তারও বেশী অংশ অচেতন বা অর্ধচেতন, যার উপর চেতন মনের কোন কর্তৃত্ব নেই; অথচ যা চেতন মনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

এই মগ্নচৈতন্য জগতে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপুগুলি অবাধে রাজত্ব করছে; সেখানে স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তির কোন স্থান যদি-বা থেকে থাকে তো তারা দীনতম প্রজা-মাত্র।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, রোমাণ্টিক মনোভাব এবং রুশো-প্রচারিত প্রাকৃত-বাদ ঘোষণা করেছিল—মানুষের মধ্যে হৃদয়জ বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক, স্বভাবের মধ্যে মানুষ প্রতিপালিত হলে এই বৃত্তিগুলিই প্রাধান্য-লাভ করে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার সঙ্গে ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্বের জ্ঞান নতুন বাস্তববাদীর-দের অন্তর থেকে সেই সুন্দর বিশ্বাসটিকে উৎপাটিত করতে সচেষ্ট হল।

অবশ্য বলা দরকার, বিংশোত্তর তরুণ লেখকদের এতখানি মানসিক পরিণতি ছিল না যে নিজেদের বিশিষ্ট চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, সেই বনিয়াদকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা করবেন। তাঁরা বলতে গেলে রবীন্দ্র-শরৎ-যুগের ভরপুর মরশুমের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং সেই যুগের আলো-বাতাসে পুষ্টিলাভ করেছিলেন। সুতরাং পূর্বযুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় তাঁরা যত সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, তত অনায়াসে তাঁরা সে-যুগের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেননি। শিল্পকৈবল্যবাদীদের উপর যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনায়াসে অনুভব করা যায়, তেমনি বাস্তব-বাদীদের উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব।

সুতরাং শিল্পকৈবল্যবাদী এবং বাস্তববাদী উভয় জাতের সাহিত্যিকই একটি জায়গায় সম-মনোভাবের অধিকারী। সমাজের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অনাস্থার সাধারণ ভূমিতে তাঁরা দণ্ডায়মান। একটি বেপরোয়া বিদ্রোহাত্মক মনোভাব উভয়ের সাহিত্য কর্মকেই অনুপ্রাণিত করেছে। এই বিদ্রোহ অবশ্য কোন সক্রিয় কর্মপন্থার রূপ নেয় নি; তা নিছক একটি প্রবণতা মাত্র। শিল্প-কৈবল্যবাদীরা যেমন সমস্ত আদর্শবাদী ও ঔচিত্যবাদী চিন্তাকে বর্জন করেছিলেন, তেমনি বাস্তববাদীরা পাঠককে সমাজ-সচেতন করে তুলে তাকে সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী করার আশা পোষণ করেননি।

সাহিত্য-রূপের বিশেষত্ব

অধ্যায়ের শুরুতে আমি বলেছিলাম, এক হিসাবে বলা চলে যুদ্ধোত্তর যুগ থেকেই প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতক শেষ হল এবং বিশ শতাকর সূত্রপাত হল। কথাটা হঠাৎ উচ্চারিত হলে মনে খটকা লাগে, কারণ যে ঐতিহ্যের বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্র-শরৎ-প্রমথ চৌধুরীদের মত শক্তিধর লেখকগণ ধারক ও বাহক

ছিলেন, তাকে কয়েকজন অস্থির-চিত্ত তরুণ, যাঁরা প্রতিভায় ও শক্তিতে পূর্ববর্তীদের কাছাকাছিও নন, ভেঙ্গে ফেলবে এ-কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যুগ পবিবর্তনের ধারা সম্ভবত ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়।

বিংশোত্তর লেখকরা দাবী করেছিলেন যে পূর্ববর্তীদের ধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁরা নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। সেইজন্যই তাঁরা 'অতি আধুনিক'। এ দাবীর মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। নতুনদের রচনার পাতায় পাতায় পূর্বতনদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কিন্তু এই অতিরঞ্জনের মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। তাঁরা যে নতুন ধারা প্রবর্তনের জন্য সত্যিই প্রয়াসী হয়েছিলেন, তা তাঁদের উপন্যাসের (এবং কাব্যের) রূপগত পরিবর্তনের মধ্যে সহজেই চোখে পড়বে। এবং সাহিত্যে রূপগত পরিবর্তন অবধারিতভাবে বিষয়গত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

ইতিপূর্বে আমি বলেছি বঙ্কিম-যুগ আর রবীন্দ্র-শরৎ-যুগের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা অনুভব করা যায়। এই উভয় যুগের উপন্যাসে কাহিনী এবং চরিত্রেব নিরঙ্কুশ-প্রাধান্য। কাহিনী সামাজিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব-মূলক এবং চরিত্রগুলি সামাজিক চরিত্র, অর্থাৎ সমাজের চোখ দিয়ে দেখা চরিত্র।

বলা বাহুল্য তরুণ লেখকরাও এই ধারাকে কম-বেশী অনুসরণ করে বিস্তর বই লিখেছেন। কিন্তু যেখানে তারা পরীক্ষামূলকতার পথ ধরেছেন, সেখানেই যুগ-লক্ষণ অধিক-মাত্রায় প্রকট হয়ে পড়েছে। কিন্তু নিছক বাস্তববাদী ঢঙে লেখা বইতেও এ-যুগে লেখক প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত, এবং সমগ্র ঘটনা প্রবাহ নায়ক চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এপিক-ধর্মী উপন্যাসে কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোন্ থেকে বিবৃত করেছেন। কিন্তু এ-যুগের বেশীর ভাগ উপন্যাসে কাহিনীর একটি-মাত্র সূত্র; এবং সেইজন্য-একটিমাত্র দৃষ্টি-কোন্ থেকে সেই সূত্র অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এক দৃষ্টিকোন্-ভিত্তিক একসূত্রী কাহিনী অনেক বেশী জমাট এবং নাটকীয়গুণ সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া এটা শুধু একটা কলা-কৌশলের পরিবর্তনই নয়। দৃষ্টিকোন্ ভিত্তিক রচনার মধ্যে এই স্বীকৃতি রয়েছে যে বাস্তবের কোন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ রূপ আমাদের জানা নেই; আমরা যে বাস্তবকে জানি তা কোন না ব্যক্তির চোখ দিয়ে দেখা বাস্তব। সাহিত্যও ঠিক ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বাস্তবকে চিত্রিত করতে চায় না; সাহিত্যের সত্য ব্যক্তির

অভিজ্ঞতায় লব্ধ সত্য। সুতরাং কোন চরিত্রের দৃষ্টিকোন্ থেকে ঘটনাকে দেখার চেষ্টার অর্থ লেখক নিজের দৃষ্টিকোণের অতিরিক্ত অপর একটি দৃষ্টিকোন্ থেকে বাস্তবকে নিরীক্ষণ করছেন। তার ফলে পাঠক দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোন্ থেকে বাস্তবকে দেখার সুযোগ লাভ করছে। আর বাস্তবের জ্ঞান আরও গভীরতর হচ্ছে।

দৃষ্টিকোন্-ভিত্তিক উপন্যাস রচনার আর একটু অগ্রসর ধাপ হচ্ছে মানস কথনের প্রাধান্য। চরিত্রের ভাবনাকে সাহিত্যে উপস্থিত করার রীতি উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত চরিত্রের ভাবনা লেখক কতৃক যেন পুনর্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মানস কথনের রীতিতে লেখক যেন শুধু-মাত্র টেপ্ রেকর্ডার। মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ, এবং হয়তো ঘুমের মধ্যেও, সে মনে মনে কথা বলে চলেছে। লেখক যেন নির্লিপ্তভাবে তারই একটি খণ্ডাংশকে লিপিবদ্ধ করছেন। বলা বাহুলা, চবিত্রের যথাযথ মানস-কথনকে কোনক্রমেই সাহিত্য-ভাত করা যায় না। কারণ রচনার পিছনে লেখকের একটা পরিকল্পনা থাকবেই। লেখক শুধু অবিকল মানস-কথনের ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চান। বিংশোত্তর যুগে এই মানস-কথনের রীতি-ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য মানস-কথনের রীতি মানেই চেতনা-প্রবাহের রীতি নয়। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রমুখ লেখকগণ যে চেতনা-প্রবাহের রীতি অবলম্বন করেছিলেন তা এক জটিল পদ্ধতি; তার উদ্দেশ্য হল অবচেতন মনকে অনাবৃত করা। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কেউ উপন্যাসে সার্থকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশের মানস-কথনের রীতি পুরোপুরি সচেতন মনের কার্যকলাপের প্রতিফলন। প্রধানতঃ বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মানস-কথনের রীতিকে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন।

ডি-এইচ্-লরেন্সেকে অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসু অসূর্যম্পশ্যা, একদা তুমি প্রিয়ে প্রভৃতি কিছু কিছু বইতে ইম্প্রেসনিজম্ (Impressionism) নামক রীতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণতঃ বিশেষ ধরণের রূপকল্প সৃষ্টিতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। এই রীতির উদ্দেশ্য হল পরিবেশ চরিত্রের মনে সঙ্গে সঙ্গে যে অনুভূতি পারম্পর্য-সৃষ্টি করে তাকে প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরা। যে-লেখকের কবি-সুলভ মন আছে, তাঁর পক্ষেই এই মানস-প্রতিবেদনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলি তুলে ধরা সম্ভবপর। বুদ্ধদেব বসু লরেন্সের অনুবর্তন

করে উপন্যাসে মনোবিকলনের পদ্ধতিও (psycho-analytic method) প্রয়োগ করেছেন। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল গভীর মনের জটিলতাকে এবং যুক্তি-বর্জিত ক্রিয়াকলাপকে আভাসিত করা।

এ-কালের বাংলা উপন্যাসে উপরোক্ত ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এতকাল পর্যন্ত আমরা সামাজিক মানুষকে উপন্যাসে বিধৃত করতে চেষ্টা করেছি। বিংশোত্তর যুগেও এ প্রচেষ্টার কিছু যে অভাব আছে তা নয়, কিন্তু পাশাপাশি আমরা আর এক ধরণের প্রয়াস দেখতে পাই: একটি সামাজিক সত্তা হিসাবে ব্যক্তিকে নয়, একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা হিসাবে ব্যক্তিকে উদ্‌ঘাটন করা। ব্যক্তি এখানে সামাজিক অর্থে ভাল বা মন্দ, সৎ বা অসৎ নয়। ব্যক্তি একটি অতি জটিল মানস-যন্ত্র, যে পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে একটি নিজস্ব মানসজগৎ রচনা করে তার মধ্যে বাস করে। মানস-জগতে সে আনন্দ পায় বা দুঃখ পায়, কিন্তু এই নিজের গড়া জগৎ থেকে তার নিস্তার নেই।

সুতরাং পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব এ-যুগের উপন্যাস একটি মৌলিক পরিবর্তনের পথে পা বাড়িয়েছে। কাহিনী এবং চরিত্র অবশ্য এখনো উপন্যাসে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে; কিন্তু তাদের সংজ্ঞা পাল্টিয়ে গিয়েছে। এখন আর আমরা বাইরের মানুষটাকে নয়, ভিতরের মানুষটাকে জানতে চেষ্টা করছি; কাজেই কাহিনীর দৃশ্যমান অংশ খুবই নগণ্য, আসল কাহিনী মানুষের অন্দর-মনের ঘটনা যাকে আমরা প্রচলিত অর্থে কাহিনী বলতেই সঙ্কুচিত হব।

কোথাও কোথাও দেখতে পাব উপন্যাসটি পরিচিত বাস্তববাদী ঢঙে লিখিত বটে; কিন্তু চরিত্রগুলি আসলে এক একটি দার্শনিক ভাবের প্রতিভূ মাত্র, এবং কাহিনীও তাই। বিশেষ করে অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিশেষত্বটি লক্ষণীয়। কোথাও আবার এমনও দেখতে পাব, চরিত্র আসলে একটি মনস্তাত্ত্বিক টাইপ; কাহিনী শুধু একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্‌ভাবিত।

এ যুগের বাস্তববাদী উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাব কাহিনী ও চরিত্রের পূর্বযুগীয় ধারণা অব্যাহত নেই। কাহিনী এবং চরিত্র এখন একটি সমাজ ব্যবস্থা বা পরিবেশকে বোধগম্য করার জন্য পবিকল্পিত হয়েছে। সুতরাং তারা- একটি প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বকে অর্থময় করে তোলার জন্য পরিকল্পিত; তাদের

কোন নিজস্ব মূল্য নেই, সেই প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বকে তারা কতখানি আলোকিত করতে পারছে তার উপরই তাদের মূল্য। বঙ্কিমের কাছে রোহিনী পাপিষ্ঠা, কি পাপিষ্ঠা নয়, এ প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে রোহিনী ভাল, না মন্দ, এটা কোন প্রশ্ন নয়; যে সমাজ-ব্যবস্থা রোহিনীকে সৃষ্টি করেছে, সেইটে ভাল না মন্দ, তা বরং আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় এই, যে-কালে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, ব্যক্তির মুক্তির উচ্চকণ্ঠ দাবীতে মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার ভিৎ নড়ে উঠেছে, সেকালের উপন্যাসে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে চলেছে। উনিশ শতকের সেই বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ও নারীগণ—প্রতাপ-শৈবালিনী, সীতারাম-রাজসিংহ, শিবাজী-প্রতাপসিংহ—একালের জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকে দেখতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি মানস শুধু কতকগুলি সাময়িক অনুভূতি-পারম্পর্যের ফেনা-মাত্র, অথবা এক প্রহরী-বেষ্টিত শ্বাপদ-শঙ্কুল অরণ্য-মাত্র। বাইরে থেকে দেখতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যক্তি এক অতিকায় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নাট-বল্টু-মাত্র; তার শারীরিক অস্তিত্বই শুধু সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নয়, তার মানসিক অস্তিত্বও সমাজ-নির্মিত। বোধ করি এই বৈপরীত্যের প্রয়োজন আছে; আমরা যখন ব্যক্তির মুক্তি দাবী করছি, তখন ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার।

বিংশোত্তর যুগের গুরুত্ব

এ-কালের বেশ কয়েকজন লেখকের মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা যুগ-পরিবর্তন কালের লেখক; পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে-ধরণের যোগ্যতা থাকা দরকার তা তাঁদের ছিল। তাঁরা প্রচণ্ড চমক সৃষ্টি করেছিলেন; আর-তার ফলে যে অনুকূল এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের বাজারে একটি প্রচণ্ড কলরব সৃষ্টি করেছিল। নদী যখন দিক্ পরিবর্তন করে তখন জলের উচ্ছ্বাস এবং পাড়ের ভাঙন একটু বেশী পরিমাণেই দেখা দেয়।

সে-যুগের তরুণ লেখকেরা আজ বার্ধক্যের সীমায় উপনীত। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন; তাদের মধ্যে কিছু কিছু অপরিহার্য পরিবর্তনও নজরে না পড়বে এমন নয়। কিন্তু প্রথম আত্ম-প্রকাশ-কালের উৎকর্ষকে তাঁরা কোনদিন অতিক্রম করতে পারেন নি। অথচ স্বাভাবিক

কারণেই কুড়ি পঁচিশ বছর বয়সের তরুণের উপন্যাসে যত শক্তি, চমক, ও প্রতিশ্রুতিই থাক, তাতে অধিক বয়সের পরিণতি ও পূর্ণতা আশা করা যায় না। তার ফলে বাংলা উপন্যাসের প্রথম সারিতে আমরা যে পাঁচ ছ'টি নাম উল্লেখ করতে পারি, তাঁদের মধ্যে এ-যুগের কেউ স্থান পাবেন না।

তথাপি, এ-কালের লেখকরা যতখানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ততখানি পরিণত ফসল উপহার না দিলেও, তাঁরা বাংলা সাহিত্যে যে প্রবল গতিবেগ দান করেছিলেন সেজন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকব। 'কল্লোল' পূর্ববর্তী উপন্যাস এবং 'কল্লোল' পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান অনুভব করা যায়। এখন অনেকে উনিশ শতকীয় রীতিতে ফিরে যেতে চাইলেও আমরা বুঝতে পারি মাঝখানে একটা বিরাট ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে। তারা-শঙ্কর, মানিক, মনোজ, বনফুল প্রভৃতি লেখকগণ তো প্রকৃতপক্ষে বিংশোত্তর যুগের ছায়া-পুষ্ট। যাযাবরী চিন্তা, আদিমতা-প্রীতি, মানস-কথন, প্রাকৃত-বাদ—প্রভৃতি যে-সকল রীতি ও প্রবণতা পরবর্তীকালে গুরুত্ব অর্জন করেছে তার বীজ লুক্কায়িত রয়েছে বিংশোত্তর যুগের সাহিত্য-প্রয়াসগুলির মধ্যে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ শতকের শিল্পে সাহিত্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়েছে। নানা রীতি নানা প্রবণতা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা চলেছে; বাংলা দেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। পূর্ববর্তী যুগে এই অস্থিরতার কিছু কিছু আভাস অনুভব করা গেলেও প্রকৃত পক্ষে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সাহিত্যেই তা একটি প্রচণ্ড আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই অস্থিরতা, এই পরিবর্তনশীলতা যে নিছক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল এ-কথা মনে করা ভুল। অর্থনৈতিক ভিত্তি সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর একটি সীমাবদ্ধতা আরোপ করে যাকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিল্পে সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক জগতের আভ্যন্তরীণ আলোড়ন ও গতিবেগের ফলেই সম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্যে তৎকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার চাপ অনুভব করা যায়। কিন্তু সাহিত্যে নতুন জমি কাটার তাগিদ যদি না থাকত, যদি বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের চিত্তকে নাড়া না দিত, সর্বোপরি বিশ শতকের চিন্তাজগতের তিন জনক—ফ্রয়েড, আইনস্টাইন ও মার্কস,—যদি যথাকালে না জন্মগ্রহণ করতেন, তবে যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্য যা হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চয়ই হতে পারত না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষট্-প্রধান (দি বিগ্ সিক্স)

বিংশোত্তর সাহিত্যিকগণের মধ্যে ছ'জন বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রথম আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির আসন লাভ করেন। বোধ করি বাংলা-দেশের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট যে যাঁরা খ্যাতিলাভ করবার তাঁরা প্রথম আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। মাইকেল; বঙ্কিম, গিরিশ, দীনবন্ধু, শরৎ প্রমুখ লেখকগণ প্রথম আবির্ভাবের আকস্মিক বিদ্যুৎ চমকেই পাঠকের হৃদয় রাজ্যে আসনলাভ করেছেন। তুলনায় বরং রবীন্দ্র-নাথের খ্যাতি একটু মন্থরগামী। এই ব্যাপারে বিংশোত্তর লেখকগণ বাংলা-দেশের পূর্বতন ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

প্রথম আবির্ভাব লগ্নে এই লেখকগণ বাংলাদেশে একটি প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাতে পেরেছিলেন; এবং সেই বিতর্কই তাঁদের খ্যাতির শিখরে তুলে দেয়। এর মধ্যেও অবশ্য নূতনত্বের কিছু নেই। বস্তুতঃ উপরে উল্লিখিত মাইকেল বঙ্কিম শরৎ প্রভৃতি লেখকগণও যে দ্রুত খ্যাতি লাভ করতে পেবেছিলেন তারও কারণ তাঁরা সার্থকভাবে একটি বিতর্ক বা চিন্তাদ্বন্দ্বের অবতারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লঘুভাষায় এই কৌশলটার নাম দেওয়া যায় শকথেরাপি। কালক্রমে তরুণ বাঙালী লেখকগণ দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনের এই গোপন রহস্যের কথা এত ভাল ভাবে জেনে গিয়েছেন যে তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী মাত্রই এই শক্-থেরাপিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। তারই ফলে, 'হাংরী জেনারেশান' ও 'অস্তিবাদী'দের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলাদেশে।

বিংশোত্তর লেখকগণ যে বিতর্কের অবতারণা করেন তা সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েডীয় প্রভাবের ফলে তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী দৈহিক সচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তেমনি আবার সাম্প্রতিক লেখকদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁদের লেখাকে পিউরিটানিক ঘেঁষা বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। এই

বিতর্কের ব্যাপারটিকে আমি একটি সাময়িক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করছি। লেখক যে-কালে সাহিত্য রচনা করেন সে-কালের পাঠক সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক, ও নৈতিক প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারেন না বলে এই ধরণের বিতর্কগুলি স্বাভাবিক কারণেই দেখা দেয়। ঐতিহাসিকের পক্ষে এ-সব সাহিত্য বহির্ভূত প্রশ্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এ-প্রসঙ্গের আলোচনায় অধিক অগ্রসর হয়ে কালক্ষেপ করতে চাই না।

এ যুগের ছয় প্রধানকে আমি দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছি। যাঁদের মধ্যে রোমান্টিক মনোভাব এবং বুদ্ধি-ধর্মিতা প্রধান তাঁদের মধ্যে পড়ছেন—বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার এবং প্রবোধ সান্যাল। যাঁরা প্রাকৃতবাদ ও বাস্তববাদকে প্রধানতঃ উপজীব্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শেষোক্ত লেখকদ্বয়ের আলোচনা পরের পবিচ্ছেদের জন্য মুলতুবি রাখছি।

ষট্-প্রধানের মধ্যে কে বড় কে ছোট নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এক সঙ্গে এতজন শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি তাঁদের মধ্যে একজনও পূরণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অল্প বয়সে খ্যাতি অর্জন করার একটু বিপদ আছে। তাতে লেখক সহজ আত্মসন্তুষ্টির বশীভূত হন বলে তাঁর মধ্যে প্রয়াসে শিথিলতা দেখা দেয় এবং অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তিনি নিজের জনপ্রিয়তার জালে জড়িয়ে পড়েন এবং বারবার অসংখ্যবার নিজেকে নিজে অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেন। আলোচ্য লেখকদের মধ্যে অবশ্য সীমিত ক্ষেত্রে ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা না যায় এমন নয়, কিন্তু ক্রম-পরিণতি বিরল-দৃষ্টি। ইংরাজী ভাষায় 'ট্যালেণ্ট' আর 'জীনিয়স' কথা দুটির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তার জের ধরে বলা যায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত ট্যালেণ্টই থেকে গিয়েছেন, জীনিয়সের শিখর দেশকে তাঁরা শুধু দূর থেকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন মাত্র।

বুদ্ধদেব বসু

ষট্-প্রধানের মধ্যে মূল্যগত তারতম্য নিরুপণ করতে আমি অক্ষম ও অনিচ্ছুক (কারণ তাঁরা সবাই এখনো জীবিত); তবে এক হিসাবে বলা চলে যে বুদ্ধদেব বসু এ যুগের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্ব-মূলক লেখক। তাঁর মধ্যে এ কালের যুগ-বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাধিক মাত্রায় প্রকাশিত। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে গৃহীত কল্প-

কৈবল্যবাদের নীতিতে আজও অনুরক্ত। বুদ্ধিধর্মিতা প্রসূত সূক্ষ্ম অথচ শানিত ব্যঙ্গ প্রয়োগে, রোমান্টিক (নাগরিক অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ) সংবেদনশীলতায়, ইম্প্রেসনিষ্টিক বা অনুভূতি-ব্যঞ্জক রচনা রীতিতে, ভাষার আধুনিকীকরণে এবং সর্বোপরি যৌন-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর অবতারণায় ও রাজনীতি-ও সংস্কার-বিমুখতায় তিনি এককভাবে এ যুগের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এ যুগে তাঁর মত শিল্পের প্রতি অনন্য-নিষ্ঠা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। শিল্প চর্চা বা সৌন্দর্য পূজাকে তিনি জীবনের ধ্যান জ্ঞান বলে গণ্য করেছেন। শিল্প-চর্চার পিছনে তাঁর অন্যতর কোন সামাজিক নৈতিক বা আত্মিক উদ্দেশ্য নেই ; শিল্পতেই শিল্পের শেষ। শিল্প তাঁর কাছে নিরীশ্বরবাদীর ভগবান। কিন্তু বোধকরি সেইজন্যেই তাঁর কাছে শিল্পের ক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ। যে জীবনকে অবলম্বন করে শিল্প গড়ে ওঠে, সেই জীবনকে উপেক্ষা করে তিনি শিল্পকে একমাত্র উপজীব্য করার অসম্ভব চেষ্টা করেছেন। তার ফলে জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়কে পরিহার করে তিনি একই সামান্য বিষয়বস্তু নিয়ে পৌনঃপুনিক গতিতে জাবর কেটে চলেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য-কর্ম সংখ্যায় বিপুল, বৈচিত্র্যে নয়। তাঁর প্রথম যুগের রচনা থেকে শুরু করে তাঁর শেষ জীবনের পরিণত ফসল পর্যন্ত এক সঙ্গে অবলোকন করলে প্রথমেই মনে হবে কত দীর্ঘ বছর ধরে কত সামান্য পথ তিনি অতিক্রম করেছেন। তাঁর পূর্বাপর সাহিত্যের মধ্যে এক স্থাবর পরিবর্তন-ভীরু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে তিনি একটি নিটোল সৌন্দর্য-জগৎ রচনা করতে চেয়েছেন এবং তাতে বহুলাংশে সফলও হয়েছেন। এই সাফল্যের জন্য তিনি প্রধানতঃ নির্ভর-করেছেন ভাষার উপর। বাংলা ভাষার উপর বুদ্ধদেবের দখল অসাধারণ। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করে ভাষার প্রয়োগ-ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। ইংরেজী ভাষার অনুকরণে বাক্যের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, ইংরেজী Clause (=বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর বাক্য)-এর অনুরূপ প্রয়োগ প্রভৃতির সাহায্যে তিনি বাংলা বাক্য গঠন রীতিকে আরও নমনীয় করে তুলেছেন। ভাষায় সুসম ধ্বনি-বিন্যাস এবং যতি ব্যবহারের দিকে তাঁর গভীর মনোযোগ। সংস্কৃত প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ রচনা করে সেই শব্দকে ধ্বনি-বৈষম্য না ঘটিয়ে দেশজ শব্দের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ। তাঁর ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা অপেক্ষাও মুখে মুখে ব্যবহৃত

ভাষার আরও কাছাকাছি। অথচ তথাপি এই ভাষা সর্বদাই পরিপাটি এবং পরিমার্জিত। তাঁর ভাষার যেমন নিটোল ধ্বনি মাধুর্য, তেমনি যথাযথ গভীর অর্থ-বহ শব্দ ব্যবহারেও তিনি সুনিপুণ। তাঁর ভাষার মধ্যে বেখাপ্পা সামঞ্জস্য-হীন বা অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার কদাচিৎ-ই লক্ষ্য করা যাবে। অতিশয়োক্তি অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা তাঁর রোমান্টিক মানসের অভীপ্সা অনুযায়ী।

ভাষার উপর এই আধিপত্য রয়েছে বলেই বুদ্ধদেবের পক্ষে ইম্প্রেসানিষ্টিক বা ইমেজিষ্টিক (রূপকল্প প্রধান) রচনারীতি উপন্যাসে ও কাব্যে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। নায়ক বা নায়িকার বিভিন্ন সময়ের অনুভবকে যথাযথ ভাবে অবিকলভাবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। এ জন্য তিনি প্রয়োজন মত রূপকল্প ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহাব করেন। এখানে উল্লেখ্য যে নায়ক নায়িকার চিন্তাধারা বা মানস কথনকে উপস্থাপিত করা বুদ্ধদেবের রীতি নয়। তাঁর লক্ষ্য হল নায়ক নায়িকার অনুভূতি পারম্পর্যকে সূক্ষ্মভাবে যথাযথভাবে রূপ দেওয়া। নায়ক নায়িকার কাছে এই অনুভূতি পারম্পর্যের অনেকখানিই ভাষার অতীত ; লেখক তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে তাকে ভাষারূপ দান করছেন। ফরাসী কবি বদ্‌লেআর মালার্মে এবং পল্ ভ্যালেরির একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন যে শব্দ বিন্যাসের জাদুরই অপর নাম সাহিত্য। লেখকের মনে কোন অনুভূতি না থাকলে কোন ক্ষতি নেই ; কথা সাজানোর কৌশল যদি তিনি আয়ত্ত করতে পারেন তবে পাঠকের মনে তিনি অনুভূতি সঞ্চার করতে পারবেন। গণিতের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান করা আর কাব্য রচনা করা প্রায় একই কাজ। বুদ্ধদেবের নিজের ভাষায়— "সেই কবি—যিনি তাঁর সনেটের ত্রয়োদশ লাইন আজ লিখলেন, তৃতীয় লাইন পরের মঙ্গলবার, একমাস পরে নবম লাইন, আর এমনি করে রচনা করলেন একটি বেগবান, অমোঘ বহুলাঙ্গ কবিতা—সেই কবিকে পাবার জন্য আমরা কী না দিতে পারি!" [হৃদয়ের জাগরণ পৃঃ ৬] সুতরাং সন্দেহ নেই, যে বুদ্ধদেব সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মানুষ হলেও তাঁর সাহিত্য রচনার পিছনে একটি বিচারশীল বুদ্ধি কাজ করছে।

বুদ্ধদেবের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রায় যে কোন বই খুললেই পাওয়া যাবে। আমি এখানে দুটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি :

সাগর দুই হাত বাড়াইয়া দিতেই সমস্ত আকাশ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ; তাহার শরীরে রাত্রির স্পর্শ, তাহার চেতনায় বিশ্বের চুম্বন ; হাওয়ার উষ্ণতা

তাহার রক্তে, তারার আবর্তন হৃৎপিণ্ডে। ঐ চুল তো আকাশের অন্ধকার, ঐ সাদা শাড়ী তো ছায়াপথ—আর সে, সে-ই তো ঐ আকাশ, এই রাত্রি, আর হাওয়ার এই অসম্ভব উদ্দামতা, চিত্ত তার রুদ্ধ, সত্তা লুপ্ত, অন্তহীন মুহূর্ত, চিরন্তন জীবন। এই উন্মাদ বিশ্ববিদারণ যাত্রার কি শেষ নাই, কখনো কি শেষ নাই, কোনখানে সীমা নাই? কিন্তু শেষ আছে, সীমা আছে, আশ্রয় আছে হ্যারিসন রোডের ফুটপাথের পাথরে।

(সাড়া—পৃঃ ২২৪)

'ছুটির দিনের শাঁ শাঁ দুপুর বেলায় হঠাৎ মাঝে মাঝে কী এক আশ্চর্য ভাল-লাগা ছড়িয়ে পড়ে—সিনেমা বেড়ানো হৈ চৈ, আর কিছুতেই তো সে রকম হয় না—আর তাই যদি না হলো, যত ভালোই হোক, কিছুই কি ভালো? আকাশ গান করে তাব কানে কানে, পৃথিবীটাই বেলগাড়ি, স্টেশন নেই, কেবল চলছে, দিনে রাত্রে কখনো থামে না গান। আমরা শুনিনা, কেউ শোনে না, আমি শুনি শুধু, আর শুনি যদি, সব মময় শুনি না কেন?'

(তিথিডোর—পৃঃ ৬৪)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে প্রথম দিকে প্রথম পুরুষের ব্যবহার এবং শেষের দিকে উত্তম পুরুষের ব্যবহার লক্ষণীয়।

বুদ্ধদেবের এই ভাষা-সম্পদ তাঁর রোমান্টিক মনোভাব এবং কাব্যধর্মিতার সহায়ক। আবার এই ভাষার মোহ তাঁকে বহু ঘটনা পরিপূর্ণ কাহিনী রচনায় পরাঙ্মুখ করে তুলেছে। বস্তুত বাস্তবের অনুকল্প তথ্যসংগ্রহ করে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করতে বুদ্ধদেবের গভীর অনিচ্ছা। কাহিনীর একটি সামান্য রেখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, অনেক ঘটনা ও নাটকীয় দৃশ্যাদির অবতারণাকে তিনি অনাবশ্যক ভারবৃদ্ধি বলে গণ্য করেন। সেই জন্যই প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতে কাহিনীর অংশ প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। 'একদা তুমি প্রিয়ে' 'যেদিন ফুটল কমল' 'ধূসর গোধূলিতে' তিনটি চারটির বেশী দৃশ্য নেই; এবং সেই দৃশ্যগুলিকে বোধগম্য করার জন্য যথোপযুক্ত পশ্চাৎপট সৃষ্টিরও তিনি তেমন আবশ্যকতা বোধ করেননি। অবশ্য শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে তিনি সতর্কভাবে প্রাকৃতবাদী রীতি অনুসরণ করেছেন বলে ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে সংযোগ-সূত্রের যথাযোগ্য বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। 'তিথিডোর' বইখানি তো রীতিমত ঘটনাবহুল—একের পর এক অনেকগুলো ক্ষুদ্র দৃশ্যের

সমাবেশ। এই দৃশ্যবাহুল্যের জন্যই বইখানি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হয়েছে। যদিও বুদ্ধদেবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বইখানিতে সেই পরিমাণে কম পরিস্ফুট।

বুদ্ধদেবের রোমাণ্টিসিজমের পরিধি সম্পর্কে আমাদের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা দরকার। বিস্ময়ের পুনর্জন্ম, আবেগ-অনুভূতির প্রাধান্য, বিষন্নতা, অনির্দেশ্য কামনা প্রভৃতি পরিচিত রোমাণ্টিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর রচনায় অনায়াসেই নজরে পড়বে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'তেই উক্ত সবগুলি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি রয়েছে। এমন কি পুলকের চরম মুহূর্তে মৃত্যুর অবোধ রোমাণ্টিক কামনার প্রকাশ দিয়ে এই বইয়ের কাহিনীর সমাপ্তি। কিন্তু রোমাণ্টিক মানস সাধারণতঃ প্রকৃতি-প্রেমিক, শহর ও কৃত্রিমতা বিরোধী। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব শহর-প্রেমিক, তিনি চাঁদের সৌন্দর্য দেখতে ক্লাইভ স্ট্রীটে যান। 'অকর্মণ্য' উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক এই ভাবে তার রচয়িতার মনোভাব ব্যক্ত করছে—"ব্রাউনিং-এর সঙ্গে সারাজীবন যাপন করলেও সে-কাব্য প্রতিদিন বিচিত্রতর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে ঐ প্রথম শুভদৃষ্টির মোহ একবার কাটিয়ে উঠলে তারপর তার মত ক্লান্তিকর, নিরানন্দ অসহ্য কিছু নেই।" (পৃঃ ১৬)। মনুষ্য নির্মিত কৃত্রিম সৌন্দর্যের জয়গানের মধ্যে অস্কার ওআইল্ডের অনুরণন শোনা যায়। প্রকৃতির বিশৃঙ্খল জটলা অপেক্ষা বুদ্ধদেবের কাছে ধনীগৃহের কৃত্রিম টব-সাজানো বাগান অধিক লোভণীয়। পল্লীগ্রামের ভাঙ্গাচোরা সনের ঘরে বুদ্ধদেবের নজর আকৃষ্ট হয় না, যদিও সেখানকার মানুষগুলো স্বভাবের অনেক কাছাকাছি। বিলাসী ধনীর ড্রয়িং রুমের মাপা-জোঁকা আসবাব-সমাবেশের সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে, যদিও তিনি ভাল করে জানেন সবই কৃত্রিমতা। সুচিক্কণ পারিপাট্যের আড়ালে কুৎসিত স্বার্থপরতা। বুদ্ধদেববাবুর কৃত্রিমতা-প্রীতি প্রায় স্বভাবজ; তাই নাগরিক সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে অনায়াসে কাব্যানুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম।

বুদ্ধদেব বসুর, তথা তাঁর কালের লেখকদের, নগর-প্রীতি এবং দেশের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতি মোহ অবশ্য খুব যুক্তি-সঙ্গত ঘটনা। তাঁর কালের গ্রাম-বাংলা ছিল রক্ষণশীলতা কূপমণ্ডুকতা এবং জড়ত্বের প্রতীক যার পরিচয় শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বইতে সুপ্রকাশ। প্রকৃতি প্রেমের নামে সেই অন্ধকারের দিকে রোমাণ্টিক মানসের পক্ষেও দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব ছিল না। শহরে তবু কিছু আলো ছিল, কিছু ঔজ্জ্বল্য ছিল, কিছু ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনা ছিল।

দেড়শ' বছরের যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি দেখে ইউরোপের যে মোহমুক্তি ঘটেছিল, যান্ত্রিকীকরণের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান বাংলাদেশের একজন লেখকের সেই মোহমুক্তি আশা করা সঙ্গত নয়। সুতরাং পাখির কাকলি বা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে নয়, কারখানার ভেঁপু ও ঘড়-ঘড় শব্দের মধ্যে বুদ্ধদেব সঙ্গীতের আভাস পান।

সুতরাং বুদ্ধদেবের সুদূরের আকুতি ড্রয়িংরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের মত উপনিষদীয় তত্ত্বে আস্থাবান হতে পারতেন তবে অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যে তাঁর রোমান্টিক আকুতি মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারত। কিন্তু বিজ্ঞান ও জড়বাদের দীক্ষাকে অস্বীকার করে সেই সহজ বিশ্বাসকে অবলম্বন করাও সম্ভব ছিল না। যদি তিনি শেলীর মত বিদ্রোহ-প্রবণতাব কবি হতে পারতেন, বা ডি-এইচ্ লরেন্সের মত আদিমতায় প্রত্যাবর্তনের অনুরূপ কোন তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারতেন; তবু তাঁর রোমান্টিক কল্পনা হয়তো সুদূব ভবিষ্যৎ বা সুদূর অতীতের কোন অসম্ভব কল্পনার মধ্যে স্থিতিলাভ করতে পারত। কিন্তু বুদ্ধদেব জন্ম-ভীরু লেখক; বিদ্রোহাত্মক বলিষ্ঠ উদ্দাম কল্পনা তার আয়ত্বের বাইরে। তাব উপন্যাসের নায়কদেব মতই তিনি দেহে এবং মনে দুর্বল। তাঁর সংবেদন-শীলতার সঙ্গে দুর্বলতার এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। তার দুর্বলতার অনুভূতি অক্ষমতার গ্লানি থেকে আত্মরক্ষাব বর্ম। কাজেই বিদ্রোহাত্মক পথেও তাঁর রোমান্টিক মানস আত্মবিস্তাবেব সুযোগ পায়নি।

রোমান্টিক মানস অবাধে পক্ষবিস্তার করতে ভালবাসে। কিন্তু কোন পথেই বুদ্ধদেব মানস অবাধ বিচরণের সুযোগ না পেয়ে অবশেষে যৌন-প্রেমের মধ্যে একান্ত-ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। তাঁর দু'একটি ছোট গল্প ব্যতীত অধিকাংশ গল্প এবং সমস্ত উপন্যাসই প্রেম বা প্রেম-জনিত বিকার বা বিকৃতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও তাঁর সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত প্রকট। ফ্রয়েডীয় জড়বাদী ব্যাখ্যার প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব কবিদের মত ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি জানেন যৌন-প্রেমের উপর যুগ যুগ সঞ্চিত মহত্ত্বের প্রলেপ একটি আরোপিত ব্যাপার মাত্র; আসলে প্রেমের আকুলি বিকুলি অবদমিত যৌন ক্ষুধার প্রকাশ মাত্র। সুতরাং বুদ্ধদেব প্রেম যে নিতান্ত দেহজ ব্যাপার এ কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন; এবং এই ঘোষণার মধ্যে খানিকটা

বিদ্রোহাত্মক আনন্দও লাভ করেছেন, কারণ বাঙ্গালী পাঠক এই অনভ্যস্ত কথা শুনে 'গেল গেল' বলে শোরগোল তুলেছিল। বুদ্ধদেববাবুর অবরুদ্ধ যৌন-কেন্দ্রিক রোমান্টিসিজমের তিনটি বিশেষত্ব—সিনিসিজম্, বিষণ্ণতা-বোধ এবং মৃত্যু-কামনা।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বুদ্ধদেববাবুর প্রথম জীবনের উপন্যাস-গুলির কোন কাহিনীই সম্পূর্ণ নয়। ক্রম-বিকাশ নেই; পরিণতি নেই; শুধু কয়েকটি অধ্যায়ের সমষ্টি-মাত্র। শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে তিনি একটি কাহিনীগত সম্পূর্ণতা আনতে পেরেছেন বটে, কিন্তু ভাবগত অসম্পূর্ণতা নজর এড়ায় না। শিল্পকৈবল্যবাদেব সাধক যে তাঁর শিল্পকর্মকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিল্পরূপ দিতে পারেননি তার কারণ তাঁর রোমাণ্টিক আকুতি কোন বন্দরে গিয়ে পৌছায়নি।

কিন্তু যত সীমাবদ্ধতাই থাক, বাংলা সাহিত্যের মোড় পরিবর্তনে তাঁর কালের আর যে কোন লেখক অপেক্ষা বুদ্ধদেবের অবদান বেশী। এতদিন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল অতীতের সমাজ। যে সমাজ ক্ষয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, অবলুপ্তির পথে চলেছে—সেই জরা-গ্রস্ত সমাজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্যই এতকাল পর্যন্ত লেখকেরা কলম ধারণ করেছেন। বুদ্ধদেব সাহিত্যে আমদানী করলেন যে-সমাজ আসি-আসি করছে, এখনো ভাল করে আসর জাঁকিয়ে বসেনি, সেই অনাগত সমাজকে। তিনি আমদানি করলেন ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ। জমিদার তন্ত্রের আভিজাত্যের বদলে ধনতান্ত্রিক আভিজাত্যকে তিনি প্রণাম জানালেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ঘেঁটে তিনি নিয়ে এলেন নীতি-বর্জিত যৌন-অস্থিরতা ও যৌন-বিকৃতির সেই চিত্র যা নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতাব অবিচ্ছেদ্য সহচর।

বুদ্ধদেববাবুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'তেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর অনস্বীকার্য। অনেকের মতে 'সাড়া' তাঁর প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু 'সাড়া' উপন্যাস-খানি কোন অধ্যায়ের শুরু নয়; বরং একটি অধ্যায়ের শেষ। এই বইখানিতে বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র খুব স্পষ্ট। সাধু ভাষায় লেখা এই উপন্যাসে ভাষার উপর লেখকের আধিপত্য সুপ্রকাশ, তবু এই ভাষার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। প্রকৃতির বর্ণনায় নায়ক নায়িকার মানসিক অবস্থাকে আরোপ করার কৌশলটিও রবীন্দ্রনাথ থেকে গৃহীত। কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিও কম-বেশী পূর্বানুসারী।

বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সমস্ত নায়ক চরিত্রই (দু'একটি ক্ষেত্রে, নায়িকা চরিত্রও) রুচি, শিক্ষা এবং মানসিকতার দিক থেকে বুদ্ধদেব স্বয়ং। বুদ্ধদেবের কবি-প্রকৃতি নিজেকে নেপথ্যে রেখে নির্লিপ্তভাবে চরিত্র ও ঘটনা সমাবেশ করতে অক্ষম। অবশ্য অন্যত্র তিনি নায়ক চরিত্রকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক পরিবেশ ও সমস্যার মধ্যে স্থাপন করেন বলে আত্মচরিত্রের সঙ্গে তার একাত্মতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কিন্তু 'সাড়া' উপন্যাসটি বহুলাংশে আত্মজীবনী-মূলক। নায়ক সাগরের বাল্যকাল, তার শিক্ষাজীবন, উয়াড়িতে তার পৈতৃক বাসভবন প্রভৃতির সঙ্গে লেখকের নিজের জীবনের ঘটনাবলীর কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে বলে আমার বিশ্বাস।

উপন্যাসটিতে সাগবেব বাল্যজীবনের বিবরণ জ্ঞাপক ছোট্ট অধ্যায়টি সবচেয়ে মূল্যবান।

বাংলাদেশে একমাত্র 'পথের পাঁচালি'র অপুব কাহিনী ছাডা এর চেয়ে সার্থকতব বাল্যজীবনেব চিত্রাঙ্কণ আব দেখা যায় না। এক স্বপ্নাতুর রোমাণ্টিক বালক নিজের ভীরুতা ও দুর্বলতাব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। প্রতি পদে পদে জীবনযাত্রাব ছোট ছোট সমস্যাগুলিব সমাধানেব জন্য সে অন্যের উপব নির্ভর-শীল তা সে জানে। অথচ সে সুদূরেব পিয়াসী। এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-চূড়ায় কুয়াসা-ঘেবা একটি মূর্তি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু কী করে সে তাব কাছে পৌছবে? পবিণত বুদ্ধদেবেব এই বোমাণ্টিক আকুতির বাল্য-রূপ বালক সাগবেব কাহিনীতে বিবৃত।

সাডা উপন্যাসটি সাগবেব যাযাবরী প্রেম জীবনেব ইতিহাস। তার প্রথম প্রণয়িনী মা, দ্বিতীয় প্রণয়িনী বাল্য সাথী লক্ষ্মী, তৃতীয় একটি কুসুমশায়িতা নারীর ছবি, চতুর্থ ড্রয়িংরুম-অধিষ্ঠাত্রী পত্রলেখা, পঞ্চম স্ত্রী মণিমালা, ষষ্ঠ বারবণিতা নির্মলা, সপ্তম বাবে বিবাহিতা লক্ষ্মী পুনঃ প্রত্যাবর্তনের রাত্রিতে উত্তেজিত পুলকিত সাগরের ছাদ থেকে পতন ও মৃত্যুতে কাহিনীর শেষ। এতগুলি অধ্যায় একটি স্বল্প কলেবর বইয়ের মধ্যে সংগ্রথিত হয়েছে বলে উপন্যাসটি অনেকটা রেখাচিত্রেব রূপ লাভ করেছে। লেখক কেবল নায়ক চরিত্রেব মানস-পট উদ্ঘাটনেই ব্যস্ত। আর সব চরিত্রগুলি ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা রূপ নিয়ে চারপাশে ভীড করে রয়েছে।

নায়ক চরিত্রের মানস-পটেরই কি কোন যথেষ্ট সম্পূর্ণ পরিচয় পাই? এক অনির্দেশ্যের পানে নায়কের যাত্রা, জীবনের কোন ঘাটেই সে নীড় বাঁধতে

পারছে না, কোন মানুষের মধ্যেই সে তার অস্থির মনের পুরো সাযুজ্য খুঁজে পাচ্ছে না, এই রোমান্টিক আকুলতার চেয়ে বেশী কিছু সাগর চরিত্রে প্রকাশিত হয়নি। বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের নিষ্ঠুর রক্তাক্ত ইতিহাস—যা এ ধরণের নায়কের প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা—তার প্রায় কোন আভাস লেখক দেননি। বইখানি তাই লিরিক-ধর্মী—একটি একতারা যন্ত্র। অনেক তারের সমাবেশে এখানে হার্মনি রচিত হয়নি। তথাপি বইখানা বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে অন্যত্র সাক্ষাৎ মিলতে পারে, কিন্তু সাগর বাংলাদেশে নতুন।

সাগরের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে লেখকের রোমান্টিক মৃত্যু-কামনার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনা কাহিনীকে স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা দান করেনি। আমি আগেই বলেছি বুদ্ধদেবের শিল্পকর্মে সম্পূর্ণতা নেই—লেখক মানসের উদ্দেশ্যহীনতা ও লক্ষ্যহীনতার দরুণ।

পরবর্তী বইগুলিতে লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। অকর্মণ্য (১৯৩১) অনেকরকম, সানন্দা, লাল মেঘ প্রভৃতি কতকগুলি কমেডি-ধর্মী বইতে লেখক সর্বপ্রযত্নে আবেগ ও চিন্তার গভীরতাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। ড্রয়িংরুম-কেন্দ্রিক এই বইগুলোতে অস্কার ওআইল্ড এবং 'ক্রোম ইয়েলো' (Crome Yellow)-র লেখক আল্‌ডুস হাক্সলির প্রভাব সুপরিস্ফুট। বইগুলো মূলত নায়ক নায়িকাদের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বৈঠকের সমষ্টি। কোন ধারাবাহিক কাহিনী নেই, কোন কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব বা সমস্যা নেই; বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলিতে দৈবক্রমে একই নায়ক-নায়িকারা অংশগ্রহণ করেছে মাত্র। একটি রোমান্টিক প্রেমের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অধ্যায়গুলিকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, কিন্তু প্রেম কোন উলেখযোগ্য সমস্যা সৃষ্টি করেনি। তীক্ষ্ণ শানিত সংলাপ, প্রচ্ছন্ন অথচ ধারালো ব্যঙ্গ, প্যারাডক্সের সুচতুর ব্যবহার প্রভৃতি বুদ্ধি-প্রধান পাঠকের কাছে অধ্যায়গুলিকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। ওআইল্ড বা হাক্সলির চরিত্রদের মত এখানেও নায়ক নায়িকারা ভাল ভাল তত্ত্বমূলক কথা বলতে ভালবাসে, যে তত্ত্বগুলো প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসের পরিপন্থী।

'অকর্মণ্য' উপন্যাসটি নায়ক শশাঙ্ক, তরুণ অধ্যাপক জ্যোতির্ময়, দুই বোন রিণি ও অনুসূয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথমে রয়েছে ড্রইংরুমের বৈঠকী আলাপ এবং পার্টির বিবরণ। তারপর রয়েছে একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে চারজন চারটি গল্প রচনা করল তার বিবরণ। তৃতীয় পর্যায়ে রিণির

ডায়েরি থেকে শশাঙ্কর প্রতি তার রোমান্টিক আকর্ষণের প্রকাশ-মূলক কিছু কিছু উদ্ধৃতি। শেষে লেখক সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছেন প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়ে রিণির সঙ্গে জ্যোতির্ময়েব এবং অনুসূয়ার সঙ্গে শশাঙ্কর বিয়ে হচ্ছে। লঘু পক্ষ বিস্তার করে হাল্কা আবেগে খুশির মেজাজ নিয়ে ফেনার মত জীবন-সমুদ্রের উপরিভাগে বিচরণ—এই হল এই পর্যায়ের বইগুলোর বিশেষত্ব।

পরবর্তী পর্যায়ের বইগুলোতে বুদ্ধদেবের সুরে গভীরতার স্পর্শ লেগেছে। ধূসর গোধূলি, (১৯৩৩) অসূর্যম্পশ্যা, (১৯৩৩) একদা তুমি প্রিয়ে, (১৯৩৪) বাসর ঘব, বিশাখা (১৯৪৫), এবং আরও অনেক বই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যাযেব কোন কোন বইয়ের উপর ডি-এইচ-লরেন্সেব প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; এমন-কি কোথাও কোথাও প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ নজরে পড়লেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। স্থানে স্থানে ইম্প্রেশনিষ্টিক ভাষা-রীতি ব্যবহারের প্রেরণাও খুব সম্ভব তিনি লরেন্স থেকেই লাভ করেছেন। অবশ্য যন্ত্র-সভ্যতাব বিরুদ্ধে লরেন্সের প্রচণ্ড ধিক্কার ও সমালোচনা বুদ্ধদেবের কাছে প্রত্যাশিত নয়। জীবনের প্রথম প্রহরেই বুদ্ধদেব এই যন্ত্রসভ্যতাকে, এই ধনতান্ত্রিক আভিজাত্যকে ভালবেসেছিলেন; এবং আজ পর্যন্তও সেই প্রথম প্রেমেব প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। সুতরাং লরেন্সের শুধু বহিরঙ্গগত প্রভাবকেই তিনি আত্মস্থ কবেছেন। কোন স্পষ্ট তত্ত্বচিন্তার অভাবে তিনি যখন আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছেন, যখন নিঃসঙ্গতা ক্লান্তি এবং বিষণ্ণতা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন কবেছে; যখন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানবিক মূল্যগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বিকৃতি এবং বিকারে পরিণত হচ্ছে, তখন তিনি তাব কোন কার্য-কারণ-সূত্র খুঁজে পান না। তাঁর কবি-মন ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাব যান্ত্রিকতাকেও অন্য অনেক লেখকের মত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ তাঁর নিজের মনেও কোন সুচিন্তিত ব্যাখ্যা দানা বেঁধে ওঠেনি। শুধু এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি তাঁর অভিজ্ঞতায় এসেছে এবং সেই অনুভবকে যথাযথভাবে নিখুঁতভাবে রূপদান করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। জীবনের কতকগুলি সংকটকাল তাঁর অভিজ্ঞতায় এসেছে, কিন্তু সেই সংকটগুলির পূর্বাপর তাৎপর্য তাঁর বোধের সীমার বাইরে। সুতরাং তাঁর এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যোগ-সূত্র বর্জিত উপযুক্ত পটভূমিকা-বর্জিত কতকগুলি অধ্যায়ের সমাবেশ ঘটেছে। এই অধ্যায়গুলি খুবই সার্থক রচনার নিদর্শন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে সংস্থাপিত নয় বলে পুরোপুরি

শৈল্পিক পরিতৃপ্তি যোগায় না। অবশ্য বুদ্ধদেবের এই অক্ষমতার মধ্যেই তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ। মিথ্যা কাহিনী রচনা করে তিনি পাঠককে ঠকাতে চাননি।

'একদা তুমি প্রিয়ে'-তে এক বিগত প্রেমকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। রেবার নারী হৃদয় প্রেমের অপমৃত্যুকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে রাজী নয়, কিন্তু শশাঙ্ক জানে যে জীবনে কোন কিছু হারিয়ে যাওয়াটা চূড়ান্ত। অবশেষে একটি রাত্রের এক সুতীব্র দুঃসহ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে রেবার মনে এই বোধ জন্মাল যে অপরিহার্যকে স্বীকার করে নিতে হয়। আর সেই সময়ে রেবার ছাত্রী প্রতিমা কিশোরী সুলভ কৌতূহল নিয়ে এদের লীলা পর্যবেক্ষণ করতে করতে শশাঙ্কর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। কাহিনীর শেষে প্রতিমাকে টেনে এনে লেখক কাহিনীর গাম্ভীর্যকে অনেকখানি খর্ব করেছেন। মৃত্যুর পরে নবজন্ম: এই নিয়ে জীবন-গতি,—এই সস্তা রাবীন্দ্রিক তত্ত্বে রবীন্দ্রোত্তর লেখকের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু মানুষের একদিনের ভালবাসা শত সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা সত্ত্বেও আর এক দিন কেন ফিরিয়ে আনা যায় না এর মধ্যে একটি আধুনিক যুগ প্রশ্ন বিধৃত হয়েছে।

অসূর্যম্পশ্যা'তে একটি খোলসে-আবদ্ধ নারীর নিজের মনের জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি বিকুলির চেষ্টা বিবৃত হয়েছে। এক ক্ষমতা-প্রিয় মায়ের প্রভাবাধীনে বড় হয়ে উঠে সে দেখতে পাচ্ছে মায়ের সৃষ্ট নাগপাশ তার মনের মধ্যে আসন গেড়েছে; নাগপাশ সে কেটে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পারে না। মাকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু মায়ের প্রভাবকে সে অতিক্রম করতে পারে না।

'ধূসর গোধূলি'তে কল্যাণকুমারের মধ্যে লেখক এক আশ্চর্য অশান্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডতার কাছে আশে পাশের সকলে যেন স্তম্ভিত। পড়াশুনাব সময়ে যে ভালত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে, বিদ্যার জগতের সমস্ত কৃতিত্ব অর্জন করে সে বিলাত গেল। অপর্ণাকে যখন সে ভালবাসল তখন সে ভালবাসার মধ্যে প্রচণ্ডতা ও আতিশয্যের অন্ত নেই। তারপর একদিন সে মিথ্যা সন্দেহের বশীভূত হয়ে সেই নয়নের মণি স্ত্রীর উপর মার-ধর করল। সে এক ধরণের উন্মাদ রোগগ্রস্ত হল যার লক্ষণ স্যাডিজম্ (পীড়নের ইচ্ছা)। কল্যাণকুমার এমন এক চরিত্র যার এক একটি অধ্যায় বিস্ফোরণের মত আকস্মিক। ঘটনাটি ঘটার পূর্বে তার মধ্যে যে এমন সম্ভাবনা আছে

তা কল্পনাও করা যায় না। সে যখন পড়ছে তখন ভাবা যায় না যে সে দুরন্ত প্রেমিক হতে পারে; তার এমন হৃত্ত প্রেম যে স্যাডিজমে পরিণতি লাভ করতে পারে তাও ভাবা যায় না। মানুষ এত ভাল, কিন্তু তার মধ্যে যে এমন রহস্যময় মারাত্মক সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে তা বর্তমান যুগের মানুষের কাছে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

আমার বিশ্বাস এই বইগুলির মধ্যেই বুদ্ধদেবের প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রকাশ লাভ করেছে। এই বইগুলোতে উপন্যাসের বাস্তববাদী কাঠামো একেবারে বর্জিত না হলেও, বাস্তববাদের মাপকাঠিতে বইগুলোর বিচার সঙ্গত হবে না। নিছক প্রতীয়মান বাস্তবকে উপস্থিত করা, বা পরিবেশ অনুযায়ী মানস প্রতিক্রিয়াকে বিবৃত করাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয়। কবি-সুলভ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে লেখক মানব-প্রকৃতির গভীরে অবতরণ করতে চেয়েছেন। এবং তার ফলে এ যুগে আমরা যে সব অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, লেখক কাল্পনিক পরিবেশের মধ্যে তারই কিছু কিছু উপহার দিতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য অভিজ্ঞতাগুলো যে বিশেষভাবে এ যুগেরই তা নয়; কিন্তু এ যুগেই অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। পঞ্চাশোত্তর যুগে বোধকরি পাঠক সমাজের মৌন দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেই বুদ্ধদেব বাস্তববাদী ঢঙে কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন। বিশুদ্ধ বাস্তববাদ বুদ্ধদেবের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়; কারণ তথ্যসংগ্রহ ও নিরাসক্ত তথ্য বিশ্লেষণ তাঁর কবি-হৃদয়ের অনুকূল কর্ম নয়। 'তিথিডোর' বোধকরি তাঁর সর্ববৃহৎ উপন্যাস। আর্নল্ড্ বেনেট-মার্কা পুরোপুরি প্রাকৃতবাদী রীতিতে বিলম্বিত লয়ে রচিত অম্লমধুর রস-সমৃদ্ধ সুখ-পাঠ্য পারিবারিক কাহিনী। মহিলা পাঠকদের কোমল হৃদয়ে যাতে ব্যথা না লাগে সে জন্য কোন বড় রকমের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বইখানিতে সংস্থাপিত হয়নি। দৈনন্দিনতার অজস্র ছোট ছোট দৃশ্যের সমাবেশে বইখানি নির্মিত। পারিবারিক জীবনের সুসম ছন্দে বাইরের হাওয়া এসে কোন প্রচণ্ডরকমের বিস্ফোরণ ঘটায়নি। মা-হারা কয়েকটি বোন এবং একটি ভাই কী করে বাপের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠছে কাহিনীতে তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ছোট মেয়ে স্বাতীর ক্রমবিকাশই লেখকের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু বস্তুর ভারে তার মানসিক ক্রম-বিকাশের ধারা অনেকখানি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মাত্র অল্প কয়েক পাতার মধ্যে সাড়া উপন্যাসে সাগরের বাল্যজীবন যতখানি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে,

এত দীর্ঘ পরিসরের মধ্যেও স্বাতীর বাল্য ও কৈশোর জীবন তা হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধদেবের পরিচিত ফরমুলা প্রফেসরের সঙ্গে প্রেমের মামুলি ঘটনা দিয়ে বইখানি শেষ হয়েছে। বইখানিতে লেখকের পরিমিতিবোধ, সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা, এক কথায় রচনা নৈপুন্যের ছাপ আছে। নিঃসন্দেহে বইখানি ইজিচেয়ারে শয়ান বৃদ্ধদের এবং মহিলা পাঠকদের আনন্দবিধান করবে।

তুলনায় 'নির্জন স্বাক্ষর' বইতে আধুনিক জীবন-চেতনা অনেক বেশী প্রকট। ব্যর্থ সাহিত্যিক সোমেন দত্ত প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছে। পরাজয়ের গ্লানি এবং নিঃসঙ্গতার দুর্গে সে বন্দী। এক দুঃস্থ নারীর সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় সে বিবেক-পীড়িত। এই পরাজিত নিঃসঙ্গ মানুষটি পরের অপরাধের জন্য নিজেকেই দায়ী করে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল। মানস কথন ও ইম্প্রেশনিস্ট রীতিতে বর্ণিত নায়কের মানস যন্ত্রণার বিবরণের মধ্যে বুদ্ধদেবের নিজেরই প্রৌঢ় জীবনের আর্তি শোনা যায়। উপযুক্ত নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অভাবে বইখানি অবশ্য খুব সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি।

'শেষ পাণ্ডুলিপি'র মদ্যাসক্ত অসুস্থ অবিবেকী যৌনকামনার শিকার সাহিত্যিক নায়ক বীরেশ্বর চরিত্রটি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ঈর্ষা-বশতঃ পরিকল্পিত কিনা আমি ঠিক জানি না। তবে আরও অনেকের মত এ গুজব আমিও শুনেছি। বইখানিতে লেখক একটি ফরাসী চিত্রকর-সুলভ চরিত্র রচনা করতে চেয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল বে-হিসেবী জীবন-যাপনের মধ্যে ছাড়া যে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করে না। কিন্তু বন্ধুর দৃষ্টিকোন্ থেকে বর্ণিত নায়ক-চরিত্র শুধু কতকগুলি চমকপ্রদ ঘটনার মারফৎ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তার মানস-গতির উল্লেখ নেই বলে ঘটনাগুলি মনস্তত্ত্বসম্মত বা প্রত্যয়-গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ।

উপরে আলোচিত বইগুলো ছাড়া বুদ্ধদেব আরও অজস্র উপন্যাস রচনা করেছেন। কিছু আমি পড়েছি, কিছু এখনো পড়ার সুযোগ পাইনি। অধিকাংশ বই রোমান্টিক প্রেম-কেন্দ্রিক, যেমন 'পরিক্রমা', 'বিপাশা' প্রভৃতি। আশ্চর্য এই যে তাঁর প্রতিটি রোমান্টিক কাহিনী হুবহু একরকমের—সাহিত্যিক বা অধ্যাপক নায়ক এবং সাহিত্য-প্রেমী এডোলেসেণ্ট্ নায়িকা। একই ধরণের জিনিস বারবার লিখতে লিখতে মানুষের কী করে যে ক্লান্তি আসে না ভাবতে অবাক লাগে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বুদ্ধদেব বসু যেখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, সেখানে বাঙালী পাঠক তাঁকে বুঝতে পারেনি। তিনি তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক জগতে আপন শিল্প কর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা নিয়ে সমাসীন, সাধারণ পাঠক তাঁর নাগাল পায়নি। তাঁর কাহিনীর পরিবেশও এক আভিজাত্যের দুর্লঙ্ঘ্য শিখরে স্থাপিত; মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে তা কিছুটা অপরিচিত। উপন্যাসের রচনা রীতিতেও তিনি 'সাড়া'র পরে বাংলার পূর্বতন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন নি; সেটাও বাঙালী পাঠকের অসুবিধার কারণ হয়েছে।

তুলনায় অচিন্ত্যকুমার অনেক বেশী ঘরোয়া, অনেক বেশী পাঠকের মনের মাপের কাছাকাছি। নাগরিক আভিজাত্য ও বিলাসব্যসনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে আকর্ষণ মধ্যবিত্ত মানসের স্বাভাবিক আকর্ষণ। তিনি স্বাভাবিকভাবেই আভিজাত্যের দুর্গে বাস করেন না। রচনা-রীতিতে তিনি পূর্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে গুরুতর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেননি। নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিকোন্ থেকে কাহিনী রচনার কৌশল রবীন্দ্রনাথই তাঁর পূর্বে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি অনেক জায়গায় মানস-কথনের রীতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য অবচেতনের উদ্‌ঘাটন নয়। কথনের মধ্যে সুকৌশলে তিনি কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করেন। রোমান্টিসিজম্ তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র হলেও তা বাস্তবের সংশ্রব-বর্জিত নয়। আর অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসেই হোক্ বা ছোট গল্পেই হোক্, একটি নিটোল নিখুঁত সুঠাম গল্প থাকবেই। বুদ্ধদেব বসুর রচনায় বস্তুর ভার কম। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ কাহিনীর সূত্রের মাঝখান থেকে যে-কোন একটা অংশ কেটে নেওয়া যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের লেখাতেও গল্প আছে, কিন্তু তার গতি সুঠাম নয়, এক-একটা অতি-নাটকীয় ঘটনার ঝাঁকুনিতে সে-কাহিনী এগিয়ে চলে। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের গল্পে একটি সুস্পষ্ট আরম্ভ আছে, একটি সুপ্রসারিত মধ্যভাগ আছে এবং একটি পুনঃসঙ্কুচিত উপসংহার আছে। প্রেমের কাহিনী হিসেবে বোধ করি অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম প্রেম' এবং 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' এই বই দুখানি সবচেয়ে উপভোগ্য; এমন-কি, আজকালকার দিনেও এ-বই দু'খানি প্রথম পড়তে গেলে খারাপ লাগবে না। এ-বই দুখানিতেই সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই নায়ক-নায়িকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদের মধ্যে এসেছে দু-কূলপ্লাবিনী প্রচণ্ড প্রেমের বন্যা যা তাদের নিজেদের জীবনের সীমাকে ভুলিয়ে

দিয়ে আবেগের অজস্রতার মধ্যে, প্রসারিত জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আবার শেষে এক সময়ে সামান্য কারণে তারা নিজেদের সীমা বুঝতে পেরেছে, আর প্রেম বিসর্জন দিয়ে 'প্রথম প্রেমে'র নায়ক ভালো মানুষের মত সাধারণ একটা চাকরির মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' বইতে অবিশ্যি প্রেমের পরিসমাপ্তি টানা হয়নি, কিন্তু যা বিবাহের চেয়ে বড সেই বিমূর্ত ভাবাবেগ যে প্রাত্যহিকতার চাপে বিলীয়মান তার আভাস আছে।

'ঊর্ণনাভ' তৃতীয় নয়ন' 'ছিনিমিনি' প্রভৃতি কয়েকখানি বইতে এই প্রেম আবার নিছক সরলরেখাত্মক নয়। সেখানে একটি ত্রিভুজাকৃতি সংগ্রামের মধ্যে ঈর্ষা, অধিকার-অর্জনের দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে প্রেমের ক্ষেত্রটি আরো জটিল এবং নাটকীয় হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষ পরিণতিটা কিন্তু সেখানেও রোমাঞ্চহীন, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ হতে একেবারে সরাসরি সমতল-ভূমিতে পতন। 'তৃতীয় নয়ন' বইটিতে নায়িকা মিনতি তার দয়িত মিহির অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রথমটায় তাকে আরো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করে অন্ধ মিহিরের কাছে নিজে তৃতীয় নয়ন হিসাবে কাজ করে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল ; কিন্তু ক্রমশ তার বাস্তব বুদ্ধি এই রোমাণ্টিক প্রেরণার উর্ধ্বে উঠে এল এবং একটি না-চতুর না-স্বাভাবিক ঘটনার মারপ্যাচের ভিতব দিয়ে মিনতি শেষে মিহিরকে ত্যাগ কবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিত্তবান্ সতীশকে গ্রহণ কবল। এই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত রোমাণ্টিসিজমের আত্মসমর্পণ, মনে হতে পারে মানুষের মনে ফ্রয়েড যে সুখসর্বস্বতা-নীতি (pleasure principle)-এর উর্ধ্বে বাস্তবনীতি (reality principle)-এর স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, এগুলো আসলে সেই মনস্তত্ত্বের স্বীকৃতি, এবং সেই হিসাবে অচিন্ত্যকুমার একজন বস্তুতান্ত্রিক। এ-ও বলা চলতে পারে যে, আমাদের আশেপাশের অধিকাংশ প্রেমঘটিত ব্যাপারের এই পরিণতিই তো ঘটে থাকে। এবং এই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার খুব সরস এবং সংক্ষিপ্ত ফরমুলা পাওয়া যাবে অচিন্ত্যকুমারের 'অবশ্যম্ভাবী' গল্পে। মোটা মাইনের চাকুরে নায়কের একজন উচ্চশিক্ষার্থী প্রেমিকা। নায়ক অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকায় প্রেমিকাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক ; ফলে মেয়েটির একটি অবাঞ্ছিত বিয়ে হল। নায়কও প্রচুর যৌতুকের বিনিময়ে একটি স্বল্প-শিক্ষিতা তরুণীকে বিয়ে করে সংসার-তরণীতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। এই হচ্ছে আদর্শ আধুনিক রোমান্স! প্রেমের জন্য নায়ক-নায়িকার মনে কোন বড় রকমের

ত্যাগস্বীকারের বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার প্রস্তুতি নেই; এমন-কি জীবনের এত বড় একটা স্মরণীয় ঘটনার ব্যর্থতায় জীবনে এতটুকু একটু আঁচড়ও লাগছে না। প্রসঙ্গত এ-কথাও উল্লেখ করা দরকার যে অচিন্ত্যকুমারের এইসব এবং অধিকাংশ বই-ই একেবারেই বাস্তবপন্থী নয়; কারণ রোমান্সের পরিণামে যাই হোক, সেইটুকু নিয়েই তো গল্প আর লেখকের যত ভাষাগত কেরামতি তা সেই রোমান্সের রসকে পরিবেশন করার জন্যই। আসল কথা, রূপে-রসে সমৃদ্ধ আড়ম্বরপূর্ণ রোমান্সের এই পরিণতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় আস্থাহীন ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক চিন্তাধারার প্রথম পদপাত।

অচিন্ত্যকুমারেব এইসব প্রেমচিত্রে বিদ্রোহাত্মক কিছু নেই: অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে প্রেমের বহু সার্থকতর ও বিচিত্রতর চিত্র ইতিপূর্বেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে যা-কিছু অভিনব সে শুধু রীতিগত। বাংলা সাহিত্যে আগে মুখ ছাড়া নাবীদেহের বর্ণনা, বা প্রেম-ব্যাপারের কেন্দ্রস্থল শরীব হলেও প্রেমে শারীরিক ক্রিয়ার বর্ণনার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। অচিন্ত্যকুমারের এইসব বইতে সেই ছুঁৎমার্গকে পরিহার করার চেষ্টা আছে। তা ছাড়া এই প্রেমে জাতি-ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর অভিভাবকদের সম্মতি গুরুত্বহীন; প্রেমের এই বেপরোয়া অকুণ্ঠ প্রকাশই বিদ্রোহ-লক্ষণাক্রান্ত। বিদ্রোহাত্মক কিছু না থাক, কিন্তু এই জাতীয় কাহিনীর মধ্যে একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আছে যা এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত হয়েছে এবং যার গুরুত্ব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে আরও বেশী স্বীকৃতি পেয়েছে। রোমান্সের সঙ্গে একটুখানি বিদ্রূপের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক মানুষের হৃদয়জ ব্যাপারের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাবকে উপস্থিত করেছেন। এই বাস্তবকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা নেই বলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সিনিক; কিন্তু যে সব আবেগকে আমরা এতকাল ধরে বিশুদ্ধ এবং স্বর্গীয় বলে ভেবেছি তা যে অর্থনীতির চাকায় বাঁধা এ কথা স্বীকার করে লেখক নিশ্চয়ই তাঁর বাস্তব-সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছেন।

আর আছে ভাষা নিয়ে অনেক অভিনব পরীক্ষা কবার চেষ্টা। বিচিত্র উপমা ও অলংকারাদি প্রয়োগ করে ভাষার মধ্যে অধিকতর অর্থময়তা সৃষ্টির প্রয়াস অচিন্ত্যকুমার তাঁর প্রথম-জীবনের লেখায় অনেক করেছেন। 'প্রেতায়িত ঠাণ্ডা', 'মধুর অশরীরিকতা', 'অন্ধকারের মত শাদা', 'স্থিতিমান নিস্তব্ধতা', 'তার সমগ্র দৃশ্যমানতায় বর্ণরাগের একটি রূঢ় প্রগল্ভতা', 'সময়ের মোড়ে

মোড়ে রুটিনের রূঢ় সঙীন'—ইত্যাদি অনেক ভাষার কারিকুরি নেহাৎ বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা বলে পরে আর তার কোন অনুকরণ দেখা যায় না। অচিন্ত্য-কুমারের আরেকটা প্রচেষ্টা ছিল ইংরেজি ভাষার শব্দ-বিন্যাসের কায়দাকে বাংলায় স্থান দেওয়া। পরবর্তীকালে এ-প্রচেষ্টারও কোন অনুকরণ দেখা যায় না। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের কোন কোন কায়দা সত্যিই অর্থময় এবং তার অনুকরণ করে পরবর্তী অনেক লেখক লাভবান হয়েছেন। যেমন 'অক্ষরের নির্ভুল পারম্পর্য', 'অমিত অতিশয়তা' ইত্যাদি।

সরল-রেখাত্মক প্রেম এবং ত্রিভূজাত্মক প্রেম নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের লেখা দুই শ্রেণীর উপন্যাস ও গল্পের আলোচনা করা গেল। অচিন্ত্যকুমারের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বিবাহ-পরবর্তী জীবনের জটিলতা নিয়ে লেখা, এবং এই শ্রেণীতে অনেকগুলো বই আছে। 'ইন্দ্রাণী', 'জননী জন্মভূমিশ্চ' 'নেপথ্যে', 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ', 'আসমুদ্র', 'প্রাচীর ও প্রান্তর' প্রভৃতি অনেকগুলো বই এই শ্রেণীতে পড়ে। স্বভাবতই এই সব বইয়ে সাহসিকতাপূর্ণ অবৈধ প্রেমের কাহিনী উপস্থিত করার সুযোগ-সুবিধা কম; বিবাহ-পরবর্তী জীবনের মধ্যে রোমান্টিক আখ্যান সৃষ্টি করাও অসুবিধাজনক। অচিন্ত্যকুমার তাই বলে যৌবনসমস্যা ছাড়া এই সব বইয়ে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এ কথা মনে করলে তাঁর রোমান্টিসিজমের প্রতি অবিচার করা হবে। নিতান্ত সাধারণ পরিবেশের মধ্যেও রোমান্স আবিষ্কারই যদি করতে না পারলেন, আর সেই পরিবেশকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যদি একটা বিকৃত যৌনসমস্যাই সৃষ্টি করতে না পারলেন তো অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব কোথায়! 'আসমুদ্র'-তে স্বামী-স্ত্রীর প্রচণ্ড প্রেমের রোমান্স শেষে অভ্যাসে পরিণত হয়ে তবে শালীনতা প্রাপ্ত হল, তখন স্ত্রীর বান্ধবী এলেন যতটা না স্বামীর সঙ্গে নতুনতর রোমান্স সৃষ্টি করতে, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস-মন্থর রোমান্টিক জীবনে এবারে বিকৃত মানসিক সংঘাত সৃষ্টির প্রয়োজনে। 'প্রাচীর ও প্রান্তরে' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বিকৃত সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের বাংলা সমাজের অতি-পরিচিত দেবরই যথেষ্ট বলে গণ্য হয়েছে। 'নেপথ্যে'র মধ্যে এই সংঘাত সৃষ্টির জন্য কোন জীবন্ত মানুষেরই দরকার হয়নি, মৃত সপত্নীই যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিনী। 'দিগন্ত', 'নায়ক-নায়িকা' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্পেও এই ধরণের স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক বৈচিত্র্যের চিত্র দেখানো হয়েছে। পুরুষের বহু-প্রেমিকতা এবং

রমণীর ঈর্ষা প্রায় চিরকালীন ব্যাপার; অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব এইটুকু যে তিনি এগুলোকে নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন। মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা সরস নাটকীয়তাই তাঁর লক্ষ্য। পরিবেশের বাস্তবতা ও সিনিসিজম্ লক্ষণীয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অচিন্ত্যকুমারের দু-একখানা বইতে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে, এক সময়ে বেশ একটি সামাজিক সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই সময়ে নিজের মনের রোমান্টিক কল্পনার খেয়াল অনুযায়ী প্লট না সাজিয়ে লেখক যদি বাস্তবপন্থী হতেন তো মধ্যবিত্ত জীবনের সুন্দর বাস্তব চিত্র উপস্থিত হতে পারত। 'ঢেউয়ের পর ঢেউ' বইখানাই ধরা যাক। সংসার-বিরাগী স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, স্ত্রী ফিরে এল পিত্রালয়ে। স্বামী-সঙ্গ-বঞ্চিত স্ত্রীব এই যে সমস্যা এটা বাংলা দেশের একটা সামাজিক সমস্যা,—এই স্ত্রী না শ্বশুর-বাড়ি না বাপের বাড়ি কোন সমাদর বা পরিতৃপ্তি পায়; এই পরিবেশের মধ্যে আধুনিক স্ত্রী হয়তো তার নিজস্ব কোন পথ খুঁজে নেওয়াব বিপদ-সঙ্কুল চেষ্টা করতে পারে। অচিন্ত্যকুমার কিন্তু তাঁর কাহিনীর এই বস্তুতান্ত্রিক সম্ভাবনার দিকে একেবারেই যাননি; স্ত্রীব পবিবেশটিকে তিনি প্রায় উপেক্ষা কবে গেছেন। সামাজিক সমস্যাটি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মানসিক অতৃপ্ত যৌন-সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে; যে-স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে স্বামী-প্রেম পেল না তার যে-কোনভাবে যে-কারো-কাছে প্রেম পাওয়ার কাঙালপনার মধ্যে কাহিনীটি সমাপ্তির দিকে গিয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতা আছে, কিন্তু বৃহত্তর বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়ায়, তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 'প্রাচীর ও প্রান্তরে'র মধ্যে বিত্তবান নায়ক হঠাৎ বিত্তহীন হওয়ায় জীবন-সংগ্রামের নিষ্করুণ পরিবেশের মধ্যে তার কঠিন পদস্খলন হল। বাইরের কঠিন জগতে মানসিক বিরামের কোন সুযোগ না পেয়ে তার উপবাসী আত্মা স্ত্রী-দেহের অতিসম্ভোগের মধ্যে সেই বিরাম পেতে চাইল। এই দেহসর্বস্বতায় স্ত্রী যথোচিত সাড়া দিতে পারল না। এইখানে মধ্যবিত্ত পুরুষের যে অতি-পরিচিত রূপ, বাইরে শোষিত এবং ঘরে শোষক,—তার একটি চমৎকার কাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ ছিল। কিন্তু যৌনসর্বস্ব লেখক সে দিক দিয়ে না গিয়ে শুধু যৌনপ্রেমের নানা বিকৃত রূপান্তরের বর্ণনায় বইখানাকে ভারাক্রান্ত করেছেন। স্যাডিজমের এই ফেনানো-ফাঁপানো কাহিনীর মধ্যে

রোমান্টিসিজমের অবক্ষয়ের লক্ষণ আছে। 'ইন্দ্রাণী' আর 'জননী জন্মভূমিশ্চ' এই দুখানি বইতে রক্ষণশীল পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌনজীবনের বিকাশে যে বাধার সৃষ্টি হয় তার কতকটা বস্তুতান্ত্রিক চিত্র আছে। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বই দুখানি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছে। দ্বিতীয় বইখানি যৌথ পরিবাবের বিরুদ্ধে একালের লেখকদের অভিযানের একটি চিত্র। বৌদের উপব শ্বাশুড়ীদের উৎপীড়ন এদেশের একটি পবিত্র সামন্ততান্ত্রিক অধিকার। তার বিরুদ্ধে আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর বিদ্রোহ বইখানিতে বর্ণিত হয়েছে।

অচিন্ত্যকুমারের এই তিন শ্রেণীর গল্প এবং উপন্যাস সম্পর্কেই সাধারণভাবে বলা চলে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক ইচ্ছে করলেই যে-কোন ছোট গল্পকে উপন্যাসের আকাব দিতে পারতেন, আবার যে-কোন উপন্যাসকেও সংক্ষিপ্ত করে ছোট গল্পেব পবিসরে নিয়ে আসতে পারতেন। অচিন্ত্যকুমার সব সময়েই একটি শোভন গল্পের ভক্ত, একথা আগেই বলেছি। এই গল্পের মালমসলা একটি সুন্দর ছোট গল্পের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরের জন্য পর্যাপ্ত একটি পটভূমিকা এবং একটি পরিবেশ সৃষ্টির মত মালমসলা এই গল্পে নেই। সেইজন্যই অচিন্ত্যকুমাবের উপন্যাসগুলি প্রায়ই ফেনানো ফাঁপানো।

অচিন্ত্যকুমাবের বোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এ-কথা আগেই ইঙ্গিতে বলেছি। এই প্রচ্ছন্ন বাস্তবতাই তাঁকে পবে আবও স্পষ্টতর বাস্তব কাহিনী চিত্রণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। 'কল্লোল'-এর স্বল্পতাব দরুন এই বাস্তব খণ্ডিত হলেও ঐতিহাসিক বিচারে সেই সময়ে এর তাৎপর্য খুবই বেশী ছিল। একে যথোচিৎ গুরুত্ব না দিলে অচিন্ত্যকুমারের উপর অবিচার করা হবে।

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', 'আকস্মিক' এবং বোধ করি আরও এক-আধখানা উপন্যাস, ও ভিখিরি, সার্কাসের মেয়ে ইত্যাদিদের নিয়ে লেখা কয়েকটি ছোট গল্পকে একটি স্বতন্ত্র চতুর্থ শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করা যায়। 'বেদে' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পরে দেশের সুধীমহল বইখানাকে অভিনন্দিত করেন; এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রশস্তি-বাণী উচ্চারণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বইখানা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ; সমগ্র অচিন্ত্য-সাহিত্যের একটি স্মরণীয় কীর্তি; কাজেই পাঠকমহল যে বইখানা পড়ে লেখক সম্বন্ধে আশাশীল হয়ে উঠেছিলেন তার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। পাঠকমহলের

সে-আশা লেখক কোনদিনই পূরণ করেননি। 'বেদে' বইতে মার্জিত রুচিবান্ নায়ক (পরে তিনি উচ্চশিক্ষিতও হন) কতকটা অবস্থার চাপে এবং কতকটা নিজের যাযাবর মনোবৃত্তির জন্য পরিব্রাজকের মত নানারকম বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো দাতব্য আশ্রমে, কখনো চায়ের দোকানের বয়দের মধ্যে, পরে বড়লোকদের বাড়িতে চাকর-বাকর মহলে, গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এবং পরিশেষে কলকাতার বস্তি-জীবনে। যাযাবর নায়ক তার যাযাবরী প্রেমের খোরাক হিসেবে প্রতিক্ষেত্রেই একটি নায়িকা সন্ধান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু নায়কের এই যাযাবর প্রবৃত্তি কেন? সে সমাজের নীচের তলার লোকদের দুর্দশার কারণ অনুসন্ধানেও উৎসাহী নয়, সে সমাজ সংস্কারকও নয় বা পরোপকারের প্রেরণাও তার নেই। শুধু বিচিত্র পরিবেশে বিচিত্র মানব মনের বিচিত্রতর প্রকাশভঙ্গি দেখে বেড়ানোর জন্যই সব জায়গাতেই সে প্রেম করেছে, কিন্তু কোন প্রেমেই সে জড়িয়ে পড়েনি: বহুবর্ণের পৃথিবীতে সে একজন পরিব্রাজক, নির্লিপ্ত কবি। কাজেই এই বইয়ের বহু চরিত্র, বহু ঘটনা-সমাবেশ শুধু রস-বৈচিত্র্য আবিষ্কারের রোমাণ্টিক তাগিদ ছাড়া আর কিছু নয়। তবু খুব অল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্যের জন্য এবং অবহেলিত শ্রেণীকে সাহিত্য জগতে আনার দুঃসাহসিকতার জন্যই বইখানা উল্লেখযোগ্য।

'আকস্মিক' বইখানা এত স্পষ্টতঃ রোমাণ্টিক নয়। সেখানে কোন মধ্যবিত্ত মনের ও রুচির নায়ক নেই। কিন্তু সেখানেও ঘন-ঘন পবিবেশের পরিবর্তন, যৌন-সমস্যার আধিক্য (যদিও নীচুস্তরের লোকদের জন্য লেখক একটু ববরতর প্রেমের ব্যবস্থা করেছেন), লেখকের এই মূলগত রোমাণ্টিক মনোভাবকে প্রকাশ করে। খুন, পোড়াইয়া মারা, গণিকা-বৃত্তি, আবার বিপরীতক্রমে সতীত্বের আতিশয্য,—প্রভৃতি গুরুতর ঘটনার অবতারণার জন্য উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করেননি লেখক। ছোট গল্পগুলিও রোমান্স-প্রধান; অনেক ক্ষেত্রে আবার ভদ্রলোক নায়ক এবং বস্তির নায়িকা। বোঝা যায় প্রেমের গল্পের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য লেখক বস্তি-জীবনের সাহায্য নিয়েছেন। তবু বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত শ্রেণীকে এই স্বীকৃতিদানের মূল্য যে অনেকখানি এবং এটা যে লেখকের প্রগতিশীল দিকের প্রকাশ তা ইতিপূর্বেই উল্লেই করেছি। মোটের উপর এ বই দু'খানি প্রাকৃতবাদী রীতির প্রতি এযুগের প্রবণতার দৃষ্টান্তস্থল।

মোটামুটিভাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম পর্যায়ের রচনার

যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল তার মধ্যে তাঁর অনেক লেখারই উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও বুদ্ধিমান পাঠক নিঃসন্দেহে সেগুলোকে এই চার শ্রেণীর কোন-না-কোন জায়গায় তালিকাভুক্ত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। অতঃপব পরিণত মন নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা পূর্ণোদ্যমে শুরু করার আগে অচিন্ত্যকুমাব তাঁর মুন্সেফি-জীবনের অভিজ্ঞতার সীমার অন্তর্গত মার্জিত চেহারা আর অমার্জিত এবং অসামাজিক মনের বিচিত্র অফিসিয়াল শ্রেণীকে নিয়ে 'ইনি আর উনি', 'খাই-খালাসী', 'অতিরিক্তবাবু' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প লেখেন। অতঃপর ঠিক কোন সময়টা যে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা আবম্ভ করেন বলা শক্ত। কিন্তু এবাবে তাঁব লেখার চেহারা একেবারে পবিবর্তিত। এবারে তিনি যে শুধু অবহেলিত শ্রেণী থেকে চরিত্র আব বিষয়বস্তু আহবণ কবেছেন তাই নয়, পরিবর্তিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানেব জন্য ভাষাকেও তিনি অলংকার আর আড়ম্বরের আকাশ থেকে গ্রাম্যতাব মাটিতে নিয়ে এসেছেন। শুধু যে গ্রাম্য কথোপকথনই জুড়েছেন তাই নয়, তাঁব নিজের বর্ণনাতেও 'কেবদানি', 'ধেয়ে নাচুনি' চিকনচাকন', 'লদপদ', 'আচম্বা' প্রভৃতি নিতান্ত গ্রাম্যভাষাব প্রচলিত কথা ব্যবহার কবেছেন। এই অতি বাস্তববাদী ঢঙের লেখাব পবিমাণ খুব বেশী নয়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা 'যতন-বিবি' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প, সাম্প্রতিক কালের সমস্যা নিয়ে কাঠ-খড-কেরোসিন, বস্ত্র, চাষাভূষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর কয়েকটি গল্প খানদুয়েক ছোট উপন্যাস: 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' আর 'পাখনা'—এই বোধকবি মোটামুটি সম্পূর্ণ তালিকা। এ ছাড়াও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের কাহিনী নিয়ে লেখা দুখানি উপন্যাস 'যায় যদি যাক' আর 'যে যাই বলুক' ও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

গল্পগুলো পৃথিবীর ইতিহাসেব করুণতম নিষ্ঠুরতম কতকগুলো ঘটনার নগ্ন, রূঢ়, বীভৎস ছবি। এই নিরবয়ব বীভৎসতাকে লেখক যেভাবে বাহুল্যবর্জিত ভাষায় সংযত উচ্ছ্বাসে বর্ণনা কবেছেন তাতে মনে হয় বর্তমানের পৃথিবী এমনি নির্দয় যে কল্পনাবিলাসী লেখককেও তাঁর নিভৃত কোণ থেকে টেনে এনে ফুটপাথে না নামিয়ে সে ছাডেনি। লেখক যেন তাঁর সযত্ন-রচিত কোঁচা গলে ফেলে সে পডতি কাপড়টুকু কোমরে বেঁধে সাধারণ মানুষের মাঝখানে নেমে এসে বলছেন, আর কল্পনা নয়, আর যৌনসর্বস্বতার বিলাস নয়, এবার কঠিন বাস্তবই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

গল্পগুলি কিন্তু রসসৃষ্টি হিসাবে ভালো উতরোয়নি। এগুলো যেন পুরো গল্প নয়,—গল্পের উপাদান মাত্র। চরিত্রগুলো বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি; বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের যোগসাধন হয়নি। কারণ সমাজ-জীবন নয়, একালের কতকগুলি মর্মান্তিক অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধানতঃ লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে গল্প হয়; একটি গল্পে সমাজের পূর্ণ চিত্র দিতে হবে এ-ও জুলুমের কথা। কিন্তু লেখককে তো শুধু তাঁর গল্পবিশেষ নিয়ে বিচার করা চলে না, বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্রতায়; কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের এ কালের সমস্ত লেখা পড়েও সমাজ সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। আর সেই জন্য এ-গুলো সমকালীন সমস্যার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারেনি। কোন গল্পেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোন ছোঁয়াচ নেই। তথাপি গল্পগুলি নিখুঁত বাস্তবচিত্র—মানব দলিল: এবং সেই হিসাবে বাংলার প্রাকৃতবাদী সাহিত্যের স্বল্পসঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছে।

'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি গোঁয়ার চাষার ছেলের একটি চাষার বৌয়ের প্রেমে পড়ে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করার ব্যর্থ চেষ্টা। 'পাখনা'তে স্বামীপরিত্যক্ত এক মুচির মেয়ে অলিখিত বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করে আর বৈষ্ণবীর ভেক ধরে যে কী অসাধ্য সাধন করল, কী করে বুদ্ধি ও অর্থের জোরে লোভী স্বার্থপর নীতি-বর্জিত অথচ নীতিরক্ষার ভানযুক্ত গ্রামবাসীদের প্রতিকূলতাকে জয় করল তার কাহিনী। বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশভঙ্গি থাকলেও, পরিবেশের খুঁটিনাটি পরিচয় থাকলেও, এ-গুলোও উপন্যাস হয়নি, বড় জোর উপন্যাসের উপকরণ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রোমান্টিক প্রেমের অবতারণার মধ্যে লেখকের শক্তির পরিচয় আছে। দ্বিতীয় বইটিতে অপ্রিয় বাস্তবের সার্থক উদ্‌ঘাটন আছে।

'যায় যদি যাক' আর 'যে যাই বলুক' বই দুখানিতেও লেখকের ঘাড়ে কল্লোল যুগের ভূত চড়াও করে বসে আছে বলে মনে হয়। 'যে যাই বলুক' বইখানা রাজনৈতিক পটভূমিকায় শুরু হলেও অল্প পরেই রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তা ছেড়ে নায়িকা অধঃপতিত নায়ককে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে বেড়িয়েছে। একটু রাজনৈতিক কর্মের গন্ধ দিয়ে 'যুগোপযোগী' করার চেষ্টা হলেও এ সেই পুরনো যৌন-সর্বস্বতা। যৌন-জীবনের বিকৃতির চিত্রায়নে

লেখকের আগ্রহের মধ্যে রোমান্টিক ক্ষয়িষ্ণুতার পরিচয় আছে। যদিও বইখানির রচনারীতি বাস্তববাদী।

কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে বিদ্রোহের একটা সুর ছিল বটে, কিন্তু তার কোন পরিপূর্ণ রূপ ছিল না। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-বুর্জোআ যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, যার ফলে আমাদের জীবনের অসঙ্গতি, অচিন্ত্য-কুমারেব মনে সেই বিশ্লেষণটা ছিল অনুপস্থিত। তার ফলে, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিসের জন্য বিদ্রোহ, বিদ্রোহের লক্ষ্য কী—অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে এসব প্রশ্ন স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি। শুধুমাত্র রবীন্দ্র-শরৎ প্রতিভায় সমাচ্ছন্ন বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির একটি বিকল্প পন্থার সন্ধানেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনির্দেশ্য অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মন্বন্তরের কালের এবং তৎপরবর্তী কয়েক বছরের ক্ষতি-উৎকট অর্থনৈতিক সংকট আরও অনেক লেখকের মত অচিন্ত্যকুমারের মনকেও নাড়া দিয়েছিল। সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মনে যে অনির্দেশ্য অসন্তোষটুকু ছিল, যার ফলে প্রথম পর্যায়ের লেখাতেও তিনি অবহেলিত শ্রেণীকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি, সেই অসন্তোষই সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সামনে তাঁকে সমাজবিমুখ হয়ে থাকতে দেয়নি। বরং এই সংকটকালীন বীভৎসতা তাঁর স্পর্শকাতর মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে এই সর্বপ্রথম রোমান্স বর্জন করে পুরোপুরি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্প লিখলেন তিনি। তাঁর বিদ্রোহ তাই বলে এবারও কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে পারল না। সাধারণ মানুষের কাহিনী সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি প্রকাশ করলেন বটে; কিন্তু যে অসাধারণ মানুষেরা অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে যে-বিপর্যয় টেনে আনল, এবং সেই অসাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ অচেতন মানুষরাও যে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেল, অচিন্ত্যকুমার সে সবের খবর জানতেন না। ফলে তাঁর গল্পগুলো পুরোপুরি রক্তমাংসের গল্প হল না, হল গল্পের কাঠামো। তাদের মধ্যে পাঠকের মনে খানিকটা সহানুভূতি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন গভীরতর আবেদন, কোন সম্পূর্ণতর জীবনবোধ প্রকাশ পেল না। এরা যেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে অভিযানের জন্য রচনা-করা ছড়া।

এবং জীবনবোধের এই অসম্পূর্ণতারই অবধারিত পরিণতি হিসাবে অচিন্ত্যকুমার

শেষে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠলেন। শুধু চোরাকারবার নয়, মানুষের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে সুদূরপ্রসারী কারণ রয়েছে, তা আবিষ্কার করতে না পেরে, এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রাম এবং পরিণামে সাফল্য সম্ভব, তা বিশ্বাস করতে না পেরে, উপরতলার বাসিন্দা অচিন্ত্যকুমার শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ম্যান্ ডাজ্ নট্ লিভ্ বাই ব্রেড্ এলোন্ শুধু খাওয়ার জন্যই তো মনুষ্যজীবন নয়—মানুষের আরও উচ্চতর আদর্শ আছে, এবং তার মধ্যে উচ্চতম হল নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতা। কল্লোল যুগের প্রিয় ইংরেজ লেখক অলডাস হাক্সলীর মত অচিন্ত্যকুমারও পীড়িত হৃদয় নিয়ে একদিন এই পলায়নী মনোবৃত্তির সত্য আবিষ্কার করে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন, এবং রামকৃষ্ণ-কাহিনী লিখতে বসে গেলেন। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন খাওয়া-পরার সমস্যারই যারা সমাধান করতে পারে না, তারাই তো চিবকাল বড় গলায় অনাহারী, নগ্ন মানুষের সামনে উচ্চতর আদর্শের এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিকতাব জয়গান কবে থাকে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে বুদ্ধির প্রাখর্য আছে; কিন্তু তাঁর বুদ্ধি আবেগ নিয়ন্ত্রিত। তিনি আগে শিল্পী, পরে চিন্তাশীল। পক্ষান্তরে অন্নদাশঙ্কর মূলতঃ বুদ্ধিজগতেব বাসিন্দা; তত্ত্বচিন্তা তাঁর মধ্যে অন্নজল গ্রহণের মত স্বাভাবিক তিনি আগে চিন্তাশীল, পবে সাহিত্যিক। বুদ্ধদেব বসুর কাছে শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য হল—সুন্দর রূপমূর্তি রচনা করা (to make beautiful forms) অন্নদাশঙ্কবের কাছে শিল্প ক্রিয়াব লক্ষ্য—ছবির মাধ্যমে চিন্তা কবা (Thinking in images—Bellinsky), অথবা চিন্তাকে ছবিতে রূপান্তরিত করা (to convert a concept into an image—Kant). বঙ্কিম তাঁব 'অনুশীলন' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছিলেন যে অল্প বয়স থেকেই তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন যে পৃথিবীতে তিনি কেন এসেছেন এবং এখানে তাঁর করণীয় কি। এই কথাগুলো অন্নদাশঙ্কর রায়ও বলতে পারতেন। বংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের পর অন্নদাশঙ্করের মত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু আর কোন লেখক এসেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি যে বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শিল্পকৈবল্যবাদী তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তার কারণ এই তত্ত্ব শিল্পীকে অখণ্ড স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি

দেয়। নিজের চিন্তাধারার অকুণ্ঠ প্রকাশের জন্য এই স্বাধীনতাটুকু তাঁর প্রয়োজন ছিল।

পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছেন যাঁবা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণায় না পৌঁছে এক পদও অগ্রসর হতে পারেন না। জৈবিক প্রবণতার তাগিদে গতানুগতিকতার স্রোতে বা অপরের নির্দেশেব অনুবর্তনে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ। জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে তাঁদের মনে আপন বিচাব বুদ্ধিতে গড়া তত্ত্বের সমর্থন চাই। এই জন্য এই জাতেব লোকেরা কট্টর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সাধারণতঃ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজাধারীগণ মনে কবেন যে তাঁরা যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই গোষ্ঠীর চিন্তাধারাব অনুসবণেব নামই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু আমি যাঁদের কথা বলছি তাবা একটু ভিন্ন ধাতুর মানুষ। তাঁরা যাচাই না কবে বিচার না করে নিজেব দলেব মতকেও গ্রহণ কবতে রাজী নন। এমন কি নিজেব গৃহীত মতবাদেব কাছেও তাঁবা বিবেক বিক্রয় করতে বাজী নন; কারণ আজকের গৃহীত মত কাল তাঁবা পরিত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ কবতে পারেন। অন্নদাশঙ্কব এই জাতের মানুষ, এবং তাঁব সাহিত্যে তাঁর পবিচ্ছন্ন চিন্তা, প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর একক ও অনন্য।

এ যুগের চিন্তাধাবা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিস্ফুট কবার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্নদাশঙ্করই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দু'জন ঔপন্যাসিক নন (ধূর্জটি প্রসাদ অবশ্য দু'একখানি উপন্যাস রচনা কবেছিলেন) বলে আমার আলোচনার সীমার বাইরে। যতদূর মনে হয় প্রথম যৌবনে অন্নদাশঙ্কর বিশ শতকের প্রথমপাদের চিন্তা নায়ক এইচ-জি-ওয়েলস্, বার্ণার্ডশ বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল প্রভৃতির জড়বাদী যুক্তিবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের থেকে প্রেরণা লাভ করে তিনি এদেশের সামাজিক ও নৈতিক চিন্তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব কবেছিলেন। তাঁর 'তারুণ্য' নামক বইতে তিনি আমাদের দেশের ব্রহ্মচর্য বা যতিত্বের আদর্শ এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে এই দুটি আদর্শ মানুষের জৈবিক প্রকৃতি ও শারীরধর্মের পরিপন্থী; প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে দেহ এবং মনের

স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। এই আদর্শ অনুসরণ করার ফলে আমাদের তারুণ্যশক্তি খর্ব হয়েছে; এবং সমাজের নৈতিক মান উন্নত না হয়ে ব্যভিচার ও নোংরামীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 'পথে-প্রবাসে' নামক বইতে তিনি ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওদেশের কর্মোদ্যম সক্রিয়তা ও প্রাণ প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি এদেশের নিষ্ক্রিয়তা নির্বীর্যতা ও ম্রিয়মানতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। ওদেশের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য গরিমা ও প্রয়াসের বিপুলতা তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসগুলিতে এই মনোভাব পরিস্ফুট।

বুদ্ধিপ্রধান লেখকের উপন্যাস হয় ব্যঙ্গধর্মী হবে নয়তে বক্তব্য-প্রধান হবে। অন্নদাশঙ্কব প্রথম দিকে ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস রচনা করেছেন; পরেরদিকে বক্তব্য-প্রধান মননধর্মী রচনার দিকে মন দিয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনার সুবিধা এই যে তাতে একটি সুঠাম সুসমঞ্জস প্লটের অস্তিত্ব আবশ্যিক নয়। কারণ সমগ্রভাবে প্লটেব মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধি থাকাই যথেষ্ট নয়, প্লটের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দৃশ্য-পরিকল্পনার মধ্যে ব্যঙ্গ-রস পরিবেশিত না হলে কাহিনী সার্থক হয় না। সুতবাং ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী ঢিলে ঢালা গতিতে অগ্রসর হলে কোন ক্ষতি নেই; যদি ব্যঙ্গরসের সার্থক সরববাহ থাকে; গল্পাংশ যদি কম থাকে এবং নির্দিষ্ট হারে যদি গল্পের অগ্রগতি না হয়, তবু কোন ক্ষতি নেই। অন্নদাশঙ্কর এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর প্রথম উপন্যাসেব প্লট অত্যন্ত শিথিল, ঢিলে ঢালা ভাবে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তার ফলে কাহিনী কোন পরিণতির দিকে যাচ্ছে না। নায়ক নয়িকারা লেখকের ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত বলে তাদের গতিবিধির স্বাধীনতা কম। প্রচণ্ড রকম সংকট বা প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস তারা এড়িয়ে চলে। ব্যঙ্গের প্রয়োজনে অন্নদাশঙ্কর কৃত্রিম বা আজগুবি কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি করেন না রাজশেখর বসু বা সুইফ্‌টের মত। তাঁর কাহিনী বাস্তবতার সীমানা মেনে চলে। পড়তে পড়তে ব্যঙ্গরস প্রিয় পাঠকরা মুচকি মুচকি হাসতে পারবেন; কিন্তু উচ্ছ্বসিত হাসির সুযোগ তাঁরা কখনো পাবেন না। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সাবলীল এবং শহুরে, তাতে মাঝে মাঝে দ্বর্থ-বোধক শব্দ, একই শব্দ দুইবার দুই অর্থে প্রয়োগ, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্য কোথাও নেই। বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যের ভাষার মত তাঁর ভাষায় কোন সচেতন প্রয়াস অনুভব করা যায় না। পড়তে পড়তে মনে হবে এ বইয়ের তীক্ষ্ণধী লেখকের চোখের

সামনে কোন মেকী জিনিস চলবে না। তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং নির্মম বিচারক। অন্নদাশঙ্করের একটি দোষ আছে—অতিকথন এবং কাহিনীর অনাবশ্যক বিস্তার। এই দোষটি তাঁর পরবর্তী জীবনে আরও প্রসারলাভ করেছে। ঢিলা ঢালা ভাবে গল্প বলার অভ্যেস থেকে এই রম্যাঁ রলাঁ স্থলভ দোষটি তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে। কিন্তু স্বল্পভাষণই ব্যঙ্গরসের প্রাণ।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা'র (১৯৩০)-র আধুনিক এবং আধুনিকতার জন্য গর্বিত নায়ক স্থচারু সমাজের প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করে দস্তুর মত প্রেম করে স্থরুচিকে বিবাহ করল। কিন্তু বিবাহের পর তার মধ্যে একটি অনাধুনিক কামনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ; সে তার আপন ঔরস-জাত কন্যার পিতা হবে। আপাতত তার এই অভিলাস পূরণ করার ক্ষমতা স্থরুচির ছিল না; কারণ সে ইতিপূর্বেই অন্তসত্ত্বা হয়েছে। এই সংবাদ জানতে পারার পর আধুনিক স্থচারুর আধুনিকতার মুখোস একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল, তার মনের যুগ যুগ সঞ্চিত নারীর সতীত্ব সংস্কার জেগে উঠল। স্থচারু সরাসরি স্থরুচির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে অবশ্য চাইল না; কিন্তু তার ব্যবহারে যে রূঢ়তা প্রকাশ পেতে লাগল তাতে স্থচারু বুঝতে পারল বিবাহ-সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এই হিন্দু ধারণা অযৌক্তিক। শিশু কন্যাকে নিয়ে সে পিত্রালয়ে ফিরে এল।

কাহিনীটি পড়ে কোন সম্পূর্ণতার অনুভূতি জাগে না ; বইটির নামেও তার স্বীকৃতি রয়েছে। বোধ করি এই নামকরণের মধ্যে সে কালের সাহিত্য চিন্তার কিছু প্রতিফলন ঘটেছে। তখনকার কোন কোন প্রাকৃতবাদী লেখক মনে করতেন যে সাহিত্য যখন জীবনের প্রতিলিপি, এবং জীবনে যখন কোন ঘটনার আরম্ভও নেই, শেষও নেই, তখন সাহিত্যেই বা কেন একটি স্থস্পষ্ট আরম্ভ এবং স্থনির্ধারিত শেষ থাকবে।

'অসমাপিকা' বইখানির উপর 'বার্ণার্ড-শ' লিখিত দি ইর‍্যাসন্যাল নট্ (The Irrational Knot—যুক্তিবিরুদ্ধ বন্ধন) বইখানির কিছু প্রভাব থাকলে থকতে পারে। উভয় বইয়ের কাহিনীতে কিছু মিল আছে ; এবং উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিবাহ-বন্ধনের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা।

'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০) এবং 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩০)-কে পরস্পরের পরিপূরক উপন্যাস বলে গণ্য করা সঙ্গত। প্রথম বইটি বিলাতের পটভূমিকায় রচিত এবং দ্বিতীয়টি ভারতীয়। প্রথম বইটিতে এক ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে বাঙালী যুবক সোমের প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই মুক্ত যাযাবরী প্রেম

প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি-পূরণের দায়মুক্ত, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কলুষ-মুক্ত। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেকে'র' মতই এই 'লাভ্ ফর লাভস্ সেক'। প্রেম নামক যে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'কে অচিন্ত্যকুমার 'বিবাহের চেয়ে বড়' বলে ঘোষণা করে গেছেন, অন্নদাশঙ্কর এ বইতে তারই এক ভিন্নতর চিত্র দিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার প্রেমকে তবু এক ভাবাবেগ বলে চিত্রিত করতে চেয়েছেন; কিন্তু বিজ্ঞান-পন্থী অন্নদাশঙ্করের কাছে প্রেমের অতখানি মর্যাদাও স্বীকার্য নয়। প্রকৃতির ইচ্ছা পূরণের জন্য নরনারী সাময়িক ভাবে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে এবং সে সান্নিধ্য থেকে কিছু সাময়িক লঘু চপল আনন্দ পওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রেম এইটুকুই ব্যাপার, এবং বিবাহ বন্ধন এর মাধুর্যটুকুকে নষ্ট করে দেয়। ইংরেজ তরুণীর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে প্রেমের এই বৈজ্ঞানিক অভিধা সে জানে। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ, কোনরকম সংস্কার বা জড়তার সে দাস নয়। আপন অধিকার ও শক্তি সম্পর্কে সে সচেতন, পুরুষ তাকে প্রভাবিত করবে বা তার উপর আধিপত্য করবে এ সম্ভাবনা নেই। কাহিনীটি সুতরাং কতকগুলি কৌতুককর পরিস্থিতির সমষ্টি মাত্র। ছদ্ম মান-অভিমানের অভিনয়ে পরিস্থিতিগুলি চিত্তাকর্ষক ; নায়ক নায়িকারা ভাল করেই জানে এ একটা খেলা যা জীবন উপভোগের একটা চমৎকার উপায়। কাহিনীতে কোন ক্রমিক অগ্রগতি বা পরিণতি নেই। তবে ইংরেজ তরুণীটির সহজ আত্মবিশ্বাসের পাশে ভারতীয় যুবককে কতকটা নিস্প্রভ, ভীরু, আপন জন্ম ও দেশগত দৈন্যের লজ্জায় ম্রিয়মান বলে মনে হয়।

'আগুন নিয়ে খেলা'র পর 'পুতুল নিয়ে খেলা' পড়লে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোম দেশে ফিরে এসে পরিবারের সকলের নিরতিশয় অনুরোধে বিবাহ করতে রাজী হ'ল। কিন্তু এ দেশে তো পূর্বরাগের ব্যবস্থা নেই, পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত, এরই মধ্যে সে একটি শর্ত করিয়ে নিল যে প্রত্যেক পাত্রীর সঙ্গে সে একান্তে সাক্ষাৎ করবে এবং খোলাখুলিভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানাবে। তার পরও যদি সেই মেয়ে তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে তবেই সে তাকে বিবাহ করবে। কার্যতঃ দেখা গেল যে নির্জন সাক্ষাতের প্রস্তাবেই প্রত্যেক পাত্রীর পরিবারে প্রবল আপত্তি উঠছে। তবু সোম বিলেত-ফেরৎ দুর্লভ পাত্র বলে শেষপর্যন্ত সর্বত্রই একটা না একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হল। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও সোমের শর্ত পূরণ হল না, খোলাখুলি ভাবে আলাপ করা এবং আলাপের পর কন্যার স্বীকৃতি লাভ তার ভাগ্যে জুটল না। শিবানী এত লাজুক মেয়ে যে তার সামনে মুখ

খুলতেই রাজী হল না। হেডমাষ্টারের গাইয়ে মেয়ে সুলক্ষণা সোমের কথার একটু আভাস পেয়েই সঙ্কুচিত এবং শালীনতা হানির ভয়ে ভীত হয়ে উঠল। বি-এ অনার্স পাস অমিয়ার মধ্যে এতটুকু উচ্চশিক্ষা-জনিত উদারতা ও মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া গেল না। সোসাইটিতে যাতায়াত আছে, সুতরাং আধুনিক ভাবাপন্ন বলে যে মেয়েকে অনুমান করা গিয়েছিল, দেখা গেল সেই প্রতিমার মধ্যে রক্ষণশীলতা পাহাড়ের মত অনড় হয়ে বসে রয়েছে। ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে তুলনায় এরা যে কতবেশী জড়তাগ্রস্ত, অনুদার ও সঙ্কীর্ণচিত্ত লেখক তাই প্রতিপন্ন করেছেন। এরা সবাই এখনো কঠিন সামাজিক অনুশাসনের খোলসের মধ্যে বাস করে, সংস্কারের দুর্গ থেকে মুক্তি লাভ করে সহজভাবে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করবাব শক্তি এদের নেই। প্রতিটি উপকাহিনীই বিদ্রূপাত্মক ; লেখক প্রয়োজন মত অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে আমাদের প্রচুব হাসিয়েছেন। কিন্তু এ হাসির মধ্যে হুল আছে।

'সত্যাসত্য' নামক ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ উপন্যাসই অন্নদাশঙ্কর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই দীর্ঘ মননধর্মী উপন্যাসটি অনেক বিমূর্ত চিন্তা ও আদর্শের উল্লেখ সত্বেও উপন্যাস হিসাবে সার্থকতার দাবি করতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে অন্নদাশঙ্কর এ বইয়ের ছ'টি খণ্ড রচনা করেছিলেন। রামায়ণের অনুসবণে একটি আধুনিক মহাকাব্য রচনা করার যে পরিকল্পনা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর এই বৃহৎ প্রয়াসে হাত দিয়েছিলেন, কাহিনী শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়নি। তার কারণ দীর্ঘ সময় ধরে এই কাহিনী লিখতে লিখতে অন্নদাশঙ্করের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আমি আগেই বলেছি প্রথম যৌবনে অন্নদাশঙ্কর ইউরোপেব যুক্তি ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী চিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন 'সত্যা-সত্যের' প্রথম পর্ব 'যাব যেথা দেশ' (১৯৩২) প্রকাশিত হয় তখন তাঁর এই চিন্তা ধারায় কোন গুরুতর ফাটল ধরেছে বলে অনুমান করা শক্ত। কিন্তু অন্যান্য পর্বগুলি রচনাকালের মধ্যে হিটলারের অভ্যুদয় হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুন্দুভি শোনা যায় এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রলঙ্কর যুদ্ধ বিশ্ববাসীর মনে ত্রাস সঞ্চার করে শুরু হয়ে যায়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপের বিজ্ঞান চিন্তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে লেখকের মনে দারুণ আশঙ্কা দেখা দেয় এবং তিনি ভারতীয় আদর্শের মধ্যে মানব মুক্তির সূত্র আবিষ্কারে যত্নশীল হন। আমরা দেখতে পাই প্রথম দু'টি পর্বে বাদল (ইয়োরোপীয় আদর্শের প্রতিনিধি)

নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন করে রয়েছে, তৃতীয় পর্বে ('কলঙ্কবতী'তে) বাদলের স্ত্রী উজ্জয়িনী প্রধানা চরিত্র। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে সুধী (ভারতীয় আদর্শের প্রতিনিধি) ক্রমশঃ লেখকের অধিকতর মনোযোগের অধিকারী হয়েছে। কাজেই আমার ধারণা গ্রন্থারম্ভের সময় লেখক হয়তো বাদলের সত্যানুসন্ধানের শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার চিত্র উপস্থাপনের কথা ভেবেছিলেন ; কিন্তু বাদলের ব্যর্থতার ভিত্তি ভূমির উপব তিনি যে সুধীর আদর্শের বিজয় তোরণ স্থাপন করবেন এ চিন্তা খুব সম্ভব কাহিনী রচনা করতে করতে তাঁর মাথায় এসেছে।

কিন্তু যদিও কাহিনীর মধ্যে অন্নদাশঙ্কব ভারতীয় আদর্শেব স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতাকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন কবেছেন, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর শিল্পীমনেব সমস্ত মনোযোগ মাধুর্য এবং করুণাবোধ শেষ পর্যন্ত বাদলের জন্য সংবক্ষিত রয়েছে। একটু অভিনিবেশেব সঙ্গে লক্ষ্য কবলেই দেখা যাবে সুধী চরিত্র পরিকল্পনাব মধ্যে দারুণ ফাঁক রয়েছে। মহাকবি যেমন বাম চবিত্রকে পরিস্ফুট কবার জন্য লক্ষণকে স্থাপন করেছিলেন, শুরুতে অন্নদাশঙ্করও বাদলকে পরিস্ফুট করাব জন্যই সুধীকে সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাসের নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধিব জন্য তিনি সুধীকে বাদলের বিপবীত দৃষ্টিভঙ্গী দান 'কবেছেন। কিন্তু বাদলের প্রয়োজনেই লেখক সুধীকে বিলাত পাঠিয়েছেন। ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী সুধী ভারতীয় পদ্ধতিতে গ্রাম সেবায় আত্মনিয়োগ করবে এজন্য তার বিলাত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু বাদলকে লেখক দুরূহ সত্যানুসন্ধানের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রেবণ করেছেন দূর দেশে ; তার খবরাখবর নেওয়া, তার জন্য দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করা, তার অবহেলিত স্ত্রী উজ্জয়িনীর দায়িত্ব গ্রহণ করা,—প্রভৃতি কাজের জন্য একজন লোক দরকার। এই সব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই লেখকের আদেশে সুধীকে বিলাত যেতে হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে বিলাতে সুধী যে কী কাজ করছে, কী বিদ্যা অর্জন করছে, তার জীবনাদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য সেই বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা কী—এ-সব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর লেখক সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সুধীর ভারতীয় আদর্শটা যে কী বস্তু আমরা এত বড় বইতেও তার কোন বিস্তারিত পরিচয় পাই না। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় বহু মত ও পথের অস্তিত্ব ছিল ; তার মধ্যে কোনটাকে সুধী গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কেও লেখক নির্বাক। সুধী গ্রাম সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু সেই গ্রাম সেবার পরিকল্পনাটা কী আমরা তা জানতে পারি না। সে

গ্রামে গ্রামে রেলগাড়ি বিজলি বাতি বর্জন করে চরকা ও খাদি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করবে কিনা লেখক তাও আমাদের স্পষ্ট করে জানাননি।

'সত্যাসত্য' বইতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের পূর্ব মনোভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গিয়েছে বলে অনুভব করা যায় না। ভারতীয় সমাজে স্ত্রী একান্তভাবে স্বামী-মুখাপেক্ষী: স্বামীর অবহেলায় বা অবিচারে স্ত্রীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লেখক অবশ্য যথেষ্ট দরদের সঙ্গে এই সমাজ ব্যবস্থার অসহায় শিকার হিসাবে উজ্জয়িনীকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষালাভ সত্ত্বেও উজ্জয়িনী যে সামাজিক বিধানকে অতিক্রম করে যেতে পারছে না সেজন্য লেখকের একটু বিদ্রূপের কাঁটাও তাকে সইতে হয়েছে। 'কলঙ্কবতী'তে উজ্জয়িনী যখন অধোন্মাদে পরিণত হয়ে রাধাভাবের ম্যানিয়া বশতঃ একটি অপদার্থ লোককে শ্রীকৃষ্ণ ভেবে তার আলিঙ্গনে ধরা দিচ্ছে তখন লেখকের বর্ণনা বেশ পরিহাস দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কোন একটি মৌলিক রীতির প্রতিই লেখক এ বইতে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেননি। এমন কি উজ্জয়িনীর পুনর্বিবাহের প্রশ্নেও সুধী যথেষ্ট আগ্রহান্বিত; বিবাহ না করেই সে যে সন্দেহভাজন-চরিত্র দে সরকারের সঙ্গে চলে গেল তাতেও লেখকের ভারতীয় মন সঙ্কুচিত হয়নি।

বাদল এই বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাদলের সমস্যাই এ বইয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যা। বাদলকে ঘিরেই এ বইয়ের সমস্ত প্রধান চরিত্র, এমন-কি সুধীও, আবর্তিত হয়েছে। বাদলের সত্যানুসন্ধানের প্রতিটি পর্ব বিস্তারিতভাবে নিখুঁৎভাবে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় আদর্শ একটি বিমূর্ত অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ভাব-মাত্র; এত বড় বইতে লেখক সেই ধোঁয়াটে ভাবকে কায়া দিতে চেষ্টা করেননি। সুতরাং লেখকের প্রকৃত মানস পক্ষপাত কোন্‌দিকে তা বিস্তারিতভাবে বলা অনাবশ্যক!

'সত্যাসত্য' নামকরণের মধ্যে বাদল অসত্যের প্রতীক, সুধী সত্যের প্রতীক। অসত্য কথাটির মধ্যে লেখকের কোন নিন্দাত্মক মনোভাব নেই। অসত্য হচ্ছে তাই যা অস্থায়ী, অস্থির, পরিবর্তনশীল, যা প্রবহমানতার স্রোতে ভাসমান, যা প্রতি পদে পদে নিজেকেই নিজে অস্বীকার করে। সত্য হচ্ছে তাই যা শাশ্বত, স্থির, যা সমস্ত পরিবর্তনশীলতা ও প্রবহমানতার মধ্যে অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অসত্য হচ্ছে ইণ্টেলেক্ট বা বুদ্ধির পথ; সত্য ইণ্টুইশান বা বোধের পথ। বুদ্ধির কাজ হচ্ছে সব-কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা; সুতরাং

বুদ্ধির সমস্ত সিদ্ধান্ত আংশিক দেখার উপর নির্ভরশীল বলে দেখার তারতম্যের জন্য তা নিত্য পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে বোধ একসঙ্গে সমগ্রকে দেখে বলে তার সিদ্ধান্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। ইউরোপ বুদ্ধির পথকে গ্রহণ করেছে; ভারত বোধের। বুদ্ধির পথ ধরে বাদল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে আশ্রয় করে অনেক জটিল বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে—ঈশ্বর-আত্মা-মন, ফ্রি উইল বনাম ডিটারমিনিজম্, স্পেস-টাইম-আপেক্ষিকবাদের পথ ধরে 'বাদল-কালে'র ধারণা, নৈরাশ্যবাদ বনাম আশাবাদ; শেষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে সে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সেবা-ব্রতকে অবলম্বন করেছে, যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয়ের টাকায় এই প্রতিষ্ঠান চলে জানতে পেরে তার সংশ্রব ত্যাগ করে সে কমিউনিস্টদেব দলভুক্ত হয়েছে, কিন্তু একনায়কতন্ত্র ও হিংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর ভয়ে সে তাদের সংশ্রব ত্যাগ করে নিজের চেষ্টায় মানবজাতিব সর্বকলুষমুক্ত কোন মুক্তির উপায়ের সন্ধানে সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষদের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা কবে নিয়েছে। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে যে সে একালের প্রফেট নয়, মানব-মুক্তির কোন ধ্রুব বাণী উচ্চারণ করতে সে অক্ষম। অনুসন্ধানেব দীর্ঘ দীর্ঘ পথ অতিক্রম কবে অবশেষে পরাজিত হয়ে আপন ব্যর্থতার গ্লানিব বোঝায়-পীড়িত হয়ে সে বাঁচবার ইচ্ছা ত্যাগ করল। "বাদলের ট্রাজেডি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার ট্রাজেডি, বিপুলায়তন মানবিক প্রয়াসের ট্রাজেডি, সুতরাং বাদল যখন বেঁচে থাকার সঙ্কল্প ত্যাগ করল, তখন লেখকের সঙ্গে পাঠকও একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন না কবে পারে না। উজ্জয়িনীর শোক-বিহ্বলতার মধ্যে আমরা আপন ব্যর্থতাব অনুভূতিতে মানব জাতির শোকবিহ্বলতাকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বইখানাকে ট্রাজেডির মধ্যে শেষ করতে চাননি বলেই লেখক আমাদের সামনে সুধীর ভারতীয় আদর্শবাদের মধ্যে এক বিকল্প আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমি আগেই বলেছি, সুধীর এই আদর্শবাদ কায়াহীন, অস্পষ্ট এবং অবাস্তব। বন্ধু প্রীতিতে, উজ্জয়িনীর প্রতি দায়িত্ব পালনে, সুজেতের সঙ্গে পরমাত্মীয় ব্যবহারে, আদর্শবাদের খাতিরে অশোকা তালুকদারের পানিগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে, যাযাবর প্রেমিক দে সরকারের প্রতি তার সহনশীল ব্যবহারে, আমরা সুধীর মধ্যে এক মানবিক বৃত্তিতে সমৃদ্ধ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, এবং সেইখানেই গ্রন্থমধ্যে সুধীর আকর্ষণ।

এ দুয়ের মাঝখানে উজ্জয়িনী এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যারূপে চিত্রিত হয়েছে।"

হিন্দুনারীর স্বামী-সংস্কার বশতঃ হলেও বাদলের প্রতি তার ভালবাসা আন্তরিক এবং গভীর। বাদলের অপ্রাপ্যতা যখন তার কাছে অসংশয়িত হয়ে উঠল তখন অর্ধোন্মাদ হয়ে বৈষ্ণব ধর্মাচরণের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজল। অবশেষে সুধী তাকে উদ্ধার করে বিলাত নিয়ে গেল। বিলাতে এসে বাদলের সঙ্গে এক নিঃসম্পর্কিত ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করল। তার এই আচরণের পিছনে যে এক অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আর্তি রয়েছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বাদলের মৃত্যুর পরে উজ্জয়িনীর বুকফাটা কান্নার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি বাদলের প্রতি তার গভীর ভালবাসা এখনো অটুট। অবশেষে বাদলের মৃত্যু উজ্জয়িনীর কাছে হিন্দু সংস্কারের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ করে দিল। সুধীর কাছে আশ্রয় চেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে সে সুসংস্কৃত দে সরকারের সঙ্গে নতুন পথে যাত্রা করল। উজ্জয়িনীর এই পথান্তর গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় রীতির বিরোধী; বরং তা পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্মত।

কাহিনীটি আগাগোড়া পাঠ করে এ কথাই মনে হবে যে এ বইয়ের লেখক মনে প্রাণে শিক্ষায় দীক্ষায় ইউরোপীয়; কিন্তু ইউরোপের কোন একটি পরীক্ষামূলক চিন্তাধারার মধ্যেই শেষপর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে ব্যাকুলভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে শেষ সমাধান হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হায়! তিনি নিজেও জানেন এই রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের যুগে প্রাচীন ভারতীয় ভাব ও চিন্তার সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র আজ জোড়া লাগানো সহজ নয়।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন জাগ্রত করে। প্রথম প্রশ্নটি এই: বিমূর্ত তত্ত্ব ও চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে কোন সার্থক উপন্যাস রচনা কি সম্ভব? অন্নদাশঙ্কর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এইচ্-জি-ওয়েলসের 'ওআর্ল্ড অব্ উইলিয়াম ক্লিসোল্ড'-এ যেমন আছে, লেখক কখনো বাদলের তত্ত্ব ভাবনাকে সে রকম নির্ব্যক্তিক স্তরে নিয়ে জাননি। বাদলের ভাবনা কোথাও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। বাদলের ভাবনার সঙ্গে অস্থিরতা উদ্বেগ আকাঙ্খা, তার নানাবিধ শারীরিক অশান্তি এমন অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে রয়েছে যে সবদাই আমরা অনুভব করি একজন মানুষ চিন্তা করছে। সবসময় বাদলের ভাবনা বাদলের ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত। বাদলের মানবিকত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য লেখক তাকে যথেষ্ট সামাজিক করেছেন। সে হঠাৎ বল্ ড্যান্স করে বা অশ্বারোহণে যোগ দেয়। বাদল একটি খামখেয়ালী চরিত্র। হঠাৎ খেয়ালে সে বিয়ে করতে রাজী হয়, হঠাৎ সে ঠিক করে বসে যে সে

অভারতীয়, হঠাৎ সে ঘোষণা করে অজ্ঞাতবাসে চলে যায় আবার হঠাৎ সে খ্রীষ্টীয় আশ্রমে যোগদান করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ পরিহার করে। সুতরাং বাদলকে ভুলে গিয়ে বাদলের তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করার সুযোগ লেখক আমাদের দেয়নি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি সুধী এবং উজ্জয়িনীও মানবিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কে অবশ্য কোন বিতর্ক নেই; তারা কাহিনীর পটভূমিকা বচনা করেছে। বাদলের রায়বাহাদুর বাবা, অশোকার প্রণয়ী, দে সরকার প্রভৃতি চরিত্র আমদানি কবে লেখক যথেষ্ট কৌতুক রস সৃষ্টি কবেছেন। সুতবাং নিঃসন্দেহে সত্যাসত্য বইখানি উপন্যাস হয়ে উঠেছে। কাবণ আমবা জানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু; কিন্তু একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীব উপন্যাসের চবিত্র হতে বাধা নেই। চিন্তাব মানবিকীকবণ সার্থকভাবে ঘটলেই তা উপন্যাস।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই: 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি কি রূপক? আমাব মনে হয় লেখক ভূমিকায় কতকগুলো কথা বলে পাঠককে যথেষ্ট বিভ্রান্ত কবছেন। প্রকৃতপক্ষে সার্থক রূপক জাতীয় উপন্যাস লেখাব ক্ষমতা একমাত্র জার্মান জাতিবই আছে। হাইন্ বা টমাস মান বা কাফ্‌কার বই আমাদের এক স্বতন্ত্র রূপক জগতে নিয়ে যায়; সেখানকার বাতাসেব আনবিক সংমিশ্রণ স্বতন্ত্র। অন্নদাশঙ্কব পুবোপুরি বাস্তববাদী ঢঙে বাস্তববাদী উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁব চবিত্ররা রক্তমাংসের মানুষ; এবং আমাদেব পরিচিত জগতে তারা চলাফেরা করে। তবে ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক সার্থক উপন্যাসেরই কিছু রূপক লক্ষণ থাকে, কারণ উপন্যাস জীবনের অর্থময় প্রকাশ। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'বা 'যোগাযোগে'র চেয়ে অধিকতর রূপক-লক্ষণাক্রান্ত নয়। বইখানি রূপক না হোক, এটি বাংলাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং অন্নদাশঙ্করেব শ্রেষ্ঠ কীর্তি এটুকু জেনেই আমরা সন্তুষ্ট।

সত্যাসত্য রচনার পব অন্নদাশঙ্কর আরও দার্শনিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর পঞ্চাশোত্তর যুগে লেখা 'কন্যা' নামক উপন্যাসটি এই দার্শনিক ভাবনাব অন্যতম ফল। চার তরুণ বন্ধু চিরন্তনী নারীর সন্ধানে বহির্গত হয়েছে। তিন বন্ধু বহু আয়াস ও সাময়িক সার্থকতার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে চতুর্থ বন্ধুকে অনুরোধ করছে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে। অপ্রাপ্যকে পাওয়ার সাধনাই মানুষের চিরন্তন সাধনা; ব্যক্তি মানুষ ব্যর্থ হয়, কিন্তু অনুসন্ধানের স্রোত অব্যাহত থাকে,—এই ধরণের একটি বক্তব্য কাহিনীটিতে পরিস্ফুট

হয়েছে। চার বন্ধুর চারটি উপকাহিনী অনাবশ্যক জটিলতায় ভারাক্রান্ত। 'কামিনী কাঞ্চন' নামক একটি ছোট গল্প সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে জীবন-বৈরাগ্যের সুর শোনা যায়। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই' গোছের একটা মনোভাব প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর 'রত্ন ও শ্রীমতী' নামক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ উপন্যাসে তিনি একটি বড় রকমের বক্তব্য বলতে চেয়েছেন। বইখানির প্রথম খণ্ড ছাড়া অন্যান্য অংশগুলো এখনো পড়ার সুযোগ পাইনি বলে এখানে আলোচনা করতে পারছি না। প্রথম খণ্ডটি পড়ে মনে হয়েছে লেখকের অতিকথনের ঝোঁক এখন দোষে পরিণত হয়েছে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যাযাবরী প্রবণতা বিংশোত্তরী লেখকদের অন্যতম চরিত্রগত বিশেষত্ব। বুদ্ধদেবের সাড়া উপন্যাসের পাইকারী প্রেম-তৃষ্ণার মধ্যে, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বাসনার মধ্যে, অন্নদাশঙ্করের বাদলেব সত্যানুসন্ধানের মধ্যে এই যাযাবরী মনোবৃত্তি প্রতিফলিত। এই যাযাবরী প্রবণতার মধ্যে অনেক সময়ে একটু সুবিধাবাদ প্রচ্ছন্ন থাকে। জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে না পড়ে, জীবনের কোন দায়িত্ব স্বীকার না করে উপর থেকে জীবনের ভাল ভাল জিনিসগুলি উপভোগ করার ইচ্ছার মধ্যে এই সুবিধাবাদ নিহিত রয়েছে। প্রবোধ সান্যালের মধ্যে এই সুবিধাবাদ সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে।

এ কালেব অন্যান্য লেখকদের মত তিনিও সমাজের গতানুগতিক নৈতিকতার পক্ষপাতী নন, তিনি আমাদের সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটিকে আমূল রূপান্তরিত করতে চান। কিন্তু অন্যান্য লেখকদের মত কোথাও স্পষ্ট দ্বর্থ-হীন ভাষায় তিনি এসব কথা খুলে বলেননি। উচ্ছ্বাসপূর্ণ অলঙ্কার-বহুল ভাষায় অস্পষ্টভাবে সমাজের বিরুদ্ধে একটা বিমূর্ত অসন্তোষ ও অভিযোগ প্রকাশে অবশ্য তিনি খুব সুদক্ষ, কারণ তিনি জানেন এই ধরণের অসন্তোষ প্রকাশে কারও তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। কিন্তু কোথায় কোন্ ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তিনি গররাজী ; কারণ তাতে অনেকের বিরূপতা অর্জনের আশঙ্কা থাকে। অপ্রচুর বিষয়বস্তুর উপর ভাষার সাহায্যে সুপ্রচুর আবেগ সৃষ্টির নাম ভাবাতিশয্য। এই

ভাবাতিশয্য সান্ন্যাল মশাইয়ের সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। পরমেশ্বরের কৃপায় বিনা আয়াসে প্রবোধবাবু বঙ্গভাষা সরস্বতীর উপর অখণ্ড আধিপত্য লাভ করেছেন। তিনি জানেন যে ইংরাজী ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও আশ্চর্য কৌশলে কোন কথা না বলেও অনেক কথা বলা যায়। 'মহা-প্রস্থানেব প্থে' থেকে শুরু করে সর্বত্রই তিনি ভাষা-লক্ষ্মীর এ সুযোগটির সদ্ব্যবহাব করেছেন। তাৎপর্যহীন বাস্তবতাহীন উচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। প্রবোধ সান্ন্যালের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে কৃত্রিম ভাবাবেগ সৃষ্টি। বিংশোত্তর যুগ সাহিত্যে যৌন-প্রাধান্যের যুগ। রোমান্টিক প্রেম পাঠকসমাজে চিরকালই আদৃত। কিন্তু এ যুগে প্রেমকে তাব দৈহিক সীমানাব মধ্যে টেনে নামানোর ফলে পাঠকসমাজে বিপুল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধিমান প্রবোধবাবু অন্য লেখদের দুরবস্থা দেখে নিজেব জন্য একটি অভিনব রাস্তা উদ্ভাবন করেছিলেন। রোমান্টিক প্রেমের অনুকূল পরিবেশ বচনা কবে, সমাজ-বিরোধী প্রেমের পুবোপুরি আবহাওয়া তৈবী করে, এমন কি যথেষ্ট যৌন-আবেগ সৃষ্টিব অনুকূল বর্ণনা দিয়ে, শেষ পর্যন্ত প্রেমেব সম্পর্কটাকে দেহ-সংশ্রব বর্জিত রেখে দেওয়া। পাঠক নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, অথচ নীতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে না। প্রেমেব এই কৃত্রিম, এবং বলা বাহুল্য অবাস্তব ভাবাবেগ সৃষ্টি কবে 'প্রিয়-বান্ধবী' বইতে তিনি বিপুল সার্থকতা লাভ করেন। তাবপব, থেকে বইয়েব পব বইতে তিনি এটাকেই তাঁর ব্যবসায়ের অপরিহার্য অনুসঙ্গ হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন।

যে লেখক এই চিন্তার স্বাধীনতার যুগেও নিজেব ধ্যান-ধাবণা বিশ্বাসকে সাহিত্যে অকপটে প্রকাশ করেন না, তিনি অসাধু লেখক। এই অসাধুতা প্রবোধবাবুর চবিত্রগত বিশেষত্ব। আমি আগেই বলেছি বিংশোত্তব লেখকগণ গতানুগতিক নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা প্রাক্-বিবাহ প্রেমের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। প্রেমহীন বিবাহিত জীবন অপেক্ষা বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম, এমন-কি যৌন-সম্পর্ককে পর্যন্ত তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। এই আবহাওয়ায় বর্ধিত প্রবোধ সান্ন্যালের চিন্তাধারা কিছু ভিন্নতর ছিল বলে অনুমান কবার কোন কারণ নেই। প্রথম জীবনে লেখা 'কলবব' 'নবীন যুবক' প্রভৃতি কিছু কিছু বইতে তিনি প্রচলিত সমাজ নীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে উদ্‌ঘাটনও করেছেন। কিন্তু তারপরেই তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। তিনি আবিষ্কার করেন যে সাহিত্যে কিছু যৌন সুড়সুড়ি দিতে পারলে পাঠক সংখ্যা বাড়ে,

কিন্তু নীতি বিষয়ক অকপটতা জনপ্রিয়তার পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে, সুতরাং বুদ্ধিমান লোকের মত তিনি প্রথম রাস্তাটিকে অবলম্বন করে উপরে আলোচিত এমন এক আশ্চর্য যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অথচ যৌন-সম্পর্ক রহিত প্রেমের ভাবাবেগ উদ্ভাবন করলেন যা বিশ্ব-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। এ জিনিস বিদেশে প্রচারিত হলে বিদেশী সমালোচকগণ বাংলা উপন্যাসের প্রশংসা করতে না পারুন, বাঙ্গালী বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন নিঃসন্দেহে।

তাঁর প্রথম বই 'কলরবে' শক্তির পরিচয় ছিল। এইটিই বোধ করি বাংলায় প্রথম নায়ক-হীন উপন্যাস। কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ কোন সমস্যা অবলম্বন করে এ বইয়ের কাহিনী গড়ে ওঠেনি। লেখক একটি অঞ্চলের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে সমাজ-জীবনের মৌল ব্যাধির সন্ধান করেছেন এই বইতে। বাইরের শোভন নৈতিক পরিচ্ছদের আড়ালে সমাজ জীবনে যে অন্তঃশ্রাবী দুর্নীতি ও ব্যভিচারের স্রোত চলেছে লেখক কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রের সাহায্যে তা তুলে ধরেছেন। মানব-প্রকৃতি-বিরোধী সমাজনীতি যে অন্তঃস্রোতের মত সমাজ-দেহকে কলুষ জীর্ণ করে তুলছে এই বক্তব্য বইতে প্রত্যয়-সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং বইয়ের বিষয়বস্তুই এমন যে কোন চরিত্র-বিশেষকে নায়ক করার প্রয়োজন লেখক বোধ করেননি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেক চরিত্র ও ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করার মধ্যে লেখকের মুন্সীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু লেখকের এই শক্তিই কালক্রমে লেখকের দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন খণ্ড-কাহিনী বা 'এপিসোড্'কে চিত্তাকর্ষক করে তোলার ক্ষমতা লেখকের আছে। কিন্তু একটি বৃহৎ কাহিনীতে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রম-বিবর্তন ও ক্রম-পরিণতির ধারাকে চিত্রায়ত করার যোগ্যতা তাঁর নেই। কলরবে'র এপিক-ধর্মী কাঠামোতে অনেকগুলো খণ্ড-কাহিনী বেশ জমে উঠেছে এবং সেগুলোর মধ্যে একটা আন্তর-ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে লেখক যখন নায়ক-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন তখনও তিনি পর পর শুধু কতকগুলো বিচ্ছিন্ন খণ্ড-কাহিনীই অঙ্কিত করেছেন, সে কাহিনীগুলোর মধ্যে না আছে ধারাবাহিকতা, না আছে ক্রমিক অগ্রগতি। 'কলরবে'র খণ্ড-কাহিনীগুলির সঙ্গে এগুলির তফাৎ এই যে এগুলিতে একই চরিত্র বারবার দেখা দিয়েছে। সুতরাং খানিক দূর পড়ার পরই কাহিনীগুলি ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। চরিত্র ও কাহিনীর কোন ক্রম-বিকাশের

বালাই না থাকার ফলে প্রবোধবাবু তাঁর কাহিনীকে লাটাইয়ের সুতোর মত যত দূর ইচ্ছা টেনে লম্বা করতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা একটা আকস্মিক নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন। আসল কথা প্রবোধ সান্যালের মত কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা মনে করেন যে উপন্যাসকে ভ্রমণ কাহিনীর মত লেখা যায়। উপন্যাস রচনায় কোন রীতি অনুসরণ করাব আবশ্যকতা নেই, কেবল পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখতে পারলেই হল। উপন্যাসও যে একটি শিল্প-কর্ম, তার যে একটি আভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্র থাকবে,—এ-কথা তাঁরা ভুলে যান। তার ফলে প্রবোধ সান্যালেব ভ্রমণকাহিনীগুলি উপন্যাস হয়ে উঠেছে এবং তাঁর উপন্যাসগুলি ভ্রমনণকাহিনী হয়ে উঠেছে।

কৃত্রিম ভাবাবেগ এবং ভাবাতিশয্য প্রবোধ সান্যালেব 'এপিসোড'-ধর্মী উপন্যাসের মূল অবলম্বন। এব সাহায্যে তিনি এমন এক বিচিত্র কল্পনার জগৎ সৃষ্টি কবেন যা না বোমান্টিক না বাস্তববাদ-সম্মত। তাব কল্পনাবিলাসেব অনন্যতা বুদ্ধিমান পাঠকের প্রত্যয়-বোধকে নির্মমভাবে নির্দয়ভাবে আঘাত করে। সুখের বিষয় বাংলাদেশের পাঠক সমাজের মধ্যে নারী এবং বালকের সংখ্যাধিক্য। এবং এই উভয় জাতিরই বাস্তবের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ বলে অলস কল্পনা তাদের প্রত্যয়বোধকে পীড়িত করে না। প্রবোধবাবুর এই কল্পনাবিলাসিতাব মধ্যেও বৈচিত্র্যেব বড় অভাব। তাঁর ভাণ্ডারে মোটামুটি গুটিতিনেক ফরমূলা বা সূত্র আছে: এই সূত্রগুলোকে পরিবর্ধিত করে স্থান কাল পাত্র পরিবর্তন করে তিনি অজস্র অজস্র উপন্যাস রচনা করেছেন। সুতরাং তাঁব তিনটি উপন্যাস আলোচনা করলে মোটামুটিভাবে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা করা হয়।

তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী নামক উপন্যাসে এই 'কামগন্ধহীন' অথচ কাম উদ্দীপক প্রেমের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ দেখা যায়। নায়িকা শ্রীমতী ও নায়ক জহবের পিতৃমাতৃ বা পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানতে পারি। কিন্তু তারা অনায়াসে বিনা বাধায় বিনা প্রতিবাদে অসামাজিক জীবন যাপন করতে পারছে দেখে ষোল বছরের তরুণ পাঠক অনায়াসে ঈর্ষান্বিত বোধ করবে। তারা বাক্‌পটু; বলা যায়, ঐ একটি গুণই তাদের আছে। সমাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে তারা ছদ্ম-পরিচয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় এবং রহস্য-জনক উপায়ে তাদের অন্নসংস্থান হয়। একবার তো শ্রীমতী সন্ন্যাসিনী সেজে

এবং জহর তার ভক্ত শিষ্য সেজে অনেক টাকা উপার্জন করে ফেলল। বলা বাহুল্য, কাহিনীতে শুধু দৃশ্য পরিবর্তন আছে, কোন অগ্রগতি বা পরিণতি নেই। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী এই আস্থা প্রকাশ করছে যে তার বিদেহী প্রেম ঈশ্বর প্রেমের মতই জহরের জীবনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে। কৃত্রিম ভাবাবেগের এই অঘটন-ঘটন পটীয়সী ক্ষমতা প্রবোধবাবুর আর একটি মূল্যবান আবিষ্কার।

'আলো আর আগুন' নামক উপন্যাসে তিনি আর এক ধরনের আগুন-ঝরানো প্রেমের বিবরণ দিয়েছেন। নায়ক এক মূর্তিমান বিদ্রোহী, সে সমাজের তথাকথিত আভিজাত্য বংশমর্যাদা-বোধ প্রভৃতি কিছুই মানে না এবং তার বিদ্রোহ প্রকাশের পন্থা হচ্ছে উদগ্র প্রেম এবং গুণ্ডামি। যে দুপুর রাত্রে রেন পাইপ বেয়ে উঠে দায়িতার ঘরে আসে। মেয়ের বাপ গুণ্ডার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নন দেখে সে তার ড্রয়িং রুমের আসবাব পত্র ভেঙ্গে দেয়। নায়ক-নায়িকা যে ভাষায় কথা বলে তা আগের দিনের যাত্রার দলের নায়ক-নায়িকার কাব্যিক ভাষাকেও হার মানায়। মোটের উপর 'আলো আর আগুন' বইতে বিদ্রোহের যে রূপ আছে তার বিবরণ পড়ে নকশালবাড়ি পন্থীবাও নিজেদের দৈন্য বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে।

'নদ ও নদী' উপন্যাসে বিদেহী প্রেমের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতার আরও সম্পূর্ণতর বিপুলতর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

নায়িকা দীর্ঘকাল ধরে নানা পরিবেশে নায়কের সঙ্গে বসবাস করে অবশেষে তাকে ত্যাগ করল পাছে কামগন্ধহীন প্রেমের মধ্যে কামতৃষ্ণা প্রবেশ করে। নায়িকাহীন নায়ক ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কর্মযজ্ঞে মেতে উঠল এবং অনতিবিলম্বে কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে শুরু করে লেখকের অসীম বদান্যতায় কোটি কোটি টাকা মূলধনের কারখানার মালিক হয়ে বসল।

প্রেমহীন হৃদয় নিয়ে সে শ্রমিকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাল। দূর থেকে নায়িকা নিজের হৃদয়ে (টেলিপ্যাথির সাহায্যে?) এই হৃদয়হীনতার সংবাদ জানতে পারল। তারপরেই কারখানার এক সংকটজনক সময়ে নায়িকার আবির্ভাব ঘটল রঙ্গমঞ্চে। প্রেমের এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা যে নায়িকার আদেশে নায়ক তার সমস্ত কলকারখানা, সম্পদ, এমন কি হর্ষবর্ধনের মত নিজের পরিধানের বস্ত্রখণ্ড পর্যন্ত বিতরণ করে নিজের নগ্নদেহখানি মাত্র সম্বল করে স্থান ত্যাগ করল। কমিউনিস্টরা বইখানি পড়ে দেখলে পারেন। তাঁরা জানতে

পারবেন যে শ্রমিক আন্দোলনের কষ্টসাধ্য পথের কোন দরকার নেই। টাটা বিড়লাদের একটি একটি করে নায়িকা জুটিয়ে দিতে পারলেই তারা তাদের যাবতীয় বৈভব জনসাধারনের হস্তে সমর্পণ করে বনবাসী হবে।

উপরে যে তিনটি প্লটের আভাস দিলাম এই তিনটি প্লটই অল্প স্বল্প বেশ পরিবর্তন করে সান্যাল মশায়ের অজস্র উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। আর সুশীল সুবোধ বাঙ্গালী পাঠকসমাজ এই উন্মত্ত প্রলাপের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি বিগত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে হৃষ্টচিত্তে পাঠ করে আসছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতবাদ ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ শৈলজানন্দ

বাস্তববাদ বনাম প্রাকৃতবাদ

ত্রিংশোত্তর যুগের উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ করতে হলে বাস্তববাদ ও প্রাকৃতবাদের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন উভয় রীতিরই উদ্দেশ্য বাস্তবের যথাসাধ্য অবিকল অনুকৃতি। কিন্তু বাস্তববাদ কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। বাস্তববাদের দাবী শুধু এইটুকু যে আমাদের পরিচিত দেশ-কাল থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হবে। এই সীমাবদ্ধতাটুকু মেনে নিয়ে বাস্তববাদী লেখক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বাস্তবের বহু বিভিন্ন প্যাটার্ন রচনা করতে পারেন। যিনি সমাজের কোন কুপ্রথাকে আক্রমণ করতে চান তাঁর কাছে বাস্তবের চেহারা একরকম; যিনি বাস্তবের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও প্রতিফলন দেখতে চান, তাঁর কাছে বাস্তবের আর এক ভিন্ন চেহারা প্রতিভাত। বাস্তব এত জটিল যে তার কোন আকার নাই, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীই তার উপর আকার আরোপ করে। ডিকেন্স ঘষা-কাচের ভিতর দিয়ে বাস্তবের এক বিকৃতিগ্রস্ত ও অতিরঞ্জিত চেহারা দেখেন। থ্যাকারে বাস্তবের মধ্যে তাঁর দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পান।

পক্ষান্তরে, প্রাকৃতবাদী রীতি একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুযায়ী বাস্তবকে নিরীক্ষণ করে; সুতরাং এই রীতিতে লেখকের স্বাধীনতা আরও সঙ্কুচিত। প্রাকৃতবাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সাম্প্রতিক কালের জীব-বিজ্ঞানের ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত এবং উনিশ শতকীয় ফ্রান্সের জোলা ফ্লাবেয়ার প্রভৃতির রচনায় এর প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলা চলে এই চিন্তাধারা অনুযায়ী মানুষের চরিত্র তার জৈব-প্রবণতা এবং পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত। কর্মে এবং চিন্তায় তার কোন সত্যিকারের স্বাধীনতা নেই। মুখ্যতঃ পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত বলে মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়, যদিও

সেজন্য হয়তো তাকে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করতে হয়। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী চুরি করার জন্য চোরকে শাস্তি না দিয়ে যে পরিবেশে মানুষ চুরি করতে বাধ্য হয় সেই পরিবেশের পরিবর্তন সাধন বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতবাদী লেখক সাধারণতঃ নিম্নতর সমাজ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন, কারণ নিম্নতর সমাজেই এই তত্ত্বের প্রকাশ সহজে চোখে পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাকৃতবাদী চিন্তায় কিছু মার্কসবাদী তত্ত্বচিন্তারও প্রভাব পড়েছে। সমাজ জীবনের পরিবর্তন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল এবং তার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। বর্তমান সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত এবং শ্রেণী-সংগ্রাম একটি বাস্তব সত্য। আমাদের দেশের বহু অ-মার্কসপন্থী লেখকও এই সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়েছেন।

বঙ্কিমের কাল থেকেই বাস্তববাদ ভিত্তিক উপন্যাস রচনার ধারা আমাদের দেশে চলে এসেছে। কিন্তু কেবল বিংশোত্তর যুগেই প্রাকৃতবাদী রীতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। ফরাসী লেখক জোলা মোপাসাঁ এবং নরওয়ের লেখক হুট হামসুনের প্রভাবই বাংলা উপন্যাসে সবিশেষ অনুভব করা যায় প্রাকৃতবাদী রীতির বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়াস খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়; তার কারণ প্রাকৃতবাদ-ভিত্তিক সাহিত্য প্রায় সমাজের দলিল চিত্র, তা সহজে কল্পনার সামগ্রী হয়ে উঠতে চায় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিপুল খ্যাতি ও প্রভাব প্রধানতঃ তাঁর প্রথম জীবনে রচিত কিছু সংখ্যক ছোট গল্পের উপর নির্ভরশীল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তাঁর 'বেনামীবন্দর' 'পুতুল ও প্রতিমা' এবং 'মৃত্তিকা' নামক তিনখানি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় এবং আরও দু'খানি গল্পগ্রন্থ 'ধূলিধূসর' এবং 'মহানগর' ১৯৪৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বই হিসাবে প্রকাশের আরও সাত আট বছর আগে থেকে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন, তা হলে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পগুলো লিখে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের তিনখানি উপন্যাস—'মিছিল', 'কুয়াসা' এবং 'উপানয়ন' ও খুব সম্ভব এই সময় সীমার মধ্যে রচিত। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' রচনা করেন। সুতরাং

চল্লিশ পূর্তির পূর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভা-সূর্য মধ্যাহ্ন-গগনের প্রচণ্ড দীপ্তি বর্ষণ করে পশ্চিমাকাশের দিকে ঢলে পড়েছিল।

সাহিত্য তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল, পয়সা দেয়নি। পয়সার জন্য তিনি সিনেমার গল্প লিখতে শুরু করেন, এবং হয়তো সিনেমার গল্প লিখতে লিখতেই এক সময়ে তাঁর সাহিত্যের কলম ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি কিছু উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন, কিছু ভাল ছোটদের গল্পও লিখেছেন; কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইংরেজ কবি ওআর্ডস্ওআর্থ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের মধ্যে মাত্র দশ বছরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। সুতরাং ওআর্ডস্ওআর্থের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রও আর একবার করে প্রমাণ দিলেন যে সাহিত্য শুধু লিপি-কুশলতা নয়, তার মধ্যে প্রেরণা বলেও কিছু একটা জিনিস আছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প উপন্যাসকে ঠিক প্রাকৃতবাদী রচনা বলে গণ্য করা সঙ্গত নয়। তবে এ কথা হয়তো ঠিক যে বিদেশী প্রাকৃতবাদী লেখকদের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। প্রাকৃতবাদের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস রয়েছে—মানুষের চরিত্র তার সহজাত প্রবণতা এবং পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত, সুতরাং তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই এবং কৃতকর্মের জন্য তাকে দায়ী করা চলে না—এই বিশ্বাসকে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রাকৃতবাদী লেখক-সঙ্গত বিষয়-নির্লিপ্ততা তাঁর প্রকৃতি বিরোধী। এক ধরণের কবি-সুলভ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে জীবনের মর্মান্তিক সত্য তাঁর সংবেদনশীল মনে যে গভীর হতাশা ও বেদনা-বোধ জাগ্রত করে তাকে তিনি বর্জন করতে পারেন না বা বর্জন করতে চান না।

তাঁর গল্পের আপাত শুষ্ক এবং আবেগ-লেশহীন উপস্থাপনার পিছনে যে এক গভীর অনুভূতিশীল কবি-প্রাণ লুকিয়ে আছে তা হঠাৎ পাঠকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু অভিনিবেশশীল পাঠক সহজেই অনুভব করবেন যে এই গল্পগুলি আদৌ তাঁর মনে জীবন সম্পর্কে এক নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-বোধ জাগ্রত করার জন্য পরিকল্পিত নয়। বরং একটা আপাত নির্লিপ্ততার ভান করে এক সুচতুর পরিকল্পনার সহোয্যে গল্পগুলো পাঠক মনকে একটি বিশেষ অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তের দিকে পৌঁছে দিতে চায়, যা আসলে মোটেই বিজ্ঞানোচিত নয়। গল্পগুলির কাব্যধর্মিতা ভাষার আড়ম্বরের মধ্যে নয়, ভাষার সুকঠোর সংযমের মধ্যে; অল্প কথা বলে অনেক না বলা কথার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করার মধ্যে। এক

সুনির্বাচিত বাস্তবকে উপস্থাপিত করে, সুর-সাম্য বজায় রেখে ঘটনা বিন্যাস করে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাষায় অতি সাধারণ ঘটনাকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলে, ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুৎ চমকের মত আকস্মিক ভাবে একটি হ্রস্ব অথচ মর্মান্তিক লেখকের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে গল্পগুলি এক ভাষার অতীত মোহভঙ্গ জনিত আবেগ সৃষ্টি করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আধুনিক কবিতার রীতি আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের রীতির মধ্যে অনেক মিল আছে।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে লেখককে এক দার্শনিক ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে তিনি মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা এক কুটিল নিয়তিকে দেখতে পাচ্ছেন যে নিপুণ পরিহাস রসিকের মত মানুষকে অনেক কিছু দিয়েও সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার এক মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র করে। তারই ফলে মানুষের একদিনের ভালবাসা আর এক দিন বাসি হয়ে জীর্ণ হয়ে প্রবল ঘৃণায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সুন্দর জীবনের কামনা অকরুণ রৌদ্র দহনে শুষ্ক হয়ে শীর্ণ হয়ে এক বীভৎস বিকৃত পরিণতিতে প্রতিভাত হচ্ছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে রোমান্টিক জীবন স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল—মানুষ মূলতঃ ভাল, উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে মানুষ এই পৃথিবীতেই এক স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করতে পারবে—সেই রোমান্টিক স্বপ্নের মোহ-ভঙ্গ-জনিত ওল্টানো রূপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যের সামগ্রিক ফলশ্রুতি। সেইজন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকে ইনভার্টেড্ রোমান্টিসিজম্ আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর মধ্যে টমাস হার্ডির নিয়তিবাদের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যায়। বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা, সাম্রাজ্যবাদের দংষ্ট্রবিকাশ প্রভৃতি ঘটনাগুলি জাতীয় জীবনে যে সাময়িক হতাসা সৃষ্টি করেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে তাই অসাময়িক রূপ গ্রহণ করে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে এক নিদারুণ সিদ্ধান্তে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল। সভ্যতার পালিশ জীবনের এক বহিরাবরণ মাত্র; তার আড়ালে মানুষের আদিম বর্বর প্রবণতাগুলি এখনো অস্ত্র শানিত করছে—ফ্রয়েডের এই বক্তব্যের এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করেছিল বিশ্ব যুদ্ধের বিপুলায়তন সুসংগঠিত ধ্বংসযজ্ঞ। আর তাই মানব অস্তিত্বের এক মর্মান্তিক সত্য হিসাবে গভীর মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিলে 'বাংলাদেশের নিভৃত কোণের বাসিন্দা এক কবি-প্রাণ লেখকের মনে।

'হয়তো' নামক প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ছোট-গল্প থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। এক দুর্যোগময় রাত্রে একটি ভাঙা সেতু পার হওয়ার সময় একটি

মেয়ে হঠাৎ নীচে পড়ে গেল। সঙ্গী পুরুষটি হতভম্ব। তখন লেখক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করলেন। তারা যখন চলে গেল তখন পিছন থেকে তিনি শুনতে পেলেন মেয়েটি বলছে যে, ছেলেটি তাকে ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিল বলেই তার মনে হয়েছিল। এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাটুকু শুনে লেখকের মনের কল্পনায় একটি কাহিনী দানা বেঁধে উঠল। ছোট-গল্পটাই একটা কল্পনা-করা জিনিস কিন্তু সেই কল্পনার মধ্যে আর একটি কল্পনার অবতারণা করাটা অভিনব। অনেক নাটকে যেমন অভিনয়ের মধ্যে অভিনয়ের কথা থাকে। 'হয়তো' এবং আরও এক-আধটি গল্পে কল্পনার মধ্যে কল্পনা হয়তো লেখক নিছক অভিনবত্ব হিসাবেই অবতারণা করেছেন, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে লেখকের রচনা-বৈশিষ্ট্যের খানিকটা আভাসও পাওয়া যায় না কি ?

'হয়তো' গল্পে লেখক অতঃপর যে কল্পিত কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ মেয়েটি একটি ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়িতে বধূ হিসাবে এসে উপস্থিত হল। তার স্বামী মহিমও এই ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। ঘৃণা, সন্দেহ, আর তাদের ঢেকে রাখার জন্য ছলনা—এই হল মহিমের মানসিক বৈশিষ্ট্য। লাবণ্যের অসহায় বধূজীবনের ভীতি আর এই ঘৃণা-সন্দেহ, এই দু-এর টানা-পোড়েনে অবশেষে মহিম একদিন লাবণ্যকে নিয়ে সুস্থ-জীবনের ব্যক্ত উদ্দেশ্যে—অথচ লাবণ্যকে কোন ফাঁকে জীবন থেকে সরিয়ে দেবার গোপন অভিসন্ধি নিয়ে—বেরিয়ে পড়ল।

গল্পটির বিশেষত্ব হল একটি বিশেষ ঘটনা যেন সাধারণ সত্যের রূপ নিয়েছে। ঘৃণা এবং জিঘাংসা যেন মানব চরিত্রের আসল পরিচয় যাকে লেখক আবরণ থেকে উন্মোচন করেছেন। সুতরাং এ গল্পের উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থে বাস্তবের অনুকৃতি নয় ; লেখকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবের পুনর্গঠন। কল্পনার মধ্যে কল্পনার অবতারণা করে লেখক হয়তো এই শিল্প-প্রক্রিয়ারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই পর্যায়ের আরও কয়েকটা গল্পের আলোচনা করা যাক। 'শৃঙ্খল' গল্পে বৌ-এর পক্ষ নিয়ে ছেলে মাকে গঞ্জনা দেয়। কিন্তু তা বৌ-এর প্রতি ভালবাসার মোহে নয়। বৌকেও সে তেমনি ঘৃণা করে। ফলে বৌ-ও তাকে ঘৃণা করতে শিখল। মায়ের মৃত্যুর পর সে বৌকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চাইল। বৌ তার চাল ধরে ফেলে সময়মত তার পিছু নিল। জীবনভরই তারা পরস্পরকে ঘৃণা করেই চলেছে ; তবু কেউ কাউকে ছাড়তেও পারে না। ঘৃণা করবারও তো একটা অবলম্বন চাই। 'কুয়াশা' গল্পে একটি

অসহায় বাল-বিধবা মেয়ের মনে প্রেম জাগ্রত করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল যে ছেলেটি, তার বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েটি আত্মহত্যা করল। 'মৃত্তিকা' গল্পে আছে একটি ভয়ংকর অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের মুহূর্তে তা সফল হল না। ভূমিকম্প হয়ে গোটা বাড়িটাই বিধ্বস্ত হল। 'পুন্নাম' গল্পে বাপ-মায়ের ভবিষ্যতের আশা বংশের একমাত্র দুলাল ছেলেটি অস্বাভাবিক রকমের স্বার্থপর। তার ধারণা পৃথিবীর যত ভাল ভাল জিনিস সব তারই জন্য, এবং সে-সবের উপর তার একচেটিয়া অধিকার সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ছোট ছেলের এই সহজাত স্বার্থবুদ্ধি মানবিক আদর্শে বিশ্বাসী পিতার মনে নিদারুণ আঘাত করে। এই পর্যায়ের গল্পগুলি মধ্যে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'চিরদিনের ইতিহাস', 'পতঞ্জলি রায়' প্রভৃতি আবও কয়েকটি গল্প উল্লেখযোগ্য।

লক্ষণীয় যে উল্লিখিত সবগুলি গল্পেই লেখক শুধু মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা সন্দেহ, স্বার্থপরতা আর প্রতিশোধ গ্রহণের চিত্র উপস্থিত করেছেন। মানুষের এই সব জঘন্যতম বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টি এবং বিকাশের জন্য যে অনুকূল আবহাওয়া প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি রেখে লেখক তাঁর কাহিনীর জন্য সবচেয়ে নারকীয় পরিবেশ কল্পনা করেছেন। ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় (সাজেস্‌টিভ) ঘটনা এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক যে নিটোল কাহিনী গড়ে তুলেছেন তার ভিতরে যাতে মানুষের এই বৃত্তিগুলি ষোল আনা নাটকীয় ভয়াবহতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ফলে কাহিনীর বীভৎস জগৎটি পাঠকের মনে দাগ কেটে বসে যায় আর জীবন সম্পর্কে একটা দারুণ নৈরাশ্যের অনুভূতিতে তার মন আচ্ছন্ন হয় নরকে বিভিন্ন পাপের জন্য বিচ্ছিন্ন শাস্তির কতকগুলো ধারাবাহিক দৃশ্য সম্বলিত একটি সুপরিচিত পটচিত্র আছে। শিশুমনে এই চিত্রটি দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করে; জীবনের কারাগারে একটু এদিক-ওদিক হেলার শোচনীয় পরিণাম দেখে সে স্বভাবতই শিউরে উঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গল্পগুলো বয়স্ক পাঠকের মনেও অনুরূপ ত্রাস সৃষ্টি করে; তার মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে জীবনে বিশ্বাস, ক্ষমা, ভালবাসা সবই মায়া মাত্র, আসল শাশ্বত সত্য হচ্ছে ঘৃণা, সন্দেহ, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সব গল্পই এই পর্যায়ের নয় (অন্যান্য পর্যায়ের গল্পের আলোচনায়

পরে আসছি)। কিন্তু এই গল্পগুলোর মধ্যেই প্রেমেন্দ্রবাবুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী সুপরিস্ফুট হয়েছে। যে সাহিত্যিক ভাবধারার মধ্যে তিনি লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিবাহক এই গল্পগুলি।

আমাদের দেশের ক্ষয়িষ্ণু, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থাই যদিও লেখাগুলোর কেন্দ্র, কিন্তু লেখক নিজেও এই সমাজের অংশীভূত বলে, সমাজের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেও ক্ষত-বিক্ষত বলে, নিজের বিষয়বস্তু থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। ফলে এই সমাজ-ব্যবস্থা থেকে কোনদিনই যে মুক্তি সম্ভবপর সে বিশ্বাস লেখক হারিয়ে ফেলেছেন, এমন কি মানব-জীবনের যে কোন ক্রম-কল্যাণকামী অগ্রগতির ধারা আছে সে-বিশ্বাসও তাঁর নেই। জীবনের যা-কিছু ভালো এবং সুন্দর, যা কিছু সুখকর, তা ক্ষণস্থায়ী, জীবনের শাশ্বত সত্য হল দুঃখ আর মৃত্যু। ('প্রথমা'র কবিতাঃ বুক দিল যে, ভুখ দিল যে দুখ দিতে সে ভুললো না; মৃত্যু দিল লেলিয়ে পিছে পিছে')। হতাশা আর ঘৃণার থেকে লেখকের মনে যে তীব্র অসহিষ্ণুতার জন্ম হয়েছিল, তার ফলে বস্তুজগতের নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। অথচ গল্পগুলি লেখকের সাব্‌জেক্টিভ্ ভাবনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হলেও উপস্থাপনার মধ্যে একটি আপাত নির্ব্যক্তিকতা আছে। এটাই গল্পগুলির শিল্পোৎকর্ষের কারণ।

দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাগ ঠিক কালানুক্রমিক নয়। মানুষের মনে একই কাল সীমার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী চিন্তা ও অনুভূতির জন্ম হতে পারে। চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কতকটা বিশুদ্ধি প্রত্যাশা করি; কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রত্যাশা অনুচিত। ইতিপূর্বে যে গল্পগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি লেখকের চরম বা তৃতীয় স্তরের রচনা। এক বিষণ্ণ জীবন দৃষ্টি এই স্তরের বিশেষত্ব। এর পূর্ববর্তী অর্থাৎ মধ্যম স্তরে লেখক বাস্তবের অপ্রীতিকর সত্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখনো মানুষর মহৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। তারও আগের প্রথম পর্বের রচনায় লেখক রোমান্টিক ভাবাদর্শগুলিতে বিশ্বাসী। এই পর্যায়গুলির মধ্যে যে সুস্পষ্ট কালানুক্রমিকতা আবিষ্কার করা যায় না তাতে প্রমাণ হয় যে লেখক তাঁর আবেগকে সচেতন চিন্তা প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে চেষ্টা করেননি। তার ফলে মনে এই

সন্দেহও জাগতে পারে যে বিভিন্ন গল্প রচনার পিছনে লেখকের মনে ততখানি প্রত্যয়-বোধ ছিল না, যতখানি ছিল গল্পকে শিল্প-সম্মত করার জন্য কোন না কোন বিশেষ 'পোজ্' গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা।

প্রেমেন্দ্রবাবুর মধ্যম পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে 'ময়ূরাক্ষী', 'মহানগর', 'ভস্মশেষ', 'সত্যমিথ্যা', 'লজ্জা', 'চুরি', 'সংসার-সীমান্তে', 'পটভূমিকা' প্রভৃতি পড়ে। এবং আরও আগে প্রথম পর্যায়ের মধ্যে 'শকুন্তলা', 'সংক্রান্তি', 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা', 'দিবাস্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের মধ্যে প্রেমেন্দ্রবাবুর 'মিছিল' প্রথম পর্যায়ের এবং 'উপানয়ন' মধ্যম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে লেখক 'সিনিক' হয়ে ওঠেননি। অনেকগুলোই সমসাময়িক কালের খুব প্রচলিত প্রেমের ব্যাপাবেব অম্ল-মধুব রস নিয়ে লেখা। লেখক তখন প্রেম মানুষকে মহৎ করে বা প্রেমের মোহিনী শক্তি আছে এ-সব কথা বিশ্বাস করেন। যেমন 'সংক্রান্তি' গল্পে নায়ক তার অপরিসীম দাবিদ্র্যের জন্য আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে আফিম খেয়েছিল। কিন্তু তারপর একটি পত্রে তার প্রেমাস্পদার দারুণ দুরবস্থার কাহিনী জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার প্রয়োজনে বেঁচে ওঠার তীব্র ইচ্ছা বোধ করতে লাগল। 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা' গল্পের নায়ক বিবাহ-বিরোধী। পিতার আদেশে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েও বৌকে তার পিত্রালয়ে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে একবার বৌয়ের পিত্রালয়ে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হওয়ার পর তার পূর্ব মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল।

'মিছিল' উপন্যাসটিতে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর বিচিত্র জীবনের একটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এই কর্মীরা প্রাণের আবেগে উচ্ছল, সমাজকে কলুষমুক্ত করতে তারা সর্বদাই ব্যগ্র। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেও লেখক মহৎ মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছেন এই বইয়ে; বইয়ের সুর মোটের উপর আশাবাদী।

মধ্যম পর্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই সমাজের নীচতা, কদর্যতা, কুসংস্কারসমূহ এবং উৎপীড়ন-ব্যবস্থা লেখকের মনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তবু এই পরিবেশের মধ্যেও যে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বই লোপ পেয়ে গেছে, বা এই সমাজ-শৃঙ্খলকে এড়ানোর ক্ষমতা যে মানুষের নেই, লেখক এখানে অতটা বিশ্বাস করেন না।

বরং এই সমাজের মধ্যেই তিনি এমন সব অদ্ভুত মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছেন, এমন সব ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখেছেন, যার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন না করে তিনি পারেন না। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রভাব আবিষ্কার করা যায়, তেমনি ব্যক্তিত্বপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

'সাগর সঙ্গমে' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন যে, একটি নিষ্ঠাবতী বিধবা একটি বেশ্যাকন্যার স্পর্শভয়ে ভীত। দৈবক্রমে নৌকাডুবির ফলে সেই মেয়েটি যখন অসহায় হয়ে বিধবাটির একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তাঁর ভিতর এমন মাতৃত্ব-বোধ জেগে উঠল যে তিনি তাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। মেয়েটির মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসে তাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন। 'লজ্জা' সতীত্বের নীতি অনুযায়ী ভ্রষ্টা অথচ অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববতী একটি মেয়ের কাহিনী। এ-সব গল্পে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

'মহানগর' গল্পে একটি মেয়ে দুর্বৃত্ত-দল কর্তৃক লুণ্ঠিত হবার ফলে পরিণামে বারবনিতা হয়েছে। পিতা তাকে গ্রহণ করেননি। তার ছোট ভাই বহুকষ্টে তাকে আবিষ্কার করল; সে যখন বুঝতে পারল যে সমাজ তার দিদিকে গ্রহণ করবে না তখন সে প্রতিজ্ঞা করল যে বড় হয়ে সে দিদিকে উদ্ধার করবে। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ক্ষুদ্র বালকের এই প্রতিজ্ঞা একদিন ভেসে যাবে আমরা তা বুঝতে পারি, কিন্তু সরলমতি বালকের প্রতিমার উল্লেখের মধ্যে লেখকের ক্ষীণায়মান আশাবাদের একটু প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না কি?

'উপানয়ন' উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত কদর্য পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কি করে একটি বালক ধীরে ধীরে শেষপর্যন্ত একটি দলের হাতে পড়ে পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত হল তার কাহিনী দিয়েছেন। এক সন্ন্যাসী শেষে ছেলেটাকে উদ্ধার করে সমাজ-কল্যাণের কাজে লাগান। এই বইয়ে প্রাকৃতবাদী সিদ্ধান্তের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছেঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল বা মন্দ নয়; পরিবেশই তাকে ভাল বা মন্দ করে। শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য যে রোমান্টিক ভাবনার জন্ম দেয় প্রতিকূল পরিবেশও তাকে একেবারে বিনষ্ট করতে পারে না।

'সংসার সীমান্তে' গল্পে এক বারবনিতা ও এক চোরের অদ্ভুত পারস্পরিক আসক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপীড়িত এবং পতিত নারীর মধ্যে একনিষ্ঠ ভালবাসার সন্ধান করতে পেরেছেন লেখক।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুয়াসা' উপন্যাসটি দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। কাহিনীর ভিত্তি একটি ফ্যাণ্টাসী—একটি দারুণ মানসিক ত্রাসের ফলে একজন যুবকের স্মৃতি বিভ্রম ঘটেছে; সে তার জীবনের সমস্ত পূর্ব-ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে; কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সবই অব্যাহত আছে। লেখক খুব মুন্সীয়ানার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিকভাবে প্রদ্যোতের স্মৃতি-ভ্রংশ-পরবর্তী জীবনের শূন্যতা-বোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার নিরলম্ব মন সহজেই অমলের পরিবারবর্গের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করল। গ্রামীন পরিবেশে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে তার মানবিক বৃত্তিগুলি অপূর্ব মাধুর্যে জাগ্রত হয়ে উঠল। অবশেষে তার জীবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটল। কিশোরীর সঙ্গে প্রথম প্রেমের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বর্ণনায় লেখক প্রায় রোমান্স-ধর্মী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বিবাহের প্রাক্কালে হঠাৎ কলকাতার পথে এক পূর্ব জীবনের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রদ্যোতের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল; মনে পড়ল সে এক দুর্বৃত্ত দলের সভ্য ছিল; সাংঘাতিক অপরাধজনক ঘটনায় লিপ্ত হয়ে সে পরিণামের আশংকায় স্মৃতিভ্রংশের কবলস্থ হয়েছিল। সুতরাং এই স্মৃতি জাগ্রত হওয়ামাত্র তার সুখীজীবন গঠনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মানুষ এক ভাগ্যহত প্রাণী; তারই অতীতের কৃতকর্ম নিয়তির মত তাকে নিরন্তর তাড়া করে ফিরছে; সুতরাং সুন্দর জীবন রচনা করার স্বপ্ন তার চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে। এমনি একটি বক্তব্য উপন্যাসটিতে আভাসিত হয়ে উঠেছে।

একটি কথা উল্লেখ না করলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর ঘোর অবিচার করা হবে। সেটা হল শিল্পী হিসাবে তাঁব নিরঙ্কুশ সততা। শরৎচন্দ্র-সুলভ আশাবাদ নিয়ে তিনি সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতার সামনে তাঁর আশাবাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তিনি অনমনীয় দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে রূপায়িত করলেন। তাঁর এই নেতিমূলক সাহিত্য বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয়ে সক্ষম কিনা তা তিনি একবারও বিবেচনা করেননি। তারপর যখন তাঁর নেতিবাচক জীবন দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনা অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তিনি সোজাসুজি সিনেমার ব্যবসাদারী গল্প লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর প্রকৃত শিল্প-গুণান্বিত গল্প আর সিনেমার অর্থকরী গল্প এ দুয়ের জাত আলাদা। পয়সার জন্য তিনি সাহিত্যের জগৎ ছেড়েছেন, কিন্তু কখনো প্রকৃত সাহিত্যের মধ্যে

জনপ্রিয়তার লোভে অন্য কোন ভেজাল আমদানি করেননি। তাঁর এই অনমনীয় সততা আধুনিক জনপ্রিয়তা-সন্ধানী লেখকদের কাছে উদাহরণ-স্থল। তাঁর শেষ পর্যায়ের লেখাতেও দুস্থ অত্যাচারিত রোগগ্রস্ত মানুষের জন্য তাঁর প্রচ্ছন্ন অব্যক্ত বেদনা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। মানুষের এক হীন পরিণাম আবিষ্কার করে তাঁর মন যে ক্ষোভমুক্ত হয়নি তার পরিচয় গুপ্ত আছে তাঁর সাহিত্যে। কিন্তু মানুষের হীন পরিণামের জন্য তিনি শ্রেণী বিশেষ বা রাষ্ট্রশক্তিকে দায়ী করেননি। মনুষ্য সমাজের অন্তরালবর্তী সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে লীন কোন রহস্যময়ী দুর্জ্ঞেয় শক্তি যেন মানুষকে এক অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা এবং নিষ্ঠুরতার পঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'র সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলো পড়লেই এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। মানুষের অপরিহার্য ভাগ্যের পিছনে এক ক্রূর অপরাজেয় রহস্যময়ী শক্তি কাজ করেছে এ অনুভূতি মূলতঃ কবির অনুভূতি। এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি এ কথা মনে রেখেই তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়া উচিত। কবি-সুলভ দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর গল্পগুলির পিছনে আছে বলেই সেগুলোর সিদ্ধান্ত আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক, তার অপরিহার্যতাকে আমরা অন্তত গল্প-পাঠ কালে অস্বীকার করতে পারি না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে আমরা ইংরেজ লেখক টমাস হার্ডির ভাগ্যবাদের প্রথম দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাই। এই ভাগ্যবাদের অনুভূতি শ্রেণী-শোষণ-ক্লিষ্ট জর্জরিত মানুষের কবি-সত্তার কাছে সত্য অনুভূতি বলে শিল্পে তার আত্মপ্রকাশ স্বীকার্য এবং মূল্যবান।
শিল্পী হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ শক্তির আর একটি প্রমাণ তাঁর কাহিনীগুলির গভীর ব্যঞ্জনাময়তা যা কাহিনী-উক্ত পরিবেশ বা চরিত্রকে অতিক্রম করে আমাদের বহুদূর টেনে নিয়ে যায়। 'পুন্নাম' গল্পের শিশুটি একটি বিশেষ শিশু নয়, সে মানব জাতির ঘরে বার বার করে যে উত্তরপুরুষেরা আসে তাদের সকলের প্রতিনিধি। তেমনি পতঞ্জলি রায়ের বেপরোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমগ্র সমাজ-দেহের অন্তর্গত বিষেরই প্রতিবিম্ব, নিছক কোন বিকৃত-বুদ্ধি মানুষের চিত্রায়ণ নয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিংশোত্তর যুগে প্রাকৃতবাদী রচনাদর্শের সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পেরেছিলেন শৈলজানন্দ! সেইজন্য বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে শৈলজানন্দের একটি বিশিষ্ট

স্থান আছে। জগদীশ গুপ্তের রচনাও মূলতঃ প্রাকৃতবাদী ; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে জ্বালাবোধের বড় প্রাবল্য ; বিজ্ঞানী-সুলভ নিস্পৃহতার তাঁর বড় অভাব। যে বামুন ঠাকুর নিজের সামাজিক মর্যাদার সুযোগ নিয়ে মুদির থেকে ধারে জিনিস নিয়ে ধার শোধ দেন না, বা যে শাশুড়ী বালিকা বধূর উপর সুযোগ পেয়ে অকথ্য অত্যাচার চালায় তারাও যে একটি ক্ষয়িষ্ণু বিকৃতি-গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থার শিকার, অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ এ কথা তিনি ভুলে যান। কিন্তু শৈলজানন্দ অত্যাচারীও যে অত্যাচারিত এ কথা অনুভব করার মত সূত্র কাহিনীতে রেখে দেন। 'খরস্রোতা' উপন্যাসের মাতৃহারা নায়ক মামাবাড়িতে উৎপীড়িত, কিন্তু মামীমা যে দারিদ্র্য পীড়িতা, জিনিসের যে প্রাচুর্য নেই, এ তথ্য তিনি যত্নের সঙ্গে কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রাকৃতবাদী আদর্শ অনুযায়ী লিখলেও শৈলজানন্দ মূলতঃ অন্তর-ধর্মী লেখক, জগদীশ গুপ্তের মত বুদ্ধি-ধর্মী নন। গভীর করুণাবোধের সঙ্গে অথচ অনুচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি মানুষের দুঃখকে চিত্রিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুঃখের সামাজিক অপরিহার্যতার পরিবেশ রচনা করেন। সহজে তিনি কারও উপর দোষারপ করেন না। যে অন্যায় বা নিষ্ঠুর আচরণ করছে তার এই আচরণও যে নিছক চারিত্রিক দীনতা নয়, তার পিছনেও যে সামাজিক কারণ বিদ্যমান—এই উপলব্ধিই তাঁর সহানুভূতিকে ব্যাপক করে তুলেছে। তিনি তাঁর কালের সামাজিক জীবন-যাত্রার মধ্যে—নিঃসীম দারিদ্র্য ও নিরন্ধ্র অজ্ঞতার মধ্যে—কোন আশার আলো দেখতে পাননি। কাজেই তাঁর অনেক রচনাতেই দুঃখবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে বলে অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রেমেন্দ্রমিত্রের মত তিনি দুঃখবাদকে বিস্তার করে মানুষ এক ভাগ্য-হত প্রাণী ; মানুষের জীবনে সৌন্দর্যবোধ শুধু কবি-কল্পনা,—এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে চাননি। গভীর দুঃখের মধ্যেও মানুষের কতকগুলি মানবিক বৃত্তি অপরিম্লান থাকে এ চেতনা তাঁর নৈরাশ্য পীড়িত কাহিনীগুলির উপর এক সান্ত্বনার প্রলেপ লেপন করেছে। যে মানুষ মরতে চলেছে, মরার মুহূর্তেও সে একেবারে দীন নিঃস্ব হয়ে যায়নি—শৈলজানন্দের কাহিনী পড়লে এইটুকু আশ্বাস অন্তত পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের মানবিক বোধের অপমৃত্যুই প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী জীবনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত শৈলজানন্দও কথাশিল্পী হিসাবে হারিয়ে

গিয়েছেন। শৈলজানন্দের সার্বিক সহানুভূতি-বোধ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও গাঢ়তা লাভ করে একটি দোষে পরিণত হয়েছে। মানুষের দুঃখ এত ব্যাপক যে সেই দুঃখানুভূতি থেকে তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চেয়েছেন। বিশেষ করে সিনেমার কাহিনী রচনার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দেখেছেন যে সাধারণ দর্শক প্রেক্ষাগৃহে কোন গভীরতা-স্পর্শী অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায় না। ইচ্ছাপূরণ মূলক কাহিনী, অনায়াস সুখ-সমাপ্তি জীবন-গতির স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ হলেও সাধাবণ দর্শকের কাছে প্রিয়। লেখকের প্রবণতা এবং দর্শক বা পাঠকেব অভিরুচি এইভাবে এক জায়গায় মিলিত হওয়ার ফলে শৈলজানন্দেব পববর্তী জীবনে রচিত অজস্র গল্প এবং উপন্যাস নেহাৎ সুখ-পাঠ্য কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। এসব কাহিনীতে অনায়াসে সমস্যাব জট-মোচন ঘটে, অনায়াসে অন্যায়কারী তার অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয় বা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। সুতরাং শৈলজানন্দ তাঁর প্রথম জীবনের রচনাগুলির জন্যই ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান, এবং এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছোট গল্পই প্রধান।

তাঁর 'কয়লা কুঠি' এবং 'নাবী-মেধ'-এ অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে স্মবণীয় হয়ে থাকবে। 'কয়লা-কুঠি'র গল্পগুলিতে সাঁওতাল কুলিদের জীবন-যাত্রার কাহিনী তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। এদের আচাব নিয়মের টুকি-টাকি বিশেষত্ব, এদেব বিশিষ্ট নীতিবোধ যা আমাদের সমাজের নৈতিক মান অনুযায়ী নৈতিক শিথিলতা বলে গণ্য হতে পারে, সর্বোপরি এদের বঞ্চিত অত্যাচারিত জীবনের অসহনীয় দারিদ্র্য—প্রভৃতির শিল্প-সম্মত বিবরণ লেখক নিষ্ঠাব সঙ্গে দিয়েছেন। মুনাফার জন্য অল্প পয়সায় অযত্নে রচিত কয়লার খাদগুলি যে মৃত্যু-ফাঁদ লেখক তার ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত কবেছেন। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র উপস্থিত করা লেখকের মুখ্য অভিপ্রায় নয়। এক অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে সাঁওতালদের আশ্চর্য জীবনীশক্তি ও জীবননিষ্ঠাই তাঁর বিস্মিত শিল্পী-দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে।

'কয়লা-কুঠী' নামক গল্পে নানকুর প্রতি বিলাসীর তীব্র আবেগবান প্রেমের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তারা বিবাহিত, কিন্তু নাইনু নামক একটি মেয়ের প্রতি নানকু আকৃষ্ট এই সন্দেহে বিলাসী মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন নানকু নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এইভাবে মান-অভিমান ভালবাসা সন্দেহের দোলায় তাদের দিন কাটতে কাটতে একদিন সত্যি সতি নানকু

নাইনুকে নিয়ে দূর দেশে পালিয়ে গেল। অগত্যা বিলাসী রম্না নামক তার এক পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে ঘর করতে লাগল, কিন্তু তার মন পড়ে রইল নান্কুর প্রতীক্ষায়। অবশেষে একদিন খবর পাওয়া গেল নান্কু কয়লার খাদের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। মৃত নান্কুকে শেষবারের জন্য দেখার আগ্রহবশতঃ সে রাত্রি-বেলা কেজ চালককে পয়সার লোভ দেখিয়ে কেজে করে নির্দিষ্ট খাদে অবতরণ করল। কেজটি যান্ত্রিক গোলযোগে মাঝপথে আটকে গেল; বিলাসী সেটাকে তল ভেবে নামতে গিয়ে অনেক নীচে পড়ে গেল। সে পড়ল তার স্বামীর মৃতদেহের উপর। স্বামীর সঙ্গে—একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা নিয়ে সে সুরঙ্গ পথে এগিয়ে চলল তিন নম্বর খাদের দিকে যেখানে আগুন জ্বলছে। একটি ছোটগল্পের পক্ষে কাহিনীটি যথেষ্ট দীর্ঘ, তথাপি লেখকের সুনিপুন বিন্যাসের ফলে গল্পটি কোথাও আকস্মিক বা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। শেষের দৃশ্যটির মর্মস্পর্শী বিবরণ দেওয়ার সময়েও লেখক ভাবাতিশয্যকে প্রশ্রয় দেননি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল চবিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সার্থকতা। সাঁওতাল নারীর সহজ সমানাধিকাব বোধের চেতনা, তার একরোখা প্রেম, তার দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি বিশেষত্ব অনায়াস নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'ধ্বংসপথের যাত্রী ওরা' নামক একটি গল্পে লেখক তখনকার দিনের এক নোংরা দরিদ্র মেসের চিত্র দিয়েছেন। দারিদ্র্য মানুষের সৎবৃত্তিগুলি নষ্ট করে দেয়; সুতরাং মেসের বাসিন্দাদের নীচতা ও মানসিক সঙ্কীর্ণতাকে লেখক চিত্রিত করেছেন। এই মেসে এসেছে গল্পের নায়ক চাকরির প্রত্যাশায়। সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে বলে পরিবেশেব কদর্যতা তাকে এখনো স্পর্শ করেনি। একটি শীর্ণ ভিখারিণী মেয়েকে সে তার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করে না। বাংলা কাহিনীর নায়ক দান করবে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু ভিখারিণীর চোখের গভীর কৃতজ্ঞতার চাহনিটুকু যে লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি এতেই লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

'নারী মেধ' নামক গল্পটিতে এক হঠাৎ বড়লোকের বাড়ির ঝি কী করে গৃহকর্তার লোভ-দৃষ্টিতে পড়ে, কী করে সে সাময়িকভাবে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে এবং পরিণামে কী করে অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্য তাকে করতে হয় প্রাণ দিয়ে তার এক বীভৎস শ্বাসরোধকারী চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। লোকচক্ষুর অগোচরে যে ঘটনা ঘটছে তার বিবরণ দেওয়ার সময় লেখক সার্থকভাবে ব্যঞ্জনা-ধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। এই একটি ক্ষেত্রে লেখক অত্যাচারীর প্রতি একটুও

করুণা প্রদর্শন করতে পারেন নি; করতে গেলে কাহিনীর রস-হানি ঘটত। অদ্ভুৎ বাক্-সংযমের সঙ্গে বর্ণিত এই কাহিনীটি পরবর্তীকালে রচিত সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পটির সঙ্গে তুলনীয়।

এই ধরণের কয়েকটি গল্পই শৈলজানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর প্রথম জীবনে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকলেও শেষপর্যন্ত খুব সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর 'খরস্রোতা' নামক উপন্যাসটিতে এযুগের যাযাবরী মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। নায়ক শশিশেখর মামাবাড়িতে মামীমার নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে আসে; দোকানদার সান্ন্যাল মশাইয়ের বাড়িতে সে সাদরে আশ্রয় লাভ করে; তাদের অবস্থা ভাল সুতরাং সে বোঝা-স্বরূপ গণ্য হয় না। কিন্তু সান্ন্যাল গৃহিণী তাকে আপন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে সে বন্ধন ভয়ে পলায়ন করে। এই পর্যন্ত কাহিনীটি খুব সুন্দরভাবে অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই সে অসদুপায়ে অনেক টাকা উপার্জন করছে এবং এক বারবণিতার মোহ-পাশে আবদ্ধ হয়ে তার পায়ে যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিচ্ছে। অবশেষে বারবণিতার প্রণয়ীকে হত্যা করে সে সাত বছরের জন্য কারাবাসে যায়। কারাগার থেকে ফিরে এসে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে প্রচুর ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে কিছুদিন কাটায়। সেই সময় সে পূর্বোক্ত বারবণিতা রোগগ্রস্ত মনিমালাকে মন্ত্রশিষ্যা করে। কহিনীর সমাপ্তিতে সে আবার সান্ন্যাল বাড়িতে অমলার কাছে ফিরে এসেছে। কাহিনীটির দুর্বলতা এই যে বিভিন্ন অধ্যায়ের গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত শিথিল। শশিশেখরের যাযাবর চরিত্র সর্বত্র রক্ষিত হয়নি; হলে সে বারবনিতাকে নিয়ে নীড় বাঁধার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ত না। অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেও শশিশেখর কোন সুষ্ঠু জীবন-বোধ আয়ত্ত করতে পারেনি।

'ছায়াছবি' উপন্যাসটিও অনুরূপভাবে ঐক্যবোধের অভাবে পীড়িত। কাহিনীর প্রথম অংশে জমিদার শ্যামসুন্দরের লাম্পট্যপূর্ণ জীবনের নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হয়েছে। শেষের অংশে তাঁর ছেলে মাণিকের অবৈধ প্রণয়িনী মণি ও বিবাহিতা স্ত্রী যমুনাকে নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনীকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দুটি কাহিনীর আবেদনও ভিন্ন। তবে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করলে দুটি কাহিনীই বেশ উপভোগ্য। প্রথম কাহিনীতে বাস্তবের এক মর্মান্তিক উদ্ঘাটন এবং দ্বিতীয় কাহিনীতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'গঙ্গা যমুনা' উপন্যাসটিতে এক স্বামীকে ঘিরে দুই সতীনের ভালবাসা ও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার কাহিনী বেশ জমে উঠেছে।

শৈলজানন্দের উপন্যাসগুলি রবীন্দ্র-শরৎ যুগের সঙ্গে বিংশোত্তর যুগের সেতুবন্ধন। পূর্ববর্তী যুগের বাঙালী জীবন-ভিত্তিক চিত্রের সঙ্গে তিনি নতুন যুগের দৃষ্টি ভঙ্গীর সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঘরে ফেরার পালা

চল্লিশোত্তর যুগের উপন্যাস অথবা রাজনীতির আবর্তে উপন্যাস।

বিংশোত্তর যুগে যাঁরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন তাঁদের রচনাসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রিশ সালের পর থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর তার মাত্র বছর পাঁচেক পর থেকেই আর একদল শক্তিশালী লেখকের সগৌরব আবির্ভাবের পদধ্বনি শোনা যায়। তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর, মাণিক, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতি লেখকগণ অপেক্ষাকৃত প্রবীণ এবং সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং পরবর্তী। সুবোধ ঘোষ বোধ করি বয়সে পূর্ববর্তীদের কাছাকাছি; যদিও লিখতে আরম্ভ করেছেন অনেক পরে। অবশ্য কিছু আগে থেকে লিখতে আরম্ভ করলেও চল্লিশ সালের পর থেকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব এবং প্রাধান্য বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। সেইজন্য এঁদের চল্লিশোত্তর লেখক বলেই উল্লেখ করব। এঁদের মধ্যে অনেকে বিংশোত্তর লেখকদের থেকে বয়সে প্রবীণ, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের আবির্ভাব পরবর্তী এবং পূর্ববর্তীদের প্রভাব তাঁদের উপর পড়েছে। তবে বিংশোত্তর লেখকদের মধ্যে যেমন চিন্তা-ভাবনার এবং রচনা রীতির সাযুজ্য অনুভব করা যায়, এঁদের মধ্যে তা যায় না। বিংশোত্তর লেখকদের প্রত্যেকেই কম-বেশী একই ক্লাবের বা আড্ডার সভ্য ছিলেন। কিন্তু চল্লিশোত্তর লেখকরা প্রত্যেকেই চিন্তায় এবং রীতিতে পরস্পর থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। এঁদের মধ্যে যে-টুকু মিল লক্ষ্য করা যায় তা এঁরা একই কালের লেখক বলে।

এক হিসাবে বলা চলে চল্লিশোত্তর যুগ বিংশোত্তর যুগের একই সঙ্গে অনুবর্তন এবং প্রতিবাদ। এ যুগের অধিকাংশ লেখকই রচনারম্ভের কালে শিল্প-কৈবল্যবাদের নীতির অত্যুজ্জ্বল আলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে গল্প উপন্যাসে ভাষা এবং বিন্যাস-কৌশলই প্রধান বিবেচ্য

বিষয়; কাহিনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার শিল্পমূল্যের কোন সম্পর্ক নেই। কাহিনীকে নীতি বা আদর্শ প্রচারের বাহন রূপে গণ্য করতেও তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন। তবে শিল্প-সঙ্গত কাহিনী রচনার উপর গুরুত্ব দিলে ও বিষয়বস্তুর উপর সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তাঁরা। তা ছাড়া তাঁরা নর-নারীর যৌন ব্যাপার সম্পর্কে বিংশোত্তর লেখকদের মত উচ্ছৃঙ্খল ভাষা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যে যে মানুষের গোপন ব্যাপারের অকপট প্রকাশ মনোরাজ্যের সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য তা তাঁদের অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বিংশোত্তর যুগে সামন্ততান্ত্রিক নীতির বদলে যে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ নীতির দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, এযুগে তার প্রবল সমর্থন না থাকলেও অধিকাংশ লেখকই নিঃশব্দে সে দাবীর যৌক্তিকতাকে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় এবং অন্যত্র চল্লিশোত্তর লেখকগণ যখন পূর্ববর্তীদের নানা কারণে তীব্রভাবে তিরস্কৃত করেছেন তখন সেই তিরস্কারের আড়ালে পূর্ববর্তীদের ঋণ অস্বীকার করার অবচেতন প্রয়াস ছিল। এক কথায় বলা চলে রবীন্দ্র-শরৎ যুগের পরে বিংশোত্তর যুগ এসেছিল বলেই চল্লিশোত্তর যুগ সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এ কালের লেখকরা যখন রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে রচনাধারা পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তখনও তাঁরা পূর্ববর্তীদের উল্লিখিত প্রভাবসমূহ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এ কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

পক্ষান্তরে চল্লিশোত্তর যুগ পূর্ববর্তী যুগের জলন্ত প্রতিবাদ। একালের লেখকরা বাংলা উপন্যাসকে বাঙালী সমাজের মধ্যে পুনর্বাসন দিতে চেষ্টা করেছেন। কারণ পূর্ববর্তীরা বাংলা উপন্যাসকে স্বদেশ থেকে উদ্বাস্তু করে একেবারে ইউরোপে প্রেরণের তোড়জোড় প্রায় পাকা করে এনেছিলেন। তাঁদের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা কেবল বেশবাসেই বাঙালী, চিন্তা ভাবনা মনোবৃত্তিতে তারা প্রায় সাহেব। তাঁদের উপন্যাসে কচিৎ কখনো বাঙালী সমাজের চিত্র যদি স্থান পেয়েছে তো সে শুধু সমালোচনার জন্য। চল্লিশোত্তর লেখকরা এই 'ছেলে বড় চাকুরে হয়ে বাপকে অস্বীকার করা'র মনোবৃত্তিকে অমর্যাদাকর ও হীনতা-ব্যঞ্জক বলে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিলেন। পরিবর্তে তাঁরা যে মনোভাবকে গ্রহণ করেছিলেন তা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের গোরার মনোভাবের কাছাকাছি: তুমি তোমার সমাজকে অস্বীকার করে বা ত্যাগ

করে তার সংস্কারসাধন করতে পার না। এই পরিবর্তিত মনোভাবের ফলে বাঙালী সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অংশের চিত্র আবার উপন্যাসে প্রাধান্যলাভ করল। জমিদার-প্রধান বাংলা, ঐতিহ্য-পুষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, বাঙালী জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ, গ্রাম-বাংলা—প্রভৃতি থেকে এ যুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু আহরিত হতে লাগল। সমাজকে নিছক সমালোচনা না করে তাকে বোঝার এবং ব্যখ্যা করার প্রবণতা দেখা গেল। সুতরাং পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনায় এযুগের উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত ব্যবধান খুব সহজে নজরে পড়ে, যদিও মৌলিক সাহিত্য নীতিগত পার্থক্য ততখানি প্রকট নয় অন্তত অনেক লেখকের ক্ষেত্রে।

যদিও সমাজ জীবনের বিভিন্ন অংশের চিত্রায়ণ উপন্যাসের লক্ষ্য হয়ে উঠল, তবু এ যুগে প্রাকৃতবাদের বদলে বাস্তববাদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে বাস্তবকে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিত্রিত করার নীতি অধিকাংশ বাঙালী লেখকের কাছেই খুব মনঃপূত পন্থা বলে গণ্য হয়নি।

লেখকগণ যাঁর যাঁর কল্পনা ও আদর্শবাদের রঙে বাস্তবকে রাঙিয়ে নিয়েছেন। তবে বাস্তবের চিত্রায়ণে পরিবেশের উপর গুরুত্বদান এবং নিম্নতর শ্রেণীকে কাহিনীর অংশীভূত করার প্রবণতা বেড়েছে। এই প্রবণতার ফলে এপিক-ধর্মী উপন্যাস রচনার দিকে এ যুগের লেখকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব যুগের উপন্যাসে যে মানস-কথন, ইম্প্রেশনিজম্, প্রতীক ধর্মিতা প্রভৃতির সামান্য সামান্য প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এ যুগে বাস্তববাদের প্রাধান্যের ফলে তা প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে বাস্তবতার আড়ালে রোমান্স-প্রিয়তা ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের রচনাতেই উঁকি ঝুঁকি মারে।

ভাষায় আধুনিকীকরণের প্রয়াস মোটামুটি অব্যাহত থাকলেও পূর্বযুগের ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। পূর্বযুগের কল্প-লোকের নায়ক-নায়িকাদের মুখে যে বুদ্ধিদীপ্ত শানিত ব্যঞ্জনাধর্মী এবং দ্যুতিময় ভাষা শোভন ও স্বাভাবিক ছিল, এ যুগের পরিচিত বাস্তব থেকে সংগৃহীত নায়কনায়িকাদের মুখে সে ভাষা শোভন ছিল না। সুতরাং বাস্তবতার প্রয়োজনেই ভাষা অনেকখানি ঘরোয়া স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করা ভাল, পূর্ববর্তী লেখকদের ভাষার উপর যতখানি আধিপত্য

ছিল—যে আধিপত্যের ফলে তাঁরা বাংলা ভাষাকে অনেক বেশী নমনীয়, পরিবর্তনশীল, অর্থবহ এবং নাগরিকধর্মী করে তুলতে পেরেছিলেন, এ যুগের কম লেখকেরই তা ছিল। তার কারণ বিংশোত্তর লেখকদের অনেকেই একই সঙ্গে কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন এবং কবিদের ভাষার উপর অধিকার বেশী। ভাষার উপর এতখানি দখল থাকা সত্বেও তাঁরা যে নবাগন্তুকদের আবির্ভাবের পর ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিলেন তা-ই প্রমাণ করে যে অন্তত উপন্যাসের ক্ষেত্রে শিল্পসৃষ্টিতে ভাষা বা স্টাইলই প্রধান উপাদান নয়।

১৯৩৭ সালে কয়েকজন কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট-ঘেঁষা লেখকদের চেষ্টায় এদেশে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। যুদ্ধ আরম্ভের কিছুদিন পর এই নাম পরিবর্তন করে ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ নামটি গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ খ্যাতিমান লেখকই ফ্যাসিস্ট ভীতিকে প্রতিরোধ করার তাগিদে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবেত হন। সেকালের অরাজনৈতিক জনসাধারণের মধ্যে ফ্যাসিস্টজাগরণ আলেয়ার আলোর মতই এক ভ্রান্তিকর মোহ সৃষ্টি করেছিল। দূর থেকে দেখা হিটলারের কর্মদক্ষতা এ দেশের সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিঁয়ে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ সবসময় শক্তিকে, বিশেষ করে রহস্যে-ঘেরা শক্তিকে শ্রদ্ধা করে, প্রভু-শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং হিটলার ইংরেজের শত্রুপক্ষ বলে এই শ্রদ্ধা আরও বেগবতী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ জনসাধারণের এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজন এবং তাগিদ অনুভব করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু এই ঐক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুদিন পরে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ নামে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং কিছু সাহিত্যিক পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এই নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ অবশ্য কোনদিন খুব শক্তিশালী বা সক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়নি। সুতরাং অনেক লেখক এই সংগঠনে যোগ না দিলেও ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সংশ্রব ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছিলেন।

আমার মনে হয় অ-কমিউনিস্ট লেখকগণ যে ধীরে ধীরে এই সংগঠনের সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ ততখানি তত্ত্বগত নয় যতখানি মনস্তত্ত্বগত। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক ধারার আলোচনায় আমি দেখাতে চেয়েছি যে বাংলা উপন্যাস তার সূত্রপাত থেকেই দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারার

সঙ্গে যুক্ত। বঙ্কিম থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রত্যেক প্রধান্ লেখকের উপন্যাসেই প্রত্যক্ষভভাবে বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত লেখকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোন লেখক কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য স্বীকার করেননি। বাংলাদেশের এই ঐতিহ্য চল্লিশোত্তর লেখকরা বর্জন করলেন; বেশীর ভাগ লেখকই কোন না কোন দলের প্রতি খোলাখুলি ভাবে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে আনুগত্য স্বীকার করলেন। লেখকরা এই সর্বপ্রথম এক একটি বৃহত্তর দলীয় ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গচ্ছিত রাখলেন। লেখকগণ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। দেশের সাহিত্যের উপর সাহিত্যিকদেব বাজনৈতিক দলাদলিতে এই অংশ গ্রহণেব ফল ভাল হয়নি। শিল্প সাহিত্যের জন্মের আদি পর্বে শিল্প-কর্মে নাকি সমাজের যৌথ মনোভাব প্রতিফলিত হত। তখন ব্যক্তি মানস আর সমাজ মানসের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়নি বলে এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তারপর বহু বহু যুগ ধরে গঙ্গানদীর প্রবাহিকা বেয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। আজ এই বহুধা বিভক্ত সমাজ জীবনে, এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে, ব্যক্তি মনের সঙ্গে ব্যক্তি মনেব কোন সহজ যোগ-সূত্র নেই। আজকের ব্যক্তি মানুষ কেবল নিজেকেই জানতে পাবেন (অবশ্য আংশিকভাবে মাত্র), জীবন জগৎ বা সমাজ বাস্তব সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা উপলব্ধি অনুভূতি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব; এবং সাহিত্যে আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে কেবল তাই তিনি প্রকাশ করতে পারেন।

সুতরাং লেখক নিজের ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ করে দলীয় ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করার ফলে তিনি তাঁর অননুভূত আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চার করতে বাধ্য হন। এই কৃত্রিম প্রয়াসই কৃত্রিম ভাবালুতা এবং ভাবাতিশয্যের জন্ম দেয়। আধুনিক বাংলা উপন্যাস এই ফাঁপা ভাবাতিশয্যের বিপুল পর্বত-প্রমাণ বোঝায় ভারাক্রান্ত। লেখক যখন নিজের ভাষা ত্যাগ করে অন্যের ভাষায় কথা বলতে চান, তখন এই ভাবাতিশয্য সৃষ্টি করা ছাড়া তাঁর আর অন্য গতি থাকে না।

আধুনিক যুগে আমরা যখন আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করছি, তখন সমাজ প্রতি পদে পদে এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বেচ্ছায় বর্জন করার দাবী জানাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু মানুষকে এক সঙ্গে কাজ করতে হয় বলে অপোসমূলক মনোভাব নিয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে সঙ্কুচিত করে নিতেই হয়। এযুগে সাহিত্য একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ব্যক্তিগত বৈষম্য ও

বৈশিষ্ট্যকে নির্বাধে প্রকাশ করা যায় এবং বহু ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে পাঠকও নিজের ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে ও মূল্য দিতে শেখেন। কিন্তু দ্বিধা-বিভক্ত রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে লেখকগণ যার যার দলের মুখ চেয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, স্বেচ্ছায় নিজেদের বাক্ স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিচ্ছেন। এ অবস্থা খুবই মর্মান্তিক এবং বাংলা উপন্যাসের উপর এর প্রভাব ভয়াবহ।

চল্লিশোত্তর যুগ এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে লেখকগণ আপন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। উপন্যাসকে আর লেখকের ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য লেখকগণ অগত্যা রোমান্স-মূলক আতিশয্য-পূর্ণ কল্পনা যৌন-বিকৃতি উৎকেন্দ্রিক নাটকীয় চমক এবং সবোপরি ভাবাতিশয্যের আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এরপরে আমরা দেখতে পাব চল্লিশোত্তর যুগে যার সূত্রপাত পঞ্চাশোত্তর যুগে তা এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্যের প্রসঙ্গে এত দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে। সাহিত্যের শিল্প মূল্যের সঙ্গে রাজনৈতিক মতামতের এমনিতে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু সাহিত্যের উপর এবং সাহিত্যিকের উপর রাজনৈতিক মতামত এবং দলাদলির প্রভাবকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। বিবদমান রাজনৈতিক চিন্তা যখন লেখকের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তখন তা উচ্চমানের সাহিত্য রচনার পথে দারুণ অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। চল্লিশোত্তর যুগের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাব শক্তিমান রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন লেখকের মধ্যে ঔদ্ধত্য এবং দুর্বলতর দলের প্রভাবাধীন লেখকের মধ্যে ভীরুতার প্রকাশ ঘটছে। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসকারের পক্ষে আলোচিত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

যাই হোক, এই যুগে কমিউনিস্ট সাহিত্যিকগণ একটি নতুন সাহিত্য তত্ত্ব উপহার দেন—সমাজতান্ত্রিক বা প্রগতিশীল বাস্তববাদ। এক কথায় বলা চলে এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল সমাজ-বাস্তবের উপর মার্ক্সীয় সমাজ বিশ্লেষণের ধারা প্রয়োগ করে সাহিত্য রচনা করা। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে লেখক-মাত্রেই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি; কোন লেখকের পক্ষে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। সেই লেখকই প্রগতিশীল যিনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন; এই শ্রেণীর চরিত্র-মাহাত্ম্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের চিত্র কাহিনীতে উপস্থিত করেন। আমাদের দেশের চল্লিশোত্তর

যুগের ধনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ ছিল বলে যে লেখক ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে এই শ্রেণীর কল্যাণমূলক চারিত্রিক বিশেষত্বগুলোকে কাহিনীতে তুলে ধরেছেন তাকেও প্রগতিশীল বলে গণ্য করা করা হয়েছে। কিন্তু প্রগতিশীলতার মধ্যেও স্তরভেদ আছে। চীন এবং রুশদেশের উদাহরণ থেকে আমরা জানি যে কোন দেশে ধনতান্ত্রিক রূপায়ণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভবপর। আমাদের দেশেও যখন এই সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল, তখন সেই লেখকই সবচেয়ে প্রগতিশীল যিনি সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সবচেয়ে অগ্রসরমান শ্রেণীকে, অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষক সমাজকে প্রতিনিধিত্ব দান করেন।

প্রাকৃতবাদের সঙ্গে এই তত্ত্বের তফাৎ এই যে প্রাকৃতবাদ শুধু প্রতীয়মান বর্তমানের নিরাসক্ত বিজ্ঞান-সম্মত চিত্র দিয়েই সন্তুষ্ট, কিন্তু এই তত্ত্ব লেখকের নিরাসক্তিতে বিশ্বাসী নয়, লেখক অবশ্যই অগ্রসরমান শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করবেন। লেখক শুধু প্রতিভাত বর্তমানের চিত্র দিয়েই সন্তুষ্ট নন, তিনি বর্তমানের উপর ভবিষ্যৎকে প্রক্ষেপ করবেন, অর্থাৎ এমন এক সুনির্বাচিত বর্তমানের চিত্র দেন যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। (মার্কসীয় সাহিত্য তত্ত্ব একটি যথেষ্ট দুরূহ প্রসঙ্গ, নানা সমালোচক এর নানা ভাষ্য দিয়েছেন। আমি শুধু আমার বইয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী এই তত্ত্বের সামান্য আভাস দিলাম)।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে এই তত্ত্ব অনুযায়ী রচিত সাহিত্য শ্রেণী সংগ্রামের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব দেয়, সংগ্রামী জনতার সাহস দৃঢ়তা ঐক্যবোধ এবং তাদের অন্যান্য চারিত্রিক বিশেষত্বের ও জীবন-যাত্রার পরিচয় দেয়। রুশ এবং চীনদেশের উপন্যাসে অনেক সময় দেখা গেছে যে পার্টির কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাহিনী রচনা করা হয়েছে। স্থূলভাবে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল বৈপ্লবিক কর্মে অনুপ্রেরণা দান করা, মানুষকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এই পরিস্থিতিতে তার যে কিছু সক্রিয় ভূমিকা আছে এই বোধ জাগ্রত করা। অর্থাৎ, এ সাহিত্য হল উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রয়োজন সাধনের হাতিয়ার।

বাংলাদেশের সাহিত্য চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে ঔচিত্যবাদ আর অনৌচিত্যবাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। বঙ্কিম পুরোপুরি ঔচিত্যবাদী ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-শরৎ যুগে অনৌচিত্যবাদ ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করে অবশেষে

কলাকৈবল্যবাদী চিন্তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আবার চল্লিশোত্তর যুগের প্রগতিশীল সাহিত্য ভাবনার মধ্যে এই ঔচিত্যবাদী চিন্তা বাংলা দেশে গুরুত্ব লাভ করল। সুতরাং বাংলা দেশে এই তত্ত্ব নতুন রূপে এক পূর্বতন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের সামিল। এবং সেইজন্যই এ যুগের উপন্যাসের উপর এ তত্ত্বের গভীর প্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রকৃত পক্ষে প্রগতিশীল সাহিত্য তত্ত্বকে ভিত্তি করে খুব কম সংখ্যক উপন্যাসই রচিত হয়েছে। গোপাল হালদার, মনোরঞ্জন হাজরা প্রমুখ দু'চার জনের বেশী লেখকের নাম উদ্যোক্তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের উপরই এই তত্ত্বের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এই তত্ত্বের প্রতিবাদে যে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, লক্ষনীয় বিষয় এই যে সেই সঙ্ঘ মূলতঃ তার তীব্র প্রতিবাদের মধ্যেই এই তত্ত্বের মূল ভিত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতার মধ্যে সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকৃত। কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের মধ্যে সাহিত্যে প্রচারধর্মিতার তত্ত্ব গৃহীত হয়েছে। মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' প্রভৃতি জাতীয় আদর্শ-মূলক গ্রন্থে এমন কি অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ কিছু কিছু শিল্পকৈবল্যবাদী লেখকের রচিত সমস্যা-প্রধান গল্পের মধ্যেও প্রগতিশীল সাহিত্য তত্ত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়। পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত লিখিত তারাশঙ্করের সমস্ত উপন্যাসে এই তত্ত্বের প্রভাব পড়েছে। তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মিত্রের রচনাতেও এ তত্ত্বের প্রভাব অপ্রচুর নয়।

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য চল্লিশোত্তর বাংলা উপন্যাসে বিষয় বস্তুর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপন্যাসের নব্য রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়াস এ যুগে কম যদিও বাস্তববাদের রীতির মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস যে লক্ষ্য করা যায় না এমন নয়, যেমন বনফুলের মধ্যে বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। বাঙালী জীবন ও বাঙালী সমস্যার গভীরে এ যুগের লেখকরা অবতরণ করতে চেয়েছেন বলে বিদেশী লেখকদের অনুকরণ করার প্রয়োজন তাঁরা কমই বোধ করেছেন। বিংশোত্তর লেখকগণ বুদ্ধির প্রাখর্য গর্ব এবং অসহিষ্ণুতা বশতঃ দেশীয় জীবনের গভীরে অবতরণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ক্লাসের বুদ্ধিমান ছেলে যেমন পরীক্ষায় ভাল ফল করার কৌশলটা জেনে নিয়ে অল্প পরিশ্রমে কৃতিত্ব অর্জন করে, তাঁরা তেমনি অনুকরণাত্মক চেষ্টার সাহায্যে অল্প পরিশ্রমেই খ্যাতিমান হতে পেরে-

ছিলেন। তুলনায় চল্লিশোত্তর লেখকগণকে অনেক বেশী পরিশ্রম করে নিজের দেশের মানুষদের জানতে ও বুঝতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির উপর ফ্রয়েড এবং মার্কসের প্রভাব অনস্বীকার্য। অধিকাংশ বাঙালী লেখকই চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গীর বিশুদ্ধি বজায় রাখার শ্রম স্বীকার করতে চান না। সেই জন্য এ রকম বাঙালী লেখক কমই আছেন যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু ফ্রয়েডকে অথবা শুধু মার্কসকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ লেখকই কাহিনীতে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির জন্য ফ্রয়েডের মুখাপেক্ষী হয়েছেন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্রায়নের সময় মার্কসের কথা ভেবেছেন।

বিষয় প্রাধান্যেব ফলে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ বড় এই অলক্ষিত চেতনার প্রসারের ফলে এ যুগে এপিক-ধর্মী উসন্যাস রচনাব প্রচেষ্টা দেখা যায়। নায়ক-কেন্দ্রিক উপন্যাসে একজন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করা হয়। ব্যক্তির সমস্যার মধ্যে কোন ব্যাপক সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হতে পারে, কিন্তু কাহিনীতে তা ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবেই প্রতিভাত। এপিকধর্মী উপন্যাসেও নায়ক থাকতে পারে ; কিন্তু নায়কের কাজ শুধু বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে ঐক্য সূত্র স্থাপন করা অথবা মনস্বিতাব দ্বারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপর ঐক্য বিধায়ক আলোক নিক্ষেপ করা। এপিক-ধর্মী উপন্যাসে সমাজের একাংশের সঙ্গে অপরাংশেব দ্বন্দ্ব বিষয় বস্তুর স্থান গ্রহণ করে—এই দ্বন্দ্ব শ্রেণীদ্বন্দ্ব আকারে শুভ ও অশুভের মধ্যে দ্বন্দ্বের আকারে, নতুনের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্বের আকারে অথবা এক মনোভাবের সঙ্গে অন্য মনোভাবের দ্বন্দ্বের আকারে (অথবা অন্যবিধ কোন দ্বন্দ্বেব আকারে) প্রকাশ লাভ করে। পাশাপাশি এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হিসাবে পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন চিত্র দেখানো হয়। পরিবেশ রচনা এপিক উপন্যাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ পরিবেশ এখানে শুধু ব্যক্তি চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য নয়। এখানে ব্যক্তি অপেক্ষা পবিবেশের গুরুত্ব বেশী। অন্নদাশঙ্করের ‘সত্যাসত্য’ উপন্যাসে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তি চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করার জন্য পরিকল্পিত। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ এ উপন্যাসের আসল পরিবেশ নয়। আসল পরিবেশ এ যুগের চিন্তার সঙ্কট, এবং তা লেখক যত্নের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এপিক উপন্যাসে একাধিক ক্ষুদ্রতর বিচ্ছিন্ন কাহিনীর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং সেগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র মূলতঃ ভাবগত। তারাশঙ্করের

'কালিন্দী' বা মাণিকের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এপিক উপন্যাস; কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত বৃহৎ উপন্যাস 'পথের পাঁচালি—অপরাজিত' এপিক উপন্যাস নয়। এপিক উপন্যাস রচনার মধ্যে পঞ্চম দশকীয় উপন্যাস প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করেছে।

মোটের উপর ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কালকে বাংলা উপন্যাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এত বৃহৎ সংখ্যক শক্তিশালী উপন্যাসিক পূর্ববর্তী কোন যুগে দেখা দেননি। প্রকৃত পক্ষে বিংশোত্তর লেখকদের রচনাও ত্রিশের পর থেকেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁরা এবং পরবর্তীরা মিলিতভাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় চাঁদের হাট বসিয়েছিলেন। এই সময়ের লেখা কিছু কিছু উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। উক্ত লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল পঞ্চাশ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ বছরের এই অসাধারণ অপ্রত্যাশিত দীপ্তির পাশাপাশি পঞ্চাশোত্তর যুগের ক্রম ক্ষীয়মান নিবু নিবু দীপ শিখার তুলনা করলে মনে এই আশঙ্কা জন্মায় যে পূর্বোক্ত ঔজ্জ্বল্য বাংলা উপন্যাসের অকাল মৃত্যুর পূর্ববর্তী ক্ষণ-দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য নয় তো!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের গভীর ঐতিহ্য-প্রীতি এবং ভাষা-ব্যবহারে প্রায় বঙ্কিমী রীতির অনুসরণ দেখে তাঁকে বিংশোত্তর লেখকদের থেকে যতখানি দূরবর্তী বলে মনে হয় আসলে তিনি ততখানি দূরবর্তী নন। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' যে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এটিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা বলে গণ্য না করে বরং অনুমান করা চলে যে এ যুগের লেখকদের রচনা ধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কোন মত পথ বা চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অর্থই তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং তারাশঙ্করের মধ্যে কল্লোল-কালীন চিন্তাধারার অনুরণন একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। যদিও তিনি এক সময়ে 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেখক হিসাবে বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তথাপি তাঁর 'অভিযান' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি কোন কোন উপন্যাসে নর-নারীর যৌন-ব্যাপারের কুণ্ঠাহীন বিবরণ স্থানলাভ করেছে। পূর্বতন তরুণতর লেখকদের লঘু-চাপল্যকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু যেখানে তিনি অনুভব করেছেন যে তার বিষয়বস্তুর জন্য গোপনীয় প্রসঙ্গের দ্বিধাহীন চিত্রায়ন প্রয়োজন সেখানে তিনি তা এড়িয়ে যেতেও চেষ্টা করেননি।

দ্বিতীয়তঃ রোমান্টিক প্রেমের চিত্রায়নে তিনি কখনোই নৈতিক চিন্তার দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কোথাও তিনি সমাজ-নীতির খাতিরে বিধি-বহির্ভূত প্রেমকে মূল্য দিতে অস্বীকার করেন নি। মানুষের স্বতস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে যখন সমাজ নীতির বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সেই আবেগকে তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করেন না বরং সমাজ-নীতিকেই ত্রুটিযুক্ত বলে গণ্য করেন। সুতরাং চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক-পন্থী, ক্লাসিক পন্থী নন।

তৃতীয়তঃ বিংশোত্তর লেখকদের মত তারাশঙ্কর ক্ষেত্রবিশেষে ফ্রয়েডের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবদমিত কামনা বা প্রতিহত কামনার দুর্বার শক্তিকে

চিত্রায়ত করা তাঁর খুব প্রিয় বিষয়বস্তু। তার প্রায় প্রতি উপন্যাসেই এই ধরণের এক আধখানা চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

বিংশোত্তর লেখকদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য শিল্প প্রেরণার উৎসের ক্ষেত্রে। বিশ শতকীয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তার বিদ্রোহাত্মক অভিনবত্ব বিংশোত্তর লেখকদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা তাকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করেছেন। যে কোন নবীন চিন্তাকে আমরা যখন প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে রোমান্টিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং বিংশোত্তর লেখকদের মধ্যে রোমান্টিসিজমের রঙীন প্রলেপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা যুক্তি-বুদ্ধির শাসনকে অতিক্রম করে যায়নি কোথাও। পক্ষান্তরে তারাশঙ্কর মূলতঃ উপলব্ধি-প্রধান লেখক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রভাব তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছে বটে, কিন্তু তা তিনি নিজের উপলব্ধির অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন।' তারাশঙ্কর সেই জাতের লেখক যিনি অন্যের চিন্তাকে নিজের মত না করে গ্রহণ করতে পারেন না। সেইজন্যই তারাশঙ্কর সাহিত্য সম্পর্কে ভাল বা মন্দ যাই বলা হোক, তার মৌলিকত্বকে কখনো অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রকাশ-রীতি তার শিল্পী ভাবনা সবই তাঁর নিজস্ব।

এ কথার মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে সেজন্য স্পষ্ট করে বলি যে অপর লেখকদের সঙ্গে তুলনায় তারাশঙ্করের বুদ্ধি যে কম প্রখর তা নয়, কিন্তু তার শিল্পীসত্তায় বুদ্ধির প্রধান ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি। তাঁর স্বাভাবিক অনুভবের কাছে বাস্তবের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তাই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই মানসচিত্রের সঙ্গে অপরের যুক্তির যেটুকু সামঞ্জস্য চোখে পড়েছে, তিনি অপরের যুক্তি থেকে সেইটুকুর চেয়ে বেশী কিছু নিতে নারাজ। তিনি তাঁর মনের সহজ বোধ-জাত সিদ্ধান্ত কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা পদ্ধতি দ্বারা সুসংস্কৃত করে নিতে রাজী নন, বরং কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে তিনি তাঁর মনের বিশ্বাস অনুযায়ী রূপান্তরিত করে নিতে সর্বদাই সচেষ্ট।

জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যে ধরণের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করেছিলেন তা প্রাকৃতবাদী রচনা-রীতির পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু উপরোক্ত কারণ বশতঃ প্রাকৃতবাদী রীতি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে বাস্তবের এক বিজ্ঞান-সম্মত প্যাটার্ন সৃষ্টির পন্থা তাঁর পক্ষে গ্রহণ কর সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের চরিত্র কতকগুলি সহজাত প্রবণতার উপর পরিবেশের প্রভাবের ফল। মানুষের কতকগুলি স্বভাব-জাত কামনা ও প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু অন্যান্য পশু-পাখীর মত মানুষের কোন স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত কর্মধারা নাই। সুতরাং সামাজিক জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই তার উপর স্বভাবের চেয়ে সমাজের বা পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ বেশী কার্যকর। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের এই পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত রূপটি যে তারাশঙ্করের চোখে পড়ে না এমন নয়। কিন্তু বিশেষ সংকটকালে বা নাটকীয় মুহূর্তে তারাশঙ্করের চোখে মানুষের আর একটি রূপ প্রতিভাত হয়। তখন মানুষের মধ্যে এমন এক আবেগ জাগ্রত হয় যা একান্তভাবে তার অন্তরজাত, যাকে পরিবেশের প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, যা যুক্তি বুদ্ধি তর্ককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের অন্তরস্থ এই রহস্যজনক আবেগের যখন প্রকাশ ঘটে তখন তার মধ্যে এমন এক উলঙ্গ বর্বর ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পায় যে কোন কোন সমালোচক তারাশঙ্করের এই ধরণের চিত্রায়নকে আদিমতা-প্রীতি বলে উল্লেখ করেছেন। এই আবেগগুলিকে মানুষের আদিম কামনা বলে উল্লেখ করা যায় কিনা জানি না, কারণ এগুলো আমাদের অপরিচিত কিছু নয়; লেখকের কল্পনায় এগুলো যে প্রচণ্ডতা লাভ করেছে তার কারণ এগুলো তাঁর কাছে পরিবেশ-জাত নয় এবং যুক্তি এবং পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-যোগ্যও নয়। মানুষের জীবনে এই রহস্যময় শক্তির লীলাকে চিত্রায়িত করার প্রয়োজনে তারাশঙ্করের কাহিনী এক নাটকীয় সংঘাত থেকে আর এক চরম নাটকীয় সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলে। বস্তুতঃ সাধারণ পাঠকের কাছে তারাশঙ্করের কাহিনীর আকর্ষণ প্রধানতঃ ধাপে ধাপে প্রচণ্ড সংঘাত সৃষ্টির দক্ষতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।' আমি আগেই উল্লেখ করেছি 'এই কৌশল বঙ্কিমই প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে তাকে বাঙালী লেখক সমাজ নানাভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছেন। বঙ্কিমের নাটকীয় সংঘাতগুলি শক্তভাবে কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত, কিন্তু তারাশঙ্করের সংঘাতে আকস্মিকতার অভাবনীয়তার চমক বেশী; কারণ তিনি যে অদৃশ্য শক্তিকে উদ্‌ঘাটন করতে চান তা এমনি আকস্মিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্যই তারাশঙ্করের কাহিনী কতকগুলি আকস্মিক ঝাঁকুনির সাহায্যে গতিবেগ অর্জন করে।' তারাশঙ্করের কাহিনী রচনার এই রীতিও ঠিক প্রাকৃতবাদী রীতি-সঙ্গত নয়। কারণ প্রাকৃতবাদী রীতির কাহিনীতে একটি সহজ মসৃণতা

প্রত্যাশিত, কারণ সেখানে লেখক সযত্নে প্রতিটি ঘটনার জন্য উপযুক্ত কার্য-কারণ সম্মত পরিবেশ রচনা করেন।

তার মানে এই নয় যে তারাশঙ্কর প্রাকৃতবাদী রীতি-চরিত্রকে একেবারে বর্জন করেছেন। তিনি যদি একনিষ্ঠভাবে তাঁর সহজাত শিল্পবোধকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করতেন তবে তার স্বরূপ কী হত বলা মুস্কিল। কিন্তু তা হলে তাঁর সাহিত্যে এক ধরণের বিশুদ্ধির সাক্ষাৎ মিলত। কিন্তু বাংলাদেশের উপন্যাসের ঐতিহ্য হল তা বরাবরই যুগোচিত রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এবং তারাশঙ্করও এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বিতর্কমূলক রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ার অর্থ যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যদিও আমরা যখন প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথের মধ্যে কোন একটিকে নির্বাচন করি তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা, অর্থনৈতিক টানা পোড়েন এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এ তিনের মধ্যে কোনটি যে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে বলা কঠিন। কিন্তু পিছনের টান যাই থাক, সামনাসামনি আমরা নির্বাচিত মত ও পথের সমর্থনে জোরালো ব্যক্তিনিরপেক্ষ যুক্তি-জালের অবতারণা করতে সচেষ্ট হই। এ যুগে মানুষের চিন্তাজগতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ এমন এক সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে আমরা আমাদের নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকেও বিজ্ঞানের পোষাক পরিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। সুতরাং যদিও যুক্তিবাদের রাস্তা তারাশঙ্করের স্বভাব-সঙ্গত রাস্তা নয়, তথাপি রাজনৈতিক চিন্তা-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে যখন তাঁকে কোন একটি চিন্তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি প্রয়োগ এবং আনুসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষণের প্রয়োজন তাঁকে অগত্যা স্বীকার করে নিতে হয়েছে। সমাজের বিজ্ঞান-সঙ্গত চিত্রায়নই প্রাকৃতবাদের পথ বলে তারাশঙ্করের পক্ষে প্রাকৃতবাদী রীতি পদ্ধতিকে একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয়নি।

সুতরাং তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের প্রধান দ্বন্দ্ব বোধ এবং বুদ্ধির দ্বন্দ্ব। ইন্ট্যুইসানের পথিক হিসাবে তিনি ঔচিত্য চিন্তা রহিত হয়ে মানবিক সত্যের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন; কিন্তু ইন্টেলেক্ট তাঁকে ভালমন্দের কল্যাণ অকল্যাণের শ্রেয় বুদ্ধি-প্রেয় বুদ্ধির জটিল আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে তিনি সাধক এবং বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

তারাশঙ্করের মানসে এই প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আর এক ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্বও অনুভব করা যায়। এই শেষোক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বটি জমিদারী ঐতিহ্য পুষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসে প্রায় সবজনীন গুরুত্ব লাভ করেছে। একদিকে জমিদারী ঐতিহ্যের গর্ব শক্তি দাপট ও নানাবিধ মূল্যবোধের প্রতি অন্তরের টান এবং অন্যদিকে জমিদারী প্রথা যে বিগত-প্রাণ, গণমানসকে চিরকাল অত্যাচারীর যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখা যে অমানুষিক বর্বরতা এই চৈতন্য। তারাশঙ্করের বারবার মত পরিবর্তনের পিছনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। তবে সমগ্র তারাশঙ্করের সাহিত্যে নবজাত বণিক ও শিল্পপতি সমাজের প্রতি কোন উল্লেখযোগ্য প্রীতির লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জমিদার সমাজ একটি উচ্চস্তরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক; তেমনি বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত গরীব জনসাধারণও এক দীর্ঘকালের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, কিন্তু ভুঁই-ফোঁড় বিত্তবান সমাজের অর্থগৃধ্নুতা এবং ভোগবাদের পিছনে কোন উন্নত ঐতিহ্য নেই। সুতরাং তারাশঙ্করের সহানুভূতি থেকে তারা বঞ্চিত।

তারাশঙ্করের শৈল্পিক অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব যে সংঘাত এবং নাটকীয়তা এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। এই নাটকীয়তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রচণ্ডতা এবং তীব্রতা। ছোটখাটো সুখ-দুঃখ মান-অভিমান অনুরাগ-বিরাগে পূর্ণ সহজ সুরে বাঁধা জীবন তারাশঙ্করের জন্য নয়। জীবন যেখানে প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি করেছে, আবেগের সঙ্গে আবেগের সংঘাত যেখানে প্রলয়ের মেঘ ডেকে এনেছে, সেখানে তারাশঙ্করের প্রতিভা সহজে নিশ্বাস ফেলে। সূক্ষ্মতা, প্রশান্তি ভাবাবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তারাশঙ্করের সাহিত্যে অনুপস্থিত। নীট্সে সমস্ত সাহিত্য কর্মকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—ডায়োনিসিয়ান (Dionysian) এবং অ্যাপেলোনিয়ান (Apollonian)। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বিশেষত্ব—প্রচণ্ডতা, জঙ্গম্যতা, উদ্দামতা; দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বিশেষত্ব—প্রশান্তি, সৌকুমার্য, স্থিতিস্থাপকতা। আমাদের দেশের শাক্ত মনোভাব এবং বৈষ্ণব মনোভাবের মধ্যে যে পার্থক্য তার সঙ্গে উক্ত শ্রেণীবিভাগের তুলনা করা চলে। এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নিলে নির্দ্বিধায় বলা চলে তারাশঙ্কর প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর।

তারাশঙ্করের এই বিশেষত্বের কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নয়। তাঁর শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে যে মানুষের অন্তর্নিরুদ্ধ আদিম আবেগ হঠাৎ প্রচণ্ড

বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া আমরা দেখেছি তাঁর শিল্পীমানস প্রচণ্ডতম রাজনৈতিক এবং সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র। আন্তরিকতা সম্পন্ন মানুষ বলে তিনি কোন একটি মতকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে এবং অপর মতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি ; বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কিছু সত্য আছে কিনা বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। সেই জন্যই অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতায় তাঁর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং তা ছাপ রেখে গেছে তাঁর সাহিত্যে।

প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হিংস্রাশ্রয়ী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি তিনি যে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন তার স্বাক্ষর রয়ে গিয়েছে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির মধ্যে। তিনি শাক্ত মনোভাবের লেখক, কাজেই সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাঁর হৃদয়জ আকর্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তথাপি তিনি যে শেষ পর্যন্ত হিংসার পথ পরিহার করে গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রের দিকে অনুরক্ত হয়েছিলেন তার কারণ হয়তো এই যে মানুষ তার স্বভাবের বিপরীত ধর্মী জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে তিনি যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটা তাঁর সধর্মে প্রত্যাবর্তনের সামিল। কমিউনিস্টরা হিংসাপন্থী বলে তিনি কিছুকাল পরে তাদের সংশ্রব বর্জন করে কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছিলেন, একথা হয়তো ঠিক নয়। বরং কমিউনিস্টরা যথেষ্ট হিংসাপন্থী নয় বলেই, তারা যে বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুত বিপ্লবের অদর্শনের ফলেই তারা কালক্রমে তারাশঙ্করের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এক সময়ে তারাশঙ্করের মত অনেক বুদ্ধিজীবীই বিপ্লবের একটি রোমান্টিক স্বপ্ন তুলে ধরতে পেরেছিল বলেই কমিউনিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একদিন নীল নভোমণ্ডল থেকে পাকা ফলটির মত বিপ্লব-বোমাটি ভারতের মাটিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে, আর রাতারাতি ভোজবাজীর মত সমস্ত অন্যায় অবিচার ধুয়ে মুছে গিয়ে এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—এই সুখ-স্বপ্নের বাস্তব সম্ভাবনা যেদিন তাঁদের অন্তর থেকে অন্তর্হিত হল সেদিনই তাঁরা কমিউনিস্টদের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়লেন। সেদিন তাঁরা দেখলেন যে কমিউনিস্টরা মাথায় তেল না দিলেও কংগ্রেসীদের চেয়েও বেশী ভদ্রলোক। সেই যে ব্রাহ্মণ দুধ উৎলিয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে অসহায়ভাবে বেদ-পাঠ শুরু করে

দিয়েছিল—কমিউনিস্টরাও তেমনি বুলেটের মুখে বুলেট নিক্ষেপ না করে মার্ক্সের তত্ত্ব আওড়ায়, তখনই তাঁরা কমিউনিস্টদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যেটুকু আস্থা ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেল যখন ১৯৫০ এর পরে কমিউনিস্টরা রাজপথে যে গান্ধীবাদী বোমা নিক্ষেপ করল তাতে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করল, কিন্তু একটি মানুষের গায়ে একটি সামান্য ক্ষতও সৃষ্টি করতে পারল না।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ যাই থাক, তারাশঙ্কর যে হিংসা আর অহিংসা নীতির দ্বন্দ্বে মর্মপীড়িত হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অন্তরের আকর্ষণ হিংসার দিকে অর্থাৎ, হিংসা প্রবণতা নয়, হিংসাত্মক ঘটনার দিকে, হিংসা জীবনের যে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে তার দিকে কিন্তু তিনি অহিংসাকে শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর মানবোচিত নীতি বলে গণ্য করেছেন। তাঁর 'বিচারক' উপন্যাসের মধ্যেও এই দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে বিবাহাতিরিক্ত প্রেম যে গভীরতর তীব্রতর অভিজ্ঞতা দান করে একথা তিনি জানেন, কিন্তু বিবাহিত প্রেমকেই তিনি সুনীতি বলে গণ্য করেন ('রাধা' উপন্যাস দ্রষ্টব্য)।

মোটের উপর তারাশঙ্কর সাহিত্যকে সমগ্রভাবে বুঝতে হলে তাঁর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। তারাশঙ্করের মধ্যে আমরা যদি সুনির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব বা বক্তব্য প্রত্যাশা করি তবে আমরা নিরাশ হব। কোন কোন বইতে অবশ্য তিনি একটি পরিচ্ছন্ন বক্তব্য হাজির করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সেই বক্তব্যের মধ্যেই বইয়ের সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিহিত নয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি সমগ্রভাবে আলোচনা করলে মনে হবে সেগুলো সংকট ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে একটি শিল্পী হৃদয়ের অভিসার যাত্রার উদ্‌ঘাটন। প্রশ্ন এই—অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর কি কোন সিন্থেসিসে পৌঁছেছিলেন? যদি তিনি কোন সিন্থেসিসে পৌঁছে থাকেন তবে তা তাঁর ধর্ম-চিন্তার মধ্যে পাওয়া যাবে। পূর্বাপর তারাশঙ্করের মধ্যে একটা গভীর ধর্মবিশ্বাস কাজ করে চলেছে। তিনি যে মানুষের মধ্যে এক ধরণের যুক্তির অতীত আবেগের সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলোর উদ্ভব মানুষের মধ্যেই সুপ্ত কোনো শক্তির মধ্যে, তা থেকে সহজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস কোন মহাশক্তি। ধর্মের নানা স্তর আছে। সাঁওতালদের মধ্যে, বেদেদের মধ্যে ধর্ম তাদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধীবাদ বা কমিউনিজম রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ধর্ম। মানবিক বুদ্ধি

স্বষ্ঠু সমাজের পক্ষে আচরণীয় ধর্ম। সর্বত্রই ধর্ম শক্তি ও প্রেরণার উৎস— একটি রহস্যময় আঁধার থেকে আমরা শক্তি ও প্রেরণা লাভ করি। কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে একই ধর্ম বহুলোকে অনুসরণ করছে; ধর্ম সেখানে সামাজিক। কিন্তু মানুষ যখন উচ্চতম ধর্মের সাধনা করে তখন সে নিঃসঙ্গ। সেখানে তার উপলব্ধি, তার সার্থকতা বা বিফলতা তার নিজস্ব। মানুষ যখন এই ধরণের ধর্মীয় উপলব্ধির পথে যায় তখন রাজনীতি বা সমাজ নীতি আর তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রয়োজন হলে নীতি লঙ্ঘন করেও সে পরম অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায়। তারাশঙ্করের বিভিন্ন বইতে ধর্মচিন্তার এই বিভিন্ন স্তরের আভাস পাওয়া যায়।

রাধা প্রভৃতি বইতে তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব ধর্ম চিন্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আধুনিক যুগ-মানুষের অনেক মৌল প্রশ্নের সঙ্গে তারাশঙ্করের ধর্মচিন্তা জড়িত। সেইজন্য এবং কাহিনীর রূপকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তাবাশঙ্করের ধর্ম-চিন্তাকে স্বষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করা সহজ নয়। আরোগ্যনিকেতন থেকে স্বরু করে তাঁর শেষ জীবনের প্রায় প্রতিটি প্রধান বইতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁব মতে মানুষ যদি যে কোন পবম প্রয়াস বা পরম আবেগের কাছে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করে তবে সে ধর্ম-পথের যাত্রী।

তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসের পরিধি সম্প্রসারিত করেছেন নতুন নতুন বিষয় বস্তু সংযোজন করে। উনিশ শতকীয় রোমান্স রচনার পালা শেষ হওয়ার পর বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকগণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক সামাজিক উপন্যাস রচনায় মনোযোগ দিয়েছেন। তার ফলে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী এবং নিম্নস্তরের কৃষক-শ্রমজীবী শ্রেণী—উভয়েই বাংলা উপন্যাসের আসরে অবহেলিত হয়েছে। একথা ঠিক জমিদার বা জমিদার বাড়ির ছেলে মেয়েরা অনেক কাহিনীতেই দেখা দিয়েছে; কিন্তু তাদের বিশিষ্ট জমিদারের ভূমিকায় নয়। তারাশঙ্কর জমিদারকে তার জমিদারী জীবন যাত্রার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

জমিদার ভিত্তিক কাহিনী হিসাবে তারাশঙ্করের কয়েকটি ছোট গল্প খুবই উল্লেখযোগ্য। জমিদারী ঐতিহ্যের দর্প ও শক্তি, আভিজাত্যের গৌরব ও বিগত আভিজাত্যের দীনতা, তার উদারতা ও বদান্যতার পাশাপাশি কুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণতা—প্রভৃতি বিশেষত্বকে তিনি নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করেছেন। তারাশঙ্করের কাছে জমিদার কলুষহীন চরিত্র নয়, কিন্তু এক

প্রচণ্ড শক্তির আঁধার। 'রায়বাড়ির' রাবণেশ্বরের চরিত্রে জমিদারী ঐতিহ্যের ভরা মরসুমের এক জমকালো চিত্র উপস্থিত হয়েছে। রাবণেশ্বর শক্তিতে ভোগক্ষমতায়, পূজা-অর্চনায় এক বিরাট পুরুষসিংহ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক প্রজার উপর প্রতিশোধ গ্রহণে হীনপন্থা অবলম্বনে সে পরান্মুখ নয়। 'জলসাঘরে' এক পড়ন্ত জমিদারের আভিজাত্য-বোধের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি এক হঠাৎ বড়লোকের চরিত্র স্থাপন করে লেখক এই গোধূলিবেলার ম্লানায়মান গৌরবের মধ্যেও যে কী অপরিসীম মর্যাদা বিরাজমান তা আরও নাটকীয়ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। আবার 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' নামক গল্পে এই বিরাট ঐতিহ্যের ভস্মস্তূপ যে কী করুণ এবং হাস্যকর, একটি বিত্তহীন উপাধিতে-মাত্র জমিদারের চরিত্রের অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর এবং চারিত্রিক দীনতার মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এই গল্পগুলোকে কল্পনা-প্রধান বাস্তবতার উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। বাংলাদেশের অতীত দিনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিচয় দিতে বসে তিনি সেই সময়াকর প্রতীয়মান বাস্তবের রূপকে ততটা ধরতে চাননি যতটা চেয়েছেন কতকগুলো অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে তার একটা ভাব-রূপ অঙ্কিত করতে। তারাশঙ্করের শিল্প প্রতিভার প্রমাণ এইখানে যে তিনি কোথাও একটি সুসমঞ্জস্য বা নীতি অথবা আদর্শের দিক থেকে সমর্থন যোগ্য চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠকের অনায়াস সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি আদর্শ চরিত্র আঁকতে চাননি; আঁকতে চেয়েছেন শক্তির এক বিচিত্র অভিব্যক্তিকে যার ভালত্ব বা মন্দত্ব কোনটাকেই ঠিক আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রার মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-জাত আবেগের আর এক ধরণের প্রকাশ ঘটেছে তারাশঙ্করের নিম্নতর শ্রেণী-কেন্দ্রিক গল্পগুলোতে। লক্ষণীয় এই যে তারাশঙ্কর বেদেনী, সাঁপুড়ে, ডোম, বৈষ্ণবী প্রভৃতি এমন সব সম্প্রদায় থেকে চরিত্র সংগ্রহ করেছেন যাদের জীবন-যাত্রা কম বেশী রহস্যময় এবং স্থিতিস্থাপকতা হীন। 'বেদেনী' গল্পে বেদেনীর সর্বগ্রাসী প্রেমক্ষুধা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'ডাক হরকরা' গল্পে দীনুডোমের কর্তব্যনিষ্ঠা মোটেই বিচারশীল নীতিজ্ঞান নয়। তা এক স্বয়ম্ভু আবেগ যা থেকে পরিত্রাণের উপায় সে জানে না; এমন কি পুত্রস্নেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতেও তা অপারগ। 'রসকলি' তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প। বৈষ্ণবীদের

সংস্কারবর্জিত স্বাধীন অনায়াস অকুণ্ঠ প্রেমের এই চিত্রে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রেম যেখানে স্বাধীন সেখানে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন অশুভ অসুস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে সহজেই সমাধান খুঁজে বার করতে পারে।

কয়েকটি ছোট গল্পে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন মানুষের কোন একটি সহজাত আবেগের সুযোগ নিয়ে নিষ্ঠুরা নিয়তি মর্মান্তিক খেলায় মেতেছে। 'প্রতিমা' গল্পে প্রতিমার কারিগর কুমারীশ মিস্ত্রীর প্রেম ইন্দ্রিয়জ-কামনা বর্জিত সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মাত্র। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন সংসারে তাই নিয়ে প্রবল ঝড় উঠল যার পরিণতি ঘটল ছোট বৌয়ের আত্মহত্যায়। 'অগ্রদানী' গল্পে গরীব ব্রাহ্মণের লোভ নিয়ে অদৃষ্ট এক নিদারুণ পরিহাস সৃষ্টি করেছে। লোভী ব্রাহ্মণ নিয়মিত ভোগের লোভে নিজপুত্রকে জমিদারের ঘরে দত্তক দিয়েছিল; সেই ছেলের অকাল মৃত্যুতে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ড ভক্ষণের মধ্যে ব্রাহ্মণ তার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করল।

কোন কোন গল্পে তারাশঙ্কর অতিপ্রাকৃতকে আরও পষ্টাপষ্টি চিত্রিত করেছেন। যেমন 'রামলালের মাঠ', 'যাদুকরের মৃত্যু'। যদিও নিম্নতর শ্রেণীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার আবরণে গল্পগুলো পরিকল্পিত, কিন্তু আমার বিশ্বাস জীবদেহকে অবলম্বন করে যে শক্তির লীলা তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছেন জীবদেহের বাইরেও কোন না কোন ভাবে তার অস্তিত্ব আছে এ বিশ্বাস তারাশঙ্করের মধ্যে স্বাভাবিক।

তারাশঙ্করের ছোট গল্প যেখানে সার্থক, সেখানে তা তাঁর জীবনোপলব্ধির সার্থকতম প্রকাশ হয়ে উঠেছে। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পেরই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ মানসিকতা অথবা কোন চরিত্রের আবেগ বা ভাবাবেগকে চিত্রিত করা। কাহিনী অবলম্বন-মাত্র বলে তাঁর কাহিনীতে কিছু ঢিলে-ঢালা ভাব, কিছু পরিমিতি বোধ ও সংযমের অভাব থাকলেও তাতে গল্পরস ক্ষুন্ন হয়নি। কোন কোন সমালোচকের মতে বাংলাদেশে ছোট গল্প যতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে, উপন্যাস তা করেনি। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পগুলির দিকে নজর দিলে এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিকে তিনটি কালানুক্রমিক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পড়ছে নীলকণ্ঠ, রাইকমল, আগুন, পাষাণপুরী, চৈতালী ঘূর্ণি, কবি; দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'ধাত্রীদেবতা,

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, তৃতীয় পর্যায়ের শুরু 'আরোগ্য নিকেতন' থেকে এবং তার সৃষ্টিশীলতা এখনো অব্যাহত।

প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রাইকমল' এবং 'কবি' বাদ দিলে অবশিষ্ট বইগুলো বাস্তবধর্মী। বইগুলো দুঃখভারাক্রান্ত, বিষাদক্লিষ্ট; সমাজ ও জীবনেব প্রতি এক তীব্র অথচ অনির্দেশ্য অভিযোগে কাহিনীগুলি জ্বালাময়। তরুণ অনুভূতিপ্রবণ লেখক যেন জীবনের কোথাও লঘু-চাপল্য বা সুশীতল ছায়ার সন্ধান পাচ্ছেন না। উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভাষায় তিনি এক নিদারুণ রিক্ততা এবং রিক্ততাজনিত ক্ষোভকে রূপ দিয়েছেন।' চল্লিশের পূর্বে এ বইগুলো রচনা করার সময় খুব সম্ভব তারাশঙ্কব কমিউন্সটদের সংস্পর্শে আসেন নি। সুতরাং এ বইগুলোব মধ্যে যে ক্ষোভ এবং বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা তত্ত্বমূলক রাজনৈতিক চিন্তার সংশ্রব-শূন্য, তা লেখকের স্বতস্ফূর্ত সহানুভূতিব প্রকাশ।

নায়ক-নায়িকারা প্রতিকূল পবিবেশেব সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে এক বিপর্যয় থেকে আর এক বিপর্যয়ের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আবেগের ঝোঁকে তারা এমন একটা কাজ করছে যাতে পরিবেশ তাদের বিরুদ্ধে জিঘাংসাব মনোভাবকে পরিতৃপ্ত করার নতুন সুযোগ পাচ্ছে। নিয়তি যেন সমাজের রূপ ধরে তাদেব তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে এক অন্ধকাব পবিণতির দিকে।

• নীলকণ্ঠ (১৯৩৩) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক শ্রীমন্ত ভাগিনেয়ীকে অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে, এবং ক্রোধবশে ভগ্নিপতির মাথায় আঘাত করে কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তার স্ত্রী গিরি দারিদ্র্যের নিষ্পেষনে ক্লান্ত হয়ে স্বামীব বন্ধু বিপিনের কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে; এবং কলঙ্কের বোঝা সইতে না পেরে গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। শ্রীমন্ত জেল থেকে ফিরে এসে গিরির পিতৃপরিচয়হীন সন্তান নীলকণ্ঠকে নিয়ে দেশান্তরিত হল। বইখানি নিঃসন্দেহে জগদীশ প্রেমেন্দ্র শৈলজানন্দের প্রাকৃতবাদী ধারার অনুবর্তন। কিন্তু কাহিনীতে হিংসা, প্রতিহিংসা, আত্মহনন, ব্যাভিচার প্রভৃতি মর্মান্তিক ঘটনার প্রচুর সমাবেশ লক্ষণীয়। মানুষের জীবন শুধু যন্ত্রণা-ক্ষুব্ধ নয়, হিংসা জর্জরিত পট। তারাশঙ্করের কাছে এই হিংস্রতা পরিবেশ-জাত নয়। তা মানুষের অন্তর্নিহিত কোন অন্ধ অবোধ নিরুদ্ধ আবেগের আকস্মিক প্রকাশ।• আমি আগেই বলেছি তারাশঙ্করের শিল্পীদৃষ্টি প্রাকৃতবাদী রচনার অনুকূল নয়।

বইখানিতে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা এত দ্রুতবেগে ঘটে চলেছে যে পাঠক তাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ পায় না। সেই জন্যই বইতে শক্তির পরিচয় থাকলেও, লেখকের গভীর মর্মজ্বালা ও সহানুভূতির সার্থক প্রকাশ থাকলেও, তা পরিপূর্ণ শিল্পানুভূতি জাগ্রত করে না।

'চৈতালি ঘূর্ণি'র আখ্যানবস্তুও অনুরূপ, তবে এখানে লেখক একটি শ্রমিক পরিবারকে কাহিনীর উপজীব্য করেছেন। ঝড়ের ঝরা পাতার মত তারা কেবলই স্থান থেকে স্থানান্তরে ভেসে চলেছে। দারিদ্র্য, লালসার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ এ বইতেও ঘটেছে। লেখক ধৈর্যের সঙ্গে শ্রমিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে বসেননি; তিনি তাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত রূপটিকে গভীর মর্মজ্বালার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পাষাণপুরী'তে অধিকতর পরিণত লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারাপ্রাচীরের অন্তরালবর্তী জীবন-যাত্রার পরিচয়-দান প্রসঙ্গে লেখক উচ্চ নীচ বহুশ্রেণীর চরিত্র উপস্থিত করেছেন। ফলে এটিকে পরবর্তীকালের এপিক উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি-পর্ব বলা চলে। জেলখানার নিরাপদ চৌহদ্দীর মধ্যে সাংঘাতিক ধরণের অপরাধীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে শান্ত জীবন যাপন করছে—এই পরিকল্পনার মধ্যেই যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে। তবে কালী কামারের চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তারাশঙ্করের বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ফাঁসির আসামিটি নিজের পূর্বকৃতকর্মের স্মৃতি এবং মৃত্যুভয়ের শাঁড়াশী চাপে প্রায় বিকারগ্রস্ত। এই জটিল-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষটির কাছে এখন পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত। সে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তরবাসী। প্রণয়িনীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় তার গুহাবাসী মন যেন বহুকষ্টে পাষাণ দরজার অবরোধ একটুখানি ফাঁক করে মুহূর্তের জন্য বাইরের আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করছে। এই চরিত্রটি অবশ্য মানস-কথনের রীতিতে আরও সার্থকতরভাবে উপস্থাপিত করা যেত। তবে তারাশঙ্করের ভাষার গাম্ভীর্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

কবি (১৯৪২) সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী রোমান্টিক রসের উপন্যাস হলেও তার বিষয়বস্তু প্রাকৃতবাদ সঙ্গত। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কবিয়াল সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল, এখনো হয়তো কিছুটা আছে। কিন্তু বিশেষভাবে এই

সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রার পরিবেশ সঙ্গত পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যেই তারাশঙ্কর 'কবি' চরিত্রটি তাঁর উপন্যাসের জন্য নির্বাচিত করেননি। সংসারে আবদ্ধ জীবদের অন্তরের আবেগ সহজে স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনা। কিন্তু কবির মন অনেকখানি বন্ধনমুক্ত। সেইজন্যই নৈতিক চিন্তা রহিত হয়ে সে তার আবেগের টানে জীবন যাপন করতে সক্ষম। এই কারণেই তারাশঙ্কর কবি চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। 'কবি' বইতে নিম্নশ্রেণীর ছেলে নিতাই নিজের মধ্যে কবিত্বশক্তির উন্মেষ অনুভব করে। সুতরাং সে গতানুগতিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে কবিয়াল হল। তার কবিত্ব শক্তির জন্য রমণীর প্রেম সান্নিধ্যের প্রয়োজন সে অনুভব করে। ঠাকুর ঝির সঙ্গে তার প্রথম প্রণয়। কিন্তু ঝুমুর দলের বসন বা বসন্তের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে সে এই যাযাবর দলে যোগ দিয়ে গৃহত্যাগী হয়। কাহিনীতে নিতাই চরিত্র অপেক্ষাও বসনের চরিত্র অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমাজ-বহির্ভূত এই মেয়েটি জীবিকার প্রয়োজনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান-নাচ করে। পুরুষকে পয়সার বিনিময়ে সাহচর্য দান করে; তার স্বার্থপরতা, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অহঙ্কার, নির্মমতা, অপর মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্য ঈর্ষা— প্রভৃতির মধ্যে কী করে প্রেমের জন্ম হল লেখক তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। সমাজের বাইরের বলে স্বভাবের কাছাকাছি বলে এই মেয়েটির মধ্যে যেন মানবী-মনের আসল রূপটা ধরা পড়েছে। বইখানির বিশেষত্ব হচ্ছে লেখক সম্পূর্ণ নীতি-চিন্তা-বর্জিত (amoral) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর বিষয়বস্তুকে দেখেছেন। কবি নিতাই কোন নীতি-বোধ বা শ্রেয়-বোধ দ্বারা চালিত নয়; সে তার স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়ে আবেগের জোয়ারে ভেসে বেড়াতে চায়; স্বাভাবিক প্রবণতা বশতই সে পরের অনেক কাজ করে দেয়।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু 'ধাত্রীদেবতা' থেকে। এই বইতে তাঁর রাজনৈতিক মানস অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিতর্কমূলক বক্তব্য উত্থাপনের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। পদ্ধতিটি হল উপন্যাসের নায়ক হিসাবে একজন লেখকের প্রতিনিধি-চরিত্রকে কাহিনীতে উপস্থিত করা। এই চরিত্রটি নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এবং মননশীলতার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা লেখকের নিজস্ব মতামতের প্রতিধ্বনি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরও

আগে টলস্টয়ের 'ওআর এণ্ড্ পীসে'র মধ্যে এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্করও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

সাহিত্যে এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগেব পথে তিনটি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ, নায়ক চরিত্র লেখকের প্রতিনিধি বলে সহজেই আদর্শায়িত হয়। পরিবেশেব অন্যান্য চবিত্র থেকে তাব দূরত্বটা বড্ড বেশী চোখে লাগে। সে যেন যীশু বা মহম্মদের মত মানবজাতির পরিত্রাণেব জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত দূত: তাব সিদ্ধান্তের উপরই যেন মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভব কবছে; সুতবাং সে পবিবেশের অনেক উর্ধ্বে বিচরণ করে। কাহিনীর অন্যান্য চবিত্রের চিন্তায় ও কর্মে যেমন স্বতস্ফূর্ততা আছে, তার তা নেই। সে অসাধাবণ; কাজেই সহজ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই জাতীয় বইতে নায়ক চরিত্র একটি ভারী বোঝার মত পাঠকের বস উপভোগেব পথে বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িযে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সব বইয়ের উদ্দেশ্য হল—দুটি মত বা পথের মধ্যে একটিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কবা। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পকর্ম কোন বক্তব্য হাজির কবতে পারে, বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ কবতে পাবে না। সকলেই জানে উপন্যাস একটি কাল্পনিক কাহিনী, এব মধ্যে লেখক অনায়াসে তাঁর বক্তব্যেব পক্ষে সুবিধাজনকভাবে ঘটনা সংস্থাপন কবতে পাবেন। সুতবাং যখনই তিনি একটি মতকে খণ্ডন করে আর একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত কবতে যাচ্ছেন, তখনই তিনি পাঠকের মনে এই সন্দেহ জাগ্রত কবছেন যে ব্যক্তি-নিবপেক্ষভাবে তিনি ঘটনা-সংস্থাপন কবেননি। তিনি কখনোই নিজেব বক্তব্যেব সপক্ষে পাঠকের মনে প্রত্যয় জাগাতে পাববেন না।

তৃতীয়তঃ, এ জাতীয় কাহিনীতে লেখক অনেক সময়েই নায়কের মানস-চিন্তায় যুক্তি এবং প্রতিযুক্তি সংস্থাপন কবেন। কিন্তু যুক্তি-গ্রাহ্য তর্ক-বিতর্কেব স্থান প্রবন্ধ, শিল্পকর্ম নয়। এই সীমাবদ্ধতা এড়ানোর জন্য লেখক যতবেশী তর্ক-বিতর্কের ভাষার মধ্যে আবেগ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন, তা ততবেশী ভাবাতিশয্য সৃষ্টি করে পাঠকেব বিরক্তি উৎপাদন করে। এই অসুবিধার কথা জানতেন বলেই 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গোরার মানস-চিন্তার মধ্যে বিতর্কমূলকতাকে প্রশ্রয় দেননি। একটি মাত্র চরম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গোরার মনোরাজ্যে চিন্তা-বিপ্লব ঘটে গিয়েছে; এবং সে অভিজ্ঞতাটি এতই পরিচিত যে তার সত্যতা সম্পর্কে পাঠকের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উপরোক্ত তিনটি দোষ-দ্বারাই 'ধাত্রীদেবতা'র শিল্প পরিণতি সীমিত। তা সত্ত্বেও বইখানির একটি মূল্য এই যে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন যাত্রার একটি পটভূমিকা লেখক রচনা করেছেন। বিশেষ করে এখানকার জমিদারী ঐতিহ্য ও কৃষক সমাজের চিত্র লেখক প্রায় প্রাকৃতবাদী ঢঙেই দিতে চেষ্টা করেছেন।

নায়ক শিবনাথের বাল্যজীবনের চিত্রায়ন খুবই উপভোগ্য। লেখক সুকৌশলে তার পারিবারিক জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস রচনা করেছেন। শিবনাথ পড়ন্ত জমিদার বংশের নাবালক উত্তরাধিকারী। কিশোর শিবনাথের চরিত্রে স্বভাবজ হিংস্রতা এবং প্রভুত্বলিপ্সা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে বলে তার উপর পিসিমার প্রভাব অধিকতর কার্যকর। পিসিমা জমিদারী ঐতিহ্য অনুযায়ী শক্তি ও দর্পের পূজারী ; কিন্তু শিবনাথের মা অহিংসা ও মানবতার আদর্শ অনুযায়ী জীবন-গঠনের পক্ষপাতী। শিবনাথের উপর এই দুই বিপরীত আদর্শের টানা-পোড়েন, পিসিমার টাকায় ঘোড়া কেনা প্রভৃতি কতকগুলি খুব চিত্তাকর্ষক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিসিমা ও মা যথাক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ ও কংগ্রেসী আদর্শের প্রতিরূপ হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছে।

পরবর্তী জীবনে শিবনাথ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এখন তার উপর পিসিমার বদলে মায়ের প্রভাব কার্যকর। এখন সে মানব-ত্রাণের জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত দূত। তার ব্যক্তিগত জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে এখন আর কিছু নেই। সন্ত্রাসবাদ আর কংগ্রেসী আদর্শের মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ করার উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সে কী করে নিজের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবে? পরমেশ্বরের প্রসাদে তার শাক্ত প্রকৃতি এখন কর্পূরের মত উবে গিয়েছে। তার মনে এখন দুই বিমূর্ত আদর্শের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কোন কিছুর স্থান নেই। সে আর এখন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, সে এখন একখানি রাজনীতি-বিষয়ক বই। পিসিমা পর্যন্ত তার আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করার পর শিবনাথের বাড়িতে এখন শুধু কয়েকটি কায়াধারী আদর্শের ভীড়। এই নিরবময় জীবন-যাত্রার মধ্যে শিবনাথের বৌ একমাত্র মানবিক কামনা-বাসনা-সম্পন্ন মানুষ যে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শেষের অংশকে সঞ্জীবিত করেছে।

আমি আগেই বলেছি ধাত্রীদেবতার ত্রুটি মূলতঃ শিল্প-রীতির ত্রুটি ; এর জন্য

লেখককে দোষ দেওয়া যায় না। তারাশঙ্কর হয়তো এই শিল্প রীতিগত সীমাবদ্ধতা খানিকটা অতিক্রম করে যেতে পারতেন যদি তিনি শিবনাথের শাক্ত প্রকৃতির কথা মনে রাখতেন। 'মানুষের মধ্যে নিজের প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। সুতরাং শিবনাথের পক্ষে কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণে কোন অসঙ্গতি নেই ; কিন্তু এইজন্য তার মনের মধ্যে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং উপজীব্য আদর্শের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে পারত। লেখক এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিলে বইখানি হয়তো আরও সার্থক হয়ে উঠতে পাবত। ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে লেখকের রচনা কুশলতা সুপরিণতি লাভ করেছে ; দৃশ্যরচনায়, সংলাপে, পরিবেশ-রচনায় তিনি এখন সুদক্ষ কারিগর। •

গণদেবতা (১৯৪২) ও পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪) উপন্যাসদ্বয়েব মধ্যে তারাশঙ্কর প্রাকৃতবাদী রচনা-রীতির সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছেন। প্রাচীন স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে এক নতুন অস্থির-মতি উচ্ছৃংখল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে। পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্বমুখর গ্রামীন সমাজকে তারাশঙ্কর বিস্তারিতভাবে চিত্রিত করেছেন দু'খানি উপন্যাসের দীর্ঘ কলেবরের মধ্যে। পুরোন জমিদার দ্বারিক চৌধুরী এখন বিগত শ্রী, কিন্তু তাঁর স্বভাবে সহজ আভিজাত্যের শোভনতা বিদ্যমান। নতুন জমিদার ছিরু পালের মধ্যে শক্তির গর্ব, অর্থ-গৃধ্নুতা এবং গ্রামের নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটেছে। অনিরুদ্ধ কামার গ্রামের বিত্তবানদের নিয়ন্ত্রিত গ্রাম-পঞ্চায়েতর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এইসব এবং আরও অনেক চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদী দেবু পণ্ডিত গ্রাম জীবনের বিভিন্ন স্বার্থ দুষ্ট দলাদলি ও দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবিক বুদ্ধি-সম্মত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় রত। গণদেবতা'তে গ্রামজীবনের বিভিন্নশ্রেণীর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের এক ব্যাপক পটভূমিকা রচনা করে 'পঞ্চগ্রামে' লেখক দেখিয়েছেন যে গ্রামজীবনের দুর্দশা অশান্তি অসন্তোষের মূল কারণ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা।' পাঁচ গ্রামের কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে দেবু-পণ্ডিতের নেতৃত্বে জমিদারের কর বৃদ্ধির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। "স্বার্থবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি, সন্দেহ, জমিদারের কৌশল—প্রভৃতি মিলিয়ে যে জটিল প্রক্রিয়ায় এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল লেখক তার খুব বাস্তবানুগ পরিচয় দিয়েছেন। পরিশেষে বন্যা এবং বন্যা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টার বিস্তৃত ইতিহাস বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। •

পরিকল্পনা অনুযায়ী বইখানির সার্থকতা সন্দেহাতীত। গ্রাম-জীবনের এমন সর্বাঙ্গীন চিত্র তারাশঙ্করের পূর্বে বা পরে আর কোন বাঙালী লেখক দিতে পারেননি বা দিতে পারার মত গ্রাম জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ও আর কোন লেখকের নেই। এই বইয়ের দুর্বলতম উপাদান দেবু পণ্ডিতের চরিত্র। রক্ষা এই যে 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের যেমন নিরঙ্কুশ প্রাধান্য, এখানে দেবু পণ্ডিতের সেরকম নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নেই। গ্রামের বিভিন্ন জীবন চিত্রের মধ্যে দেবুর ভূমিকা অনেকটা যোগাযোগ-রক্ষাকারীর ভূমিকা। কিন্তু লেখক দেবুকে আর একটু গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। লেখকের প্রতিনিধি হিসাবে দেবু কাহিনীর ব্যাখ্যাকার এবং তত্ত্ববিৎ। একটি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আদর্শবাদের ভাবালুতা দেবু চরিত্রকে কুয়াশার মত ঘিরে রয়েছে। কিন্তু কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেবুর আদর্শবাদের কোন পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটে ওঠেনি। তার কারণ, সে জানে যে গ্রামের দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কারণ শোষণ-ব্যবস্থা, শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব ও অপরিহার্যতাও সে হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু এ দুয়ের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত যে শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ লেখক দেবুকে কখনোই সেই সিদ্ধান্তে পৌছে দিতে রাজী নন।

'গণদেবতা পঞ্চগ্রাম মূলতঃ দলিল-চিত্র। এর মধ্যে যতখানি বস্তুভার আছে, যতখানি সমাজ জীবনের বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ আছে, ততখানি মানব হৃদয়ের গভীরে অবতরণের চেষ্টা নেই।' যে রীতিতে এই উপন্যাসদ্বয় লিখিত তাতে অবশ্য এই শিল্প পরিণতিই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। তারাশঙ্করের নিজস্ব শিল্প বৈশিষ্ট্য এই বই দু'টিতে তেমন পরিস্ফুট নয়। তুলনায় 'কালিন্দী' বইতে জমিদারের চরিত্রায়ণের মধ্যে এবং সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ জীবনের চিত্রায়ণের মধ্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব উপলব্ধি প্রধান চরিত্রায়ণের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এই বইতে অন্ধকারের গর্ভে নেপথ্যে পদসঞ্চারে আয়োজিত বিপ্লবের একটি রোমান্টিক স্বপ্ন বিধৃত হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্করের বিশিষ্ট প্রতিভার সর্বাধিক স্ফুরণ ঘটেছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) গ্রন্থে। হাঁসুলি নদীর বাঁকে বসবাসকারী কাহার সমাজ এই বইয়ের উপজীব্য বিষয়। তারা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতীয় গোষ্ঠী; তাদের রীতি নীতি ধর্মবিশ্বাস তাদের নিজস্ব।" "এ বইতে" লেখক গণদেবতা পঞ্চগ্রামের প্রাকৃতবাদী রীতি প্রায় সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন। "কাহারদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সামান্য অত্যাবশ্যক

পরিচয় মাত্র দিয়ে লেখক প্রধানতঃ কল্পনার সাহায্যে এই সমাজের সাংস্কৃতিক মানসিক পরিমণ্ডলের একটি ভাবরূপ সংগঠিত করতে চেয়েছেন। এই সমাজের ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসকে তারাশঙ্কর মোটেই তথ্য হিসাবে উপস্থিত করেননি। এদের বিশ্বাস এদের অর্থনৈতিক জীবন ও সমাজ শৃঙ্খলাকে বিধৃত করে রেখেছে—এই ধরণেব সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও তারাশঙ্কর এগুলিকে চিত্রায়িত কবেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে মানব-মনের কোন যুক্তির অতীত গভীর কন্দরে এই সব ধর্মবিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীগুলির জন্ম। 'বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসগুলি যে ফিকসান লেখক তা জানেন। কিন্তু এই বিশ্বাসগুলিকে অবলম্বন করে এইসব মানুষের অন্তরের সঙ্গে দৃষ্টির অতীত এক অতীন্দ্রিয় লোকের আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে।' এই বিশ্বাসভূমি তাদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মকাণ্ডের উপর মূল্য আরোপ করতে শেখায়। তাদের মধ্যে এক তীব্র গভীর আত্মমর্যাদাজ্ঞানের জন্ম দেয়। সেই সঙ্গে শেখায় সামাজিক হীনতাকে হীনতাবোধশূন্য ভাবে গ্রহণ করতে; দেশের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নিজেদের মর্যাদাহীনতাকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে। 'ধর্মবিশ্বাসগুলি গভীর ভাবাবেগ আশ্রিত এবং সেগুলিকে বজায় রাখার জন্য ওরা জীবন দিতেও প্রস্তুত।'

সামাজিক জীবনেও কাহারগণ বহুলাংশে ইন্স্টিংক্ট বা সয়ম্ভু আবেগ দ্বারা পরিচালিত। দুটি নর নারীর মধ্যে প্রেমের আবেগ যখন জন্মায় তখন তা প্রচণ্ড হিংস্রতার রূপ পরিগ্রহ করে; তখন যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমাজ বাধা দিতে চেষ্টা করে তখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যৌন-দ্বন্দ্বের মত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব স্বার্থ-দ্বন্দ্ব বা বিশ্বাসের দ্বন্দ্বও সহজেই মারাত্মক সংঘাত সৃষ্টি করে। তথাপি লক্ষণীয় এই যে এই ধরণের সাময়িক বিস্ফোরণে কাহার সমাজের সামগ্রিক সংগঠনটি বা মৌল বুনিয়াদ এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মোটের উপর কাহার সমাজের চিত্রায়নের মধ্যে লেখক এক যুক্তি ও বিজ্ঞানবর্জিত ইন্সটিংক্ট শাসিত প্রাক্-সভ্য সমাজের চিত্র উপস্থিত করেছেন যা মৌল মানব প্রকৃতির উপর কিছু আলোক নিক্ষেপ করেছে।

কাহিনীতে লেখক দেখিয়েছেন যে এই সমাজের মধ্যে পুরাতন এবং নতুনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে এবং তার কারণ নতুন অর্থ-নৈতিক সংঘাত যা তাদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। সমাজ প্রধান বনোয়ারি পুরাতনের প্রতিনিধি, করালী নতুনের প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে সংঘাত এখনো পুরাতন

ক্ষমতা বা প্রেম দ্বন্দ্বের পথেই রূপ নিচ্ছে; কিন্তু তার মধ্যেই বিদ্যুচ্চমকের মতই একটু একটু ভিন্ন সুর দেখা দিচ্ছে। করালী হঠাৎ যুগ যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায় এবং বিশ্বাসের অসারতাকে প্রমাণ করে ছাড়ে। অদূরবর্তী কারখানার ভেঁপু কাহারদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আহ্বান জানায় আর কারালীর উস্কানি তাদের লোভে ইন্ধন জোগায়, তাদের গণ্ডীর বাইরে পা ফেলার ভয়কে ভেঙ্গে দেয়। লেখক নতুনের জয়কে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু করালী ও তার অনুচরদের শেষ পরিণতিকে খুব প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। গণ্ডীর বাইরে এসে তারা উচ্ছৃংখল এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে। যে পাখির প্রতি করালীর প্রেম ছিল দুর্বার এবং সীমাহীন, বিয়ের পর সেই পাখির প্রতি তার অমনোযোগ এক কেন্দ্রচ্যুত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

হাঁসুলি বাঁকের কাহিনীর সামগ্রিক কাঠামোটি প্রাকৃতবাদ সঙ্গত—কারণ সমাজের পরিবর্তনের একটি বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেওয়ার চেষ্টা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যে তারাশঙ্কর কাহার সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন তা কল্পনার সাহায্যে বাস্তবের পুনর্গঠন বলে গণ্য হতে পারে। তার মধ্যে লেখকের বিশিষ্ট প্রতিভা এবং উপলব্ধি প্রধান শিল্পী-মানসের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। হাঁসুলি বাঁকের শিল্পোৎকর্ষের আর একটি কারণ এর মধ্যে লেখকের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন চরিত্রের অনুপস্থিতি।

'ধাত্রীদেবতা'র তারাশঙ্কর কংগ্রেসী আদর্শের সমর্থক। 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম 'কালিন্দী', 'হাঁসুলি বাঁকে' তারাশঙ্কর কমিউনিস্ট-কথিত সমাজ রূপান্তরের তত্ত্বকে প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন। এই দুই আদর্শের অন্তর্দ্বন্দ্বের তারাশঙ্কর-কৃত ধর্মীয় সিন্থেসিসের প্রথম আভাস পাওয়া 'আরোগ্য-নিকেতন' নামক গ্রন্থে। কবিরাজী এবং ডাক্তারির সমন্বয় সাধক চিকিৎসক জীবন মশয় বিশ্বাস করেন যে রোগের চিকিৎসা করা যায়, মৃত্যুর কোন চিকিৎসা নেই। মৃত্যু ঈশ্বরের অমোঘ বিধান; এবং ঈশ্বরের অনন্ত প্রজ্ঞার কথা স্মরণ রেখে এই অপরিহার্যতাকে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত পুরাতন পৃথিবী আমাদের এই দার্শনিক প্রজ্ঞা দান করেছে; সমস্ত দুঃখ গ্লানি ব্যর্থতার মধ্যে এই প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্তি দান করে। আধুনিক বিজ্ঞানের কর্মকুশলতার অহঙ্কারে আমরা যদি অন্ধ না হই, তবে আমরা এই প্রাচীনদের প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিতে পারব এবং সমাজের পরিবর্তন-

শীলতার মধ্যে সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সহাবস্থানের নীতিকে গ্রহণ করতে পারব। কাহিনীতে হাসপাতালের ডাক্তার জীবন মশায়ের নিদান-ঘোষণার তীব্র সমালোচক ; কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন এ দুজনের মধ্যে গভীর সৌহার্দ স্থাপিত হল। এই ঘটনার মধ্যে লেখক হয়তো আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন প্রজ্ঞার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছেন।

তারাশঙ্করের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সপ্তপদী (১৯৫৮), বিচারক (১৯৫৭), রাধা (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'সপ্তপদী'র নায়ক কৃষ্ণেন্দু ধর্মান্তরিত হয়েও প্রণয়িণী বিণা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে খ্রীষ্টীয় পাদরি সন্ন্যাসী কৃষ্ণস্বামীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কুষ্ঠদের সেবাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে সে প্রশান্তিলাভ করেছে। বিণা কিন্তু সমাজে লাঞ্ছিত হয়ে অধঃপতনেব চবম সীমায় নেমে গিয়েছে। এই সময়ে কৃষ্ণ-স্বামীর সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎকাবের মধ্যে তাব অনিদেশ্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের তীব্রতার পাশাপাশি কৃষ্ণস্বামীব প্রশান্তি ও কল্যাণকামনা দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। কৃষ্ণস্বামীর অদৃশ্যপ্রভাবে বিণার জীবনে পরিবর্তন আসে এবং সে বিবাহ কবে। কাহিনীতে পরিবর্তনের নাটকীয় গ্রন্থিগুলি অন্তবালে রেখে লেখক শুধু সেগুলি উল্লেখ করেছেন। তার ফলে উপন্যাসটিতে মাত্র কয়েকটি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং দৃশ্যগুলিব মধ্যে সময়ের বিস্তব ব্যবধান। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে লেখক দৃশ্যগুলিকে বিস্তারিত করাব সুযোগ পেয়েছেন এবং কাহিনীর মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি একাগ্র রাখতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা এযুগেব যুগ যন্ত্রণা ও উন্মার্গগামিতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই ধরণের একটি বক্তব্য কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

রাধা-তত্ত্ব অর্থাৎ সমাজ-অস্বীকৃত পরকীয়া প্রেম যে ধর্মসাধনার অবলম্বন হতে পারে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন করেছেন তারাশঙ্কর 'রাধা' নামক উপন্যাসে। 'রাধা'র আর একটি উদ্দেশ্য একটি ঐতিহাসিক কালকে—মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের পত্তনের অন্তর্বর্তি রাজনৈতিক শূন্যতার কালকে—চিত্রায়িত করা। দু'টি নিঃসম্পর্কিত উদ্দেশ্যকে লেখক নায়ক মাধবাচার্যের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন ; কিন্তু তবু কাহিনীর ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছে। বহু ঘটনা, বহু চরিত্র, বৈষ্ণবধর্মের বহু তথ্যের সমাবেশ এমন এক জটিল জট সৃষ্টি করেছে যে কাহিনী সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে

পারেনি। তবে মাধবাচার্যের প্রতি মোহিনীর একনিষ্ঠ প্রেম যে ধর্মসাধনার নামান্তর লেখক তা প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন। 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসটিও বস্তুভারাক্রান্ত, বহু ঘটনা ও বহু চরিত্রের ভীড়ে এবং বারবার কাহিনীর পট পরিবর্তনের ফলে শিল্প-পরিণতি ক্ষুন্ন হয়েছে। নায়ক সুদর্শন ঈশ্বর ও তাঁর কল্যাণময়তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়, কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার ভোগবাদ হিংসা ও ব্যভিচারের মধ্যে বিশ্বাসের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায় না। এই মোহভঙ্গ তাকে এক পৈশাচিক ভোগবাদী করে তুলেছে। আসলে সুদর্শন তারাশঙ্করের পরিচিত এক ইন্সটিংক্ট্-প্রধান চরিত্র, তার আবেগ তাব অন্তর্নিহিত শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ এবং এই প্রকাশের মধ্যে নীতিবোধ বা শুভাশুভ চিন্তার সম্পর্ক নেই। রূপকার্থে সুদর্শন আধুনিক যুগমানসের মানবধর্ম বা অনুরূপ কোন ধর্মগ্রহণের আকুতি এবং হিংসা ও ভোগবাদের ধুম্রজালের মধ্যে সেই আকুতির ব্যর্থতার প্রতীক।

তারাশঙ্করের শেষ পর্যায়ের বইগুলির মধ্যে যে ধর্ম-চিন্তা বিধৃত হয়েছে তা আধুনিক যুগ-সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাতেই প্রমাণ হয় যে লেখকের মন এখনো সক্রিয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটখাটো সংস্কারের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব এ-আশা কল্লোল-কালীন লেখকদের মন থেকে এক রকম উবে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের মনে একটি ইওরোপীয় ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থা, যার মধ্যে প্রাচুর্য এবং বিলাস-ব্যসনের উপকরণের সঙ্গে থাকবে সমানাধিকার এবং নব্য কালোপযোগী সমাজ-নীতির প্রচলন, তার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সংস্কারে অনাস্থার সঙ্গে এসেছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের পরাজয়ের পর ঘনায়মান অর্থনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে রাজনৈতিক কর্ম ও শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে যে দেশের ভাগ্য ফিরবে এ আশাও তাঁদের মন থেকে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা শিল্পের নিজস্ব দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করতে চেয়েছেন; এবং পুরনো অবাঞ্ছিত সমাজকে যত্রতত্র হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছেন। চতুর্থ দশকেও অবস্থার কিছু উন্নতি হল না। তখন একদল লেখক বেরুলেন এই নিরাশার মধ্যে আশার আলোর সন্ধান করতে জীবনের ব্যাপ্তি এবং গভীরতার মধ্যে। এতকাল পর্যন্ত লেখক-সমাজের দৃষ্টিপটের সামনে ছিল প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। এবার একজন তারাশঙ্কর গেলেন সাঁওতাল, বাগ্‌দী, বাউড়ী, সাপুড়ে, প্রভৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবর্তন-প্রতিরোধী শক্তির আবরণে আচ্ছাদিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজগুলির কাছে জীবনের অর্থ, জীবনের আদিম রূপ, তার গতি এবং ভবিষ্যতের তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য। একজন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবতরণ করলেন সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মনের গভীরে মানুষ কেন সংস্কার-বিরোধী তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য। আর বিভূতিভূষণ ডুব দিলেন নিজের ব্যক্তিসত্তার গভীর সমুদ্রে আশার আলোর সন্ধানে।

বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গে সকলের আগে যে-কথাটি মনে হয় তা হল তাঁর নিরঙ্কুশ আন্তরিকতা। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত কৃত্রিমতা-বর্জিত লেখক

আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। কৃত্রিমতা কথাটি নানা সময়ে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে এখানে কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কৃত্রিমতার বিপরীত হল স্বভাব বা স্বাভাবিকতা। কিন্তু এই পরিণত সভ্যতার যুগে মানুষ কখনোই পুরোপুরি স্বভাবের জীব হতে পারে না। জন্মাবধি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি কামনা এবং প্রবণতাগুলি ক্রমাগত সমাজের শাসনে অবদমিত, সুসংস্কৃত বা রূপান্তরিত হতে থাকে। এইভাবে বছর ষোল বয়সের সময় মানুষের চরিত্র মোটামুটি একটা স্থিতি-স্থাপকতা লাভ করে। এই পর্যায়টাকে যদি মানুষের স্বভাব বলে ধরা যায় তবে কৃত্রিমতা হল সেই মুখোশ যা মানুষ পরবর্তীকালে ধারণ করে নিজের এই স্বভাবকে গোপন করার জন্য, নিজের সম্পর্কে অপরের মনে একটি অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করার জন্য। জীবিকার্জনের প্রয়োজনে বা অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তির মালিক হওয়ার জন্য মানুষ এই কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং ষোল বছর বয়সে যার মধ্যে লোভ স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি প্রবণতাগুলি সঙ্কুচিত, মানুষকে যে সহজেই নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে, একমাত্র তার পক্ষেই পরবর্তী জীবনে এই স্বভাব বজায় রাখা সম্ভবপর। গ্রামীণ পরিবেশে বা কৃত্রিমতা-বর্জিত অনভিজাত পরিবেশে যাঁর ষোল বছর কেটেছে কেবল তিনিই অকৃত্রিম থাকতে পারেন আজীবন। বিভূতিভূষণ এই শর্তগুলি পূরণ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি আজীবন অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

এই ধরণের মানুষ কিছুটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আত্ম-মগ্ন হয়; ইণ্টুইসানের পথে গেলে তারা সাহিত্যিক বা ভাবুক হয়, ইণ্টেলেক্টের পথে গেলে তারা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হয়। জীবন সম্পর্কে তাদের শিশু-সুলভ রোমাণ্টিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-জাত কৌতূহল আছে, কিন্তু স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-কোলাহল মুখর জীবন-যাত্রা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন বলে মানব মনস্তত্ত্বের অনেক কুটিলতা এবং জটিলতার তারা সন্ধান রাখে না। এই কারণেই বিভূতিভূষণের শিল্পজগতে চরিত্র-বৈচিত্র্যের অভাব নেই, কিন্তু সমস্ত চরিত্রই মোটামুটি সরলরেখাত্মক। বিভূতিভূষণের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ডের নিরিখে তারা দুটি ভাগে বিভক্ত— হয় গ্রহণযোগ্য, নতুবা গ্রহণের অযোগ্য। এই পছন্দ-অপছন্দও সম্পূর্ণভাবে স্বতস্ফূর্ততা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নয়। সাধারণতঃ বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান মানুষদের মধ্যে যারা অহঙ্কারী, লোভী, স্বার্থান্বেষী এবং নিষ্ঠুর তারা বিভূতিভূষণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। মানবিক গুণসম্পন্ন

সাধারণ মানুষই তার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে, যদিও তাদের মধ্যে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

তাঁব পছন্দ-অপছন্দের মত ভাল-লাগা মন্দ-লাগাও স্বতঃস্ফূর্ত এবং তীব্র। আকাঙ্ক্ষামুক্ত মন বলে কুটিলতা-বর্জিত মন বলে তাঁব মনের সংবেদনশীলতা স্বভাবতঃই অত্যন্ত প্রখব। প্রতিটি ঘটনা এবং দৃশ্য এই মনেব উপর যেমন প্রতিবেদন সৃষ্টি কবে, তেমনি এই মনেব সুখানুভূতি এবং দুঃখানুভূতিও অত্যন্ত প্রবল। চরিত্র গ্রহণ ও বর্জনেব স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রতি পদে পদে সুখ দুঃখ বোধেব তীব্রতা এক ধরণেব নাটকীযতা সৃষ্টি করে। আর এই নাটকীযতার আবেদন বযেছে বলেই সাধাবণ অসাধাবণ সমস্ত পাঠকেব কাছে বিভূতিবাবু জনপ্রিয়।

বিভূতিভূষণেব মধ্যে বোমান্টিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব সহজ সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্য তাঁব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিতান্ত প্রাথমিক স্তবেব, জীবনেব বহিবঙ্গেব নিখুঁত পর্যবেক্ষণেই তা সীমাবদ্ধ। একই সমযে তিনি মানব জীবনের মধ্যে গভীর বহস্যমযতাব সন্ধান পান—যা বোমান্টিক মানসের বিশেষত্ব। এই বহস্যমযতা সন্ধানেব জন্য তাঁকে জীবনের উপব উদ্ভট বা অতিরঞ্জিত কল্পনা আবোপ কবতে হয না। জীবনেব পবিচিত বাস্তব কার্য কাবণেব নিযমগুলিই তাঁব কাছে অসীম রহস্যমযতাব দ্যোতক। বস্তুতঃ বাস্তবের সাধারণ বৈজ্ঞানিক-সুলভ চিত্রাযনের মধ্যেই তিনি অসাধাবণত্বেব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি কবতে পাবেন এবং এইভাবে তাঁর মধ্যে রোমান্টিক এবং বৈজ্ঞানিকেব মিলন ঘটেছে। শিল্পী হিসাবে তাঁব মহত্ত্বের এইটিই প্রধান কাবণ।

উপবোক্ত কারণে বিভূতিভূষণেব উপন্যাসে প্রাকৃতবাদ উভয অর্থে প্রতিফলিত হযেছে। বাস্তবেব বিজ্ঞানী-সুলভ চিত্রাযন যেমন বযেছে, তেমনি বযেছে 'ব্যাক্ টু নেচাব' (Nature অর্থ প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি দুই-ই)-এব আবেদন। বিভূতিবাবুর সমগ্র সাহিত্য কর্মের মধ্যে যদি কোন বক্তব্য আভাসিত হয়ে থাকে তবে তা এই—প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে হবে, এবং যারা প্রকৃতিব কাছাকাছি আছে তাঁদের মত চরিত্র আয়ত্ত কবতে হবে।

রাজনৈতিক চিন্তাদ্বন্দ্ব বিভূতিবাবুব মনকে স্পর্শ করেনি। তার কারণ জীবনকে অনায়াসে স্বীকার করে নেওযাই তাঁর জীবন-নীতি। আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতাকে তিনি বুঝতে পারেন না, একে তিনি পরিহার করে

চলতে চান। কিন্তু তাই বলে এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মনোভাবও তাঁর নেই। তিনি যা পছন্দ করেন না, তা তিনি এড়িয়ে চলতে চান; কিন্তু তাকে উচ্ছেদ করার চিন্তা তাঁর মাথায় আসে না। তিনি মূলতঃ জীবন-রস উপভোগের কবি, এবং তিনি জানেন প্রকৃত জীবন উপভোগের জন্য অনেক আয়োজনের দরকার নেই। তবে যারা আয়োজনের নেশায় মেতেছে, তাঁরা মাতুক। চির পরিবর্তনশীল জীবনের স্রোতে তারা আপনা থেকেই একদিন ধুয়ে মুছে যাবে।

বিংশোত্তর যুগের প্রভাব যে বিভূতিবাবুর মধ্যে অনুভব করা যায় না তা নয়। তাঁর অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের আগ্রহের মধ্যে যাযাবর প্রবণতার লক্ষণ আছে। গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও বৈরাগ্যতন্ত্রের উপর তাঁর আস্থা প্রকাশ পায়নি; বরং সহজিয়াদের মত সহজভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য এবং ভোগ্যবস্তুকে তিনি অকুন্ঠিত চিত্তে উপভোগ করতে চেয়েছেন, এবং এই রোমান্টিক ইন্দ্রিয়তন্ত্রতার মধ্যে 'কল্লোল'-মানসিকতা কাজ করছে। তিনি যে উপন্যাস রচনার প্রচলিত রীতি ত্যাগ করে নতুন অপরীক্ষিত রীতি অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন তাও সম্ভব হয়েছিল তিনি বিংশোত্তর যুগের আবহাওয়ার বর্ধিত হয়েছিলেন বলে। কল্লোলের লেখকদের সঙ্গে তাঁর প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য এইখানটায় যে তাঁরা ছিলেন যন্ত্র ও নগর সভ্যতার পূজারী; পক্ষান্তরে তিনি আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এক অপরিচিত আগন্তুক।

'পথের পাঁচালি' থেকে আরণ্যক পর্যন্ত বিভূতিবাবুর প্রধান চারখানা বই আত্মজীবনীমূলক। এই জাতীয় উপন্যাসের বিশেষত্ব কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে ওঠে না। নায়কের জীবনের সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে তার মানস-ইতিহাস এবং মানস-পরিণতি ও উপলব্ধিকে বিধৃত করা এই উপন্যাসের লক্ষ্য। এই রীতির প্রথম ইঙ্গিত বুদ্ধদেবের 'সাড়া' উপন্যাসে সূচিত হয়েছে, কিন্তু বিভূতিবাবুর রচনাতেই তা সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। এই রীতিতে কাহিনীর ঢিলেঢালা যথেচ্ছ বিন্যাসের খানিকটা সুযোগ আছে, এবং বিভূতিবাবু সে সুযোগের যে কিছু কিছু অপব্যবহার করেননি তা নয়। তাঁর বর্ণিত প্রতিটি অধ্যায়ই নায়কের জীবনোপলব্ধির পক্ষে অপরিহার্য নয়। বিভূতিবাবু কাহিনী-গ্রন্থনার সুদক্ষ কারিগর নন। কিন্তু তাঁর কাহিনীর সামগ্রিক মূল্য এবং আবেদন এতই বেশী যে এইসব ত্রুটি আমাদের নজরেই আসে না।

'পথের পাঁচালি' বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস। এই বই প্রকাশের পর কিছুদিনের মধ্যেই বিভূতিভূষণ খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন এবং সে খ্যাতির আসন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার প্রথম গ্রন্থই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি। কেন সে আলোচনায় পরে আসছি।

'পথের পাঁচালি' আত্মজীবনীমূলক বই, অর্থাৎ নায়ক অপুর জীবনের মারফৎ লেখক বাল্যকাল থেকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিসমূহকে অনুসরণ করে চলেছেন। তার মানে এই নয় যে অপুর জীবনের কাহিনীগুলিই আসলে লেখকের নিজের জীবনের কাহিনী। অপুর জীবনের কাল্পনিক কাহিনী প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসমূহের আদর্শীকৃত রূপ। এই আদর্শীকরণ বা সাধারণীকরণ (generalisation)-এর ফলে যা ছিল লেখকের মনোজগতের নিজস্ব ব্যাপার তা হয়ে দাঁড়ালো বহু সমভাবাপন্ন মানুষের মনোজগতের ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

বইখানার বিন্যাস-কৌশল যে বিভূতিবাবু রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফে'র থেকে গ্রহণ করেছেন তো বোধকরি সন্দেহাতীত। জাঁ ক্রিস্তফ্ এবং অপু উভয়েই শিল্পী অথবা শিল্পভাবাপন্ন ব্যক্তি। উভয়েই জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, অত্যন্ত শিল্পী-সুলভ স্পর্শকাতর মন নিয়ে বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, জীবনের চরম উপলব্ধিতে পৌঁচেছে। কিন্তু অপু নিজে এবং অপুর পরিবেশ সম্পূর্ণ বাংলা দেশের, যেমন জাঁ ক্রিস্তফের ফরাসী দেশের। আর অপুর পরিণতি আর জাঁ ক্রিস্তফের পরিণতিও তদনুযায়ী বিভিন্ন।

লেখক অপুর দীর্ঘ বংশ-পরিচয় দিয়েছেন। খুনে অভিশপ্ত বীরু রায়ের বংশে বড় ছেলেরা বাঁচত না, অপুর বাবা হরিহর প্রথম বড় ছেলে যিনি বেঁচে রইলেন। কেন? এতদিনে বংশের অভিশাপ কেটে গেল বলে? না, হরিহরের ছেলে অপু জীবনের নতুন সত্য আবিষ্কার ক'রে করে অভিশাপ খণ্ডন করবে বলে? (এ সব নেহাৎ গ্রাম্য প্রবাদ বা কবিকল্পনা নয়, বিভূতিভূষণ এ-সব বিশ্বাস করতেন।) এই পূর্ব ইতিহাস দেওয়ার তাৎপর্য জীবনের প্রবহমানতার মধ্যেও গ্রাম্য সমাজের স্থিতি স্থাপকতার অনুভূতি জাগানো। এ-ইতিহাসের রোমান্টিক অবেদনও লেখকের কাছে উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু এ-ইতিহাসের মধ্যে কি এমন তাৎপর্যও নেই—

বংশের ধারাব মধ্যে জঘন্য পাপের কাহিনী লুক্কাইত থাকে বলেই মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিযে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে ? বিভূতিভুষণের ধ্যান-ধাবণাব কথা মনে কবলে এ-অনুমানকে একেবাবে উডিযে দেওয়া যায় না। অপুব বাল্যকালেব কাহিনীকে কেন্দ্র কবে লেখক গ্রাম-সমাজের এক আশ্চর্য বাস্তব চিত্র উপস্থিত করেছেন। ছোট ছোট নাটকীয ঘটনার ভিতব দিযে এই গ্রাম্য বাস্তব ফুটে উঠেছে। অপুব দিদি দুর্গা আতা চুরি কবে এনে পিসি ইন্দির ঠাকরুণকে দিচ্ছে বলেই মা সর্বজযাব নীতিবোধ প্রখব হযে উঠেছে। হাব চুবি গিযেছে বলে বডলোকেব মেযে গবীব দুর্গাকে সন্দেহ কবে, হবিহব সর্বজযাব কাছে শিষ্যবাডি থেকে ফিরে প্রতিবাবই বড বড আশাব কথা শোনায,—ইত্যাদি ঘটনাব মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের জন্যই গ্রাম্য-বাস্তবেব চিত্র অত্যন্ত নিখুঁত এবং জীবন্ত হযে উঠেছে।

তবু এ বাস্তব মূলতঃ চোখে দেখা বাস্তব—বাস্তবেব বাহ্যরূপ ঃ ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ মনস্তত্ত্বটুকু। ঘটনাব পিছনে বা ঘটনাব গভীবে লেখক প্রবেশ কবতে চেষ্টা কবছেন না। এই জিনিস আছে, এবকম ঘটছে, লেখক তাই বিবৃত কবছেন। কেন আছে, কেন ঘটছে,—লেখক সে প্রশ্ন কবছেন না। শিশু-মানসেব অনুসন্ধিৎসা 'কি' তেই শেষ, 'কেন' পর্যন্ত পৌছায না। সেই হিসাবে শিশু অপুব চোখ দিযে দেখা এই বাস্তব চিত্র অত্যন্ত প্রত্যযসিদ্ধ। কিন্তু পবেব বইগুলো পডে আমবা জানতে পাবি পবিণত বিভূতিভূষণেব বাস্তব দৃষ্টিও এইখানেই সীমাবদ্ধ।

এই বাস্তবেব কোন কোন্ ঘটনা বিভূতিবাবুকে সবচেযে বেশী অভিভূত কবেছে এবং তাব মনে সুদূবপ্রসাবী প্রতিক্রিযা সৃষ্টি কবেছে? প্রথমতঃ গবীব ছেলে-মেযেদেবও তরুণ ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত সজাগ, ভালো-মন্দ জিনিস উপভোগেব জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র, ভযে ভযে অতি ছোটখাটো জিনিস তাবা কামনা কবে,—আতাটা, আমটা, ভাঙা পুতুলটা, এক টুকবো সোনার জিনিস। এ সামান্য জিনিসও পায না বলে এমন-কি তাবা চুরি করে এবং সেজন্য নির্যাতিত হয। দ্বিতীযতঃ, গ্রামের যারা বিত্তশালী অবধারিতভাবেই হৃদযেব ঐশ্বর্যে তাবা দীন, অহংকারে তারা স্ফীত, তাদেব বিবাট সম্পত্তির সামান্য টুকরোটাও বক্ষায তারা নিষ্ঠুর, এবং গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েদের তাবা হ্যাংলা পথেব কুকুবেব মতই দেখে এবং ঘৃণা করে।

গ্রাম্য বাস্তবের বিপরীতে রযেছে অপুর সম্প্রসারণশীল মন। প্রত্যেক শিশুর

মধ্যেই যে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা থাকে, পৃথিবী ও প্রকৃতির প্রতি টান থাকে, রোমাণ্টিকতার নয়নাঞ্জন দিয়ে বিভূতিভূষণ তাকেই অসামান্য করে তুলেছেন অপুর মধ্যে। নিশ্চিন্দিপুরের ছোট্ট বন-জগৎ; ইছামতী নদী, রেল-লাইন,—এ সামান্য জিনিসগুলোর আশ্চর্য বৈচিত্র্য, অপুর কৌতূহলবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং বিরাট পৃথিবীর আরও হাজার গুণ বৈচিত্রের সান্নিধ্যে এসে তার জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর করে তুলবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগ্রত হয়।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি আর রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে তফাৎ আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মনুষ্য-সংস্পর্শ-বর্জিত প্রকৃতির কোন স্থান নেই (আছে কি?)। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতির মূল্য তার সৌন্দর্য এবং ঋতু বৈচিত্র্যের জন্য আর মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতিফলন প্রকৃতির মধ্যে ঘটে এমন কল্পনা করার সুবিধা আছে বলে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তার অজস্র গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, ঋতু-চক্র নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন্ত সত্তা। মানুষের সেখানে কোন প্রয়োজন নেই বা মানুষ প্রকৃতিতে মানবীয় গুণ আরোপ করে তাকে মহৎ করে তোলে তাও নয়, প্রকৃতি নিজেই মহৎ। তবে মানুষ প্রকৃতির কাছে গেলে প্রকৃতি তাকে স্বাভাবিক স্নেহে কোলে তুলে নেয়, তাকে শিক্ষা দেয়, তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, সভ্যতা তার মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করে সে ক্ষত আরোগ্য করে। প্রকৃতির এই পরিপূর্ণ সত্তার পূর্ণতর পরিচয় আমরা পাই 'আরণ্যকে', প্রকৃতি সেখানে বিশাল এবং প্রায় জনমানবশূন্য এবং সেখানে দ্রষ্টা পরিণত বিভূতিভূষণ (বা অপু)। 'পথের পাঁচালি'তে অপুর শিশু-চৈতন্যে অস্পষ্টভাবে প্রকৃতির সত্তার চেতনা ধরা পড়ছে এই অবধি আমরা বুঝতে পারি।

অপুর মনের রোমাণ্টিক আদর্শবাদ গড়ে ওঠে প্রকৃতি, মা ও দিদির স্নেহ এবং রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাবে।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপু নিজের অভিজ্ঞতাতেই জীবনের পরিবর্তনশীলতাকে হৃদয়ঙ্গম করে। মহাকালের গতিশীলতা এবং মহাকাশের বিশাল ব্যাপ্তি এই দু-এর ছন্দে অপুর কবি-সত্তা আলোড়িত হয়। এ দু-এর সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন দেবতা অপুর দিকে হাত বাড়ান। এইখানেই 'পথের পাঁচালি' শেষ।

একদিকে গ্রামের সংকীর্ণ শ্বাসরোধকারী বাস্তবতা, আর একদিকে অপুর

বাস্তব-অতিক্রমী রোমান্টিক মনের বিস্তৃতি,—এই দুই বৈপরীত্যের আশ্চর্য সুসম সমাবেশে 'পথের পাঁচালি'র শিল্প-নৈপুণ্য। বাস্তবতা এবং রোমান্টিকতার এমন মিশ্রণ—সুসমঞ্জস মিশ্রণ খুব দুর্লভ। আর এই রোমান্টিকতাও বিশেষজ্ঞের রোমান্টিকতা নয়। প্রত্যেক মানুষই তার প্রথম বয়সে নিকট থেকে দূরে, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার স্বাভাবিক জৈব প্রেরণা বোধ করে বলে এই রোমান্টিকতা সার্বজনীন।

অবশ্য একমাত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে ছাড়া এ রোমান্টিসিজম সম্ভব নয়। অনড় অচল স্থিতিশীল সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মানুষের জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ব-নিধারিত। সেখানে দূরের স্বপ্ন অজানার স্বপ্ন প্রেরণা লাভ করে না। আধুনিক সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে বলে অপু নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী গিয়েছে এবং কাশী থেকে অন্যত্র। দূরের কামনার এই আংশিক সাফল্যই দূরকে অধিগত করার রোমান্টিক আকুতিকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

'অপরাজিত'তে অপু চলে এসেছে আধুনিক সভ্যতার ভারতীয় সংস্করণের পীঠস্থান কলকাতায়। অনেক আশা নিয়ে সে ঢুকল কলেজে, তারপর কর্ম-জীবনে। কিন্তু এ কোন্ বৃহত্তর জীবনকে জানার আগ্রহ নিয়ে সে কলকাতা এসেছিল? দারিদ্র্য-পীড়িত অপু একটু স্থিতিস্থাপকতার আশায় দুয়াবে দুয়ারে ধর্ণা দিল। তাকে যেতে হল ধনীর কাছে, জ্ঞানীর কাছে, ক্ষমতার অধিকারীর কাছে। সবখানেই সে একই অভিজ্ঞতা লাভ করল। যেখানেই কায়েমী স্বার্থ—তা সে বিদ্যারই হোক, ধর্মেরই হোক, ক্ষমতারই হোক—সেখানেই অহংকারের স্ফীতিতে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। একটা নিষ্ঠুর নির্মানবিক বৈষয়িক বুদ্ধি সমস্ত সভ্যতাকে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে রেখেছে। এই অকরুণ মরুভুমির মধ্যে পরিভ্রমণ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত অপু মাঝে মাঝে আশ্রয় পায় যখন কোন সাধারণ লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়, বা কোন পূর্ব-পরিচিতের সঙ্গে—যেমন লীলার সঙ্গে —তার দেখা হয়। তখন সে বুঝতে পারে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে সে এসেছিল ভুল জায়গায়, জীবনের সত্যিকারের পরিচয় সে ফেলে এসেছে পেছনে—নিশ্চিন্দিপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। প্রকৃতিই মানুষের একমাত্র সত্যিকারের আশ্রয়। অতঃপর অপু এক বনরাজ্যের মধ্যে চাকরি নিয়ে পালিয়ে গেল সভ্য-সমাজের ছোঁয়াচ থেকে। তবে যাওয়ার আগে সে এই

আশ্বাস নিয়ে গেল যে সভ্যতার নিষ্পেষণ সত্ত্বেও জীবন অবিনশ্বর; কারণ ছেলে কাজলের মধ্যেও সে দেখল শিশু অপুর প্রকৃতি-প্রেম। প্রকৃতির প্রতি জীবনের টানই জীবনকে সভ্যতার ধ্বংসকারী শক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তুলবে।

'অপরাজিত'র পর 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। অপু আবার জিতু হয়ে ফিরে এসেছে। অপুর জীবনের অভিজ্ঞতারই কম-বেশী পুনরাবৃত্তি জিতুর মধ্যে;—তবে এবার পরপর ঘটনাগুলি অনেক বেশী ছকের মধ্যে এসে গিয়েছে। অপুর জীবনচক্র লেখকের কাছে শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু জিতুর বেলায় তা প্রথম থেকেই লেখকের মনে নির্ধারিত হয়ে আছে। তার ফলে সভ্যতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অপুর জীবনে এসেছে অনেক ধীরে ধীরে, জিতুর জীবনে তা প্রায় শুরু থেকেই বর্তমান। পার্বত্য প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য থেকে জীতু নির্বাসিত হল সমতলের সভ্যতা নামক বর্বর সমাজে সেই সভ্যতারই স্বার্থান্বেষী চক্রান্তে। সে এল এক ভূসম্পত্তির মালিক বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে। বড়লোকের সেই একই চেহারা,—সেই অহংকার, সেই সংকীর্ণ-বিষয়-বুদ্ধি, সেই সম্পত্তি রক্ষার জন্য ঠাকুর-দেবতাকে জমকালো ভাবে ঘুষ দেওয়া, সেই গরীবের উপর অত্যাচার। অপুব বড় বোন দুর্গাব মত জিতুরও এক বড় ভাই আছে। তবে দুর্গার মত সে বুদ্ধিমতী এবং সজীব নয়; সে একটু বোকা; লোভেব বশে চুরি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে এবং মার খায়। অপুর মতই জিতু মা এবং ভাইকে হারিয়ে জীবনের পথে যাযাবর-যাত্রায় বার হয়েছে।

অপুর মত জিতুও বারবার ধনের সংস্পর্শে এসেছে। বিভূতিভূষণের কাছে সর্বত্রই ধনের চেহারা একই,—সে ধন ভূস্বামীরই হোক, বা শিল্পপতিরই হোক, বা ধর্মগুরু মোহান্তরই হোক। মানবতার শত্রু, জীবনের শত্রু, নীচ জড়-তাপসী ধনিকদের বিরুদ্ধে বিভূতিভূষণের আক্রোষের শেষ নেই। এরাই সভ্যতার স্রষ্টা বলে তিনি ধরে নিয়েছেন এবং সেইজন্য তিনি সভ্যতারও বিরোধী। ধনিক সম্পর্কে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা এত প্রত্যক্ষ, বাস্তব এবং সত্য যে সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া যত ছেলেমানুষী বলেই মনে হোক, তার গভীর আন্তরিকতা মনকে স্পর্শ না করে পারে না।

অপুর সঙ্গে জিতুর তফাৎ দুই জায়গায়। অপু প্রকৃতি প্রেমিক হলেও তার জীবনে কোন অতি-প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা নেই। জিতুর আছে। হঠাৎ কখনো

কখনো ভবিষ্যতের ঘটনা তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। এ-রকমের অতি-লৌকিক ঘটনা হরদম ঘটে বলে থিওজফিস্টরা হাজার প্রমাণ দিতে পারবেন। সুতরাং তা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র এটা নয়। এটুকু বললেই যথেষ্ট যে যার প্রত্যয়গ্রাহ্যতা অন্তত সন্দেহের ব্যাপার সাহিত্যে তার প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে এ-জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অপু মনের ধিক্কারে সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বনে। জিতু বৈরাগ্যের অনির্দিষ্ট বাসনা নিয়ে ঘুরে ঘুবে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে সংসারী হল, ফিরে এল সমাজে। অপুর জীবনে কোন সুনির্দিষ্ট প্রেমের ঘটনা নেই। জিতু সচেতনভাবে বার তিনেক প্রেম করেছে; এবং শেষবারের সবচেয়ে সাধারণ প্রেমাস্পদাকে সে বিয়ে করল। সমস্ত বইতে যত মেয়ে বিভূতিবাবুর প্রীতি লাভ করেছে তাদের চেহারা এক। তারা নম্র, শান্ত, অনুগত, সেবা-পবায়ণা, মোটামুটি বুদ্ধিমতী, অল্পে সন্তুষ্ট, মায়াশীল, এবং বেশী লেখা-পড়া জানে না।

জিতু সমাজে ফিবে এল, কিন্তু সে সমাজের রূপ কী রকম হবে। বিভূতি-বাবু সেই সমাজের খানিকটা আভাস দিয়েছেন 'আরণ্যকে'। অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে অরণ্য-সত্তার সঙ্গে যে মনুষ্য-সমাজ গড়ে ওঠে সে মানুষবাই হবে খাঁটি মানুষ। আরণ্য-জীবনে মানুষের বৃত্তিসমূহ সতেজ এবং কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু এমনই অরণ্যের শিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খল হয় না। সেখানে সততা মনুষ্যত্ব, এবং আন্তরিকতা স্বতস্ফূর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করে।

চারখানা বই মিলিয়ে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি জীবনের অনুসন্ধান-পর্ব শেষ হল। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন। আধুনিক মানুষ জীবনযাত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে অন্ধের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে,—আসল শত্রু—এই সভ্যতাকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। বনচ্ছায়াতলে নতুন সমাজ নির্মাণ করে সরল সাধাসিধে জীবনযাপন করতে হবে। তবেই প্রকৃত মানবীয় গুণগুলো—তথাকথিত বড় বড় আদর্শ নয়—মানুষের মধ্যে বিকশিত হবে।

'ইছামতি' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটির কথা আলোচিত চারখানা বইয়ের পরেই উল্লেখ্য। নীলকুঠির অত্যাচারের যুগের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় এই বইতে বর্ণিত হয়েছে। বিভূতিবাবুর অত্যাচারী এবং উৎপীড়কের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা এবং অত্যাচারিতের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি বোধের ফলে

এই যুগের অমানুষিকতার কিছু আভাস তিনি দিতে পেরেছেন। তবে নীল বিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর বোধ-সীমার অতীত বলে তিনি কাহিনীতে শশিশেখর নামক একজন সেকালের পক্ষে প্রগতিশীল ভাবাপন্ন চরিত্রের উপর কাহিনীর ভার-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। শশিশেখরের অনুভাবনা এবং জীবন যাত্রার চিত্রায়ণের মধ্যে লেখক যুগে থেকে যুগান্তরে মানব পথিকের নিরন্তর যাত্রা, মানব-যাত্রার ঘরঘর নিনাদের মধ্যে একদিনের লোভ নিষ্ঠুরতা অত্যাচার অবিচারের কাহিনী যে তলিয়ে যায় এবং সেই ইতিহাসকে অতিক্রম করে মানবাত্মা যে এক অগ্রগতি থেকে আর এক আর এক অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়—বিভূতিবাবুর অতিপ্রিয় এই ভাবনাটি মূর্তিলাভ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিভূতিভূষণের জীবন-পরিক্রমাও শেষ হল, তাঁর মধ্যেকার রোমান্টিক কবি-প্রকৃতিও অবসর গ্রহণ করল। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে অনেক খুঁজেও সে কবির চিহ্ন-মাত্র পাওয়াও দুষ্কর। আসল কথা, জীবনের প্রতি গভীর অসন্তুষ্টির সঙ্গে তাঁর কবি-প্রকৃতি জড়িত ছিল। যে দিন তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার শেষ হল, অস্থির অসন্তোষের বদলে স্থির প্রজ্ঞায় তাঁর মন আলোকিত হল, সেদিন কাজ ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর কবি-প্রকৃতিও বিদায় নিল। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁর শিল্প-প্রতিভার মূল প্রেরণাও। পরবর্তীকালে তিনি গল্প-উপন্যাস নেহাৎ কম লেখেননি,—সেগুলির একটাও প্রথম শ্রেণীর রচনা না হলেও তাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান শিল্পীজনোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন থেকে তিনি বাস্তববাদের ভিত্তিতে কাহিনী রচনা করেছেন। আগের যুগের বাস্তবতার সঙ্গে অবশ্য এর তফাৎ অনেক। আগের যুগের বাস্তবতার পিছনে লেখকের গভীর বেদনাবোধ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল। এখন তাঁর মন দার্শনিক প্রশান্তিতে চির-উজ্জ্বল। এখনও তিনি লেখক হিসাবে দুঃখের চিত্র আঁকেন,—দুঃখ ছাড়া জীবন কোথায় পাওয়া যাবে!—কিন্তু সে বেদনা কাহিনীর চরিত্রদের, লেখকের নয়। তাঁর বাস্তবতার ক্ষেত্রও অবশ্য অত্যন্ত সযত্নে নির্বাচিত। নাগরিক জীবন বা সভ্য মানুষ তাঁর আওতার বাইরে। গ্রাম্য-জীবনের সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা তাঁর কাহিনীর পাত্র-পাত্রী হতে পারে—কিন্তু দুটি সর্তে। সভ্যসমাজের তথাকথিত অর্থনৈতিক বা সামাজিক ঘাত-সংঘাতের থেকে তারা বাইরে থাকবে; এবং প্রেম-হিংসা-ঘৃণা-লোভ

ইত্যাদির সাংঘাতিক কুটিল নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতকেও তারা এড়িয়ে চলবে।

'অথৈ জল' বইয়ে এক সরল ডাক্তারের জীবনে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের বিড়ম্বনার একটি অধ্যায়ের চিত্র এঁকে তিনি এর বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা সরল সাধাসিধে অনাড়ম্বর উচ্চাশা-বর্জিত জীবনযাত্রার পথিক: ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ, ছোটো-খাটো আশা-আকাঙ্ক্ষা, একটুখানি হৃদয়ের উত্তাপ,—এই নিয়েই তাদের জীবন। জীবনের এই ক্ষুদ্রতার জন্যই বিভূতিবাবুর শেষদিককার বইগুলি বেশীক্ষণ পড়া যায় না, পীড়াদায়ক মনে হয়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিন্তু তিনি আশ্চর্য-রকমের বস্তুনিষ্ঠ। কোথাও মিথ্যা কল্পনা নেই, বাস্তবকে বানানোর চেষ্টা নেই, সাধারণ মানুষকে ভালবাসেন বলে অযথা তাদের উপর দেবত্ব আরোপের চেষ্টা নেই। তাদের ছোটোখাটো নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতার চিত্রকেও তিনি অকুণ্ঠিতভাবে উপস্থিত করেছেন। আদর্শ হিন্দু হোটেল, অনুবর্তন, প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে এবং পুঁইমাচা, যাত্রাবদল প্রভৃতি গল্পের মধ্যে এই বাস্তবতা সুপরিস্ফুট। সাধারণ মানুষের মধ্যে চরিত্র-বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে তাঁর অসীম আনন্দ।

অনুবর্তন স্কুল শিক্ষকদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত উপন্যাস। বিভূতিবাবু নিজে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; এবং সরল অনাড়ম্বর দরিদ্র মানুষদের অন্যতম বলে স্কুল শিক্ষকরা সহজেই বিভূতিবাবুর সহানুভূতি লাভ করেছে। তাদের ভালবাসেন বলে তিনি তাদের কোন অতিরঞ্জিত আদর্শায়িত চিত্র দিতে চেষ্টা করেননি। তাদের চরিত্র বৈচিত্র্য, তাদের ব্যবহারের হাস্যকর দিকগুলোর উদ্‌ঘাটনে লেখক নির্দোষ কৌতুক অনুভব করেছেন। তাদের নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতার চিত্রও তিনি অকুণ্ঠিতভাবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই চিত্রায়নের মধ্যে কোন জ্বালা নেই; এমন কি সমাজের অবহেলার বিরুদ্ধেও কোন স্পষ্ট অভিযোগ নেই। বাস্তবকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই বিভূতিবাবু এক ধরণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছেন।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' তো মানুষের ইচ্ছা পূরণের এক প্রায় রূপকথা সুলভ উপাখ্যান। এক হোটেলের রাঁধুনী ব্রাহ্মণ অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা দারিদ্র্য সহ্য করেছে। কিন্তু তার রন্ধন দক্ষতার খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে সে এক বিরাট হোটেলের মালিক হল। শুধু তাই নয়, রেলওয়ের

ক্যাটারিং-সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হল। রাখাল বালকের রাজকন্যা-লাভের মত এই অসম্ভব কাহিনীও পড়তে ভাল লাগে সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের স্বতঃ উৎসারিত ভালবাসা, এবং তাদের ছোটখাটো আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদের জন্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম চারখানি উপন্যাসে বিভূতিবাবু পবিব্রাজক। তাব নাযকেরা মানবিক অভিজ্ঞতাব একঘাট থেকে আব একঘাটে নিবন্তব পবিভ্রমণ কবে বেড়াচ্ছে। জীবন যাপনেব এক বন্দব থেকে আব এক বন্দবকে তাবা স্পর্শ কবে বেড়াচ্ছে জীবনেব কোন মহৎ সত্য আবিষ্কাবেব নেশায। বিভূতিভূষণেব অনুসন্ধান মূলতঃ আধ্যাত্মিক। কাবণ তিনি বিশ্বাস কবেন, যে পবম উপলব্ধিব ফলে জীবন অর্থময ও মূল্যবান হযে উঠবে তা মানুষকে আপন মনেব গভীবেই অর্জন কবতে হবে, পাবিপার্শ্বিক বা বহিঃপ্রকৃতি তাকে তখনই সাহায্য কববে যখন তাব গ্রহণ কবার উপযুক্ত একটি সংবেদনশীল মন থাকবে। তাব অধিকাংশ বইতে মাণিকবাবুও একজন অনুসন্ধানকাবী—এক্সপ্লোবাব। সুষ্ঠু জীবন-যাপন প্রণালীব একটি অনাবিষ্কৃত ভূমি আবিষ্কাবেব উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বইতে নতুন নতুন পবীক্ষায মেতেছেন। সুতবাং তাব প্রায প্রতিটি উপন্যাসেব কাহিনীই একটি কল্পিত পবিবেশ যাব সাহায্যে একটি বিশেষ ধবণেব জীবন-যাপন প্রণালীব উপযোগিতা পবীক্ষা কবা হচ্ছে। 'ইলিউসান এণ্ড বিযেলিটি'ব লেখক কড্‌ওযেল্ সাহিত্য কমেব কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক-কৃত ল্যাববেটবি এক্সপেবিমেণ্টেব সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সুতবাং মাণিক সাহিত্য কড্‌ওযেল কথিত সাহিত্য তত্ত্বেব একটি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। তাব সাহিত্য দর্পনে প্রতিবিম্বিত জীবন-চিত্র অবিকল বাস্তব নয বা জীবনেব বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুলেখন নয়। তিনি এমন একটি সম্ভাব্য বাস্তবকে কল্পনা কবে নেন যাব মধ্যে তিনি অনাযাসে তাব জিজ্ঞাসাব উত্তব খুঁজতে পাবেন। বলা বাহুল্য এই বাস্তব কল্পিত হলেও তা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক কার্য-কাবণ সূত্রেব দ্বারা গ্রথিত, তা লেখকেব সুখ-কল্পনাব দ্বাবা আবর্তিত নয।

বিভূতিবাবুব লক্ষ্য আধ্যাত্মিক, মাণিকবাবুব লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক। একটি উন্নততব অধিকতব সুখী জীবন যাপন প্রণালী আবিষ্কাব কবাই তাঁব লক্ষ্য। বস্তুতঃ উনিশ শতক থেকেই আমাদেব দেশেব সাহিত্যে এই প্রয়াসের প্রতিফলন

ঘটেছে। রবীন্দ্র-শরৎ যুগ পর্যন্ত এই বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে ক্রমিক সংস্কারের সাহায্যে সমাজ জীবনকে উন্নততর, কুসংস্কার ও কলুষ-মুক্ত করা যায়। বিংশোত্তর যুগের লেখকদের মধ্যে এই সংস্কারের সম্ভাব্যতায় প্রথম সংশয় দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের যুক্তিও ততখানি তথ্য-নির্ভর ছিল না যতখানি ছিল অসহিষ্ণুতা-জাত। মাণিক এই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে দূরে সরিয়ে রেখে বিজ্ঞানী-সুলভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে সংস্কারের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতাকে অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হলেন। সুতরাং মাণিক বিংশোত্তর লেখকদের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

নিজের বিশিষ্ট শিল্প-লক্ষ্য পূরণ করার জন্য মাণিক এমন এক সাংগঠনিক রীতি গ্রহণ করেছিলেন যা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন না হলেও তিনিই তাকে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন ও সুসঙ্গত ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এই রীতির বিশেষত্ব হল লেখক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংগুপ্ত রেখে নায়কের দৃষ্টিকোন্ থেকে কাহিনীর বাস্তবকে দেখেন। লেখক যখন নিজেকে ভগবানের আসনে বসিয়ে কাহিনীর বাস্তবকে পর্যালোচনা করেন তখন তিনি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচারকের আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু কাহিনীর নায়ক যখন বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করছে তখন সে নিজেও সেই বাস্তবের একজন অংশীদার, কাহিনীর অন্যান্য চরিত্র থেকে সে শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন নয় এবং একই সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক নিয়মের সে-ও বশীভূত। সুতরাং মাণিকবাবুর রীতির বিশেষত্ব এই যে পর্যবেক্ষক বিচারক নিজেই বাস্তবের একজন শরিক, অপরের মধ্যে সে যে সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করছে, নিজের মধ্যেও তাই করছে। কাজেই এই চিত্রায়ন আমাদের মনে আরও সম্পূর্ণভাবে নিবিড়ভাবে এবং নাটকীয়ভাবে বাস্তবানুভূতি জাগাতে সক্ষম। একজনের দৃষ্টিকোন্ থেকেই পূর্বাপর বাস্তবকে দেখা হচ্ছে বলে পাঠকের মন বারবার বিক্ষিপ্ত হবার সুযোগ পায় না। তা ছাড়া লেখক নিজে বক্তা হলে তাঁকে সর্বজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়; কিন্তু নায়ক সর্বজ্ঞ নয়; কোন চরিত্রের ব্যবহারের রহস্য উন্মোচনে সে স্বাভাবিক ভাবেই বিস্ময়-বিমূঢ় হতে পারে, বা ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারে এবং পরে সেই ভুলের সংশোধন করতে পারে। এই প্রক্রিয়া অনেক বেশী বাস্তবানুগ।

মাণিকবাবুর এই রচনা-রীতি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক চরিত্র লেখকের প্রতিনিধি। কাহিনীর ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে যদিও নায়ক অংশ গ্রহণ করছে এবং যদিও সে অন্যান্য চরিত্রের মতই মনস্তত্ত্বের আইনের বশীভূত,

তথাপি যখন সে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ করছে, অথবা আত্ম-সচেতন হয়ে আত্ম-বিশ্লেষণ করছে, তখন সে লেখকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে। নায়ক-চরিত্রের এই অতি-বিশ্লেষণ প্রবণতা মাণিকবাবুর অনেক কাহিনীর শিল্পোৎকর্ষকে ব্যাহত করেছে। যে-কোন শিল্প-কর্মেরই মূল কথা হল মূর্তি বা চিত্র-নির্মাণ। উপন্যাসের বিশেষ আঙ্গিকে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করার খানিকটা সুযোগ আছে, যদি তা সম্পূর্ণভাবে নির্মিত মূর্তির অংশীভূত বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ যদি কাহিনীর মধ্যে অন্তঃস্যূত না হয়ে কাহিনী-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে তবে শৈল্পিক আবেদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মাণিকের 'ইতিকথার পরের কথা' 'অহিংসা' এবং শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ কাহিনীই অতি বিশ্লেষণ প্রবণতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় বিশ্লেষণ কাহিনীর মধ্যে সুসঙ্গত সমাধি লাভ করেছে, এবং সেইটেই বইখানির শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ।

অন্নদাশঙ্করের যেমন তত্ত্বনিষ্ঠা, মাণিকবাবুর তেমনি সত্যনিষ্ঠা। সত্য, ধ্রুব নিছক সত্য ছাড়া আর কিছুতে তিনি সন্তুষ্ট নন। অন্নদাশঙ্করকে যদি দার্শনিক বলি, তবে মাণিকবাবু বৈজ্ঞানিক। তারাশঙ্করের সত্যনিষ্ঠা তার প্রিয় এবং অপ্রিয় বোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত, যা তার মনের কাছে ভাল লাগে তাকেই তিনি অনেক সময় সত্য বলে ভুল করেন। কিন্তু মাণিক বাবু সব সময় বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে, ভাবাবেগ এবং আদর্শবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে নগ্ন নিরাবরণ সত্যকে অবলোকন করতে সচেষ্ট। জীবনের অপ্রিয় সত্যকে উদ্ঘাটন করার অপ্রিয় কর্তব্যকে তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তথাকথিত উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শগুলির বাস্তব অস্তিত্ব এবং বাস্তব সম্ভাবনা কতখানি মাণিকবাবু তা ভাবাবেগ-লেশহীনভাবে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। মাণিকবাবু তাই বিংশশতকীয় মোহভঙ্গের লেখক, মূর্তি-ভাঙ্গাদের অন্যতম। এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাণিক সাহিত্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে 'অতসিমামী' 'জননী' 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রভৃতি বইতে তিনি রোমান্টিক ভাবাবেগ ও মূল্যবোধগুলির অনতিরঞ্জিত বাস্তব স্বরূপকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এসব বইতে মাণিকবাবু পুরোপুরি সীনিক এবং অবিশ্বাসী না হয়ে উঠলেও মানবিক মূল্যগুলিকে আমরা যতখানি মহৎ বলে ভেবেছি বাস্তবে তারা যে তেমনি মহৎ নয়—এ কথা প্রতিপন্ন করতে ইতস্ততঃ

করেননি। একবার মাত্র—দিবারাত্রির কাব্যতে তিনি রোমাণ্টিক প্রেমের ভাবাবেগের চরম অভিব্যক্তিকে রূপদান করেছেন।

এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'জীবনের জটিলতা' বইতে লেখক সুন্দর রোমাণ্টিক প্রেমের অসুন্দর মর্মান্তিক পরিণতিকে চিত্রিত করেছেন। 'প্রাগৈতিহাসিক' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত ছোটগল্পগুলিতে লেখক জীবনের নিম্নতম পর্যায়ে অবতরণ করে আবিষ্কার করেছেন যে সেখানে শুধু শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির নিষ্ঠুর বর্বর অভিযান ছাড়া আর কোন উচ্চতর সত্যই বেঁচে নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক নিছক বাস্তবের চিত্রায়ণ ত্যাগ করে বাস্তব নিয়ে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষাকার্যে রত হয়েছেন। কিন্তু 'চতুষ্কোণ' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' এই দু'খানিকে প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যবর্তী পর্যায় বলে উল্লেখ করা যায়। এই দু'খানা বইতে নায়ক আত্মসচেতন এবং বিশ্লেষণ-ধর্মী; কিন্তু তারা লেখকের প্রতিনিধি নয় এবং বিশ্লেষণ অন্তে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম নয়। শেষ পর্যন্ত মহৎ মূল্য বোধগুলির অসংৎ বাস্তব পরিণতি দেখানোতেই বইগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'সহর বাসের ইতিকথা' এবং 'সহরতলী'ই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান বই। বইগুলোতে লেখক দেখিয়েছেন যে যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে যে মানব মনকে সংস্কার'মুক্ত ও সুসংস্কৃত করা যায় এ ধারণা ভ্রমাত্মক। মানব-মন যুক্তির বাধ্য নয়, অন্তরবাসী যৌন-দেবতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে চালিত হয়। অবশ্য সহরতলীতে অর্থনীতিও যে মানুষের নিয়ামক শক্তি লেখক এ চেতনায় পৌছেছেন।

সংস্কার প্রচেষ্টার সার্থকতা বা অসার্থকতা লেখক কী-ভাবে নির্ধারণ করেছেন? মাণিক বাবুর কাছে আয়োজন বা ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য সামাজিক উন্নতির মাপকাঠি নয়; পরিবারিক বা পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিই তাঁর কাছে সংস্কার প্রয়াসের সার্থকতার মাপকাঠি। উল্লিখিত তিনখানি বইতেই লেখকের উত্তর নেতিমূলক। 'অহিংসা' এবং 'জীয়ন্ত' একটু ভিন্ন ধরণের বই হলেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

মার্কসবাদ গ্রহণ করার পর মাণিকবাবু তৃতীয় পর্যায়ের বইগুলি লেখেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের মত এই বইগুলোও এক্সপেরিমেণ্ট-ধর্মী; বিশ্লেষণ-প্রবণ লেখকের প্রতিনিধি-মূলক নায়ক চরিত্র এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। তবে লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গী এখন আর নেতিমূলক নয়; অন্ততঃ যুক্তিবাদ প্রয়োগের সীমাবদ্ধ

সার্থকতাকে লেখক স্বীকার করেন। তবে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে অপরিহার্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষের মন দ্বিধা-বিভক্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব পীড়িত হয়; তার একমাত্র প্রতিকার শ্রেণীহীন সমাজ।

'জননী' উপন্যাসখানির উপর শরৎবাবুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মাণিকবাবুর মৌলিকতা এমন নিরেট যে এই প্রভাব খুব স্বতঃসিদ্ধ নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়। 'জননী'র গল্পাংশে আছে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মায়ের কাহিনী। অনুরূপা দেবীর মায়ের মত আদর্শ মা নয়, সাধারণ ঘরের ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের বশীভূত ভালো-মন্দ মেশানো একটি মা, যে একই সঙ্গে আর কারও স্ত্রী, আব কারও ভগিনী ইত্যাদি। একটু ছন্নছাড়া প্রকৃতির স্বামী এক সময় আপিসের তহবিল তছরূপ করে জেলে গেল। আর একা সেই মায়ের নানা দৈন্য সমস্যার মধ্যে পরের গলগ্রহ হয়ে থেকেও সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার এবং বিশেষ করে বড় ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তোলার ঐকান্তিক এবং অদম্য কামনা এবং চেষ্টার বিবরণই এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। সন্তানের মঙ্গল ছাড়া মায়ের জীবনে আর কোন নীতি নেই; তাদের জন্য সে চুরিও করতে পারে; তাদের প্রয়োজনে টান পড়লে সে উপকারীর উপকার ভুলে যেতে পারে। তাদের জন্মলাভে সহযোগিতা করেছে বলে এবং ভরণ-পোষণে সাহায্য করে বলে খামখেয়ালী অত্যাচারী স্বামীকে সে সহ্য করে। ছেলের বৌ এসে যখন ছেলেকে অধিকার করে তখন মা ঈর্ষান্বিত; কিন্তু ছেলের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় তবু সে সংসারে তার মর্যাদা-লুপ্ত স্থান ত্যাগ করতে পারে না। সুতরাং মাতৃত্ব নীচতা ঈর্ষা স্বার্থের উধ্বর্গামী ভাবাবেগ নয়, তা নিছক একটি জৈবিক প্রবণতা।

'দিবারাত্রির কাব্য' অবৈধ প্রেমের রোমান্টিক চিত্র। শরৎবাবুর মত অবৈধ প্রেমের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার বাস্তববাদী প্রয়াস এতে নেই। কল্লোল-কালীন 'প্রেম নিজের অস্তিত্বের জোরেই স্বীকৃতিযোগ্য' এই রোমান্টিক মনোভাবের ভিত্তিতে লেখা এই বইয়ে দু-রকমের প্রেমের পাশাপাশি চিত্রণের ভিতর দিয়ে প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য, গভীরতা এবং বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। হেরম্ব-সুপ্রিয়ার প্রেম ঘরোয়া; সুপ্রিয়া বিবাহিতা, কিন্তু হেরম্বকে নিয়ে নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বিদ্যমান। হেরম্ব-আনন্দের প্রেম পার্থিব-লোক ছেড়ে পাখা মেলে উধ্বর্গামী হয়েছে। নানারকম কাল্পনিক প্রতীকতার ভিতর দিয়ে এমন এক প্রেমের কল্পরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে মানুষের

আবেগ-অনুভূতিসমূহ এক চরম একাগ্রতায় কেন্দ্রীভূত হয়; মানুষ এক জীবনে সাত দিনের বেশী এই আনন্দের তীব্রতা ভোগ করতে পারে না। এই চরম মুহূর্তটিকে চিরস্থায়ী করার জন্য নৃত্যশীল আনন্দ অগ্নিগর্ভে নিজেকে সমর্পণ করল! কাহিনীর উপসংহার একটি গতিয়ের-সুলভ ভাবাবেগের চরম উপলব্ধিকে চিত্রিত করছে।

চারটি মেয়ে ও একটি ছেলের বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের কাহিনী রচিত। স্বভাবতই চারটি বিভিন্ন চরিত্রের মেয়ের প্রতি আকষণ-বিকর্ষণেব টানাটানির ফলে ছেলেটির মনে এক ধরনের অনিশ্চয়তার ভাব জাগ্রত হয়। সেই অনিশ্চয়তা তার মধ্যে নানা বিচিত্র খেয়ালের জন্ম দেয়। শেষ পর্যন্ত যে মেয়েটি প্রথমে তার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিল, এবং দৈবক্রমে পাগল হয়ে যাওয়ার পর একান্ত ভাবে তার প্রতি অনুরক্ত এবং নির্ভরশীল হয়ে উঠল, ছেলেটি তাকেই জীবনসঙ্গিনী বলে গ্রহণ করল। নায়ক যে শুধু কর্তব্যবোধের তাডনায় বা মহৎ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এ কাজ করল তা নয়, সে যেন একটি নিয়তি নির্দিষ্ট অচ্ছেদ্য বন্ধনকে স্বীকার করে নিল।

কাজেই যৌন-প্রেমের রোমান্টিক দিকের চেয়ে যৌনজীবন মানুষের সমগ্র জীবনেব উপর কীভাবে প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তার করে সেইটেই মাণিক-বাবুব কাছে ক্রমশ প্রধানতর হয়ে উঠল। স্পষ্টতই বোঝা যায় জীবনের বাস্তবেব সঙ্গে লেখক ক্রমশ অধিকতর সংস্পর্শে আসছিলেন, নিজের ব্যক্তিজীবনে আঘাত খেয়ে সচেতন হয়ে তিনি দেখছেন তাঁর চারপাশের জীবনযাত্রায় মানবিক মূল্যবোধসমূহ কীভাবে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হচ্ছে। মানুষের মৌলিক ভালোত্বের উপর রোমান্টিক বিশ্বাসটা অত্যন্ত প্রখর ছিল বলে মাণিকবাবুর মনে এই নবজাগ্রত বাস্তব-চেতনা খুব রূঢ় আঘাত হেনেছিল। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষের নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতার অভিযান নিয়ে তিনি কতকগুলো নিরঙ্কুশ বাস্তবতার চিত্র আঁকলেন 'প্রাগৈতিহাসিক' 'প্রমুখ গল্পগুলির মধ্যে। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এমনি প্রবল হয়েছিল যে এই সব গল্পে যৌনপ্রেমের কোন অস্তিত্বই লেখক স্বীকার করেননি। মানুষের জীবনে শুধু দুটো জিনিস আছে, ঔদরিক ক্ষুধা ও যৌন-ক্ষুধা এবং তারই প্রযোজনে মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। নৈরাশ্যবাদের দিক দিয়ে এই গল্পগুলোর সঙ্গে প্রেমেনবাবুর পরিণত রচনা 'পুন্নাম', 'পতঞ্জলি রায়' প্রভৃতির

তুলনা চলে। কিন্তু একটা মৌলিক তফাৎ আছে। প্রেমেনবাবু বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে এসে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মানুষের স্বার্থপরতা হীনতা তার প্রকৃতিগত ; এটা এমন একটা পর্যায় যখন যে শিল্পী শিল্প-সৃষ্টি করবে সে তার নিজের মূল্য হারিয়ে ফেলে। এবং বাস্তবিক প্রেমেনবাবু তারপর লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাণিকবাবু ভিখিরি চোর প্রভৃতিদের যে বর্বর জীবনের চিত্র এঁকেছিলেন তার পিছনে এই অকথিত ইঙ্গিত ছিল যে, এদের এই অবস্থার জন্য দায়ী সমাজব্যবস্থা।

বাস্তববাদী প্রবণতা মাণিকবাবুকে নিম্নতর শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। তারই ফলে লেখক 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখেন। পদ্মাপারের মাঝিদের জীবনালেখ্যই কাহিনীর মুখ্য পটভূমিকা হলেও একটি মানুষের নদীর নির্জন চরের উপর লোকবসতি স্থাপন করার স্বপ্ন এবং তার জন্য যথাশক্তি নিয়োগ করা—কাহিনীটির মধ্যে একটি রোমান্টিক আমেজ এনেছে। লোকবসতি স্থাপনের চিত্রটিকে কখনো কাহিনীতে ব্যাপকভাবে না এনে লেখক খুব সুকৌশলে এই রোমান্টিকতার আভাসটাকে বরাবর বজায় রেখেছেন। একটি মাঝির পরিবারিক জীবনচিত্রই এই কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন-সংগ্রাম এবং যৌনজীবনের কাহিনী পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে। যৌন আকর্ষণ-বিকর্ষণ যে জীবনের বহু ঘটনার জন্য দায়ী—এ-কাহিনীতে লেখক ব্যাপকভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন। যৌনপ্রেমের জটিলতা নিয়ে লেখক ইতিমধ্যেই অনেক কাহিনী রচনা করেছেন, কিন্তু সে-জটিলতা যৌনসম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যৌন-জীবন যে মানুষের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের উপরও প্রভাব বিস্তার করে তারই বিচিত্র চিত্র 'পদ্মানদীর মাঝি'। মাঝি কুবের এবং তার শ্যালিকা কপিলার মধ্যেকার অন্তঃসলিলা প্রেম তাদের জীবনযাত্রা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাদের জীবনে রহস্য সৃষ্টি করছে, এবং সেই রহস্য উন্মোচনের ভিতর দিয়েই এক অদ্ভুত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী গড়ে উঠেছে।

'প্রাগৈতিহাসিক' প্রভৃতি গল্পে এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'তে লেখক যে-সব বাস্তববাদী চিত্র এঁকেছেন সেগুলোর মূল কথা একটি। ঔদরিক প্রয়োজন এবং যৌনকামনা মানুষকে কর্মচক্রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ; মানুষের সুনীতি-দুর্নীতি এরই দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। কাজেই মানবিক মূল্যসমূহের কেতাবী বুলির বাস্তবজীবনে কোন অস্তিত্ব নেই। অবশ্য 'পদ্মানদীর মাঝি'তে মানুষের

নগ্ন বর্বরতার চিত্র নেই ; বিবাহজ প্রেম আর অবৈধ প্রেমের দ্বন্দ্বের ফলে অবৈধ প্রেমের অবদমিত তির্যক আত্মপ্রকাশ খানিকটা রোমান্টিক আমেজ এনেছে, যদিও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ বাস্তবাশ্রয়ী।

চরিত্র চিত্রণে মাণিকবাবুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 'পদ্মানদীর মাঝি'তে পরিণতি লাভ করেছে। দু-চারটে সহজ বিশেষণের সাহায্যে—যেমন সাহসী, ভীরু, স্বার্থপর, পরার্থপর, লোভী, নির্লোভ,—মাণিকবাবুর চরিত্রকে বিশেষিত করা যায় না। বিভিন্ন ঘটনায় চরিত্রগুলি কি-ভাবে অংশ গ্রহণ করছে তার দ্বারাও তাদের বোঝা যায় না। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান হয় তাদের ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। বাক্য, চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে চরিত্রদের ব্যবহারে বিচিত্র অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায় ; এবং এই অসঙ্গতির বিশিষ্টতাই চরিত্রগুলোকে বৈশিষ্ট্য দান করছে। এই অসঙ্গতির পরতের পর পরত খোসা ছাড়িয়ে লেখক শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটন করেন যে যৌন সমস্যাই অন্তরালে থেকে সহস্র আবর্ত সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষের চরিত্রের নিয়ামক শক্তি যে যৌনজীবন মাণিকবাবু এই আবিষ্কারকে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করলেন। রহস্য সৃষ্টি এবং রহস্য উন্মোচনের ভিতর দিয়ে মাণিকবাবু পাঠকের কৌতূহলকে অব্যাহত রাখলেন। মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে কত বিচিত্র অলি-গলি তার সন্ধান সে নিজেও রাখে না। এই অন্তর্লোকের অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণই মাণিকবাবু তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করলেন। অন্তর্লোকের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হল যৌন-কামনা। মনোভাবটা তিনি গ্রহণ করলেন কল্লোল যুগ থেকে, কিন্তু কল্লোল যুগে যা ছিল নিতান্ত ভাসা ভাসা, একটা রোমান্টিক অস্থিরতার ব্যাপার মাত্র, মাণিকবাবু তার অনেক গভীরে অবতরণ করলেন। যৌনসমস্যা শরৎ-সাহিত্যেও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে ; কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে মোটামুটিভাবে মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা। যৌনকামনা এবং আত্মমর্যাদা-জ্ঞান বা সংস্কার মানুষকে বিচিত্র পথে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু সেটা ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তি বা সমাজের ইচ্ছার সংঘাতের ফল ;—মানুষের ইচ্ছাটা তার নিজের নয়, এমন নয়। মাণিকবাবু দেখালেন, সমস্যা অত সরল নয়। মানুষের ইচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রিত করছে অন্ধকার গুহাবাসী এক বিরাট জৈবিকশক্তি। বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি করে এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। এই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ই মাণিকবাবুর শিল্প হিসাবে সবচেয়ে সার্থক বই।

নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জীবনের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিই মাণিক-বাবুকে তাদের জীবন-চিত্রণের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু লিখতে গিয়ে তিনি ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌছলেন, অর্থনীতিটা মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটা তার বহিরঙ্গের ব্যাপার, মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ামকশক্তি অর্থনৈতিক নয়, যৌন কামনা। সেইজন্য 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অর্থনৈতিক জীবনের উপর যেটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় তা-ও নেই।

অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে শশী ডাক্তার। নতুন পাস করে এসে গ্রামেই ডাক্তার হয়ে বসেছে আদর্শবাদের ঝোঁকে। গ্রাম্য মানুষদের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার এবং অশিক্ষার মধ্যে সে তিল তিল করে বিজ্ঞানের আলো ফেলে নতুন সুস্থ জীবন গড়ে তুলবে, এই তার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সংস্কার প্রচেষ্টা গ্রাম্য সমাজের উপর এতটুকু দাগ কাটতে সমর্থ হল না। অতি দুঃখে সে আবিষ্কার করল যে, যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা মানুষ চালিত হয় না। মানুষের মন যেন এক একটি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত দুর্ভেদ্য দুর্গ, বিজ্ঞানের যুক্তির গোলা তার দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। এই সব দুর্গের কেন্দ্রীয় শক্তি কি? কাহিনীর ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে উদ্‌ঘাটিত হল যে, পরাণের বৌ কুসুমের খামখেয়ালিপনা, বোন মতির রোমাণ্টিক মনোভাব, কবিরাজের বৌ সেনদিদির ছিঁচ,-কাঁদুনে ব্যবহার, তার অসুখের চিকিৎসায় শশীর যাওয়াতে শশীর বাবা গোপালের অনিচ্ছা, শশীর বোন বিন্দুর মদ্যাসক্তি,—সব কিছুর মূলে রয়েছে সেই অবিচলিত শক্তি—যৌনকামনা। পরিবেশ এবং ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী তার প্রকাশের বৈচিত্র্য। শশীর নিজের মনের অস্থিরতার মূলও শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল যখন দেখা গেল সে কুসুমকে ভালবাসে। কিন্তু ততদিনে কুসুমের ভালবাসা মরে গেছে, সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। শশী কিন্তু গ্রাম ছেড়ে যেতে পারল না, নিজের মনের জালে সে জড়িয়ে পড়েছে। 'পুতুল নাচ' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের প্রথম সার্থক চিত্রায়ণ সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যের ডি-এইচ্-লারন্সের ভূমিকার বাংলায় মাণিকবাবু গ্রহণ করেছিলেন।

বইখানা কতকগুলো বিচ্ছিন্ন চরিত্র এবং পরিবারের ছাড়া ছাড়া কাহিনী হলেও চরিত্রগুলি সকলে মিলে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র

প্রতিফলিত করে। অকর্মণ্য পরাণ আর তার অসুখী বৌ কুসুম, পরাণের অল্পবয়সী রোমাণ্টিক বোন মতি, কুসুমের খিটখিটে রোগা শাশুড়ী, অহংকারী বদমেজাজী কবিরাজ আর তার অবহেলিতা সুন্দরী স্ত্রী সেনদিদি; শশীর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাবা, সিদ্ধপুরুষ সাধু, প্রভৃতি মিলিয়ে গ্রাম্যজীবনের এক আশ্চর্য অন্তরঙ্গ চিত্র বইখানাকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। সমস্ত চিত্রটি শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে; প্রত্যেকটি মানুষের আসল রোগটা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ সে নিজেই যে কখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তা সে জানতে পারছে না। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের সঙ্গে এ-চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য আছে। শরৎচন্দ্রের কাছে বাইরের দৃশ্যমান ঘটনাগুলিই সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোর প্রকৃতি নিরূপণের নির্ভুল মাপকাঠি। মাণিকবাবুব কাছে কিন্তু বাইরের ঘটনাগুলি রোগের লক্ষণ মাত্র; রোগের অনুসন্ধানে তিনি মানব-মনের অনেক গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন এক অন্ধ ক্লিষ্ট জৈবিক শক্তির বিকৃত আত্মপ্রকাশের মধ্যেই রোগের উৎস বিদ্যমান। শরৎবাবুর চরিত্রেরা তাদের কৃতকার্যের জন্য নিজেরাই অন্তত বহুলাংশে দায়ী। মাণিকবাবুর চরিত্ররা কিন্তু তা নয়, কারণ তাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভু তারা নয়। সেইজন্য সৎ-অসৎ বা উদার-অনুদার-নিষ্ঠুর-দয়ালু ইত্যাদি বিশেষণগুলোর সাহায্যে তাদের পরিচয় দেওয়া যায় না। তাদের মধ্যে কোন দেবতা বা দানব নেই।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' যেমন গ্রাম্য সমাজের চিত্র, তেমনি 'শহরবাসেব ইতিকথা'য় মাণিকবাবু শহরজীবনেব একটি চিত্র দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। সংস্কারকরা বলতে পারেন, গ্রামের অর্ধশিক্ষিত সমাজে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা জাগ্রত করা শক্ত হতে পারে, কিন্তু যারা প্রকৃতই শিক্ষিত তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এ কাজ সম্ভব। এই সম্ভাব্যতাকে যাচাই করার জন্য মাণিকবাবু 'শহরবাসের ইতিকথা' লিখলেন। পুতুলনাচে যেমন শশী শহর থেকে পাস করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল, এখানে তেমনি মোহন গ্রামের বাস তুলে দিয়ে শহরে চলে এল; তার মনে আশা, শহরের শিক্ষিত পরিবেশের মধ্যে সে উন্নততর জীবন-যাত্রার সন্ধান পাবে। এখানে তার বন্ধুবান্ধবরা ফ্রয়েডকে জানে, নরনারীর যৌন-সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা জানে, নারীর সমানাধিকারকে স্বীকার করে। তবু মোহনকে আবিষ্কার করতে হল, সমস্যা এখানে বরং আরও জটিল। তার উচ্চশিক্ষিতা বান্ধবী তার তেমনি শিক্ষিত এবং অনুরাগী স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে দূরে থাকে; অজুহাত—স্বামী সন্তান-কামনা করে, সে করে

না ; তার মনে স্বামীর সংশ্রবে অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা। মোহন ভাইয়ের সংগে যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক ব্যবহার করে, তবু তাকে এই অভিযোগ শুনতে হল যে সে ভাইয়েব সঙ্গে অভিভাবকসুলভ ব্যবহার করে। তার ভাইও একটা প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। অর্থের প্রয়োজন—এই অজুহাতে তাব কাছে পৈতৃক অর্থের অর্ধাংশের ভাগ নিয়ে পৃথক হওয়ার দাবি জানায়। মা ভাই-এর পক্ষ নিলেন তাঁর নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী। মোহন নিজেই তার অসুখী দাম্পত্যজীবন নিয়ে, সন্ধ্যার প্রতি তাব মনোভাবেব অনিশ্চয়তা নিয়ে বিপর্যস্ত ; মোহন দেখল বিদ্বান-বুদ্ধিমানদেব সমাজেও মানুষ তার বায়ু-নিরুদ্ধ দুর্গের কুটিলা দেবীর বিকৃত যুক্তির প্রভাবে সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলছে।

মাণিকবাবুব দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে উৎক্রমণের অন্তর্বর্তীকালে খানিকটা পরিবর্তনের কাজ চলে তাঁর মানস-ক্ষেত্রে। এতদিন পর্যন্ত বিংশোত্তব যুগের প্রভাবে তিনি দেশের বাজনৈতিক জীবনকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে কতক মানুষ জীবনে একটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ; তারা দেশে এবং সমাজে একটা পরিবর্তন-সাধন করতে চায় যাতে সমাজের গতানুগতিক নির্বীর্যতাব অবসান ঘটে। প্রকৃত বাস্তববাদীর মত এবং তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি প্রথমে রাজনীতিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেব মানসক্ষেত্রেব পর্যালোচনা আবম্ভ করলেন। তার প্রথমদিককার আবিষ্কাবসমূহ খুব সুখকর নয়। কিন্তু সততা এবং সত্যানুসন্ধানে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। যা তিনি আবিষ্কাব কবেছিলেন, তাই তিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যে রূপ দিলেন। তিনি দেখলেন যে, রাজনৈতিক কর্মে যাবা নামে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু জৈবিক জীবনে তারা অসুখী বলে সহজেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এখানেও তিনি অবদমিত বা অপরিতৃপ্ত যৌনকামনার অসীম শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু তাছাড়াও আবিষ্কার করলেন অর্থ নৈতিক সমস্যার প্রভাবও মানুষের মনের উপর কম কার্যকরী নয়।

'শহরতলী'তে যশোদা নামে এক ধুমসী ব্যক্তিত্বশালী বাড়িউলির বাড়িতে একদল শ্রমিক ভাড়াটেকে দেখতে পাই। ভাড়াটেরা তার অন্নেব যোগানদার বলে স্বামীপুত্র বঞ্চিত এই মেয়েটির অনপচয়িত স্নেহ এই শ্রমিকদের উপর বর্ষিত হয়। সেইজন্য শ্রমিকদের উপর তার প্রভাব অসীম। তাদের সে চাকরি ঠিক করে দেয়। তার কথা মত তারা ধর্মঘট করে বা ধর্মঘট ভেঙে কাজে যোগ দেয়। এক কারখানার মালিক সত্যপ্রিয় যশোদাকে বাড়ি থেকে

মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ভাইকে চাকরি দিয়ে এবং নানাভাবে খাতির দেখিয়ে তাকে একবার ধর্মঘট তুলে নিতে প্ররোচিত করে। যথাসময়ে সে শ্রমিকদের সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি পালনের বদলে তাদের ছাঁটাই করতে থাকে এবং যশোদার ভাই নন্দর মাইনে বাড়িয়ে দেয়। ফলে শ্রমিকরা যশোদাকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করে তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এখানে লেখক দেখাচ্ছেন যে যশোদা ছিল যৌনজীবনে বঞ্চিতা, সে স্থূলাঙ্গী কুৎসিত বলে কেউ তাকে কামনা করে না। একটি শ্রমিক তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে বটে, কিন্তু সে প্রকৃতই ভালবেসে নয়, তার সাহায্য পাওয়ার আশায়। এ-হেন যশোদাকে যখন সত্যপ্রিয় নানাভাবে খাতির এবং সম্মান দেখালো তখন সে তার অতৃপ্ত অন্তরের হৃত মর্যাদাবোধ যেন ফিরে পেল। তাই সহজেই সে প্রতারিত হল।

যশোদা নেহাৎ-ই একটি মেয়েমানুষ নয়। তার ভিতর দিয়ে লেখক একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাকে চিত্রিত করেছেন। ব্যক্তিগত যৌন-জীবনের অতৃপ্তি যাদের পদস্খলনের কারণ হয়।

'শহরতলী' বইখানা নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এবং শিল্পোত্তীর্ণ। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের যে চমৎকার বিবরণ এ বইয়ে আছে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। যশোদা এবং শ্রমিকদেব চরিত্র জীবন্ত, বাস্তব, কৌতুহলো-দ্দীপক এবং অতিরঞ্জন-বর্জিত। এই বইয়ের মূল বক্তব্য রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনের একটা সত্য ট্রাজেডি। দেশের বুভুক্ষা যারা মেটাতে চায় দেশের সাধারণ লোকের চেয়েও তাবা অনেক সময় বেশী বুভুক্ষু থাকে। তার ফল প্রায়ই ভালো হয় না। এই বইয়েও রাজনৈতিক কর্মের কোন সমর্থন বা অসমর্থন নেই।

'প্রতিবিম্ব' বইখানা আধুনিক রাজনৈতিক দলের লোকদের জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সমালোচনা। প্রাচীন সমাজ যেমন যৌনকামনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে নরনারীকে দূরে দূরে রেখে ভুল করেছিল, এরাও তেমনি অবাধ মেলামেশার ভেতর দিয়ে যৌনকামনাকে হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভুল করছে। এরাও মানসিক দিক দিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরের যোগ-সূত্র হারিয়ে ফেলে। গ্রামের সৎ আদর্শবাদী ছেলে যে রাজনীতি করবে বলে সাধা চাকরি পায়ে ঠেলে চলে আসে,—তাকে তারা না-বুঝতে চেষ্টা করে অবজ্ঞা ভরে দূরে সরিয়ে দেয়। এই হচ্ছে 'প্রতিবিম্বে'র প্রতিপাদ্য।

'জীয়ন্ত' প্রভৃতি আরও দু-একখানা বই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লেখক আবিষ্কার করলেন যে, নতুন সমাজ সৃষ্টি করার আদর্শবাদ যারা গ্রহণ করে তারা নিজেরাও বিকৃত যৌনকামনাজাত রোগের শিকার। তবে কি এই সামাজিক রোগের হাত থেকে মানুষের অব্যাহতির কোন উপায় নেই? দুজন মনীষী এই সমস্যার সমাধানের দুই স্বতন্ত্র পথ নির্দেশ করেছিলেন,—একজন ফ্রয়েড আর একজন মার্কস। ফ্রয়েডের যৌনসর্বস্বতার তত্ত্ব মাণিকবাবু বহুলাংশে গ্রহণ করলেও ফ্রয়েডের সঙ্গে প্রথম থেকে তাঁর কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। ফ্রয়েডের তত্ত্ব ছিল মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক; তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিও ছিল ব্যক্তিগত—চিকিৎসাকেন্দ্রে মনোবিকলনের পদ্ধতির সাহায্যে আরোগ্য দান। কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা' থেকে শুরু করে মাণিকবাবুর প্রায় সব বইতেই আমরা দেখেছি, তিনি মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতাকে মোটেই একটা ব্যক্তিগত ব্যাধি বলে গণ্য করেননি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিমূলক চরিত্রদের নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আত্মপ্রকাশ যত বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণই হোক, আসলে রোগটা সর্বত্রই এক। যে রোগের আত্মপ্রকাশ সর্বব্যাপক সে রোগ নিশ্চয়ই সামাজিক। এবং সমাজে যতদিন রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষ চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করলেও সে রোগজর্জর সমাজে ফিরে এসে আবার রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

ফ্রয়েডের মত মার্কসও ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রভু বলে মনে করেননি। কিন্তু ফ্রয়েড ব্যক্তিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা বলে মনে করায় ব্যক্তির সীমার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। মার্কস তা পেরেছেন। মার্কসের মতে সমাজের মূল ব্যাধি হচ্ছে দ্বন্দ্ব, আবার শ্রেণী-দ্বন্দ্বই সামাজিক অগ্রগতির কারণ। শ্রেণীদ্বন্দ্ব সত্য বলেই ব্যক্তি তার শ্রেণীর কাছে নিঃশেষে আত্ম সমর্পণ করে; শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক রীতি নীতি রচিত হয় বলে তা অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তির নানাবিধ মানসিক পীড়ার কারণ-স্বরূপ হয়। মানুষ তার পরিবেশের নিষ্ক্রিয় শিকার: ফ্রয়েডের এ তত্ত্বও মার্কস মানলেন না। মানুষ একই সময়ে তার পরিবেশের শিকার এবং প্রভু। মানবচরিত্র সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়; কাজেই মানুষের অন্তর্লোকের যে সমস্যা মাণিকবাবুর চিন্তাজগৎকে পীড়িত করেছিল তার সমাধান তিনি খুঁজে পেলেন মার্কসবাদের মধ্যে।

মাণিকবাবুর শেষ পর্যায়ের রচনা দক্ষিণ বা বাম কোন পক্ষকেই বেশী খুশী করতে পারেনি। যে-লেখক একান্তভাবে মৌলিক, যিনি কারও তৈরি কোন বাঁধা ছকের মধ্যে কোন ক্রমেই নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে এ-বিপদ অনিবার্য। দক্ষিনপন্থীদের বিরাগের কারণটা সহজবোধ্য —ফ্রয়েড ছেড়ে মার্কসকে গ্রহণ। বামপন্থীদের বিরাগের কারণ তিনি বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী সমাজ বিশ্লেষণের এবং পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক সমাধানের পথে যাননি। এই নীরবতার বর্মে আচ্ছাদিত বিরাগের পরিণাম যে কত গুরুতব হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন আমরা দেখি যে, তাঁব এই মূলতঃ পরীক্ষামূলক পর্যায়ের তাৎপর্য এবং এই সময়কার উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তির মর্যাদা কেউই বুঝতে বা স্বীকার করতে চাননি।

শেষ পর্যায়ের সাহিত্যেও মানিকবাবু তাঁর মূল উপজীব্য বিষয়বস্তুর প্রতি অবিচলিতনিষ্ঠ হলেন। মানুষের অন্তর্লোকের সমস্যা নির্ধারণই তাঁর মূল বিষয়বস্তু। এই পর্যায়ে তিনি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমাধানের ইঙ্গিত দেয়াও নিজের কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছেন। বাইরের ঘটনাসমূহের আপাত মূল্যকেই চবম বলে গ্রহণ করতে তিনি কোনদিনই রাজী ছিলেন না, আজও হলেন না; মানুষ এমন এক ধরনের জীব যার মনও আছে, এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচলিত রইলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত উপন্যাস শিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-পদ্ধতি যে সমাজজাত মানসিক অসুস্থতার আরোগ্যের নির্দেশ দিতে পারে না তিনি 'অরোগ্য' বইয়ের মূল কাহিনী এবং আরও কোন কোন বইয়ের কাহিনীবিশেষে তা প্রতিপন্ন করেছেন।

'আরোগ্য' বইয়ের কাহিনী একজন মোটর ড্রাইভারকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছে। কেশব অনিমেষের বাড়ীতে গাড়ি চালায়। অনিমেষের বোন ললনাকে সে গাড়িতে বয়ে নেয়; তার প্রতি এক অজ্ঞাতকারণ আকর্ষণে সে দিন হলেই শহরে না-এসে পারে না। তেমনি সন্ধ্যা হলেই তার মন তাকে শহরতলীর বাড়ির দিকে দুর্বার আকর্ষণে টানে,—সেখানে মায়া নামে এক বিধবা মেয়ের প্রতি তার টান। এই দ্বিমুখী আকর্ষনের টানাপোড়েনে সে নিজেকে খুব অসুস্থ বোধ করে এবং তার মস্তিষ্কে যন্ত্রণা হয়। এক মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার তাকে দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা করে তার দ্বিমুখী আকর্ষণের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন, এবং সামাজিক দিক দিয়ে অসঙ্গত ললনার প্রতি কামনাকে বুদ্ধি দ্বারা জয় করতে পরামর্শ দেন। তাতে কোন ফল না হওয়ায় এবং ললনাদের রাজনৈতিক কর্মের পরিচয়

পেয়ে সে রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

সমাপ্তির আকস্মিকতা ছাড়া 'আরোগ্য' বইখানা সর্বাঙ্গ সুন্দর। কেশবের সমস্যা বিশিষ্ট এবং অনন্য অথচ তা সমাজের একটি ব্যাপক সমস্যার অনুলিপি। দ্বিধাবিভক্ত মন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিধিলিপি,—তার পরিচয় আমরা নিজেদের জীবনের চারপাশে যথেষ্ট পেতে পারি। কেশবের চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত, তার মনোলোকের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বাস্তব এবং নিপুণ।

'হরফ' বইতে আছে, একটি মেয়ে প্রেমজ বিবাহের পরেও একবার স্বামীর ঘরে গিয়েই আর যেতে চায় না। এক অভিজ্ঞ মহিলা তার সঙ্গে গল্প করে বুঝতে পারলেন স্বামীর শারীরিক দাবি মেটানোর অনিচ্ছাই মেয়েটির স্বামীর ঘরে না-যাওয়ার কারণ। মহিলাটি তাকে স্বামীর শারীরিক দাবি মেটানোর প্রয়োজন ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও সে বেশীদিন স্বামীর সঙ্গে ঘব করতে পারল না। এখানে লেখক দেখাচ্ছেন যে বর্তমানের রোগ অনেক গভীবে প্রসারিত, ছকবাঁধা সমাধানে বোগারোগ্য সম্ভব নয়।

'পরাধীন প্রেমে' লেখক দেখিয়েছেন যে এ-যুগের প্রেমের সমস্যাও অর্থনীতির চাকায় বাঁধা। একটি ছেলে টি-বি-তে আক্রান্ত হাওয়ায় সে তার দয়িতার সঙ্গে মিলিত হতে পারল না; একটি বিধবা মেয়ের প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্তি; একটি ছেলের বিয়ে নাকচ হয়ে গেল সে হঠাৎ বেকার হয়ে গেল বলে। এমনি কতকগুলি কাহিনী নিয়ে বইখানা রচিত।

'সোনার চেয়ে দামী' বইতে অর্থনৈতিক কারণে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেব উন্নতির জন্য প্রয়োজন উভয়ের প্রতি উভয়ের সমান মর্যাদা আরোপ; নায়িকা ও নায়ক এই সিদ্ধান্তে আসার পর কাহিনীতে যবনিকাপাত ঘটেছে।

'পাশাপাশি' 'নাগপাশ', 'মাশুল', প্রভৃতি বইয়ে লেখক বিভিন্ন কাহিনীর ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষের পারিবারিক সম্পর্কে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে অনেক মনোমালিন্য এবং জটিলতা সৃষ্টি হয় যার দূরবর্তী কারণ অর্থনৈতিক হলেও আপাত কারণ থাকে নানারকমের ভুল বোঝাবুঝি এবং জ্ঞানের অভাব। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা এবং জ্ঞানের প্রসারের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতরকার সম্পর্কগত এবং হৃদয়গত

জটিলতা অন্তত আংশিকভাবে যে হ্রাস করা সম্ভব এই বইগুলিতে তাব ইঙ্গিত আছে।

'পুতুলনাচেব ইতিকথা'ব শশী বা 'শহববাসেব ইতিকথা'ব মোহন কার্যতঃ বাস্তবেব প্রায নিষ্ক্রিয দর্শক এবং ব্যাখ্যাকাব। 'পাশাপাশি'ব স্থনীল বা 'সোনাব চেযে দামী'ব বৌটি বা 'আবোগ্যে'ব কেশব শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয দর্শকমাত্র নয, তাবা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ কবে, সেই শিক্ষাব আলোতে নিজেকে এবং সমযে অন্যকেও সংস্কৃত কবতে চায। জীবনেব ক্ষেত্রে যুক্তি-বিবেচনাকে প্রযোগ কবা বা যাকে ইংবেজীতে বলা যায ব্যাশনালিটি, তাই মানুষ আব পশুব মধ্যে প্রধান পার্থক্য বলে স্বীকৃত। মাণিকবাবু আগেব যুগে এই ব্যাশনালিটিকে একটি সার্থক প্রক্রিযা বলে স্বীকাব কবেননি। নানাবকম সামাজিক এবং জৈবিক শক্তিসমূহেব ঘাত-প্রতিঘাতে এই ব্যাশনালিটি বিপর্যস্ত হয,—এ কথা বাস্তবিকই সত্যি। সেইজন্য একজনেব কাছে যে-যুক্তি অত্যন্ত সহজ গ্রাহ্য আব একজন সেই যুক্তিকে কিছুতেই মেনে নিতে পাবে না। প্রিযজনেব সঙ্গে মনোমালিন্য অতি সহজে বোঝাপডাব সাহায্যে মীমাংসা হতে পাবে, এ কথা জেনেও আমবা সে পথে যেতে পাবি না, তীব্র অভিমানবোধ এসে বাধা দেয, এবং অভিমানবোধ আসলে আহত আত্মমর্যাদাজ্ঞান আব আত্মমর্যাদাজ্ঞান একটি সহজাত বৃত্তি। এত সব বাধা সত্ত্বেও যে ব্যাশনালিটিব সীমাবদ্ধ প্রযোগ সম্ভব সেটা আমবা প্রাত্যহিক জীবনেব অভিজ্ঞতাতেই দেখতে পাই। কাজেই ব্যাশনালিটি ব্যক্তিমনুষেব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ পবিবর্তন আনযনে সক্ষম। মাণিকবাবু এখন এই সিদ্ধান্তেব উপব জোব দিলেন এবং এব মধ্যে নৈবাশ্যবাদ থেকে আশাবাদেব দিকে প্রত্যাবতনেব প্রযাস লক্ষ্য কবা যায।

এ বইগুলোকে অনেকটা যেন scrappy বা খসডা বলে মনে হয। যেন মাণিকবাবু তাব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলোকে এবং চিন্তাধাবাকে এলোমেলো ভাবে নোটবইতে টুকে বাখছিলেন। কযেকখানি বইতে অনেক চবিত্রেব ভিড, লেখক তাদেব বিস্তৃত পবিচয দানেব মধ্যে না গিযে শুধুমাত্র তাদেব জীবনেব উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ উপস্থিত কবেছেন। তিনি যেন কেবল প্রযোজনীয তথ্যগুলিকে পুঞ্জীকৃত বা ক্যাটালগিং কবেছেন। বক্তমাংসকে বাদ দিযে লেখক যেন শুধু জীবনেব এক একটি কঙ্কালকে আমাদেব উপহাব দিযেছেন। সমস্ত রকম অনাবশ্যক আবেগ বা উচ্ছ্বাসকে লেখক বাদ দিযেছেন, চবিত্র বা ঘটনাব চিত্রণে কোনবকম বিস্তারের স্থযোগকে তিনি সজ্ঞানে গ্রহণ করেননি।

কাহিনীকে সহজে চিত্তাকর্ষক করে তোলার সহস্র সুযোগকে তিনি হেলায় পরিহার করেছেন। ঐকান্তিক এবং অনন্য নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাস্তবের নির্যাসকে টেনে বার করেছেন বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে। এবং সেই আশ্চর্য সততা ও আন্তরিকতাই এই বইগুলির প্রধান মূল্য। বইগুলো স্বভাবতই একটু নীরস ; পড়ার সময় পাঠককে প্রতি মুহূর্তে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রেখে অগ্রসর হতে হবে ; একটুখানি অমনোযোগী হলেই ঘটনার খেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একমাত্র 'আরোগ্য' এবং 'সোনার চেয়ে দামী'তে লেখক জীবনের সমস্যাকে আবেগের স্তরে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছেন ; এবং তারই ফলে এ-বই দুখানি তাঁর স্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকবে। শিল্পমূল্যের দিক দিয়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'শহরতলী'র পরেই এ-বই দু'খানির স্থান।

আগেই বলেছি, বইগুলো একটু খসড়া ধরনের ; দারিদ্র্য, রোগ, এবং আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় পীড়িত লেখক এই পরীক্ষামূলক বইগুলোর মধ্যে বাস্তবের নানা উপাদান সংগ্রহ করে রাখছিলেন। মাণিক-সহিত্য আলোচনা করে আমার এ প্রত্যয় হয়েছে এবং মানিকবাবুর শেষ জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাও হয়তো এ-কথার সত্যতা স্বীকার করবেন যে, মাণিকবাবুব একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ শিল্পকর্মে হাত দেওয়ার অভিলাষ ছিল। তিনি শুধু একটুখানি অবকাশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাংলা দেশের কেউ তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ সৃষ্টির মাশুল জোগাননি। মৃত্যু এসে চিরকালের জন্য তাঁর অখণ্ড অবকাশ সৃষ্টি করে দিল।

মাণিক-সাহিত্যকে আমি যে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছি তাতে লেখাগুলির কালানুক্রম বিচার করিনি। লেখকমানসের চিন্তাধারা এবং উপলব্ধিব ক্রম হিসাবে আমি পর্যায় বিভাগ করেছি। এই তিনটি পর্যায়ের সাহিত্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মাণিক-প্রতিভার বিরাট পবিধির একটি মোটামুটি পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তবে মাণিকবাবুর শ্রেষ্ঠ অলিখিত উপন্যাসখানি আমরা কোনদিনই পড়ার সুযোগ পাব না বলে মাণিকবাবুর পুরো মূল্য আমরা কোন দিনই উপলব্ধি করতে পারব না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

চল্লিশোত্তর যুগ

অন্যান্য লেখক

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ১৯৩০-১৯৫০ পর্যন্ত কাল বাংলা উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। স্বভাবতঃই আলোচিত তিন জন দিকপাল লেখক ছাড়া এযুগে আরও বেশ কিছু সংখ্যক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা শক্তিতে পূর্বোক্তদের সমকক্ষ না হলেও কাছাকাছি। বইয়ের কলেবর ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে গেছে বলে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছিনা। নীচে আমি এঁদের কয়েকজনের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

সতীনাথ ভাদুড়ী

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম সতীনাথ ভাদুড়ী। দুঃখের বিষয় যে যুগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা, অর্থ নৈতিক অসাম্যের গ্লানি মানুষকে সব সময় ঢক্কানিনাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করছে, যখন প্রচণ্ড প্যাসান এবং সংঘাতের চিত্র ছাড়া মানুষের বিদ্ধস্ত চৈতন্যে সাড়া জাগানো সম্ভব নয়, সেখানে তাঁর মত নিরালা কোনে শিল্প ভাবনায় নিযুক্ত নির্বিরোধী মানুষের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা শক্ত। তাই তিনি আশ্চর্য শিল্প শক্তির অধিকারী হয়েও জন সমাজের সামনে পাদ-প্রদীপের আলোয় উপস্থিত হতে পারেননি।

বিশুদ্ধ শিল্পী বলে যদি কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় তবে সতীনাথ ভাদুড়ীকে এই নাম দেওয়া চলে। তিনি মনে প্রাণে শিল্পী ছিলেন। অর্থাৎ সুন্দর মূর্তি নির্মানকেই তিনি নিজের কর্তব্য কর্ম বলে গণ্য করেছেন। তাঁর আধুনিক মনে অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তা ভাবনার স্থান ছিল। কিন্তু সাহিত্যকে তিনি সেই চিন্তার বাহন বলে গণ্য করেননি। শিল্পের কাজ কর্মের প্রেরণা দান নয়, বা সত্যের অনুসন্ধান নয়, বা নীতি প্রচার নয়।

টমাস মানের মত তিনি মনে করেন আর্ট হল নিরুত্তেজ মনের ভাবনা (art is cool contemplation). শিল্পীর কাজ কোন কল্পিত পরিবেশে মানব মনের সম্ভাব্য গতি প্রকৃতি অনুমান করা ও তাকে রূপদান করা। সুতরাং প্রচণ্ড প্যাসান বা সংঘাতের পরিবেশ কল্পনা করলেও তিনি পাঠকের মনে তজ্জনিত বিপুল বিক্ষোভ জাগাতে অনিচ্ছুক।

তাঁর প্রথম বই 'জাগরী' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বইখানির রাজনৈতিক পটভূমিকার জন্য এবং আঙ্গিকগত অভিনবত্বের জন্য। অগাষ্ট আন্দোলনের ফেরারী আসামী বড় ভাইকে কমিউনিস্ট ছোট ভাই ধরিয়ে দিয়েছিল। ফাঁসির দিন রাত্রে দুই ভাই এবং তাদের মায়ের মনে যা যা ঘটেছিল তার অবিকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। চেতনা প্রবাহের রীতির এতখানি ব্যাপক প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে কেউ করেননি। অবশ্য চেতনা প্রবাহের রীতির আসল উদ্দেশ্য অবচেতন মনকে উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে লেখক যে খুব সার্থক হয়েছেন তা নয়। তবে তিনটি বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মন একই আসন্ন ঝটিকা সম্পর্কে চিন্তা করছে, অথচ তিনজনই পরস্পরের সঙ্গে এবং ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত—এই পটভূমিকার মধ্যে যে নাটকীয় সম্ভাবনা আছে লেখক তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করেছেন।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' লেখকের শ্রেষ্ঠ বই। বিহারের এক পশ্চাদ্বর্তী গ্রামের এক পারিবারিক সম্পর্ক-বঞ্চিত স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে লেখক নায়ক হিসাবে মনোনীত করেছেন। সে শারীরিক সামর্থে খুব পটু নয় বলে মালিকের কাছে অল্প পরিশ্রমের কাজ করে দিন গুজরান করে। বস্তুতঃ স্থূল জৈবিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। তথাপি তার মন নিষ্ক্রিয় নয়; তার পারিপার্শ্বিক, প্রচলিত বিশ্বাস, কিছু কিছু শোনা কথা—এ সব মিলিয়ে সে জগৎ সংসার সম্পর্কে নিজের মনে একটু সুসঙ্গত চিত্র রচনা করে। শিক্ষিত পাঠক মানসের চিন্তার সঙ্গে এই অশিক্ষিত মানসের দার্শনিকতার বৈসাদৃশ্য অপরিসীম কৌতুক রসের যোগান দেয়, এবং সেইটেই এই বইয়ের প্রধান রস। ঢোঁড়াইয়ের অবৈজ্ঞানিক মনের গতি এক ধরণের ডিডাক্‌টিভ লজিকের ভিত্তিতে এগিয়ে চলে। একটি সম্পূর্ণ মন-গড়া স্বতঃসিদ্ধের উপরে ভিত্তি করে সে এমন এক কৃত্রিম ইমারত তৈরি করে যা অবাস্তব, কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ। স্টার্ন রচিত ট্রিস্ট্রাম স্যাণ্ডি (Tristram Shandy)র রীতির সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের চিন্তা প্রণালীর মিল আছে।

সতীনাথের সৃষ্ট শিল্প-কর্মের সংখ্যা কম। বিষয়বস্তু এবং রূপের বিচারে বইগুলি এতই স্বতন্ত্র যে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করা সহজ নয়। তাঁর বিষয়বস্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অভাবনীয়। তাঁর রীতির অভিনবত্ব বাঙ্গালী পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। 'অচিন রাগিনী'তে তিনি দুটি ছেলের সঙ্গে এক বর্ষীয়সী মহিলার

এক রহস্য-জনক সম্পর্কের চিত্র এঁকেছেন। এই মানসিক একনিষ্ঠ আনুগত্য কোন প্রচলিত ছকের মধ্যে পড়ে না, অথচ মনস্তত্ত্বে এর স্থান আছে। 'সংকট' নামক বইতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মানব মনের এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন তার ব্যবহারের কোন যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। উত্তেজক কারণের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার বিপুলতা আমাদের স্তম্ভিত করে। এই দু'খানি বইতে সতীনাথ অস্তিত্ববাদের কিছু কিছু সিদ্ধান্তকে আভাসিত করেছেন। ফ্রয়েডের মন রহস্যজনক হলেও জড়বাদী, বা ঋজুভাবে কার্যকারণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে। কিন্তু সতীনাথের মন জড়ের বিপরীত এক জীবন-শক্তির প্রকাশ; তা জড়বাদী নিয়ম অনুসরণ করে না।

মোটের উপর আমরা বুঝতে পারি যে সতীনাথ বিভিন্ন বইতে মানব মনের অকথিত রহস্যকেই পর্যালোচনা করেছেন। অনাবিষ্কৃত বিষয়বস্তুকে কোন অভিনব কোন্ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে না পারলে সতীনাথ মূর্তি রচনায় উৎসাহ বোধ করেন না। তাঁর অসাধারণ মৌলিকত্বই তাঁর প্রতি পাঠকের অবজ্ঞার কারণ।

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সতীনাথের মত বনফুলের কাছেও উদ্দেশ্যহীন শিল্প-সৃষ্টিই প্রধান কথা। রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়ে জীবন-বৈচিত্র্যের রস পরিবেশনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। বিংশোত্তরী যুগের যাযাবর কৌতূহল-প্রবণতা তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ শক্তি, মানব চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান এবং রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টির যোগ্যতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এক বিচিত্র সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর পর্যবেক্ষক মনের কাছে মানব চরিত্রের ছোটখাটো অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধ সহজেই ধরা পড়ে এবং এই কৌতুক নাট্যই তাঁর এক বা দুই পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যের ছোট গল্পগুলির মূল উৎস। এই কৌতুক রস বড় ভঙ্গুর জিনিস; একটু বেশী কথা বললে তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে; একটি কম কথা বললে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত না হতে পারে। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে রস-বোধ থাকা দরকার বনফুলের তা আছে; আর তাই তাঁর গল্পকার হিসাবে দুর্লভ সার্থকতার কারণ।

বনফুলের কৌতূহল সতীনাথের মত জীবন বা মানব মনের গভীরতায় নয়, তার

উৎকেন্দ্রিক অভাবনীয় বৈচিত্র্যে। এই বৈচিত্র-বিলাস তাঁকে তৃণখণ্ড (১৯৪২), সে ও আমি (১৯৪৬), কিছুক্ষণ (১৯৩৭) প্রভৃতি উপন্যাস রচনায় প্ররোচিত করেছে। 'তৃণখণ্ড' বইতে তিনি তাঁর ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন; অসুস্থ মানসের বিচিত্র ভাবাবেগকে তিনি চিত্রিত করেছেন। 'কিছুক্ষণ' বইটিতে কোন রেল স্টেসনে এক ঘণ্টার জন্য বিলম্বিত রেলগাড়ির যাত্রীদের জীবন-যাত্রা ও চরিত্র-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন লেখক। এই বৈচিত্র্য বিলাসের অদ্ভুৎ ফসল 'মৃগয়া' নামক কাব্য, গল্প এবং নাটকের মিশ্রিত সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও বহু চরিত্রের ভাবাবেগ ও সমস্যার বৈচিত্র্য এবং আপেক্ষিকতাই একটি রমণীয় ও কৌতুকপ্রদ উপখ্যান সৃষ্টি করেছে।

যদিও জীবনের লঘু চপল কৌতুকজনক সুখকর অভিব্যক্তিগুলিই বনফুলকে সাধারণতঃ আকৃষ্ট করেছে, তথাপি দু' একবার তিনি জীবনের বিকৃতি এবং দুঃখ-বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানও করেছেন। তাঁর মধ্যে একটি ডাক্তার সুলভ যুক্তিবাদী সংস্কার-বর্জিত সত্তা বাস করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রাত্রি' নামক উপন্যাসটিতে তিনি যেভাবে বিক্ষুব্ধ জীবনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা-গুলিকে চিত্রিত করেছেন তাব মধ্যে।

বোধ করি মাত্র দু'বাব তিনি ছোট ছোট আখ্যায়িকা রচনার সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে বৃহৎ এপিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। 'স্থাবর' (১৯৫১) একটি আশ্চর্য পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আদি মানবের পশু-সুলভ জীবন-যাত্রা থেকে শুরু করে নৈতিক বোধ সম্পন্ন মানুষের বিবর্তন ধারার কয়েকটি পর্যায়কে তিনি কাহিনীতে বিধৃত করেছেন। যে-কালে ভাষার ব্যবহার খুবই সীমিত, সেকালেব জীবন চিত্রে লেখক স্বভাবতঃই সংলাপেব যথেষ্ট ব্যবহার করার সুযোগ পাননি। তথাপি এই প্রায় বিবরণধর্মী কাহিনীটিকে উপাদেয় করে তুলতে পেরেছেন উৎকণ্ঠা (suspense) সৃষ্টি এবং নাটকীয়তা আবিষ্কারের অদ্ভুত ক্ষমতা বলে। কাহিনীটি উত্তম পুরুষে লিখিত : 'আমি' কোন বিশেষ মানব নয়, মানবজাতি।

তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'জঙ্গম' (১৯৫৩) উপন্যাসে বনফুল আধুনিক অস্থির-চিত্ত বহুধা বিভক্ত সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রাজনীতি, সাহিত্য, গণিকালয়, জমিদার-বাংলা, শহর,—প্রভৃতি নানা পরিবেশের চিত্র অঙ্কনে লেখক বহু চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করেছেন। নায়ক শঙ্কর এদের

মধ্যে যোগ-সূত্র, এবং এ ধরণের বইয়ে যা সচরাচর হয়ে থাকে, কাহিনীর দুর্বলতম সৃষ্টি—জীবনের বিপুল পরিমাণ অভিজ্ঞতা তার মনে শুধু অস্পষ্ট অনির্দেশ্য ভাবাবেগের বুদ্বুদ সৃষ্টি করেছে মাত্র। বহু বিচিত্র চরিত্র ও বহু ঘটনা চিত্রনে লেখকের কল্পনা কুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কাহিনীর পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা বক্তব্য না থাকার ফলে এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা না থাকার ফলে লেখকের সাফল্য নিতান্তই আংশিক। ঘটনা ও চরিত্রের বিশৃঙ্খল জটের মধ্যে কোন সংহতি লক্ষ্য করা যায় না। ছোট নিটোল উপখ্যান রচনাতেই বনফুলের কৃতিত্ব অধিক।

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

বনফুলের মত বিভূতি মুখোপাধ্যায়ও প্রথমে ছোট গল্প রচনা করেই বাংলাদেশে যশস্বী হয়েছিলেন। তিনিও জীবনের কৌতুক-কর এবং সুখকর দিকগুলিই সাধারণতঃ চিত্রিত করেন; এবং পাঠকের মনোরঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিভূতিবাবুর অধিকতর স্নেহ-প্রবণ মন জীবনের যে সব অসঙ্গতিকে অবলম্বন করে হাস্যরস সৃষ্টি করে তার মধ্যে কেন হুল নেই; তাঁর কৌতুক-হাস্য জীবনের আনন্দকে বাড়িয়েই তোলে। কিন্তু বনফুলের ক্ষুরধাব কৌতুকের মধ্যে একটু কাঁটা আছে; মানব-চরিত্র সম্পর্কে একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কার আছে।

বিভূতিবাবু শিশু ভালবাসেন। তঁর যে গল্পগুলি রাণুর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ গ্রন্থত্রয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি গল্পই শিশু-কেন্দ্রিক; সেগুলি বাংলা দেশের স্থায়ী সম্পদ বলে চিরকাল আদৃত হবে। তিনি যে বাংলা দেশের চিত্র দিয়েছেন তা এখন অতীত ইতিহাস; তবু সেকালের শিশু চিরকালের শিশু হয়ে আমাদের মন জয় করতে সক্ষম। তাঁর গণেশ ঘোৎনা, কে. গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় চরিত্রকে নিয়ে রচিত গল্পগুলিও অনাবিল হাস্যরসের গল্প।

তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়' রোমান্টিক প্রেমের বাস্তব পরিবেশ সঙ্গত কাহিনী। এক বড়লোকের মেয়ে গরীব গৃহশিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও কী করে আপন অহঙ্কারের দুর্গ ভেদ করে কোন ক্রমেই তাকে গ্রহণ করতে পারল না বইতে সেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

বিভূতিবাবু মিষ্টি ও মধুর রসের লেখক; কিন্তু সেজন্য তাঁকে সহজ বাস্তবতার

সীমা লঙ্ঘন করতে হয় না। বিংশোত্তর যুগের প্রভাব বশতঃ যদিও কাহিনীকে শিল্প সঙ্গত রূপ দিতে তিনি সচেষ্ট; কিন্তু তিনি কোথাও সুরুচি সুনীতি ও শোভনতার সীমাকে লঙ্ঘন করেন না। জীবনের স্বাভাবিক ও প্রীতিকর রূপটিই তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। সেজন্য একালের লেখক হলেও একালের জীবন যন্ত্রণার চিত্র তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

মনোজ বসু

অতি-প্রাকৃতের রোমান্টিক ব্যঞ্জনাময়তা সৃষ্টি করে মনোজ বাবু তাঁর প্রথম জীবনে যে কয়েকটি গল্প রচনা করেন তাতেই তঁর যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই গল্পগুলি 'বনমর্মর' এবং 'নববাঁধ' (১৯৩৩) নামক দুটি সংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। জমিদার-বাংলার গৌরবময় দিনে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে জমিদারদের উত্থান পতন; তাদের রহস্যময় ভোগ-বিলাস, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসার কাহিনী সামন্ততান্ত্রিক অতীতের এক রহস্যময় স্মৃতি হিসাবে আমাদের মনে বর্তমান রয়েছে। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনার সাহায্যে অতি-প্রাকৃতের আবহাওয়া সৃষ্টি করে লেখক এই রহস্যময়তাকেই চিত্রায়িত করেছেন উল্লিখিত গল্পগুলিতে।

অবশ্য মনোজ বাবু জন্ম-রোমান্টিক নয়। তাঁর অতীত-বিলাস কয়েকটি গল্প রচনা করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তিনি বর্তমান বাস্তবের রাজ্যে ফিরে এসেছেন। বস্তুতঃ 'নরবাঁধ' গল্পের প্রথম খণ্ডে বল্লভ রায়ের বাঁধ দেওয়ার সঙ্কল্প এবং নিয়তি-তাড়িত হয়ে দেবীর রক্তের দাবী পূরণের জন্য জোয়ারের জলে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়ে নিমজ্জন অতিপ্রাকৃতের আবহাওয়া রচনা করেছে; কিন্তু পরের খণ্ডেই সেই নরবাঁধে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার অভিযান লেখকের বাস্তবে প্রত্যাবর্তনকে ইঙ্গিত করেছে। আসল কথা মনোজবাবুর মূল লক্ষ্য গল্পপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠককে গল্প শোনানো। এবং পরবর্তী ছোট গল্প এবং উপন্যাস-সমূহে জমাটি গল্প রচনাতেই তিনি সর্বাধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর স্নেহশীল কোমল প্রকৃতি সাধারণতঃ জীবনের অপ্রীতিকর দিকগুলির চিত্র উপস্থিত করতে অনিচ্ছুক; তেমনি নৈরাশ্যমূলক এবং বিয়োগান্ত-পরিসমাপ্তিও তিনি এড়িয়ে চলতেই ভালবাসেন। অবশ্য প্রয়োজন বোধে তিনি যে জীবনের নিষ্ঠুরতা, আবিলতা ও বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগের হানাহানির চিত্র দেননি এমন নয়। যেমন 'রক্তের বদলে রক্ত' বইতে

সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা এবং 'ভাঙছে, শুধু ভাঙছে' বইতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজের ক্রমিক ভাঙ্গনের চিত্র উপস্থিত করেছেন। তবে 'রক্তের বদলে রক্ত' বইতেও হিন্দু সুরেশের সঙ্গে মুসলমান লায়লার মিলন সাধন করে তিনি কাহিনীর সুখ-সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

রাজনৈতিক চিন্তা-দ্বন্দ্ব মনোজবাবুর মনকে কখনো বিচলিত করেনি। পাঠকের দাবী পূরণের জন্য তিনি অনায়াসে একই সঙ্গে কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসী আদর্শকে সমর্থন করে গল্প রচনা করতে পারেন। তাঁর 'ভুলি নাই' নামক উপন্যাসটি রাজনৈতিক আদর্শবাদ-ভিত্তিক কাহিনী। গল্পের আবেদন বৃদ্ধির জন্য তিনি মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা না করে নায়ককে আদর্শায়িত করেছেন। কোন তত্ত্বচিন্তা সম্পর্কেই তাঁর মনে কোন দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার ফলে এই ধরণের প্রয়াস তাঁর প্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্র নয়।

তেমনি নগ্ন বাস্তবের উদ্‌ঘাটনেও তাঁর সার্থকতা সীমাবদ্ধ। 'মানুষ গড়ার কারিগর' বইতে তিনি শিক্ষক সমাজের অনতিরঞ্জিত অধঃপতনের চিত্র বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন, তেমনি 'জলজঙ্গল' ও বন-কেটে বসত' বইতে তিনি যথাক্রমে সমুদ্র তীর ও সুন্দর বন অঞ্চলে মেহনতী মানুষদের বসতি পত্তনের প্রয়াসের মধ্যে কী করে স্বার্থান্বেষীরা বানরের ভাগ নিতে সচেষ্ট হয় তার কাহিনী আছে। তবু এ-সব বইতেও লেখক সুঠাম সুবিস্তৃত ও জটিল গল্প রচনার তাগিদে শেষ পর্যন্ত বাস্তব চিত্রায়নকে অবহেলা করেছেন।

তুলনায় অপ্রাকৃত-আশ্রয়ী 'আমার ফাঁসি হল' এবং চুরিবিদ্যার কারবারীদের নিয়ে লেখা 'নিশি কুটুম্ব' বইতে লেখক নির্বাধ কৌতুকজনক রোমাঞ্চকর গল্প রচনার অবকাশ পেয়েছেন। বইগুলো তাই নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য কাহিনী হয়ে উঠেছে।

সুবোধ ঘোষ

পরিণত বয়সে লিখতে আরম্ভ করে প্রথম গল্প প্রকাশের পরই অম্লান খ্যাতির আসন লাভ করেছিলেন সুবোধ ঘোষ। অবশ্য তাঁর প্রথম গল্প 'ফসিল'ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। 'ফসিল' ছাড়াও 'সুন্দরম্', 'অযান্ত্রিক,' 'গরল অমিয় ভেল,' 'কর্ণফুলীর ডাকে,' 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি আরও কতক-গুলি ছোট গল্প তিনি রচনা করেছেন যা খুবই উল্লেখযোগ্য। তথাপি প্রথম

আবির্ভাবের সময় তিনি যে প্রত্যাশা জাগ্রত করেছিলেন সে প্রত্যাশা তিনি পূরণ করতে পারেননি।

উপরে যে ক'জন লেখকের আলোচনা করেছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র সতীনাথ ব্যতীত আব কাউকেই প্রকৃত অর্থে আধুনিক বলা চলে না; কারণ আধুনিক যুগ মানসের নিদারুণ মোহমুক্তি ও প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংঘাতকে তাঁরা দূর থেকে দেখে থাকলেও তাঁদের অন্তরতম অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েনি। ফলে তাঁদের মনের পূর্বার্জিত বিশ্বাসভূমি প্রচণ্ড ভূকম্পনে বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। মোটামুটিভাবে সামন্ত-তান্ত্রিক নীতি-বোধ এবং মানবিক মূল্যবোধগুলি তাঁদের মানস-জগতের স্থৈর্য এবং ভারসাম্যকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সুবোধ ঘোষ আধুনিক যুগ দ্বন্দ্বের দ্বাবা ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন এবং সেই বিক্ষোভেব কিছু চিহ্ন তাঁর সাহিত্যকে যুগ-চিহ্নিত করেছে।

প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ ঘটনা ছাড়া সুবোধ ঘোষেব কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয় না। দুই বিপরীতের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ তাঁর প্রায় অধিকাংশ কাহিনীর মৌল বিশেষত্ব। সাহিত্য-কর্ম মাত্রেরই মূলে কোন না কোন দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু সুবোধ ঘোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং সচেতন। প্রথম জীবনে তিনি কমিউনিস্ট নীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, পবে কংগ্রেসের বিপরীত মেরুব আদর্শে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শে থীসিস এ্যান্টিথীসিসের দ্বন্দ্বের যে তত্ত্ব আছে তা সুবোধ ঘোষেব সমস্ত সাহিত্য-কর্মকে প্রভাবিত করেছে। 'ফসিল' গল্পে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, 'সুন্দবম্' গল্পে রক্ষণশীল নৈতিকতার সঙ্গে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বন্দ্ব, 'অযান্ত্রিকে' যন্ত্রের যান্ত্রিকতার সংগে মানবিক বোধের দ্বন্দ্ব, 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে অপসৃয়মান যৌবনের সঙ্গে যৌন কামনাকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষাব দ্বন্দ্ব। সুবোধ ঘোষেব কাহিনীতে প্রবল বিরূপতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়; ভালবাসা ঘৃণার মধ্যে আত্মগোপন করে, প্রচণ্ড ভালবাসা সহজেই দারুণ ঈর্ষায় পরিণত হয়।

ডায়ালেকৃটিক-ধর্মী কাহিনী বলেই সুবোধ ঘোষের গল্পে বলিষ্ঠতা, তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা যেমন বেশী, তেমনি তা এক ধরণের জ্যামিতিক ছকের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ভাষার উপর তাঁর অখণ্ড আধিপত্য রয়েছে বলে অনেক সময়েই তিনি কাহিনী বিস্তার করে কাহিনীর কঙ্কালের উপর রক্ত মাংসের সঞ্চার না করে ভাষার জাদু দিয়ে রসাবেদন সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু একটির প্রয়োজন আর একটি দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়। সুতরাং সুবোধ ঘোষের

কল্পনা-বৈশিষ্ট্য তাঁর কোন কোন গল্পের ত্রুটির কারণ হলেও তাঁর কতকগুলি ছোট গল্প নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি অপরিচিত দূরবর্তী অঞ্চলে কাহিনীর পটভূমিকা স্থাপন করেন; অপ্রত্যাশিত কোন্ থেকে কাহিনী রচনা শুরু করেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও ঠিক আমাদের পরিচিত ঘরের মানুষ নয়। সুতরাং তাঁর গল্প এবং থীম্ বাস্তববাদী হলেও আমরা খানিকটা রোমান্সের ব্যঞ্জনা অনুভব করি।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের কল্পনা-বৈশিষ্ট্য ছোট গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে যে কারণে সার্থকতা অর্জন করেছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই কারণেই তা ততখানি সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। তার প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। এই বইয়ে লেখক কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ করে কমিউনিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছেন। লেখকের পক্ষে মত পরিবর্তন নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু দলীয় মনোবৃত্তি বইখানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। লেখকের নিরপেক্ষতায় পাঠকের মনে একবার সন্দেহ জাগলে তাঁর কাল্পনিক কাহিনীর বাস্তবতা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক জানেন উপন্যাসের কাহিনী বানানো কাহিনী; সংবাদ পত্রের অকাট্য তথ্যের মূল্য তার নেই; সুতরাং এ কাহিনী যে বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া এ প্রত্যয় একবার বিঘ্নিত হলে রসহানি অপরিহার্য।

সুবোধ ঘোষের চরিত্রগুলির মধ্যে এক ধরণের ঋজুতা আছে; পটে আঁকা ছবির মত তা কখনো রূপ পরিবর্তন করে না। এই সরল রেখাত্মক কল্পনাকে আড়াল করার জন্য তিনি এক জটিল কাহিনীর অবতারণা করেন; এই জটিলতার জন্য পাঠকের পক্ষে কাহিনীর মধ্যে অংশ গ্রহণ সহজ হয় না ও তার রসাবেদন ক্ষুন্ন হয়। 'গঙ্গোত্রী' উপন্যাসে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে হৃদয়জ দ্বন্দ্বের এক জটিল সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭) উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের বিপরীত কোটিতে আদর্শনিষ্ঠ কেতকীকে স্থাপন করে লেখক ভারসাম্য রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর কল্পনার বিশেষত্ব রূপকাশ্রয়ী কাহিনীর পক্ষে উপযোগী বলে 'ত্রিযামা' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য দাবী করতে পারে।

সুবোধ ঘোষ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী লেখক। জীবন-সত্যকে তার দ্বন্দ্বের মধ্যে তার জটিলতার মধ্যে ধরতে চেষ্টা করে তিনি যদি সর্বত্র সার্থক না-ও হয়ে থাকেন, তবু তাঁর পরাজয় মহতের পরাজয়। সহজতর বিষয়বস্তু গ্রহণ করে

অনায়াসে সাফল্যের পন্থাকে তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন একথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উর্বরা কল্পনা এবং বেগবান বর্ণাঢ্য ভাষা—এই দু'টি নারায়ণবাবুর প্রায় সহজাত সম্পদ। সেইজন্য তিনি অতি দ্রুতবেগে যথেষ্ট সংখ্যায় গল্প এবং উপন্যাস রচনা করতে পেরেছেন একসময়ে।

কল্পনার প্রসাদের দরুণই নারায়ণবাবু পরিচিত পরিবেশ অপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলকে কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করতে ভালবাসেন। সুন্দরবনের জলদস্যু অধ্যুষিত দ্বীপ, রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল পল্লী, ডুয়াসের জলঢাকা নদীর তীর প্রভৃতি তার কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে। তেমনি রোমান্স সুলভ রোমহর্ষক ঘটনার সমাবেশ ঘটাতেও তার স্বাভাবিক আগ্রহ। সাংঘাতিক ঘটনার আকস্মিক চমক দ্বারা তিনি পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করতে ভালবাসেন অনেক সময়, যেমন 'টোপ' 'হাড' প্রভৃতি গল্পে, এই চমক সৃষ্টি অসম্ভব কার্যকর, যে সব ঘটনা অতি পরিচয়ের জন্য আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে, নারায়ণবাবুর কাহিনীতে তার চরম প্রকাশ ঘটনার প্রকৃত অমানুষিকতা সম্পর্কে আমাদের সজাগ করে তোলে।

কিন্তু ঘটনার ভয়াবহতা ও বীভৎসতা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আকস্মিকতার চাবুক মেরে পাঠককে যেমন সজাগ করে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনার পুনঃপৌনিকতা তেমনি পাঠকের সংবেদনশীলতাকে নিঃসাড় করে দেয় সাংঘাতিক ঘটনার প্রতি মোহ ছাড়াও চমকপ্রদ অস্বাভাবিক দৃশ্য ও চরিত্র রচনার দিকেও নারায়ণবাবুর ঝোঁক আছে। ঝড, বজ্রপাত, বিকারগ্রস্ত চরিত্র প্রভৃতির প্রতি তার আকর্ষণ সহজেই যে কোন পাঠকের নজরে পড়বে। এইভাবে জীবনের বহিঃপ্রকাশের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়ার ফলে নারায়ণবাবু মানুষের অন্তর্লোকের চিত্রায়নে বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি।

জীবনের প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশের চিত্রায়নে নারায়ণবাবুর দক্ষতা অসাধারণ। তার 'পুষ্করা', 'বীতংস', 'বনজ্যোৎস্না' প্রভৃতি ছোট গল্পে ছাড়াও উপন্যাসেও তিনি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সার্থকতা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশে'ই তাঁর এই দক্ষতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিন খণ্ডে

সম্পূর্ণ এই উপন্যাসের প্রথম দুই খণ্ডে চর ইসমাইলের পর্তুগীজ জলদস্যুদের এবং বর্মী চোরা ব্যবসায়ীদের বংশধরদের কাহিনীর মধ্যে তিনি মানুষের কামনার আদিম বর্বর রূপকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। ডি-সুজা, গঞ্জালেস, মগ রমণী সাফ্রন প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে লেখক লোভ, প্রেম, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি প্রতি ব্যাপারেই এক বেপরোয়া প্রচণ্ড উদ্দামতাকে চিত্রিত করেছেন। বর্ণনাগুণে রোমহর্ষক ঘটনাগুলি রোমান্সের আমেজ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নিছক রোমান্স সৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তৃতীয় পর্বে যখন চর ইসমাইলে সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে, তখন সেই আদিম উদ্দামতা সংহত হয়ে কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। এইভাবে সমাজ-গতির এবং পরিবর্তনের কার্য-কারণ সূত্রের একটি চিত্র কাহিনীতে বিধৃত হয়েছে; যদিও দু'টি পর্যায়ের সংযোগ-গ্রন্থী যথেষ্ট পরিস্ফুট হয়নি। আদিম নীতিহীন বর্বরতার সঙ্গে কৃষকদের নীতিসঙ্গত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক অবশ্য কবি-কল্পনা মাত্র।

'লালমাটি' বইতেও জমিদার ও মীর্জা শাহেবের সমন্বিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সাঁওতাল ও মুসলমান চাষীদের সমবেত প্রতিরোধের একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হত্যা, ঝগড়া, দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রস্তুতি পর্ব রচনা করে লেখক এই সংঘর্ষের এক প্রত্যক্ষবৎ চিত্র উপস্থিত করেছেন। কেরুসাহেব, কালো শশী, কুমার ভৈরব নারায়ণ প্রভৃতি চরিত্রগুলির উৎকেন্দ্রিকতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্পেক্টেক্‌ল্যারের প্রতি নজর বেশী থাকায় লেখক বিষয়বস্তুর গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারেননি। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন সাধনের ব্যাপারটি যেমন অনায়াসে লেখক ঘটিয়েছেন তা খুব প্রত্যয়সিদ্ধ হয়নি। এখনকার পাঠকের কাছে বইটির রাজনৈতিক ছক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

'একতলা' নামক একটি ছোট বইয়ে কলকাতার মেস বাড়ীর চিত্র দিতে গিয়ে অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে নারায়ণবাবু যে ভাবে আত্মহত্যা, চুরি, প্রতারণা, প্রভৃতি ঘটনার প্রচুর সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাতেই তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা দুয়েরই খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

নারায়ণবাবু রাজনৈতিক পটভূমিকা নিয়ে 'স্বর্ণসীতা' 'সূর্যসারথী' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, মন্বন্তর, আগস্ট বিপ্লব, কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিকে তিনি কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আর কোন লেখক দেশের রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে

এত প্রাধান্য দেননি। এই ধরণের কাহিনীর দিকে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ নয়; কিন্তু নারায়ণবাবু তাতে সফল হয়েছেন তাঁর কল্পনা-শক্তির জোরে। এই পর্যায়ের বইগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'শিলালিপি' বইখানি বোধ করি সর্বাধিক সাফল্য দাবী করতে পারে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পশ্চাদ্বর্ত্তী রোমান্টিক মানসিকতা এবং তার বাস্তব পরিণতির বৈসাদৃশ্য লেখক সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত উপন্যাসেও নারায়ণবাবু তাঁর কল্পনা-বৈশিষ্ট্যকে প্রয়োগ করেছেন। 'বিদূষক' উপন্যাসটি এক বিকৃতদেহ কুৎসিৎ বালককে নিয়ে রচিত। কাহিনীর শেষে সে তার চির বঞ্চিত জীবনকে আহুতি দিয়েছে রেলগাড়ির তলায় আগে ট্রাপিজের দড়ি কেটে নিয়ে প্রণয়িনীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করে।

নারায়ণবাবুর এই 'ভয়ঙ্কর' প্রীতির মধ্যে হয়তো আমাদের তান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রভাব আছে। কিন্তু এর মধ্যে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এ যুগের ক্ষমতা লোভ এবং হিংসার প্রাচুর্য স্বভাবতঃই সাহিত্য কর্মের উপরেও ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়েছে। এই কারণেই জীবনের মর্মান্তিক ও বর্বর রূপের সম্মুখীন হওয়ার সৎসাহস নারায়ণবাবু দেখাতে পেরেছেন। তিনি যতখানি সার্থক ভাবে রাজনৈতিক সংঘাতের চিত্র আঁকতে পারেন, ততখানি মনোযোগের সঙ্গে যদি পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে তার পশ্চাদ্বর্তী মানস-প্রস্তুতির চিত্র অঙ্কিত করতেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে এ যুগের শ্রেষ্ঠ এপিক উপন্যাস রচনার গৌরব লাভ করতেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নারায়ণবাবু যেমন অসাধারণের মধ্যে সাধারণকে খোঁজেন, বাস্তবের মধ্যে রোমান্সের অপরিচয়ের আমেজ সৃষ্টি করেন, নরেন্দ্রনাথ তেমনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খোঁজেন, ছোটর মধ্যে বৃহতের স্পন্দন অনুভব করেন।

নিজের সঙ্কীর্ণ পরিচিত জীবন বৃত্ত থেকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন। বাস্তববাদী বলেই তাঁর মধ্যে যে পরিমিত রোমান্স চেতনা বা আদর্শগত ভাবাবেগ নেই তা নয়, কিন্তু এ সবের সন্ধানে তিনি অপরিচিত কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক পরিবেশে যাওয়ার আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁর ছোট গল্প বা উপন্যাসের ছোট ছোট কাহিনীগুলি সহজেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে

ওঠে এই কারণে যে সেগুলি নিছক ব্যক্তিগত বা হৃদয়জ দ্বন্দ্বের ব্যাপার নয়, তার মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়। কাহিনীর মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে একটি বিধিবদ্ধ দম্পতির পাশাপাশি হয়তো লেখক অনিয়মিত দম্পতির কলঙ্কজনক চিত্র উপস্থিত করলেন এবং নায়কের মুখ দিয়ে আকস্মিকভাবে প্রশ্ন তুললেন, কিন্তু নিয়মিত দম্পতিদের জীবনেও যখন এত গোঁজামিল, তখন এদের চেয়ে তাদের জীবন ভালো কিসে? কোন নারী সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে দারুণভাবে ব্যর্থ হল, অথচ বাড়িতে পাওনাদারের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সে হয়তো অত্যন্ত নিপুণভাবে স্বামীর কল্পিত রোগের জন্য স্ত্রীসুলভ কাতরতা অভিনয় করতে পারল। তেমনি আবার অনেক সময় সমান্তরাল ঘটনার থেকে লেখক জীবনের কোন রূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করেন। কোন পুরুষ একজন রিক্সাওয়ালার সঙ্গে যেমন কর্কশ আচরণ করলেন, নিজের স্ত্রীব বিরুদ্ধেও তাঁর কথায় হয়তো তেমনি কর্কশতা প্রকাশ পেল; স্ত্রী ভাবলেনঃ তবে কি তাঁর স্বামীর কাছে রিক্সাওয়ালা এবং স্ত্রীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই? এমনিভাবে মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতার থেকে লেখক এমন কতকগুলি সুনির্বাচিত অংশ আমাদের উপহার দেন যা পারিবারিক সম্পর্কের গরমিলকে, বা সমস্যা-পীড়িত পারিবারিক জীবনে সংহতি বজায় রাখার জন্য মানুষ যে হীনতা, নীচতা বা মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয় তার চিত্রকে উপস্থিত করে।

যৌন-কামনার প্যাশনের চিত্র নরেন্দ্রনাথের অনেক ছোট গল্পে এবং প্রায় সব উপন্যাসেই বর্তমান। 'দ্বীপপুঞ্জ' এবং 'দেহ-মন' প্রধানতঃ যৌন-সমস্যামূলক; 'দূরভাষিণী' এবং 'চেনা মহলে' যৌন-সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ সর্বত্রই পারিবারিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন-সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। প্যাশনের উদ্দামতা, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উত্থান-পতনের কাহিনী, বা তার বিপর্যয়কর পরিণতির ঘটনাকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। নরেন্দ্রনাথের প্রেম পারিবারিক সম্পর্কে সাময়িক বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তাকে কখনো একেবারে ভেঙে দেয়নি। প্রেমের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের চিত্র তিনি দিয়েছেন; কিন্তু সুবিধাবাদ যে ট্রাজেডিকে ডেকে আনে তার চিত্রকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্যাশনের চিত্রে শেষ পর্যন্ত আছে আপোষ যাতে পারিবারিক সংহতি না ভেঙ্গে যায়।

আপোষের মনোভাব—মধ্যবিত্ত জীবনে এইটেই নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আবিষ্কার। গণতান্ত্রিক চেতনার ফলে মধ্যবিত্ত-মানসে কতকগুলো মূল্যবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক জীবনে সমানাধিকার, স্বামী-স্ত্রীব সমানাধিকার, স্বাধীন প্রেমের অধিকার, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনে গুরুতর অমিল থাকলে তাদের বাইরের কোন মেয়ে বা পুরুষের সঙ্গে প্রেমের অধিকার, সৌন্দর্য ও কৃষ্টিসম্পন্ন জীবনযাত্রা প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথের কাহিনীতে যে সংঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমস্ত দাবি থেকেই তাদের জন্ম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংঘাত শেষ হয় আপোষে,—দাবির আংশিক স্বীকৃতিব ভিত্তিতে আপোষ নয়, সমস্যাকে চাপা দেওয়ার ভিত্তিতে আপোষ—কোনবকমে পাবিবাবিক সংহতিকে গোঁজামিল দিয়েও অব্যাহত বাখার চেষ্টায় আপোষ।

জীবনেব অপ্রীতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সজাগ হলেও নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী নেতিমূলক নয়। তিনি জানেন যে, যে সমাজের চিত্র তিনি আঁকেন সে সমাজ পরিবর্তনশীল, পুরনো মূল্যবোধগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মূল্যবোধের জন্ম হচ্ছে। তাই বলে এ সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে, এ সভ্যতা বন্ধ্যা—এ জাতীয় আধুনিক লেখকদেব কাছে মুখোবোচক পাশ্চাত্য থেকে ধাব করা কোন সিদ্ধান্ত নরেন্দ্রনাথেব কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিক থেকে নরেন্দ্রনাথের মন মূলতঃ ভাবতীয়। তিনি জানেন অবৈধ সন্তানেব জন্ম দিয়ে প্রণয়ী পলাতক হলেও মেয়েটির শিশু-সন্তান অকূলে ভেসে যায় না, তারা সংগ্রাম ক'বে সমাজে বেঁচে থাকে তবু। সামান্য এক পেয়ালা দুধ নিয়ে কষ্টের সংসাবে ঈর্ষার সঞ্চার হয়, তাই বলে শেষ পর্যন্ত যে শুভ বুদ্ধি জয় লাভ করে না এমন নয়। স্বামী বেকাব হলে স্ত্রী বাড়িতে পুতুল তৈরি করে সংসার চালায়, এবং এর পেছনে নিছক দেহরক্ষাব জৈব কামনা ছাড়া ভালবাসাবও কিছু প্রকাশ রয়েছে। ছোটবোনের প্রণয়ী-কে বড় বোন আয়ত্ব করতে চায় ছোট বোনের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের হাতেই তার প্রণয়ীকে ফিরিয়ে দেয় নিছক মহত্ব বশতঃ যে তা নয়; মহত্ত্বের পিছনে খানিকটা বাস্তবতা বোধও রয়েছে (তিন দিন তিন রাত্রি)। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ জীবনের উপর রোমান্টিকদের মত মিথ্যা মহত্ত্ব আরোপ করতে চান না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভ বুদ্ধি যে জয়ী হয় এ বিশ্বাস তাঁর অটুট।

নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছোট গল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সার্থক। তাঁর শ্রেষ্ঠ

উপন্যাস 'চেনা মহল' তো মূলতঃ কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। একটি ছোট্ট ঘটনা, একটি ছোট্ট সংকট কাল, এবং তার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটি জীবন সত্য আভাসিত হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথের কাছে জীবন সত্য সবসময় ন্যায় বিচারের ধার ধারে না। তাঁর বিখ্যাত 'রস' গল্পের চাষী নায়ক একবার তার প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবিচার করেছিল, আবার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে প্রথমাকে ফিরিয়ে এনেছিল তার সৃষ্টির (গুড় তৈরির) প্রয়োজনে। শিল্পী মনস্তত্ত্বের কাছ এই ধরণের নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার স্বাভাবিক, সুতরাং তা মেনে নিতে হবে। বাস্তব-সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এই হল নরেন্দ্রনাথের নীতি। নরেন্দ্রনাথ মৌলিক ধর্মী লেখক; কারণ সব সময় নিজের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে ভিত্তি করে তিনি লেখেন।

গোপাল হালদার

গোপাল হালদার মূলতঃ লেখকদের লেখক। তাঁর বই থেকে লেখকরা তাদের লেখার অনেক উপকরণ এবং সুষ্ঠু চিন্তাশীলতার খোরাক পেতে পাবেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর তথ্যভাবাক্রান্ত মননশীল বিশ্লেষণধর্মী রচনা একটু নীরস বলে বোধ হতে পারে।

এ কথা অবশ্য তাঁর প্রথম বই 'একদা' সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। 'একদা'র নায়ক যুক্তিবাদী হলেও তার মনের উত্তাপ যে-কোন পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করবে। এই বইয়েরই ধারাবাহিকতায় রচিত 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার জালে অপেক্ষাকৃত ভারাক্রান্ত। তথাপি লেখক অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে চিন্তাশীলতাকে আবেগের স্তরে উন্নীত করতে পারার ফলে এ বই দু'খানারও সর্বজনীন অবেদন আছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে তিনি যে তিনখানি উপন্যাস লিখেছেন সে তিনখানা বইই ঐতিহাসিক তথ্যসংস্থাপনার জন্য সবিশেষ মূল্যবান। বইতে যে সার্থক চরিত্র চিত্রায়ণ নেই তা নয়। বহু টাইপ চরিত্র আছে—ঐতিহাসিক এবং লেখকের কাছে যার মূল্য অসীম। কিন্তু মূল নায়ক চরিত্রকে লেখক খুব জীবন্ত করে তুলতে পারেননি; কারণ আসলে সে তথ্য পঞ্জীয়নের একটি যোগসূত্র মাত্র।

বাঙালী মধ্যবিত্তের উৎপত্তি থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অগ্রগতির

ইতিহাস ছয় খণ্ডের একটি উপন্যাসের মধ্যে চিত্রিত করার একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গোপালবাবুর নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত লেখক এর চার খণ্ড মাত্র সম্পূর্ণ করেছেন। 'ভূমিকা'তে লেখক তিনশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস গ্রথিত করেছেন বলে বইখানা অত্যন্ত তথ্যভারাক্রান্ত; বইয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কীর্তি সনাতনের চরিত্র। কৃষক-বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল এই জমিদার পুত্রটি কী করে বিদ্রোহের বিফলতার পর ধীরে ধীরে চৈতন্যের ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে সংসারে বীতরাগী হয়ে পড়লেন তাব অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মত চিত্র দিয়েছেন লেখক। 'জোয়ারের বেলা'ও তথ্যবহুল হলেও তার মধ্যে সাহিত্যমূল্য অনেক বেশী।

গোপাল হালদারের একটি শিল্পী-মন আছে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মননশীল বলে তাঁর চিন্তা-লব্ধ সত্যকে আনুপূর্বিক উপন্যাসে উপস্থিত করতে চান। উপন্যাস এতখানি ভার বইতে অক্ষম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশোত্তর যুগ

সাহিত্য এক পণ্য নারী

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশোত্তর উপন্যাস ইতিহাসকারের অধিকার-ভুক্ত নয়। ঐতিহাসিক যে দূরবীনের সাহায্যে তাঁর লক্ষ্যবস্তুকে দেখেন, সে দূরবীন সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটু দূরত্ব আবশ্যক। একবারে সাম্প্রতিক সাহিত্য অতি নৈকট্যের দরুণই অস্পষ্ট। সেই কারণেও বটে, এবং বইয়ের কলেবরের শঙ্কাজনক বৃদ্ধিকে সংবরণ করার জন্যও বটে, অমি পঞ্চাশোত্তর সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা এড়িয়ে চলব। এ যুগের কয়েকটি লক্ষণ ও প্রবণতার উল্লেখের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

নব-লব্ধ স্বাধীনতার সূর্যের আলোয় এযুগ যাত্রা শুরু করেছিল। সেই সময়টায় দিগন্তে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা রূপালি রেখা দেখা গিয়েছিল। এই আশা-মরীচিকার একটি ক্ষীণ আভাস চীন-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত বজায় ছিল। এ যুদ্ধের পর থেকেই জাতীয় বাজেটের বৃহত্তম অংশ এবং ক্রম-ক্ষীয়মান বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় সবটুকুই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের খাদ থেকে সরে গিয়ে দেশরক্ষার খাদ দিয়ে বইতে শুরু করেছে। যুদ্ধের উত্তেজনা একটি চমৎকার জিনিস; দেশপ্রেমের কৃত্রিম ভাবাবেগ জনগণকে যে কোন দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করতে প্ররোচিত করে। সুতরাং যে-কোন জনস্বার্থ-বিরোধী সরকার যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তার আড়ালে নিরুপদ্রবে ক্ষমতা উপভোগ করতে ভালবাসে। কিন্তু যুদ্ধের অপরিহার্য পরিণতি হল খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ এবং সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অপমৃত্যু। এবং হতাশা, নিশ্ছিদ্র রূপালিরেখা বর্জিত হতাশা। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে ১৯৫০ থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাজার ক্রমশঃ স্ফীততর হয়েছে; এবং তরে পর থেকেই ভারতব্যাপী ক্রমবর্ধমান মন্দার অসহায় শিকার হয়েছে এই সাহিত্য। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যের বাজারের স্ফীতিটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির যৎসামান্য ভগ্নাংশ এমন একটি শ্রেণীর হাতে এসে পড়েছিল যাদের সংস্কৃতির প্রতি কিছু অনুরাগ আছে। সুতরাং পত্র পত্রিকা পুস্তকাদির বিক্রয় আশাতীত রকম বেড়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই শারদ

সংখ্যাগুলি প্রকাশের মরশুম শুরু হয়। তার ফলে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল বাংলাদেশে সাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস, একটি বাজারের পণ্যে পরিণত হল। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। ছাপানো বই চিরকালই বাজারে বিক্রি হয়। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত বিক্রীত বইয়ের সংখ্যা এত কম ছিল যে তা বৃহৎ পুঁজিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি বা তার উপর নির্ভর করে কোন লেখক ভাবতে পারেননি যে নিছক বই লিখেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু এখন উৎসাহিত হয়ে বৃহৎ পুঁজির মালিক দৈনিক পত্রিকাগুলি সাপ্তাহিক এবং পূজাবার্ষিকী প্রকাশ আরম্ভ করল এবং কিছু মোটামুটি ভাল পুঁজির মালিক প্রকাশনার ব্যবসায়ে অগ্রসর হল। দু'চার জন লেখক জীবিকার জন্য শুধু লেখার উপব নিভর করতে শুরু করলেন।

(বাংলাদেশের পোড়া মাটিতে এই অত্যন্ত আশা এবং আনন্দজনক ঘটনাটি একটি বিপত্তি সৃষ্টি করল। প্রকাশক এবং পত্রিকা ব্যবসায়ীদের কাছে সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের কোন মূল্য ছিল না; সাহিত্যের বিক্রয় মূল্যই তাদের কাছে একমাত্র মূল্য। তাব ফলে যে সব লেখকরা বাজারে সুপরিচিত, তাদেব নাম 'সানফোরাইজ্ড্' বা 'আগ' ট্রেড্মার্কের মত এমন একটি ট্রেড্মার্ক বলে স্বীকৃত হল যা কোন বইয়ে থাকলে সে বইয়েব বিক্রি গ্যারাণ্টিযুক্ত। তার ফলে তাবা নাম-করা লেখকদেব বাড়িতে বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে তাদের দাদন এবং উপঢৌকন দিয়ে কিনে নেবার আয়োজন করল। প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় নাম-করা লেখকরা অনায়াসে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলেন; তাঁদেব যে-সব রচনা ইতিপূবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সামান্য রূপান্তরিত করে সেই সব রচনার অজস্র অজস্র পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন তাঁরা গল্পের পর গল্পে এবং বইয়ের পর বইয়ে। সৃষ্টির অজস্রতায় তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বাজারকে প্লাবিত করে দিলেন। তার ফলে প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে শতকরা আশী ভাগ অংশ মাত্র পনের ভাগ লেখকেব দ্বারা লিখিত হতে লাগল। সিনেমার মত সাহিত্যের জগতেও এক ধরণের 'স্টারডম' দেখা দিল।)

রম্য রচনাধর্মী উপন্যাস

এঁদের প্রাচুর্যের জন্য স্থান সঙ্কুলান কবে বাঙালী প্রকাশকদের কমবেশী বিশ পার্সেণ্ট অতিরিক্ত সংস্থান ছিল, সেটুকুর জন্য তাঁরা উপযুক্ত অর্থকরী উপায়ের সন্ধান করতে লাগলেন। বৃহৎ পত্রিকাগুলিতে যে সব রচনা জনচিত্তকে জয়

করতে পারল প্রকাশকরা সেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উৎসাহিত হয়ে লেখকরা সেই ধরণের রচনা লিখতে প্ররোচিত হলেন। এইভাবে রম্যরচনা নামে এক ধরণের সাহিত্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি হল, যার পথিকৃৎ যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' বইখানা। এক কথায়, রম্য রচনা হল এক জাতীয় জার্নালিস্ট ধর্মী রচনা যার মধ্যে লেখক যথেচ্ছভাবে শিল্পরূপের বন্ধন মুক্ত হয়ে কল্পনা প্রয়োগ করতে পারেন এবং তথ্যের নামে মন-গড়া মুখোরোচক মিথ্য কথার ভেজাল দিতে পারেন। কথার মারপ্যাচ, কিছু কিছু তীর্যক মন্তব্য, কৃত্রিম ভঙ্গী-প্রধান ভাষা, কিছু অতিশয়োক্তি-মূলক কল্পিত কাহিনী এবং সেই সঙ্গে কিছু তথ্য ও জ্ঞান বিতরনের ভান—এই হচ্ছে রম্য রচনার শাকুল্যে মূলধন। সাহিত্য আর জার্নালিজম পাঞ্চ করা এই আশ্চর্য জিনিস না ঘটনা না কল্পনা, না সত্য না মিথ্যা, না প্রকৃত জ্ঞান দান করে না শিল্পানুভূতি জাগায়। শহরের বুদ্ধির অহমিকাযুক্ত অথচ অলস মানুষদের লঘু-পক্ষ বুদ্ধি-প্রধান চিত্তবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করে এই সাহিত্য। তথাপি এ-কথা স্বীকার করতেই হবে উপন্যাসে যখন ঘ্যান-ঘ্যানানি প্যান-প্যানানির অন্ত থাকে না, যখন তা ভাবাতিশয্য আর অলস ভাবাবেগের বুদ্বুদে ঠাসা হয়, যখন তুচ্ছাতি তুচ্ছ ঘটনার ক্লান্তিকর বিবরণে তার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়, তখন এই ধরনের রচনার সংক্ষিপ্ত ঝাঁঝালো ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা ভাবাবেগ-বাহুল্য বর্জিত বলিষ্ঠতা পাঠকের কাছে অনেক বেশী তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে।

রম্যরচনার অতি-জনপ্রিয়তা এ-যুগের উপন্যাস-শিল্পের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জাতের উপন্যাসের রচনা-কৌশল হচ্ছে পর পর একের পর এক অতি-নাটকীয় রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করে সম্ভাব্যতার একটি ক্ষীণ সূত্র দিয়ে সেগুলোকে সংগ্রথিত করা। জার্নালিস্ট-ধর্মী লেখক রিপোর্টাজের ভঙ্গীতে যেন তাঁর দেখা একটি ঘটনাকে বিবৃত করছেন; সুতরাং ঘটনার বহিরঙ্গই তাঁর লক্ষ্যস্থল, নায়ক-নায়িকার অন্তর্লোকের পরিচয় লেখক দু' চারটি মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের ভান-যুক্ত কথায় সেরে দেন। পাঠক এ কাহিনীর মধ্যে অংশগ্রহণের অবকাশ পান না, তিনি দর্শক মাত্র। সেজন্য সংঘাতিক সাংঘাতিক নাটকীয় ঘটনাও পাঠকের মনে প্রত্যাশিত আলোড়ন সৃষ্টি করে না। পাঠক অনেকটা কৌতুক ও কৌতূহলের মনোভাব নিয়ে দৃশ্যগুলি উপভোগ করেন অবকাশ যাপনের অবলম্বন হিসাবে। এই ধরণের কাহিনীর বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রধানতঃ যৌন-বিকৃতি, এবং কিছুটা কিছুটা অন্যবিধ বিকৃতির চিত্র উপস্থিত করা।

বাস্তবের উদ্ঘাটনের নামে আতিশয্য পূর্ণ কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত এক একদেশদর্শী বাস্তবকে উপস্থিত করা হয়, অনেকটা উনিশ শতকীয় কিস্সা সাহিত্যের মত। রঞ্জন, মুজতবা আলী, যাযাবর, শংকর প্রভৃতি রম্যরচনার রচয়িতাগণ কিছু কিছু এই ধরণের কাহিনী রচনা করেছেন। চাণক্য সেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ এ জাতীয় উপন্যাস রচনা করে নাম করেছেন।

এ জাতীয় উপন্যাস রচনায় সর্বাগ্রগণ্য হলেন বিমল মিত্র। বিমল মিত্র একজন শক্তিশালী লেখক, যদিও তাঁর জার্নালিস্ট-ধর্মী উপন্যাসের কোন স্থায়ী মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তাঁর রচনা-রীতি অবশ্য মোটেই আধুনিক নয়। জার্নালিস্টের মত তিনিও যেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কোন কাহিনী বিবৃত করছেন এইভাবে কাহিনী শুরু করেন। কাহিনীর পটভূমিকা রচনার জন্য তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনার আশ্রয় নেন। আসল ঘটনা বলার আগে তিনি কেবলই ফিরে ফিরে এসে পারিপার্শ্বিক রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং অজস্র অজস্র প্রস্তুতি-মূলক খণ্ড-ঘটনা বিবৃত করেন। এই ভাবে অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশাকে ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উন্নয়ন করাই তাঁর পাঠকের মনোযোগকে ধরে রাখার প্রধান কৌশল। সাধারণতঃ বর্ণনা-প্রধান রচনা অপ্রীতিকর হয়, কিন্তু বিমল মিত্র সাবলীল গতিশীল ভাষার জোরে, ভাষাকে নাটকীয়তা গুণ-সম্পন্ন করার ক্ষমতার জোরে, এবং সর্বোপরি উৎকণ্ঠা সৃষ্টির কৌশলের সাহায্যে বর্ণনাকেও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। অবশ্য বলা বাহুল্য বিমলবাবুর কৌশল সরলমতি পাঠককে যতখানি বিভ্রান্ত করতে পারে, বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত পাঠককে ততখানি করতে পারে না। তাঁর কৌশলের কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়ে, এবং বইয়ের পর বইয়ে একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি বিরক্তি উদ্রেক করে।

মোটের উপর বিমলাবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী হাঁ-ধর্মী এবং গঠনমূলক। তিনি এ-যুগের গভীর হতাশা এবং মোহমুক্তির লেখক নন : সমস্ত সরল বিশ্বাস এবং ভাবাবেগ পরিহার করে নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা যাঁরা গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁদের একজন নন। অপ্রীতিকর বাস্তবের উদ্ঘাটন ও ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের চিত্রায়নে তিনি কম-বেশী বিংশোত্তর লেখকদের অনুসরণ করেন, অবশ্য তাঁদের বিদ্রোহ-প্রবণতাকে বাদ দিয়ে। কিন্তু তিনি মানুষের মহৎ উত্তরণে বিশ্বাসী না হলেও, মানুষ যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও

কতকগুলো ভাবাবেগ ও মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে এ-কথা প্রতি উপন্যাসেই উপস্থিত করেছেন। তাঁর ভাবাবেগগুলো শরৎচন্দ্র সুলভ, বরং অনেক সময় সেগুলো কৃত্রিম এবং মনস্তত্ত্বসম্মত নয় বলে প্রবোধ সান্ন্যালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং বিমলবাবুর দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক। সাধারণ পাঠক মোহমুক্তি চায় না, মোহ নিয়েই বাঁচতে চায়; সে উত্তেজক রোমহর্ষক স্নায়ু-চাঞ্চল্যকারী গল্প চায়, কিন্তু তার পরিচিত বিশ্বাস এবং নীতি-বোধে আঘাত লাগুক তা চায় না। এক-কথায় সে রূপকথার গল্প চায় এবং বিমল মিত্র এবং তাঁর অনুগামীরা একালের পাঠককে অজস্র অজস্র রূপকথার গল্প সরবরাহ করে চলেছেন।

এক কথায় বলা চলে রম্য-রচনাধর্মী উপন্যাসের বিশেষত্ব হল যে তা মুখোরোচক সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। যন্ত্র প্রাধান্যের যুগে কল-কারখানা আপিস-আদালতের কর্মক্লান্ত কর্মীদের এবং ছোট ছোট পরিবারের অলস বৌদের কিছু অনায়াস সহজলভ্য আনন্দ যোগানোই এব উদ্দেশ্য। এ কথা অকপটে স্বীকার করাই ভাল যে রম্য-উপন্যাস রচনায় যাঁরা সার্থক হয়েছেন তাঁদের লেখার ক্ষমতা আছে, ভাষার উপর তাঁদের যথেষ্ট আধিপত্য আছে, এবং নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তাঁদের পল্লবগ্রাহী জ্ঞান আছে। তাঁদের নেই শুধু একটি জিনিস—শিল্প বোধ। তাঁরা হয়তো এ-কথা নিজেরাও জানেন না যে তাঁদের রীতি মোটেই আধুনিক নয়; তা প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস সৃষ্টির আদিম যুগের—অষ্টাদশ উনবিংশ শতকীয়—আদর্শে প্রত্যাবর্তন। তাঁদের রীতি বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকীয় 'পিকারেস্ক' যা দুঃসাহসিক ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে-কালে উপন্যাসকে বিশুদ্ধ শিল্প বলে গণ্য করা হত না। কিছু পাঁচমিশেলী রসের সরবরাহের সঙ্গে কিছু নৈতিক সামাজিক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান দান করাই ছিল সেকালের উপন্যাসের লক্ষ্য। সুতরাং রোমান্স, অ্যাড়ভেঞ্চার, কিছু হাস্যরস এবং কৌতুকরস, কিছু করুণ রস—এবং এ সবের সঙ্গে সামাজিক এবং নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টা সেকালের যে-কোন উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তথাপি সেকালের প্রকৃত প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে এমন সহজাত শিল্প বোধ ছিল যে পাঁচমিশেলী রস সরবরাহ করতে বসেও তাঁরা মূল থীমের কথা বিস্মৃত হতেন না এবং সে জন্য কাহিনীর বিভিন্ন উপাদানকে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে

মূল থীমের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারতেন যে কাহিনীর ঐক্য বজায় থাকত। রম্য-উপন্যাস রচয়িতাদের আদর্শও এই পূর্বসূরীদের অনুরূপ : তাঁরাও পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচমিশেলী রস সরবরাহ করতে চান, শুধু সেই সঙ্গে তাঁরা নৈতিক এবং সামাজিক শিক্ষার দায়িত্ব না নিয়ে কিছু কৃত্রিম ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ কাহিনীতেই থীমের কোন বালাই নেই বলে ঐক্যও নেই। বিচিত্রানুষ্ঠানের সঙ্গে থিয়েটারের যে পার্থক্য, তাঁদের রচনা ও প্রকৃত উপন্যাসের মধ্যেও সেই পার্থক্য। [থীম— বিমূর্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় আট দশটি শব্দের মধ্যে বর্ণিত কাহিনীর মূল উপজীব্য বিষয়।]

ঐতিহাসিক উপন্যাস

পঞ্চাশোত্তর যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটা প্রচণ্ড হুজুগ দেখা দিয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে মোট রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস রম্য-রচনাধর্মী উপন্যাস থেকে কোন স্বতন্ত্র জিনিস নয়। পাঠককে লঘু পাঁচমিশেলী আনন্দ দেবার অভিলাষেই বৈচিত্র-বিলাসী মন ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে-সব বিচিত্র চরিত্র এবং নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়, বর্তমানের পটভূমিকায় সম্ভাব্যতার সূত্র বজায় রেখে অনেক সময়েই তা সম্ভব নয়। সুতরাং পাঠককে অপ্রাপ্য দূরবর্তী অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়ার জন্য এ কালের লেখকরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। জীবন-সত্যের অনুসন্ধানের জন্য, অথবা প্রেরণা লাভের জন্য, অথবা ঐতিহাসিক কালকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁদের কোন মাথা ব্যথা নেই। এমন কি একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত বিশুদ্ধ রোমান্স সৃষ্টির আগ্রহের পরিচয়ও কারও মধ্যে পাওয়া যায় না। আধুনিক আত্মম্ভরিতা-সম্পন্ন লেখকগণ নিছক ঐতিহাসিক রোমান্স সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট নন। সেই সঙ্গে তাঁরা ঐতিহাসিক বাস্তবের চিত্রও দিতে চান ; সেই বাস্তবকে আবার নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ব্যাখ্যাও করতে চান। এই সব উপাদানগুলির সাহায্যে তাঁরা পাঠককে তাক লাগিয়ে দিয়ে উপসংহারে একটি কৃত্রিম ভাবাবেগ সৃষ্টি করে পাঠককে মুগ্ধ করতে চান। এতগুলো উদ্দেশ্যকে একটি ঐক্যবদ্ধ থীমের মধ্যে সংগ্রথিত করার মত প্রতিভা

এ যুগের কোন লেখকের নেই। তার ফলে এ-কালের বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক উপন্যাসই পাঁচমিশেলী উপাদান ও রসের সমাবেশের চেয়ে বেশী কিছু হয়ে ওঠেনি। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য অন্ততঃ কিছু কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকরা দায়িত্বের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য মাথার মধ্যে থাকায় এবং প্রকৃত শিল্প-বোধের অভাবের ফলে তাঁরা বড়জোর আংশিক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। কোন কোন বইয়ের অংশ-বিশেষ হয়তো সুন্দর ও শিল্পসম্মত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সমগ্র ভাবে বইখানি কোন শিল্পানুভূতি জাগ্রত করে না। একালে যে কয়েকখানি বই খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সে বইগুলো সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য।

উদাহরণ হিসাবে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং প্রথম নাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' বই ত্'খানির কথা উল্লেখ করা যায়। নিঃসন্দেহে উভয় লেখকই মহৎ কিছু সৃষ্টি করার সঙ্কল্প নিয়েই রচনায় হাত দিয়েছিলেন; নিছক পাঠকের মনোরঞ্জনই তাঁদেব উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলে তাঁদের সংকল্পের মহত্ত্বকে খাটো করা উচিত নয়। বই দু'খানি শুধু ব্যাপক গণ-সমর্থনই নয়, বিদগ্ধ জনের সমর্থনও লাভ করেছে। কিন্তু যদি শিল্প পরিণতির কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা কী দেখতে পাই?

'সাহেব বিবি গেলোম' বইতে ছোট বৌরাণীব লম্পট মাতাল স্বামীকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা এবং কাহিনীর বক্তার সঙ্গে জবার ঘনিষ্ঠতার বিবরণ বিশুদ্ধ বোমান্স রচনার চেষ্টা; ছোট ছোট কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পড়ন্ত জমিদার বাড়ির অহঙ্কার, নোংরামী এবং কদর্যতাকে প্রকাশ করার মধ্যে বাস্তবতা সৃষ্টির প্রয়াস; উনিশ শতকের প্রথম পাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপান্তবের বিবরণ নিছক প্রবন্ধের ভাষায় রচিত ইতিহাস; সবোপরি কাহিনীর বক্তার প্রেম-পাত্রী জবাকে পত্নী হিসাবে লাভ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে-সুযোগ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কৃত্রিম ভাবাবেগ সৃষ্টির প্রয়াস বয়েছে। এতগুলি বিভিন্ন পরস্পব-বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্যে কোন অন্তর সঙ্গতি বা ভাবগত ঐক্যও নেই; সেগুলোর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র এই যে সবই একই কালের ঘটনা। স্বভাবতঃই পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগে—বই-খানার থীম কী? একটি পড়ন্ত জমিদার বাড়ির চিত্র অঙ্কিত করা? তা যদি হয় তবে লেখক এ বাড়ির বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধারা-

বাহিক কাহিনী রচনা না করে ছোট বৌরাণীব একটা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ সমস্যাকে অসামান্য গুরুত্ব দিলেন কেন? উনিশ শতকের প্রথম পাদে জমিদার তন্ত্রের ক্রমাবসান ও পুঁজিতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের চিত্রায়নের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপান্তরের চিত্র বিধৃত করা? তা হলে এই রূপান্তরের চিত্র কাহিনীতে অনুপস্থিত কেন? ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রোমান্স-মূলক কাহিনী রচনা করা? কিন্তু তা হলে কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার তথ্যসংগ্রহে এত মনোযোগ কেন? এক কথায়, একটি ছোট বাক্যের মধ্যে এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্যকে উপস্থিত কবা অসম্ভব ব্যাপার। শিল্পকর্মের জাত হিসাবে বইখানিকে চিহ্নিত করতে হলে না বলে উপায় নেই যে বইখানি জার্নালিজম ও রূপকথার এক সদৃশ-সমন্বয়।

প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র আলোচনা করতে বসলেও সমালোচককে একই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। বিশী মশাই নিজে একজন বিশিষ্ট সমালোচক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। উপন্যাস কী করে শিল্প হয়ে ওঠে এ-কথা তাঁকে বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা-মাত্র। যথেষ্ট ঐতিহাসিক জ্ঞান, রচনা-নৈপুণ্য, কৌতুকপ্রিয়তা এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানকে পুঁজি কবে তিনি এই বই রচনায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে রাম রাম বসু কাহিনীর প্রথম অংশে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, কর্মানুরক্ত ভাবালুতা-এবং নীতিজ্ঞান-বর্জিত চরিত্র, কাহিনীর শেষে এক ভাবালুতা সর্বস্ব কর্ম-বিরক্ত চরিত্র। প্রকৃত পক্ষে একই নামের আড়ালে তিনি দুই ভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আবার, কাহিনীর বেশীব ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে রেশমী নামক একটি স্বামীব চিতা থেকে পলাতক মেয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী যার সঙ্গে রাম রাম বসুর জীবন চিত্রেব কোন সম্পর্ক নেই। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে —লেখকের উদ্দেশ্য কি একটি ঐতিহাসিক কালকে বিবৃত করা? না, একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করা? না, রেশমীর কাহিনীর সাহায্যে পাঠকের মনে সতীদাহ-বিরোধী ভাবাবেগ জাগ্রত করা (যার এযুগে কোন উপযোগিতা নেই)? উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার দরুণ বইয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন ঐক্য বা সমন্বয় সৃষ্টি হয়নি। বইটি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীর যান্ত্রিক মিশ্রণ, একটি অখণ্ড অবিভাজ্য কাহিনীতে পরিণত হয়নি। আসল কথা প্রমথবাবু মূলতঃ বুদ্ধিমার্গের লেখক: ঐতিহাসিক কাল প্রথমেই তাঁর মানস চক্ষের সামনে ছবি হিসাবে দেখা দেয় না:

ঐতিহাসিক কাল সম্পর্কে বুদ্ধির সাহায্যে গৃহীত কতকগুলি সিদ্ধান্তকে তিনি ছবিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধির কাজ বিশ্লেষণ, শিল্পের কাজ সংশ্লেষণ।

উপরোক্ত দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে তাকালেই এ কালের বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কেই একটি মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। তবে বিমলবাবু এবং প্রমথবাবুর মধ্যে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের যে অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায়, অন্যান্যরা তা এড়িয়ে চলেছেন। রোমান্স, অ্যাড্ভেঞ্চার এবং ভাবাবেগ, এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু চমকপ্রদ মন্তব্য—এর সাহায্যে পাঠকচিত্তকে জয় করাই ঔপন্যাসিকদের প্রধান লক্ষ্য। এই ধরনের পাঁচমিশেলী উপাদানের বিশৃঙ্খল সমাবেশ পড়তে পড়তে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই পড়লে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। শরদিন্দুবাবু প্রকৃত শিল্পী এবং তিনি খুব ভাল করে জানেন যে তাঁর উদ্দেশ্য রোমান্স সৃষ্টি। ঐতিহাসিক কালের রীতি-নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের খতিয়ান—প্রভৃতি সব কিছুকে নিপুণ ভাবে তিনি তাঁর নিটোল কাহিনীর মধ্যে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংগ্রথিত করেন যে কাহিনীর বাইরে সেগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের নজরেই পড়ে না। শরদিন্দুবাবুকে সবচেয়ে ভাল লাগে এইজন্য যে টলস্টয়ের মত ঋষি সুলভ আপ্তবাক্য উচ্চারণ করে যুগ-প্রধান লেখক বলে পরিগণিত হওয়াব অহমিকা তাঁর নেই। এর মধ্যেই তাঁর শিল্পীসুলভ পবিমিতি-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাটনি সাহিত্যের যে কিছু বাড়বাড়ন্ত হবে তা প্রত্যাশিত। সুতরাং রম্যরচনাধর্মী উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ নেই। তবু মনে অভিযোগ জাগে এই কারণে যে মাত্র কয়েক বছবের মধ্যে এই সাহিত্য পাঠকের স্বাভাবিক শিল্প বোধকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজকে কোন অভিজ্ঞ পাঠকও অনায়াসে বলতে পারেন না কোন বইয়ের অংশবিশেষ চিত্তাকর্ষক হলেই সেটা প্রকৃত শিল্প-কর্ম হয়ে ওঠে কিনা। উপভোগ্য সাহিত্য আর প্রকৃত শিল্প-কর্মের মধ্যে পার্থক্য বোধ এ কালের অধিকাংশ পাঠকই, এমন কি বহু বিদগ্ধ পাঠকও হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ উপন্যাসকে আজ যদি সুনিশ্চিত অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে তাকে প্রকৃত শিল্প-কর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

চল্লিশ সালের পর বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে আনুগত্য স্বীকারের পর থেকে ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যখন কোন লেখক বাস্তববাদী বা প্রাকৃতবাদী রীতিতে উপন্যাস লিখলেই তিনি বামপন্থী রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত বলে চিহ্নিত হন। সুতরাং বাংলা দেশের বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশালয়গুলিতে সে-লেখকের স্থান লাভ দুরূহ হয়ে পড়ে। তার ফলে সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে একটি অদ্ভুৎ পট-পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেখানে চল্লিশোত্তার যুগে বাস্তববাদ প্রায় একাধিপত্য লাভ করেছিল, সেখানে পঞ্চাশোত্তর যুগে বাস্তববাদ অবজ্ঞাত, অবহেলিত, কোণঠাসা।

বাস্তবাদের এই দ্রুত অবক্ষয়ের আর একটি কারণ ১৯৫৭-সালে রুশদেশে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতা লাভ এবং স্টালিন এবং স্টালিন-নীতির প্রত্যাখ্যান। এই ঘটনার ফলে বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। না পারলেন তাঁরা পূর্ব-অনুসৃত নীতিতে অবিচলিত থাকতে, না পারলেন তাঁরা নতুন পরিস্থিতিতে নবতর চিন্তার আলোতে পূর্বতন নীতির সংস্কার সাধন করতে। আমাদের দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়ার বিপজ্জনক ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজী হননি। কিছুদিন পরে মাও-সে-তুঙ্-র মধ্যে স্টালিন নীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত এবং আরও পরে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী আন্দোলনের ছেঁড়া সুতোয় আর জোড়া লাগেনি। যে-সব সৃজন-ধর্মী লেখক এই আন্দোলনের পিছনে ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই একে একে রাজনীতি তথা বাস্তববাদের পক্ষপুট ত্যাগ করে ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নীতি সাহিত্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা এ যুগের শ্রমিক-কৃষক এবং নিম্ন বিত্ত শ্রেণী-কেন্দ্রিক বাস্তববাদী সাহিত্য এই আন্দোলনের প্রভাব-পুষ্ট। পূর্বযুগে যাঁরা বাস্তববাদী সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তনের ফলে বাস্তববাদকে বর্জন করেছেন। সুতরাং পঞ্চাশোত্তর যুগের বাস্তববাদী উপন্যাসে প্রোথিতযশা লেখকদের অনুপস্থিতি সহজেই নজরে পড়ে। তাঁদের বদলে কিছু সংখ্যক তরুণ লেখককেই বাস্তববাদের আসরে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

দুই দশকের বাস্তববাদী ফসলের দিকে তাকালে প্রথমেই যে তফাৎটা নজরে পড়ে তা এই যে চল্লিশোত্তর যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন কেন্দ্রিক, এবং পক্ষান্তরে পঞ্চাশোত্তর উপন্যাস মূলতঃ জীবন-যাত্রা কেন্দ্রিক। সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীবাদী আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, আগস্ট আন্দোলন—প্রভৃতি মোটাদাগের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো চল্লিশোত্তর উপন্যাসে ছায়াপাত করেছে। কিন্তু, তুলনায় পঞ্চাশোত্তর যুগ যথেষ্ট ঘটনাবহুল নয় বলেই হয়তো এ যুগের উপন্যাসে নিম্নবিত্ত মানুষের নিবিড়তর ঘনিষ্টতর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে শুধু ঘটনাবাহুল্যের অভাবই যে এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী তা নয়। এক হিসাবে বলা চলে পঞ্চাশোত্তর যুগ অন্তরানুসন্ধানের যুগ, চিন্তার সংকটের যুগ। বাইরের বড় বড ঘটনাগুলি জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে, তার প্রচণ্ড কলরব নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কিন্তু শুধু সংঘাত আর উত্তেজনা নিয়েই মানুষের জীবন নয়; মানুষ প্রধানতঃ তার মনের রাজ্যের বাসিন্দা। বাইরের কলকোলাহলের মধ্যে মত্ত হয়ে থাকলেই জীবনের অমৃতত্ব-লাভ হয় না, কোলাহল যত প্রয়োজনীয়ই হোক, কোলাহলের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের অন্তরের দিকে মানুষকে একবার না একবার দৃষ্টি দিতেই হয়। এই উপলব্ধির ফলে এ যুগের তরুণ লেখকরা আন্দোলনের বদলে যারা আন্দোলন করে তাদের উপর অধিকতর মনোযোগ ন্যস্ত করেছেন। নিম্নবিত্ত-মানুষরা শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের যন্ত্র নয়, তাদের মনেও নানাবিধ গভীরতর অনুভূতি আছে এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে—এবং এ-সব সাহিত্যিকের উপযুক্ত বিষয়-বস্তু। তাছাড়া ১৯৫৭ সালের সংকটের পূর্বেই লেখকদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে—মানুষের রাজনৈতিক সত্তাই কি তার প্রধান পরিচয়? আশ্চর্যের বিষয় এই যে ৬০ সালের পরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক আন্দোলন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, খাদ্যের দাবীতে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, চীন-ভারত ও পাক-ভারত যুদ্ধের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে; কিন্তু সাহিত্যে এ সব ঘটনা দু'একটি ছোট খাটো গল্পে বা কবিতায় ছাড়া আর কোথাও বিশেষ দাগ রেখে যেতে পারেনি। বরং বামপন্থীরা যাঁকে খুব সুনজরে দেখেন না সেই বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' প্রভৃতি দু'একটি উপন্যাসে এবং কিছু কিছু ছোট গল্পে অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং তজ্জনিত নৈতিক অধঃপতনের সার্থক প্রাকৃতবাদী চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

এ যুগের লেখকরা যে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-যাত্রার চিত্র দিতে চেয়েছেন তার জন্য প্রাকৃতবাদী রীতিই প্রশস্ত ছিল। প্রাকৃতবাদী রীতি অনুযায়ী কিছু কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে সত্য; কিন্তু বেশীরভাগ লেখকই সমাজ বাস্তবের উপর নিজের নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করতে চেয়েছেন বলে প্রাকৃতবাদের বদলে বাস্তববাদই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। অনেক লেখক আবার মানুষের মনের গহনে মানুষের কর্ম প্রেরণার উৎস আবিষ্কারের চেষ্টায় বাস্তববাদের সঙ্গে চেতনা-প্রবাহের রীতি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। মোটের উপর যে সব বাস্তববাদী লেখক বামপন্থী বাজনীতির প্রতি অনুরক্ত, এমন-কি তাঁদের রচনাতেও মানুষের নিছক সংগ্রামী সত্তা নয়, জটিল রহস্যময় বহু বিচিত্র মানব সত্তার সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

এযুগের এমন কি পাতলা চেহারার বাস্তববাদী বা প্রাকৃতবাদী উপন্যাসও এপিকেব রীতিতে রচিত হয়েছে। একজন নায়ক এবং তার সমস্যার মধ্যে সমাজ বাস্তবের বিপুলতাকে ধরা যায় এ যুগের লেখকদের মধ্যে এ বিশ্বাস কম। সুতরাং অনেক চরিত্র এবং ঘটনার অনেক সূত্র সৃষ্টি করে লেখক তাঁর আলোচ্য সমাজের একটা মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র দিতে চান। শুধু বহিরঙ্গের চিত্র নয়, অন্তর্লোকের চিত্র দিতেও লেখকরা সচেষ্ট। তরুণ লেখকদের উপর অনেক ক্ষেত্রেই মাণিকবাবুর প্রভাব অনুভব করা যায়। এই কারণেই আমি এপিক উপন্যাসের আলোচনার জন্য আলাদা একটি অনুচ্ছেদ ব্যবহাব করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

প্রাকৃতবাদী লেখকদের মধ্যে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। গ্রামের গরীব কৃষকদের অন্তরঙ্গ চিত্র রচনায় বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়তা দাবী করতে পারেন। চাষীদের আন্তরিকতা, সবলতা, তাদের অল্পে-সন্তুষ্ট প্রকৃতিকে লেখক এমন অনায়াসে বিনা আয়োজনে এবং বিনা আড়ম্বরে ফুটিয়ে তুলেছেন যা কেবলমাত্র দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলেই সম্ভবপর। লেখক চাষী চরিত্রদের আদর্শায়িত করতে চেষ্টা করেননি; কিন্তু এই ভালোমন্দ মিশ্রিত মানুষদের প্রতি তাঁর অনাবিল ভালবাসাকে তিনি পাঠকের মনে সঞ্চার করতে পেরেছেন। তাঁর কৃষক-কেন্দ্রিক বই 'চরকাশেম' এবং 'দক্ষিণের বিল' (দু'খণ্ড)-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। দু'খানি বইয়েরই থীমে যথেষ্ট মিল আছে এবং তা নুট হামসুনের 'গ্রোথ্ অব্ দি সয়েল'

নামক গ্রন্থটি দ্বারা অনুপ্রাণিত। কুমারী মাটিতে সোনা ফলাবে কৃষকদের এই মিষ্টি স্বপ্নকে লেখক রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রথম বইতে দুর্ভিক্ষের করাল আক্রমণে কৃষকদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে; দ্বিতীয় বইতে অনেক প্রতিকূলতা পার হয়ে অবশেষে কৃষকরা দূর দিগন্তে একটি রূপালি রেখা দেখতে পাচ্ছে—ধানের তরুণ শীষ তাদের মনে যে উল্লাস জাগায় তার অনুরণন যেন আমরাও শুনতে পাই।

এ বই দু'খানি ছাড়া লেখক 'কণকপুরের কবি' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি বই লিখেছেন। কিন্তু স্নেহপ্রবণতাব আধিক্যের ফলে তিনি সংঘাতের চিত্রগুলি ভাল জমাতে পারেন না, সেই জন্য বইগুলোতে ভাবপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

গুণময় মান্নার 'লখিন্দর দিগর' এবং 'কটা ভানারি' আর দু'খানি প্রাকৃতবাদী কৃষক-কেন্দ্রিক বই। মাটির কাছাকাছি মানুষদের সঙ্গে যে লেখকের নিবিড় পরিচয় আছে বই দু'খানিতে তার স্বাক্ষর রয়েছে। দু'খানি বইতেই কৃষক বিদ্রোহের একটি পটভূমিকা আছে, আব তার ফলে কৃষক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। পরবর্তীকালে গুণময়বাবু শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে বিপুল কলেবরের বই লিখেছেন। তাঁর 'জোনপুর স্টীল' বইখানি শ্রমিক কেন্দ্রিক দীর্ঘ উপন্যাস। কিন্তু তার প্রথম বইয়ের কৃতিত্বকে তিনি ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

বাস্তববাদের ভিত্তিতে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' একালের একখানি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ উপন্যাস। এক বাড়িতে বারোটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার বাস করে; এইসব পরিবার-ভুক্ত বহু চরিত্র এবং বহু ঘটনার সূত্র অবতারণা করে লেখক সহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের এক ব্যাপক চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। বাইরের ঘটনার চেয়ে মানস ইতিহাস উদ্ঘাটনের দিকে জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নজর বেশী; সেই জন্য অনেক সময় তিনি মানস কথনের কৌশল অবলম্বন করেন। সব সময় তিনি কোন না কোন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী বিবৃত করেন। যদিও ফ্রয়েডের অনুসরণে তিনি মানুষের মনোরাজ্যে যৌন-কামনার প্রাধান্যকে স্বীকার করেন, তথাপি মানুষ যে কী করে তার অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যৌন-কামনার সামঞ্জস্য বিধান করে, নারী-পুরুষকে আকৃষ্ট করে বিনিময়ে কিছু না দিয়ে অর্থ নৈতিক সুবিধা আদায় করে নেয়—

এই সব ঘটনাই তাঁর কৌতুক-প্রসন্ন শিল্প-দৃষ্টিকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। সেই জন্য উল্লিখিত বইখানি ততখানি না একটি বিশেষ স্থানের একটি বিশেষ কালের প্রতিনিধিত্ব-মূলক চরিত্র-চিত্রন হয়ে উঠেছে, যতখানি হয়েছে বিভিন্ন পবিস্থিতিতে মানুষের মানস প্রতিক্রিয়ার রূপায়ন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুব দৃষ্টিভঙ্গীর বক্রতা লক্ষণীয়। তাঁব ভাষা বুদ্ধদেব বসুর ভাষার মতই মার্জিত পরিশীলিত এবং রূপক ধর্মী; তাঁর কাহিনী-বিন্যাস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

বিমল কবের দেওয়াল—চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ বই এ-কালের আর একখানি মূল্যবান সংযোজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পটভূমিকায় রচিত এই বইতে লেখক শুধু যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখেননি। মানুষের দুঃখ বেদনা, নানাবিধ বিকৃতির মূলে এমন এক পরিবেশ রয়েছে যাব সংশোধন মানুষের সাধ্যের অতীত; সুতরাং জীবনেব দুঃখেব গভীরতব উৎসের সন্ধানে তিনি যুদ্ধকালীন পরিবেশের সীমাকে অতিক্রম কবে গেছেন। 'ছুটি' (সিনেমার নাম) এবং আরও অনেক গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির পথে সমাধানাতীত প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বিপ্লবেব পথে উন্নততর সমাজ গঠনেব সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন না; কারণ মানুষের পথে এমন অনেক প্রতিবন্ধক রয়েছে যা মানুষের সৃষ্ট নয় এবং যার প্রতিবিধান মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মত তিনিও অনেক কাহিনীতে যৌন বিকৃতির চিত্র দিয়েছেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র বাবু যেখানে কামনার সঙ্গে সুবিধাবাদের দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেন, বিমল বাবু সেখানে বিকৃতির অবশ্যম্ভাবিতার উপর জোর দেন। জ্যোতিবিন্দ্র বাবু সীনিক; কিন্তু বিমল কর পেসিমিষ্টিক—নৈরাশ্যবাদী।

তরুণ লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসুর জনপ্রিয়তা এখন সব চেয়ে বেশী। আলোচিত লেখকদের সঙ্গে তুলনায় শিল্পী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য সংশয়ের উর্ধ্বে নয়; তবে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। তাঁর কাহিনীর আবেগ-গত আবেদন বেশী এবং বাস্তবধর্মী কাহিনীর মধ্যেও তিনি এমন একটু রোমান্টিক কল্পনার ছোঁয়া যোগ করতে পারেন যা সহজেই পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের নায়ক সিপাহী বিদ্রোহের এক পলাতক সিপাই বাংলাদেশের এক গ্রামে আত্মগোপন করে রয়েছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসের নায়কের সাগরে যাওয়া আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও এমনি একটু রোমান্টিক

ছোঁয়াচ রয়েছে। শুধু উপন্যাসে নয়, ছোট গল্পগুলিও তিনি এমন এক অভাবনীয় বিন্দু থেকে আরম্ভ করতে পারেন যা অপ্রত্যাশিত বলেই চিত্তাকর্ষক।

সমরেশ বসুর প্রায় সমস্ত গল্প এবং উপন্যাসের নায়কের মধ্যেই অবদমিত যৌন কামনা বা কোন অবদমিত ক্ষোভ তার সমস্ত কর্ম-প্রেরণার উৎস। এই অবদমিত কামনা বা ক্ষোভ যে ঠিক ফ্রয়েডীয় অবচেতনের বাসিন্দা তা নয় নায়ক সচেতনভাবে তার সন্ধান পুরো না জানলেও কিছুটা জানে; কিন্তু কামনার অপ্রাপ্যত্য এবং অপ্রকাশ্যতার দরুণ তার মনে এক ধরণের অনির্দেশ্য আকুলতা সৃষ্টি হয়, এবং, বলা অনাবশ্যক, এই আকুলতার মধ্যেও একটি রোমান্টিক আমেজ আছে। এই নায়কের মধ্যে এক ধরণের প্রচণ্ডতা আছে,—সে বেপরোয়া সাহসী, হঠাৎ রেগে যায়, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, অথবা গভীর হতাশা ও আপশোষের মধ্যে ডুব দেয়। এই প্রচণ্ডতার কারণ তার মনের অবরুদ্ধ কামনা। সমরেশ বাবুর অভিজ্ঞতায় এই অবরুদ্ধ আবেগের কোন শেষ নেই, কোন সমাধান নেই, তা নায়ককে কোন জায়গায় নিয়ে যায় না। শুধু কাহিনীর প্রয়োজনে কাহিনী এক সময়ে একটি আকস্মিক মোড় নিয়ে শেষ হয়ে যায়। এই আকুলতা এবং অনির্দেশ্যতাও মূলতঃ একটি রোমান্টিক লক্ষণ। সমরেশ বাবুর নায়কের মানসিকতার মধ্যে অবশ্য জটিলতা এবং ঐশ্বর্যের অভাব; সেই জন্যেই ছোট গল্পে তিনি যতখানি সার্থক, উপন্যাসে ততখানি সার্থক নন। উপন্যাসের দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন, ঘটনার পর ঘটনা যোগ করেন, কিন্তু কাহিনী এগুতে চায় না।

সমরেশবাবুর প্রথম যুগের উপন্যাসের মধ্যে 'উত্তরঙ্গ', 'বি টি রোডের ধারে', 'নয়নপুরের মাটি', 'গঙ্গা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বইগুলির মধ্যে 'গঙ্গা' বইখানিই বোধকরি কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ। কাহিনীর মূল আবেদন রোমান্টিক হলেও জেলেদের ইলিশ মাছ ধরার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। বইখানিতে তিনি যে বিষয়োপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। 'উত্তরঙ্গে'র পরের খণ্ড 'জগদ্দলে' চটকলের গোড়া পত্তনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বইখানি প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি লেখকের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাবে এবং কাহিনীগত ঐক্যের অভাবে। এ বইখানি আর একবার করে প্রমাণ করেছে বড় বই রচনার প্রয়াস সমরেশবাবুর প্রতিভার অনুকূল নয়।

উপরোক্ত লেখকদের সঙ্গে তুলনায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের অভিজ্ঞতার

পরিসর অনেক বেশী বিস্তীর্ণ। সার্থক এপিক উপন্যাস রচনার জন্য জীবনের বৈচিত্র্য ব্যাপকতা এবং আপেক্ষিকতা সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকা দরকার অমিয় বাবুর তা আছে। তাঁর উপন্যাসে বহু বিভিন্ন চরিত্র ভীড় করে এসেছে, অথচ তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা দেশের আর কোন লেখক এত অফুরন্ত চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেননি। উপরে আলোচিত লেখকগণ, এদং অনালোচিত আরও অনেক সমশক্তিমান লেখক যথেষ্ট শক্তির অধিকারী, ঐতিহ্য-সূত্রে তাঁরা যে পরিণত ভাষা এবং কলা কৌশলের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে জানেন; তথাপি তাঁদের কেউই মধ্যম স্তরের—মিডিয়োক্রাইটির—গণ্ডী পেরুতে পারবেন কিনা সন্দেহ। একমাত্র অমিয়ভূষণের মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা 'নীল ভুঁইঞা' পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পরবর্তী বই 'গড়শ্রীখণ্ড' আরও পরিণত রচনা। একটি অঞ্চলের সমস্ত শ্রেণী—জমিদার, কৃষক, মধ্যবিত্ত, সরকারি চাকুরে—থেকে তিনি প্রতিনিধিমূলক চরিত্র সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে শ্রেণীগত চরিত্র অক্ষুন্ন আছে, অথচ তারা ব্যক্তি হিসাবে বিশিষ্ট।

অমিয়ভূষণ নিপুণ শিল্প-বোধের অধিকারী। ঘটনা, মানস প্রতিক্রিয়া এবং মানস বিশ্লেষণের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য বিধান করে চলেন। অনেক ঘটনার সূত্র যাতে একেবারে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় সে-জন্য তিনি কিছু কিছু সাধারণ সমস্যার অবতারণা করেন। একটি বিস্তীর্ণ সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রার সামগ্রিক চিত্র তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন; তাতে কোথাও এক আধটি ঘটনা যদি খাপছাড়া বা অবান্তর বলে বোধ হয় তবে প্রয়াসের বিপুলতার তুলনায় সে ত্রুটি সামান্য।

স্নেহপ্রবণ মন বলে অমিয়ভূষণের হাতে দারুণ সংঘাত বা বিক্ষোভের চিত্র ভাল জমে না। মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি এ কথা তিনি স্বীকার করলেও শুভবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদের সাহায্যে মানুষ পরিবেশ-সৃষ্ট বিরোধ বা সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারে—এরকমের একটা সরল বিশ্বাস তাঁর মনে আছে। সেইজন্যই তাঁর রীতি প্রাকৃতবাদ এবং বাস্তববাদের সংমিশ্রণ। কিন্তু তাঁর উপন্যাস পড়লে মনে হয় না যে কোন পরিচ্ছন্ন জীবন-দর্শন তিনি এখনো আয়ত্ত করতে পেরেছেন। জীবনের এক বিপুল এবং বিচিত্র প্রকাশকে

তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ; কিন্তু সে জীবন কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, বা আদৌ চলছে কিনা—এ সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। এইখানেই তাঁর উপন্যাসের অপূর্ণতা।

নব নিরীক্ষামূলক উপন্যাস

পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী হয়তো স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শতকে টেকনিকের অভাবনীয় উন্নতি আশার চেয়ে আশঙ্কাই সৃষ্টি করেছে বেশী। দু'টি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের উপর টেকনিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। বিরাট বিরাট আধুনিক শহরে কীটের মত মানুষ নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে। একটি শহর একটি বিরাট সংগঠন। সহস্র অদৃশ্য হস্ত আমাদের নানাবিধ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে ; অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এক একটি ট্রেড ইউনিয়নের অধীনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ; আধুনিক একটি ট্রেড ইউনিয়ন একটি সরকারের মত বিরাট ; কর্মকর্তাদের আদেশ শ্রমিকদের মানতে হয়, অথচ শ্রমিকের কাছে তারা দুর্নিরীক্ষ, নভোচর জীব।

সুতরাং সংগঠনগুলি যত বড় হচ্ছে ততই তাদের একটা যান্ত্রিক অমানবিক রূপ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন এক যন্ত্র-শাসিত দুনিয়ায় বাস করছি ; যন্ত্রের উপর আমাদের মরণ বাঁচন নির্ভর করছে, কিন্তু তার উপর আমাদের প্রকৃত অর্থে কোন কর্তৃত্ব নেই।

পৃথিবীতে টেকনিকের হাতে মানুষ এত ক্ষুদ্র অসহায়, কিন্তু ফ্রয়েড প্রমাণ করে দিয়েছেন আমাদের মন এক বিশাল সাম্রাজ্য ; এর মধ্যে কত গলি ঘুঁজি কত অনালোকিত প্রদেশ। শুধু তাই নয়, ইউং-এর মতে লক্ষ বছর আগের আদিম মানুষ ধারাবাহিকতার সূত্রে আজও আমার মধ্যে বিদ্যমান।

মার্কসের সংগ্রাম-তত্ত্ব জানার পর আজ আমরা বুঝেছি মানুষকে কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রেণীর অভ্যন্তরীন সংগ্রাম, পারিবারিক পেশাগত ক্ষেত্রে সংগ্রাম, নিজের অন্তরে সংগ্রাম।

আজ আমরা বিশ্বাসহীন, অথচ বিশ্বাস আমাদের দরকার। আমরা দায়িত্বহীন হয়ে বাঁচতে চাই, অথচ দায়িত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সমস্ত নীতিকে অস্বীকার করতে চাই ; কিন্তু পারি না।

বিংশ শতকের মানুষ এইভাবে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রাকৃতবাদ বা বাস্তববাদের পদ্ধতিতে স্থান কালের পারম্পর্য বজায় রেখে ঘটনার সূত্রকে অনুসরণ করে মানুষের এই অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া যায় না বলে অনেক লেখক অনুভব করেছেন। ঘটনার সূত্রকে অনুসরণ করতে গেলে মনের যেটুকু অংশের পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের মন তার চেয়ে অনেক বড়। সেইজন্য চেতনা-প্রবাহেব রীতির জন্ম—যার উদ্দেশ্য চেতন মনের চিন্তা-বুদ্বুদের মধ্যে অচেতন মনেব প্রতিচ্ছায়াকে আবিষ্কার করা।

মানুষ আজ এমন সব গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে যা ঘটনায় প্রকাশিত তাব কর্মজীবনের মধ্যে ধরা পড়ে না। অথচ বাইরের ঘটনা নয়, সেইসব অভিজ্ঞতাই মানব-অস্তিত্বের গভীরতর সত্যের দ্যোতক। সেইজন্য এই গূঢ়তর বাস্তবকে বিধৃত কবাব জন্য ইম্প্রেসনিজম্, এক্সপ্রেসনিজম প্রভৃতি রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

অস্তিত্ববাদ মানব অস্তিত্বেব কতকগুলো মৌল সত্যকে আবিষ্কার করতে চায়। এই তত্ত্বেব মতে মানুষেব কতকগুলি সমস্যা হল—নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা-বোধ, দুশ্চিন্তা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, অর্থহীনতার অনুভূতি প্রভৃতি। অনেক লেখক এইসব সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখছেন। প্রয়োজন বোধে তাঁরা চেতনা-প্রবাহের রীতি প্রতীক-ধর্মিতা প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করছেন।

পাশ্চাত্ত্যেব এইসব নব্যচিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে নব্য রীতি অনুযায়ী বাংলাসাহিত্যে পরিবেশন করাব জন্য কিছু তরুণ লেখক আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের প্রয়াসগুলি কয়েকটি ছোট গল্প এবং দু'চারখানি ছোট উপন্যাস রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ফসল তেমন উল্লেখযোগ্য না হয়ে উঠলেও এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা দরকার।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যেব অভিজ্ঞতা বাংলা দেশের সমাজে কতখানি সত্য হয়ে উঠেছে চিন্তা করে দেখা দরকার—তত্ত্বচিন্তা অন্য দেশ থেকে ধার করা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতা যার যার নিজস্ব ব্যাপার, আর সাহিত্যের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশে শিল্পায়ন এখনো প্রাথমিক স্তরে। যে কারগরি জ্ঞান আমরা আমদানী করছি তা আমাদের উদ্ভাবিত নয়, এবং তা উদ্ভাবনের জন্য সমাজে যে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার দরকার এ দেশে তার অভাব আছে। সুতরাং কলকারখানাকে আমরা অনেকটা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে গণ্য করি; তা আমাদের রীতি নীতি ধ্যান ধারণায় প্রত্যাশানুরূপ পরিবর্তন ঘটায়নি। আমরা অনেকে শহরে বাস করি বটে, কিন্তু গ্রামীণ

অভ্যাসগুলোকে এখনো বর্জন করিনি। এই অবস্থায় অনুকরণাত্মক কর্মের সাহায্যে আমরা যদি পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতাকে এদেশে পরিবেশন করি তো এ দেশের লোক কি তাকে আপনার জিনিস বলে গণ্য করতে পারবে? একথা মনে রাখা দরকার সাহিত্যের রূপ রীতি বিদেশ থেকে ধার করা যায়, কিন্তু বিষয়বস্তু নিজের দেশের মাটি থেকে সংগ্রহ করতে হয়। বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী রূপরীতিকে রূপান্তরিত কবে নেওয়ায় বাধার কিছু নেই।
দ্বিতীয়তঃ, বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, বিদেশী কোন রীতিকে আমরা তাঁর বিশুদ্ধি বজায় রেখে গ্রহণ করিনি। বাঙালী প্রতিভা সংমিশ্রণে এবং নিজের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত করে নিতে খুব পটু। এর একটি কারণ আমাদেব দেশে সমালোচনা ও সাহিত্য-তত্ত্বমূলক শিক্ষাব অভাব। এখনো আমাদেব দেশের কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পত্র পত্রিকায় এই শিক্ষার পরিপোষক আলোচনা খুব কম, পুস্তকাদি আরও কম। কাজেই আমাদের দেশে সৃজনশীল সাহিত্যের যতখানি অগ্রগমন হয়েছে, সমালোচনা সাহিত্যের তা হয়নি। আমি এমন কথা বলছি না যে রূপ রীতি ও তত্ত্বমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য এ সব জিনিসেব অবিকৃত প্রয়োগ। কোন রীতিকে আমরা অবিকৃত ভাবেই প্রয়োগ করি, আর বিকৃত-ভাবেই করি, সেটা যেন আমরা সচেতনভাবে কবি, আর যেটাই আমরা করি সেটা যেন শিল্প-সম্মত হয়ে ওঠে।
যাই হোক, উপরোক্ত দুটি সক্রিয় কারণ বয়েছে বলেই সাম্প্রতিক কালের রূপ রীতি এবং বিষয়বস্তুকে অন্ধভাবে অনুসরণ কবা সঙ্গত কিনা চিন্তা করে দেখা উচিত। আমাদের প্রতিভা পরিবেশ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা একটি সজীব সত্ত্বা। আধুনিকতার মোহে তার উপর বলাৎকার কবা সহজ, কিন্তু ধারাবাহিকতাব সূত্র একবার ছিঁড়ে গেলে তা জোড়া লাগানো সহজ নয়।
পরীক্ষামূলক সাহিত্য প্রয়াসের অবশ্য প্রয়োজন আছে। পুরোন প্রচলিত রীতিতে নতুন অভিজ্ঞতাকে রূপদান করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এবং প্রত্যেক নতুন যুগ সাহিত্যের জড়ত্ব ভাঙবার জন্য নতুন ভাবে নতুন বিষয়বস্তুকে উপস্থিত করবে এটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা। আমার বক্তব্য এইটুকু যে বিদেশী জিনিসের অনুকরণ বিপজ্জনক পন্থা; কিন্তু লেখক তাঁর নিজের এবং তাঁর

দেশের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনানুযায়ী বিদেশী শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারেন বৈকি!

এখন পর্যন্ত বাংলা দেশে নব পরীক্ষা-মূলক রচনার মোট ফসল খুব সামান্য। কিছু দুর্বোধ্য কালানুক্রমিতা-বর্জিত এবং প্রতীক-কণ্টকিত ছোট গল্প রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা এখনো অনুল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের ব্যবসাদার কাগজ এবং প্রকাশালয়গুলি স্বাভাবিক কারণেই এই ধরণের পরীক্ষামূলক জিনিসের পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজী নয়। সুতরাং তরুণ লেখকদের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

নির্মীয়মান সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ নয়। যে সব পরীক্ষামূলক উপন্যাস সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দু' চার খানা মাত্র আমার নজরে পড়েছে। উদাহরণ হিসাবে সেগুলিরই এখানে উল্লেখ করছি।

অসীম রায়ের 'দ্বিতীয় জন্ম' একটি মিশ্রিত রীতির উপন্যাস। পুরোপুরি প্রাকৃতবাদী কাঠামোর মধ্যে তিনি একটি ফ্যাণ্টাসির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু ফ্যাণ্টাসিটিও একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়। এক বন্ধু তার এক টি-বি রোগগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করছে সে রোগমুক্ত হবে এই ভরশায় নয়, সে নিশ্চিত মারা যাবে এই ধারণা বশতঃ। তার উদ্দেশ্য বন্ধুর বিলম্বিত মৃত্যু-যাত্রার মানস-অভিজ্ঞতাটুকু সে জানবে। বন্ধুটি সুস্থ হয়ে উঠল বলে সে হতাশ। তার এই মৃত্যুমুখী অসুস্থ মানসিকতা পুরীতে নুলিয়াদের জীবন যাত্রা দেখে আরোগ্য লাভ করল। কাহিনীর এই সমাপ্তি অবশ্য খুব দুর্বল; অপরের জীবনের ঘটনা থেকে নায়কের পক্ষে কোন গভীর শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়, কারণ ইচ্ছে করলে নায়ক খুব সহজে সেই একই ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারত। কিন্তু কাহিনীর আরম্ভটা খুব সুন্দর। আধুনিক সভ্যতার একটি বিশেষত্ব মৃত্যুমুখিনতা—এই এক্সপ্রেসনিষ্টিক বিষয়বস্তুকে লেখক প্রাকৃতবাদী কাঠামোর মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন' বইটি বাস্তববাদের সঙ্গে মানস-কথনের রীতির মিশ্রণের উদাহরণ। মানুষের কোন স্থির চরিত্র নেই, বিভিন্ন পরিবেশে একই মানুষের বিভিন্ন চরিত্র প্রতিভাত হয়। কাহিনীর নায়িকার চরিত্র বাড়িতে একরকম, স্কুলে আরেক রকম, প্রেম এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তার তৃতীয় ব্যক্তিত্ব আভাসিত। অবশ্য এই তিন ভুবনের মধ্যে এক

অদৃশ্য ধারাবাহিকতার সূত্র আছে। সুতরাং লেখকের অভিজ্ঞতা আধুনিক; এবং এই আধুনিক অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি গল্প বলার প্রচলিত রীতিকে সামান্য রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। কিন্তু কোন উগ্র আধুনিক রীতি গ্রহণ না করেও তিনি নিজের প্রয়োজন সাধন করতে পেরেছেন।

প্রাকৃতবাদী রীতিতে, অর্থাৎ স্থান কাল এবং ঘটনার পারম্পর্য অব্যাহত রেখে এবং আমাদের অভ্যস্ত ভাষা এবং ব্যাকরণে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি না করে যেমন জেমস্ জয়েস্ প্রমুখ চেতনা প্রবাহের লেখকগণ করেছিলেন, সেই সঙ্গে একটি ফ্যাণ্টাসি বা আজগুবি ঘটনা বা ফ্যাণ্টাসি-সুলভ কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রসঙ্গ বা সমস্যার সংমিশ্রণ করে খুব সার্থক তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী রচনা করেছেন টমাস মান, আঁন্দ্রে জিদ্, কামু প্রমুখ লেখকগণ। বাংলা দেশে আলোচিত বই দু'খানিতে কম বেশী এই রীতি অনুসৃত হয়েছে এবং সমরেশ বসুর বহু আলোচিত 'বিবর' উপন্যাস খানিকেও অনুরূপ প্রয়াস বলে গণ্য করা যায়। 'বিবব উপন্যাসের কাহিনীর কাঠামোটি ডস্টয়েভ্স্কির' 'ক্রাইম্ এণ্ড পানিশমেণ্ট' নামক বই থেকে সংগৃহীত, এবং তার সঙ্গে লেখক অবদমিত কামনার মনস্তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবদমিত কামনাব মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব এই যে একবার এই মানসিকতা কাউকে পেয়ে বসলে কামনার অতি পরিতৃপ্তিতেও কামনার নিবৃত্তি ঘটে না।

কেবল নিরন্তর কামনা-পরিতৃপ্তির অন্বেষণের ফলে একধরনের ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণা জন্মায়। শিকারের পিছনে শিকারীর নিরন্তর ছোটাকেই লেখক বিবর বলেছেন। কারণ শিকারী এই পাপ-চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পারে না। এমনি এক বিতৃষ্ণার চরম মূহূর্তে নায়ক একটি নারীকে খুন করেছে। ঘটনা এবং তার উপযুক্ত পরিবেশকে লেখক চমৎকার ভাবে উপস্থিত করেছেন। হত্যার পর মানস কথনের রীতিতে নায়কের মানসিক অবস্থার উদ্‌ঘাটনে লেখক খুব সার্থক হননি। কারণ প্রকৃত পক্ষে মানস কথনকে লেখক নায়কের পূর্ববর্তী জীবনের পরিচয় দানের উপায় হিসাবে ব্যাবহার করেছেন। এই ধরনের কৌশল—যাকে সিনেমায় ফ্লাস-ব্যাক বলে—কাহিনীতে ছেদ সৃষ্টি করে বলে এবং অতীত ঘটনার বর্ণনায় নাটকীয়তার অভাব সৃষ্টি করে বলে কৌশল হিসাবে বর্জনীয়। লেখক আশা করেছেন অতীতের বিবরণ হলেও যেহেতু বর্ণনীয় বিষয় নীতি-বিগর্হিত সেক্স, সেহেতু পাঠকের আকর্ষণ বজায় থাকবে; এবং লেখকের অনুমান অনেকখানি ঠিক। পরবর্তী কালে নায়ক

যে আপিসে ওপরওয়ালার আদেশ অনুযায়ী পূর্বকৃত একটি সত্য রিপোর্টকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে রাজী হল না এবং আদর্শনিষ্ঠার ধ্বজা ধারণ করে চাকরি ত্যাগ করল—এ-ঘটনা পূর্ব ঘটনার সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিহীন। লেখক আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে লোকটি বিবর কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে; হত্যা তার প্রথম চেষ্টা, এবং চাকরি ত্যাগ দ্বিতীয়। তার হত্যার কাজটি মনস্তত্বসঙ্গত হতে পারে; কিন্তু বিবর কেটে বেরিয়ে আসার পথে পদক্ষেপ হত্যা নয়। সে তো দুর্নীতির প ।চক্র থেকে মুক্তি চাইছে, কিন্তু হত্যা তাকে ঘটনার অবধারিত লজিক অনুযায়ী আরও গভীরতর পাপচক্রের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। আইনের হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতা তাকে নিশ্চয়ই গভীরতর অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করবে, এবং অনেক যন্ত্রণা ভোগের পর হয়তো তার পক্ষে, পাপ মুক্তির আলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাংলা দেশের স্টেজে গলা কাঁপিয়ে বলতে পারলে ক্ল্যাপ পাওয়া যায়; বাংলাদশের উপন্যাসে তেমনি নায়ককে দিয়ে একটি মহৎ কাজ করাতে পারলে পাঠককে সন্তুষ্ট করা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় শিল্প-লক্ষ্মী অত সহজে সন্তুষ্ট হন না। বইখানির আরম্ভ অনেকটা অস্তিত্ববাদ-মূলক কাহিনীর অনুকূল হলেও, লেখক কাহিনীর পরবর্তী অংশকে সে-ভাবে গড়ে তোলেননি। অস্তিত্ববাদ-মূলক কাহিনীতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা-বোধ থাকে, ঘটনার অপরিহার্যতা এবং ঘটনা-স্রোতে নায়কের অসহায়তার অনুভূতি থাকে; অবশেষে যন্ত্রনাসাগরের ওপারে সন্ধ্যাতারার আবির্ভাবের মত নায়কের চেতনায় একটি জীবন সত্য ও প্রত্যয় উদ্ভাসিত হয়। সমরেশ বাবুর কাহিনীতে এ জিনিস নেই। এটিএকটি মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির কাহিনী যার মধ্যে শেষের অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত।

সুতরাং বাংলা দেশের নব্য রীতির পরীক্ষামূলক প্রয়াসগুলি এখনো কোন উচ্চ সার্থকতার বন্দরে পৌছায়নি। তথাপি এই প্রয়াসগুলি অভিনন্দন যোগ্য। বিভিন্ন রীতির মিশ্রণেব সাহায্যে জীবনের গভীরতর উপলব্ধি বা প্রতীয়মান বাস্তব অপেক্ষা গভীরতর বাস্তবকে রূপ দেওয়া সম্ভব। আধুনিক লেখকরা যদি লক্ষ্য করেন তবে প্রাচীন ভারতের মিথ, লোক-কথা, কিংবদন্তী প্রভৃতির মধ্যে বহু রূপক এবং প্রতীক্ ধর্মী রচনার মাল মসলা ছড়িয়ে রয়েছে।